বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড : আলোচনা

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ্. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ
১৯৬২

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪
সংস্করণ, ১৯৫৭
সংস্করণ, ১৯৬২

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থনা
নিউ ক্যালকাটা বাইণ্ডার্স
৫, নবীন পাল লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীমন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১/১, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য বার টাকা পঞ্চাশ ন. প. মাত্র

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য

এম. এ. ; বি. এল্. ; পি. আর. এস্. ; দর্শনসাগর

মহোদয় শ্রীচরণেষু

'আমার সোনার বাংলা,

আমি তোমায় ভালবাসি,

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলার লোক-সাহিত্য' পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রায় এক বৎসর পূর্বেই গ্রন্থখানি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, ইহার বৃহৎ আয়তনের জন্যই মুদ্রণ কার্যে এই বিলম্বটুকু অপরিহার্য হইল, সুতরাং পুস্তকখানির অভাবের জন্য যাঁহাদের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের নিকট দুঃখপ্রকাশ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

তৃতীয় সংস্করণে ইহার কলেবর আরও বৃদ্ধি পাইল। তবে ইহার ভূমিকা অংশটিই বিস্তৃততর করার প্রয়োজন বোধ করিয়া প্রধানতঃ এই অংশই ইহাতে বিস্তৃত করা হইল; অন্যান্য অধ্যায়গুলি এই গ্রন্থের মধ্যে বিস্তৃত না করিয়া প্রত্যেকটি অধ্যায় লইয়াই এই গ্রন্থের এক একটি স্বতন্ত্র খণ্ড প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল; সুতরাং বর্তমান গ্রন্থখানিকে 'বাংলার লোক-সাহিত্যে'র প্রথম খণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা গেল; ছড়ার সংকলন ও আলোচনামূলক এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এইভাবে বিষয়গুলিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত না করিয়া প্রকাশ করিলে ইহাদের বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। 'বাংলার লোক-সাহিত্যে'র এই প্রথম খণ্ডে সাধারণভাবে বিষয়টির আলোচনা করা হইল, অন্যান্য খণ্ডে প্রত্যেক বিষয়েরই সঙ্কলন এবং বিস্তৃততর আলোচনা প্রকাশিত হইবে। পাঠকবর্গের মধ্যে আগ্রহের পরিচয় াইলে এই গ্রন্থখানি এই প্রকার অন্ততঃ ছয়টি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে এই বিস্তৃত পরিকল্পনা করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রকাশিত হইবার পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার াাক-সাহিত্যের অনুশীলন সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং যে সঙ্কোচ এবং আশঙ্কা লইয়া আমি এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের ম্মুখে প্রথম উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে। কয়েক ৎসরের মধ্যেই এমন একখানি গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার ধ্যেই ইহার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ কলিকাতা বশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় লোক-সাহিত্য একটি বিশেষ পাঠ্য

বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সাহিত্য বিষয়ের ষোলজন ছাত্রছাত্রীর একটি দল বর্তমান গ্রন্থকারের নেতৃত্বে পুরুলিয়া জিলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী বিভিন্ন পল্লী অঞ্চল হইতে লোকসাহিত্যের বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লোক-সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিয়া কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়াছেন। এই সকল কারণেই বিষয়টিকে আমি বিস্তৃততররূপে উপস্থিত করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি।

এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা করিয়া আমি কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকট সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া একটি আবেদন প্রচার করিয়াছিলাম। তাহাতে যে আশানুরূপ সাড়া পাইয়াছি, এ' কথা বলিতে পারি না। কারণ, ইংরেজ প্রবর্তিত উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্র হইতেই লোক-সাহিত্যের সকল সংস্কার নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজ কিংবা পারিবারিক জীবন আশ্রয় করিয়া যে শিক্ষা এ'দেশে বিস্তার ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, সেই সংহত গ্রাম্য জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও আমাদের মধ্যে আজ আর অবশিষ্ট নাই। সেইজন্য উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাদের সন্ধান করা বৃথা। সুতরাং কয়েকটি বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্রের (Basic Training School) ছাত্র ও শিক্ষকদিগের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে পাই নাই। এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ জিলার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। ইহার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেনগুপ্ত এই বিষয়ে উৎসাহী হইয়া তাঁহার ছাত্রদিগের মাধ্যমে বাংলা লোক-সাহিত্যের যে বিপুল উপকরণ এখনও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতেই আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে, বাংলার পল্লী এখনও প্রাণ-শূন্য হয় নাই, এখনও অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রাণরসের উৎসটি আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই আমি বাংলার লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও আশান্বিত আছি।

লোক-সাহিত্য অনুশীলনের দুইটি পদ্ধতি আমাদের সম্মুখে আজ দেখা যাইতেছে—প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত পদ্ধতি, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্ত্য গবেষকদিগের প্রবর্তিত পদ্ধতি। পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিরও দুইটি বিভাগ—একটি মার্কিন পদ্ধতি

আর একটি ইউরোপীয় পদ্ধতি। ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত পদ্ধতিটিই হৃদয়ের উপর স্থাপিত, পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি দুইটিই মস্তিষ্কের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথে যেমন হৃদয়ের মধ্যে রসোপলব্ধি এবং তাহার মধ্য দিয়াই সত্যদর্শন, পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের পথে কেবল বস্তু-বিশ্লেষণ এবং সংখ্যা-নিরূপণ। এই উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়াই লোক-সাহিত্য অনুশীলনের আদর্শ পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কারণ, লোক-সাহিত্য সাহিত্য হইয়াও সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ এবং ব্যবহারিক দিকটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সেইজন্য ইহার বিচারে অনুভূতির যেমন প্রয়োজন, বুদ্ধিরও তেমনই আবশ্যক। বর্তমান গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্র এবং পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করা হইয়াছে, হয়ত সেই প্রয়াস সর্বত্র সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি গ্রন্থকারের তাহাই লক্ষ্য।

এই গ্রন্থখানি রচনা করিবার জন্য ১৯৫৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থকারকে পি-এইচ্. ডি. বা 'ডক্টর অব ফিলসফি' উপাধি দ্বারা এবং ১৯৬১ সনে কলিকাতার পত্রিকা-যুগান্তর প্রতিষ্ঠান 'শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার' দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সেইজন্য আমি এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই সম্মান আমার পরিবর্তে বাংলার যে সকল অগণিত পল্লীকবি নিজেদের পরিচয় বিসর্জন দিয়া যুগে যুগে বাংলার প্রাণের প্রবাহটি রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রাপ্য—আমার এই সম্মান সেই অজ্ঞাত-পরিচয় নিরক্ষর পল্লীকবিদিগেরই কবিত্বের স্বীকৃতি।

বর্তমান সংস্করণের শব্দসূচীটি রচনার কার্যে আমার স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্র এম. এ. আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, বর্তমান ছাত্র শ্রীমান্ তুষার চট্টোপাধ্যায়ও আমাকে নানাভাবে সাহায্য দান করিয়াছেন, সেজন্য উভয়ই আমার আশীর্বাদভাজন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩৬৮ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আশাতীত অল্পদিনের মধ্যে 'বাংলার লোক-সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে সামান্য কিছু বিলম্ব হইয়া গেল; ইহার কারণ, প্রথমতঃ এই প্রকার বৃহদায়তন একখানি গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য অল্পদিনে সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন, দ্বিতীয়তঃ এত শীঘ্রই পুস্তকখানি পুনরায় মুদ্রণের প্রয়োজন হইবে, তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া আমি ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ধন কার্য ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারি নাই। তথাপি গ্রন্থখানি দ্বারা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ইতিমধ্যেই যে অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যাহাতে ইহার অভাবে শিথিল হইয়া পড়িতে না পারে, সে'জন্য ইহার পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও মুদ্রণের কার্য আমি যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পূর্ণ করিতে যত্নের ক্রটি করি নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানির কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে—কারণ, ইহার প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে বাংলা লোক-সাহিত্যের সংগ্রাহক, গবেষক ও অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বহু মূল্যবান্ অপ্রকাশিত সংগ্রহ আমাকে অযাচিতভাবে উপহার পাঠাইয়াছেন, ইহাদের অধিকাংশ আমার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে অনুল্লেখিত ছিল। পুস্তকখানির এই নূতন সংস্করণে এই সকল মূল্যবান্ উপকরণ সংযোগ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। তারপর 'ইতিকথা'* নামক নূতন একটি অধ্যায় গ্রন্থখানিতে যোগ করা হইয়াছে। 'ইতিকথা' কথাটি আমি ইংরেজি legend কথার পরিভাষা রূপে গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ববর্তী সংস্করণে এই বিষয়ক আলোচনা আমি 'পুরাকাহিনী' (myth) নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিতে পাইলাম, পুরা-কাহিনী (myth) ও ইতিকথা (legend)য় যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তাহা বুঝাইতে হইলে, একই অধ্যায়ে ইহাদের উভয়ের আলোচনা করা সঙ্গত হয় না; সুতরাং 'ইতিকথা'র জন্য একটি নূতন অধ্যায় রচনা করিয়া ইহাতে নানা দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টির বিস্তৃততর আলোচনা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি মূল্যবান্ বিষয়

সম্পর্কে অস্পষ্টতার আর কোনও অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না।

বাঙ্গালী নানা কারণে আজ কৃষিমুখী পল্লীজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রাণান্তকর প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী যে সংস্কৃতির সাধনা করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে, পল্লীজীবনের সঙ্গে তাহার যোগ এত অবিচ্ছেদ্য যে, তাহা হইতে তাহার মুক্তি লাভ কোনদিনই সম্ভব নহে। বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা দেশে কত নূতন নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই; তাহারা যে কেবল দৃশ্যতঃ লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে, তাহাই নহে—তাহারা বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনের উপর কোনও স্থায়ী প্রভাবও রাখিয়া যাইতে পারে নাই। সুতরাং আজ নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার যে নূতন সমাজ গঠিত হইবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহার ভিতর দিয়া অন্তত অদূর ভবিষ্যতে কোনও প্রাণ-সঞ্চার হইতে পারিবে না—ইহা সর্বাংশেই কৃত্রিম হইয়া উঠিয়া জাতির মৌলিক জীবন-ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে। লোক-সাহিত্যের প্রতি আধুনিক নাগরিক অধিবাসীর অনুরাগের ইহাই কারণ। এই অনুরাগের পরিচয় বর্তমানে যত সামান্যই হউক, ভবিষ্যতে যে আরও ব্যাপক হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণের কলেবর বৃদ্ধি করিতে সাহসী হইয়াছি।

নূতন তথ্য দ্বারা বর্তমান সংস্করণখানি সমৃদ্ধতর করিবার জন্য যাঁহারা আমাকে অযাচিত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক কবি আশরাফ্ সিদ্দিকির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গ হইতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ যখনই যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তখনই তাহা আমাকে উপহার পাঠাইয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, আমার বাংলার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসকে তিনি এমন আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন যে, তাহাতেই গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার উৎসাহ আমার মধ্যে প্রথম সঞ্চারিত হইয়াছিল। মৌলভি সিরাজুদ্দীন কাশীমপুরী তাঁহার পূর্ব বাংলার লোক-গীতির বিপুল সংগ্রহ হইতে আমাকে কয়েকখানি অপ্রকাশিত গীতি উপহার পাঠাইয়া

বর্তমান সংস্করণের গৌরববৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছেন। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব তাঁহার 'পূর্ববঙ্গ ও পল্লীগীতিকা' গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার পরও বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্যে ব্রতী আছেন, তাঁহার নিকট হইতেও আমি নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ জয়দেব রায় তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'বাংলার লোক-সঙ্গীত' নামক গ্রন্থখানির জন্য যে সকল নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার নিজের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই আমার ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছিলেন। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্যে তরুণ গবেষক শ্রীযুক্ত সুধীর করণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছেন—তাঁহার সংগ্রহ হইতেও আমি সাহায্য লাভ করিয়াছি। বাংলার লোক-সাহিত্যের উপরোক্ত সংগ্রাহক ও গবেষকগণ ব্যতীতও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে লোক-সাহিত্যের কত অনুরাগী ব্যক্তি যে তাঁহাদের সংগৃহীত উপকরণ আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমার কার্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করাও অসম্ভব। ইঁহারা প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে অপরিচিত—কেবল মাত্র লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ভিতর দিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে; এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে যে অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতেই আমার গ্রন্থের এই নূতন সংস্করণ প্রকাশের কার্যে সর্বদা উৎসাহ লাভ করিয়াছি।

লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে সংরক্ষণ করিবারও একটি দায়িত্ব আছে। কেবল মাত্র লোক-মুখ হইতে শুনিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিলে কিংবা ধারাবাহিক ভাবে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করিলেই সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা যাইতে পারে না। নাগরিক সমাজের সম্মুখে ইহাদের যথার্থ রূপটি তুলিয়া ধরিতে না পারিলে, ইহাদের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। ইহা লোক-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার কঠিনতম অংশ। সৌভাগ্যের বিষয় কলিকাতার 'গম্ভীরা পরিষদ' এই সম্পর্কে সচেতন হইয়া ইহার নির্দিষ্ট শক্তি অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। আমি ইহার সভাপতিরূপে দুই বৎসর যাবৎ ইহার কার্যধারা

অনুসরণ করিতেছি ; তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি, ইহার কর্মিবৃন্দ নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলার লোক-সঙ্গীতের যথার্থ রূপটির সন্ধান করিয়া কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করিতেছেন। অর্থ ও কর্মীর অভাবে কলিকাতার যে একটি লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা-প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে, তাহা বঙ্গীয় লোক-সংস্কৃতি পরিষৎ। ইহার একটি গবেষণাগার ও মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রথম অবস্থায় ইহার সংগ্রহ-বিভাগ আশানুরূপ কার্যও করিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রূপে কার্য করিতে গিয়া আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, কেবল মাত্র অনুরাগ থাকিলেই সংগ্রহ কার্য সম্ভব হয় না, ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। ইহার পরিমিত অর্থবল নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পর, ইহার কার্য আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীতও 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করিবার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতেছে। বাংলার পল্লীসঙ্গীতের সুগায়ক শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত নির্মল চৌধুরী তাঁহাদের নিরলস সাধনা দ্বারা শিক্ষিত সমাজের নিকট ইহার যথার্থ পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত মৌলভি আব্বাস উদ্দীন, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দেববর্মণ প্রমুখ গায়কগণ বহুদিন যাবৎই নাগরিক সমাজের সম্মুখে পল্লীসঙ্গীতের পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট গায়কদিগের প্রচেষ্টার ফলে বাংলার লোক-সঙ্গীত এ'দেশের উচ্চতর সঙ্গীতের পার্শ্বে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে।

এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে যাঁহাদের নিকট সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী মহোদয় আমাকে সর্বদা উৎসাহ ও পরামর্শ দান করিয়াছেন। আশুতোষ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। কবি-বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্ত প্রথমাবধিই আমাকে উৎসাহ দান করিয়া এই বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য জাগ্রত রাখিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার

সহকর্মী বন্ধুগণ যেমন, ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই সর্বদা উৎসাহ লাভ করিয়াছি। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমার সর্বকার্যের উৎসাহ ও পরামর্শদাতা এবং আমার সহপাঠী বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগী আমার সর্ববিষয়েই সহায়ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র কল্যাণভাজন মুহম্মদ আব্দুল হাই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই ইহা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেককেই এই সুযোগে আমার সুগভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থখানির পুনর্লিখনের কার্যে আমার ছাত্রদিগের নিকটও যে পরিমাণ সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহাও কিছুতেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। কল্যাণভাজন শ্রীমান্ অধীর দে আমার সকল কার্যেই সাহায্য করিয়াছেন, শ্রীমান্ শিশির কুমার দাশ ও শ্রীমান্ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতেও কোনও কোনও বিষয়ে সাহায্য লাভ করিয়াছি, কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনিলা শাহ্ কপি তৈয়ারের কার্যে এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় শব্দসূচীটি প্রস্তুত করিবার কার্যে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেককেই আমার আশীর্বাদ জানাইতেছি।

গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ আজ প্রকাশিত হইতে দেখিলে যিনি সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আজ পরলোকে—তিনি আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক খ্যাতনামা দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য মহোদয়। তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৬৪ সাল

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

১৯৫৩ সনের দোল-পূর্ণিমার সময় শান্তিনিকেতনে যে সাহিত্য-মেলার অধিবেশন হয়, তাহার প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট হইতে ইহার লোক-সাহিত্য শাখায় একটি ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করি। সেই অনুসারে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্বোধনে ও বর্তমান উপাচার্য ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য-মেলার প্রথম দিনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে 'বাংলার লোক-সাহিত্যে প্রতিবেশী উপজাতির দান' সম্পর্কে একটি মৌখিক ভাষণ দেই। এই অধিবেশনে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী ব্যতীতও পশ্চিম এবং পূর্ববাংলার বিশিষ্ট প্রতিনিধি ও অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা-সমিতির মৌখিক ভাষণের উপর আমি কোনদিনই কোনও গুরুত্ব আরোপ করি না; কারণ, চিরদিনই দেখিয়া আসিতেছি, শ্রোতৃবর্গের উপর ইহার কোন স্থায়ী প্রভাব হয় না। কিন্তু স্থানগুণেই হউক, কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংক্ষিপ্ত মৌখিক ভাষণটিও সে'দিন মন্ত্রের মত ক্রিয়া করিয়াছে। পরিচিত এবং অপরিচিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই ইহার জন্য আমাকে আন্তরিক সাধুবাদ দিয়া বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। এমন কি, আমার অগ্রজ-প্রতিম কবি শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত আমাকে বাংলার লোক-সাহিত্য-বিষয়ক একখানি আনুপূর্বিক পুস্তক রচনা করিতে পরামর্শ দিয়া তাহা মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। গ্রন্থরচনার পূর্বেই তাঁহার নিকট হইতে এই সহৃদয় প্রতিশ্রুতি ও উৎসাহ লাভ করিয়া আমার দীর্ঘকাল যাবৎ সংগৃহীত এই বিষয়ক উপাদান-গুলির দিকে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম। ইহাই এই পুস্তকখানি রচনার মুখ্য ইতিহাস।

লোক-সাহিত্যের প্রতি অনেকেরই অনুরাগ জন্মগত দেখিতে পাই; কিন্তু আমি তেমন কোন অধিকারের দাবি করিতে পারি না। ইহার প্রতি আমার

আকর্ষণ সৃষ্টি হইবার বিশেষ কতকগুলি কারণ হইয়াছিল, তাহাদের কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে যখন্ আমি সর্বপ্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হই, তখন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তখন বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এ'বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় তাঁহার 'বাংলা প্রবাদ' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৯) নামক সুপরিচিত সঙ্কলনে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিবার ফলেই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ-সংগ্রহের কার্যে আমি প্রেরণা লাভ করি। তাহার ফলে আমি অল্পদিনের মধ্যেই বহু অপ্রকাশিত সংবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই। তাহাদের কতক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় সঙ্কলিত উক্ত সংগ্রহে স্থান লাভ করিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ অতঃপর যখন সংস্কৃত বিভাগ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তখন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আমি নবগঠিত বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মত লোক-সাহিত্য প্রেমিক ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। ১৯৩৮ সনে মৈমনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ সহরে পূর্ব মৈমনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে তিনি সভাপতি ও আমি সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। এই সম্মিলনীর সভাপতিরূপে লোক-সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে তিনি যে একটি সুচিন্তিত মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সমসাময়িক প্রায় সকল পত্রিকাতেই আনুপূর্বিক প্রকাশিত হইয়াছিল—বহু পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যেও ইহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার লোক-সাহিত্য-প্রীতি কেবল মাত্র বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হইতে একটি লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ-সমিতি গঠন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতির এবং আমি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ পালাগান সংগ্রাহক

স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে তখন জীবিত ছিলেন। আমাদের আমন্ত্রণে তিনি ঢাকায় আসিয়া আমাদের এই পরিকল্পনায় সর্বাঙ্গীণ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইতিমধ্যেই স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, মৌলভি সিরাজুদ্দীন কাশীমপুরী প্রভৃতি আমাদের পক্ষ হইতে সংগ্রাহক নিযুক্ত হইয়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কয়েকটি অপ্রকাশিত পালাগান ও বহু লোক-গীতি সংগ্রহ করেন। আমিও সমিতির পক্ষ হইতে আমার অবসর সময় এই সংগ্রহের কার্যে নিয়োগ করি এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাই। এমন সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লোক-সাহিত্য-সংগ্রাহক কবি জসীমুদ্দীন সাহেব আমার সহকর্মিরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। তাঁহার মত পল্লীসাহিত্যের এত বড় রসগ্রাহী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে আমাদের মধ্যে লাভ করিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ নিতান্ত অপ্রচুর ছিল বলিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের কার্য অগ্রসর হইতেছিল না। অনন্যোপায় হইয়া ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মৌলভি ফজ্‌লুল হক সাহেব ও অর্থমন্ত্রী স্বর্গত নলিনী-রঞ্জন সরকার মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই বিষয়ে বাংলা সরকারের নিকট তিনি অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা উভয়েই তাঁহার প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও তৎসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার জন্য কার্য স্বভাবতঃই আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এমন সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান। কবি জসীমুদ্দীন সাহেবও কর্মান্তর গ্রহণ করিয়া ঢাকা পরিত্যাগ করেন। তারপর যে বৎসর ভারত-বিভাগ হয়, সেই বৎসর আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম পরিত্যাগ করি। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনাটি সেখানেই অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে।

কলিকাতায় আসিয়া আমি কয়েকজন বিশিষ্ট লোক-সাহিত্যরসিকের সান্নিধ্য লাভ করি। তাঁহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ ডক্টর ভেরিয়র এল্‌উইনের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। আমি

তাঁহার গবেষণা-সহযোগিরূপে উড়িষ্যার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী আদিম জাতিসমূহের মধ্য হইতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহারই পরামর্শমত এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষতঃ ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার আদিবাসী অঞ্চল বিস্তৃত ভ্রমণ করিয়াছি। এতদিন পর্যন্ত লোক-সাহিত্য সংগ্রহ আমার সৌখীন বিলাস মাত্র ছিল, কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার ফলেই ইহার আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সঙ্গে আমি পরিচিত হইলাম। বিশেষতঃ লোক-সাহিত্য সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও তথ্যনিষ্ঠার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি লাভ করিয়াছি, তাহাতে এই বিষয়ে আমার মধ্যে সুগভীর প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

লোক-সাহিত্য বিষয়ে বিস্তৃত অনুশীলন করিবার জন্য কিছুকালের মধ্যে কলিকাতার যে কয়টি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কার্য-ধারার সঙ্গেও আমি পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। ১৯৫০ সনে কলিকাতায় নাটোরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ রায় মহোদয়ের উৎসাহ ও কর্মতৎপরতায় ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় বঙ্গীয় লোক-সংস্কৃতি পরিষদ নামক যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, আমিও সূচনা হইতেই তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। বাংলার বিলুপ্ত লোক-সংস্কৃতির উদ্ধারকর্তা স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্রতচারী সঙ্ঘের বর্তমান সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের উৎসাহে বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতির পটভূমিকায় বাংলার লোক-সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য যে National Society of Folk Dance, Music and Art নামক এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আমি সংযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও এই বিষয়ক অধ্যয়নের এই ব্যাপক সুযোগের উপরই আমার এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; অতএব ইহার সঙ্গে আমার যে যোগ, তাহা হৃদয়ের পথে স্থাপিত হয় নাই, মস্তিষ্কের পথেই স্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং আমার এই গ্রন্থে আমি বুদ্ধিজাত যুক্তিতর্ক দ্বারা লোক-সাহিত্যের রস-বিচার করিয়াছি, হৃদয়াবেগের বশীভূত হইয়া রসোদ্গার করি নাই।

বর্তমানে এ' দেশে লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কাহারও সুস্পষ্ট ধারণা নাই; যদিও ৬০ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ইহার প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি বিষয়টির আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের মধ্যে আজিও অনুশীলন আরম্ভ হয় নাই। এই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে সেই অভাব মোচন করিবার সর্বপ্রথম প্রয়াস।

এই গ্রন্থরচনায় যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নহে; তথাপি যাঁহাদের কথা উল্লেখ না করিলে আমার কর্তব্যের নিতান্ত ত্রুটি হইবে, তাঁহাদের কথাই স্মরণ করিতেছি। আমি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ নহি, অথচ বাংলা পল্লীগীতির সুর-সম্পর্কিত কোনও আলোচনা না থাকিলে এই গ্রন্থ যে সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। সুপরিচিত সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সঙ্গীতাচার্য মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের জন্য 'বাংলা পল্লীগীতির সুর-বিচার' নামক একটি নিবন্ধ রচনা করিয়া দিয়া প্রত্যেক লোক-সাহিত্য রসিকেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার এই মূল্যবান্ রচনাটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইল। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোরম গুহঠাকুরতা মহাশয় তাঁহার একটি মূল্যবান্ সংগ্রহ আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। তরুণ শিল্পী শৈলেন মিত্র প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়াছেন। বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় প্রভৃতির নিকট হইতে সর্বদা উৎসাহ ও পরামর্শ লাভ করিয়াছি। কল্যাণভাজন শ্রীমান্ অধীর দে গ্রন্থ রচনাকালে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমার আশীর্বাদ জানাইতেছি। বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় আমার প্রায় দশ সহস্রের মত সংগ্রহ হইয়াছে, এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র খণ্ডরূপে তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা

ভাদ্র-সংক্রান্তি, ১৩৬১

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সংহত সমাজ ও লোক-সাহিত্য

লোক-সাহিত্য কাহাকে বলে ? এই বিষয়ে কেবল মাত্র আমাদের দেশের কেন, পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদিগের মধ্যেও যে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে ইহার সম্বন্ধে একটি বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য সকল সমালোচকই প্রায় একমত হইয়া থাকেন যে, ইহা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে। উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে এইখানেই ইহার মূল পার্থক্য। বিষয়টি একটু গভীর ভাবে এখানে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

সংহত সমাজ বলিতে এখানে যে সমাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত মানব গোষ্ঠীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়া চিরাচরিত প্রথায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়া চলে, তাহাই মনে করা হইয়াছে; কিন্তু যে সমাজ কেবল মাত্র নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, তাহা মনে করা হয় নাই। বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য কথা দুইটিতে একটু পার্থক্য আছে। যে সমাজ বাহির হইতে নিত্য নূতন উপাদান গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে, সেই সমাজ আপাতদৃষ্টিতে বাহিরের দিক দিয়া পরিবর্তিত বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃত অন্তরের দিক দিয়া অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়; কারণ, এখানে একটি কথা বলিয়াছি যে, বহিরাগত উপকরণ সমূহ যে নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে; এই নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া লওয়ার মধ্যেই ইহার স্বকীয়তা রক্ষা পায়। কিন্তু যে সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, সে বহিরাগত সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে কোন ভাবেই গ্রহণ না করিয়া কেবলই পরিত্যাগ করিয়া যায়। সাংস্কৃতিক উপকরণ সমূহই সামাজিক সংহতি সৃষ্টির মূল। যে সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণ যত বেশি, তাহার সামাজিক সংহতিও তত দৃঢ়। অতএব যে সমাজ বাহির হইতে কিছুই গ্রহণ করে না,

সর্ববিষয়ে কেবলই পুরুষানুক্রমিক পুঁজির উপরই নির্ভর করিয়া চলে, তাহার পুঁজি শেষ হইতেও বেশি বিলম্ব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশের পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে। এইভাবে বহু স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন (isolated) সমাজ পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সমাজ বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজের উপযোগী করিয়া লইতে লইতে অগ্রসর হইয়া যায়, তাহার স্বকীয়তাও যেমন একদিক দিয়া রক্ষা পায়, তেমনই প্রাণশক্তিরও কোনদিন অভাব হয় না। স্বতন্ত্র সমাজকে আদিম (primitive) সমাজ বলা যায়; কিন্তু লোক-সাহিত্য যে সমাজের সৃষ্টি, তাহা আদিম সমাজ নহে, তাহা হইতে আরও অগ্রসর সমাজ; কারণ, তাহার মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাহা বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণে সমৃদ্ধ। বিষয়টি এইবার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে আরও একটু স্পষ্ট হইতে পারে।

আসামের অধিবাসী মণিপুরী ও নাগা মূলতঃ একই সমাজ বা জাতির (race) দুইটি বিভিন্ন আঞ্চলিক (territorial) শাখা। ইহাদের মধ্যে নাগা-সমাজকে প্রকৃত স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন (isolated) সমাজ বলা যায়; কারণ, ইহা নিজের পুরুষানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য নিশ্ছিদ্র রাখিয়া সকল প্রকার প্রতিবেশীর সংস্রব বাঁচাইয়া চলিতে চলিতে আজ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। ইহা নিজেরও যেমন কিছু পরিত্যাগ করে নাই, তেমনই অন্যেরও কিছু গ্রহণ করে নাই। এখানে খ্রীষ্টীয়ান্ নাগাদিগের কথা বলিতেছি না, আদিম নাগাদিগের কথাই বলিতেছি। আদিম নাগাদিগের মধ্যে পৃথিবীর বর্বরতম একটি সামাজিক প্রথা আজিও প্রচলিত আছে, তাহা নরমুণ্ড শিকার (head-hunting)। কিন্তু তাহারই অন্যতম আঞ্চলিক শাখা মণিপুরীদিগের ইতিহাস স্বতন্ত্র। যে কোন কারণেই হউক, একদিন নাগাজাতির মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ইহা একটি বিশিষ্ট সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সামাজিক জীবনের একটি প্রধান ধর্ম এই ছিল যে, ইহা নিজের মধ্যে নিশ্ছিদ্র হইয়া বাস করে নাই; যে সকল উপকরণ দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্য পুষ্ট ও আয়ু বর্ধিত হইতে পারে, তাহা ইহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে—তাহার ফলে ইহার প্রাণশক্তি ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব দুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু ইহার আকৃতি ও প্রকৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নাই। মণিপুর একদা ব্রহ্মদেশের অধীন ছিল; সেই সময় ইহা ব্রহ্মদেশীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; তারপর

একদিন যখন বাংলা দেশ হইতে বৈষ্ণবধর্ম গিয়া সেখানে প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেইদিনও সে তাহার সমাজ-জীবনের মধ্যে তাহা বরণ করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ধর্মপালনের তাহার যে নিজস্ব আঙ্গিক, তাহাই ইহার উপর আরোপ করিয়া লইয়াছে। এইখানেই মণিপুর অন্যের উপকরণ গ্রহণ করিয়াও স্বকীয়তা রক্ষা করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ কিংবা বাংলার সংস্কৃতি ইহার সংস্কৃতি গ্রাস করিতে পারে নাই, বরং উভয়ের নিকট হইতে দুই হাত পাতিয়া ইহা যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে নিজের মত করিয়া লইয়াই ব্যবহার করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় কথা এই যে, ইহাদের চাপে পড়িয়া সে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির মৌলিক প্রকৃতি বিসর্জন দেয় নাই। সেইজন্য মণিপুরবাসিগণ অর্জুনের বংশধর বলিয়া দাবী করিলেও মহাভারতের সংস্কৃতির মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া নাই, উৎসবে পার্বণে তাহারা নিজেদের জাতীয় চরিত্রসমূহের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকে; রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী অপেক্ষাও মণিপুরে থৈবী ও খাম্বার প্রেম-কাহিনী অধিকতর জনপ্রিয়। সঙ্গীতে ও নৃত্যে একদিক দিয়া ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী যেমন তাহারা নিজেদের মত করিয়া রূপায়িত করিতেছে, আবার তেমনই নিজেদের জাতীয় আখ্যায়িকা সমূহকেও তাহাদের মধ্য দিয়া রূপ দিতেছে। অতএব মণিপুরীর সমাজ একটি আদর্শ সংহত সমাজ, অর্থাৎ ইহাই যথার্থ লোক-সংস্কৃতি (folk-culture) তথা লোক-সাহিত্যের জন্মস্থান হইতে পারে। কিন্তু নাগার সমাজ আদিম (primitive) সমাজ, ইহার মধ্যে লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে না; যাহা হয়, তাহা অপরিণত ও অসম্পূর্ণ—সাহিত্যের কোন পরিচয় তাহাতে প্রকাশ পায় না। এই শ্রেণীর বহু আদিম সমাজের মধ্যে জনশ্রুতিমূলক (traditional) কোন সাহিত্যের অস্তিত্বই নাই। কিন্তু আদিম জাতির সমাজ যে সংহত নহে, তাহা নহে; তথাপি যে বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণের সমাবেশে লোক-সাহিত্য বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহা তাহার মধ্যে নাই; সেইজন্য প্রকৃত লোক-সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাগাদিগের মধ্যে নাই, মণিপুরীদিগের মধ্যে আছে।

সংহত সমাজের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ব্যষ্টি (individual)র কোন দাবী স্বীকৃত হয় না, সমষ্টির বা সামগ্রিক (communal) দাবীই সেখানে স্বীকৃত হয়। ব্যক্তিবিশেষ সেখানে কিছুই নহে, সমষ্টির জন্যই তাহার অস্তিত্ব। সেইজন্য তাহাতে পরস্পর পরস্পরের আপেক্ষিক এবং

সমগ্রভাবে সকলে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। বিষয়টি একটু গভীরভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট একজন কোন রচয়িতার প্রায়ই সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার মূল ইহার সামাজিক অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে; কারণ, যে সমাজ ব্যক্তির কোন অধিকার কিংবা প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে না, তাহার নিকট বিশিষ্ট একজন কবি কিংবা গীতি-রচয়িতার কোন স্থান নাই, বরং তাহার পরিবর্তে সমগ্র সমাজই ইহাদের রচয়িতা বলিয়া বিবেচনা করা হয়—সে'কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। সংহত সমাজের মধ্যে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির যে কোন অধিকার কিংবা প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয় না, এখানে সে'কথাই বলিতেছি। ইংরেজিতে এই স্তরের সমাজ-জীবনকে community life বলে। ইহাতে সমাজের জন্য ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য সমাজ নহে। গ্রামে যখন কোন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ কিংবা মড়ক দেখা দেয়, তখন গ্রামের অধিবাসিগণ সমগ্র গ্রামের অধিষ্ঠাতা গ্রাম্য দেবতার নিকট সমবেতভাবে ইহার প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা জানায়। গ্রাম্য দেবতা ব্যক্তিবিশেষের দেবতা নহেন, ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখে তিনি উদাসীন, কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্র গ্রামের কল্যাণ-সাধনে তিনি সর্বদা তৎপর; সমগ্রভাবে গ্রামের পক্ষ হইতে তাঁহার নির্দিষ্ট পূজার যদি কোন ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তিনি সমস্ত গ্রামের উপর দিয়াই তাঁহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন, ব্যক্তিবিশেষের উপর দিয়া নহে। এই প্রকার সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষ (individual) যদি কোন অসামাজিক আচরণ, যথা বিধিনিষেধ (taboo) লঙ্ঘন ইত্যাদি করে, তবে সমগ্র সমাজকেই তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয় বলিয়া মনে করা হয়। অতএব যেখানে সমগ্র সমাজের দেহে ব্যক্তির জীবন এমন অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে এবং ব্যক্তির কোন স্বাধীন সত্তা নাই, সেই সমাজের সাহিত্যের প্রকৃতিও যে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমাজের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক উচ্চতর সাহিত্য ব্যক্তি-প্রতিভা দ্বারা সৃষ্ট; ইহার মধ্যে সমাজ-চেতনা যাহাই থাকুক না কেন, তাহা ইহার রচয়িতার মানসলোকে যে ভাবে প্রতিভাত হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই রূপায়িত হয়। নাটকপ্রমুখ নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) সাহিত্যের মধ্যেও রচয়িতার ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিভার স্পর্শ এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাহাও কিছুতেই সমগ্র সমাজের সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত সংহত সমাজের মধ্য হইতে

ব্যক্তিবিশেষও যদি কিছু রচনা করে, তবে তাহাতে সমগ্র সমাজেরই প্রাণ স্পন্দিত হইয়া থাকে। যেখানে ব্যক্তি-জীবনের কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই, সেখানে ব্যক্তি-প্রতিভার আত্ম-কেন্দ্রিক সাধনাও নাই; সেইজন্য ইহার রচনা সহজেই সমগ্র সমাজের রচনা বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে।

সংহত সমাজ কথাটি বুঝাইতে এত কথা বলিতে হইল। লোক-সাহিত্যের যে সংজ্ঞাটি লইয়া আলোচনা করিয়াছি, তাহার আরও একটি অংশ বুঝিতে বাকি আছে; তাহা এই যে, ইহা সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে। এই বিষয়ে সকলেই যে সম্পূর্ণ একমত তাহা নহে; কারণ, কেহ মনে করেন, 'All aspects of folklore, probably originally the products of individuals, are taken by the folk and put through a process of recreation, which through constant variation and repetition become a group product'[১] অর্থাৎ লোকশ্রুতির সকল বিষয়ই মূলতঃ ব্যক্তিবিশেষেরই সৃষ্টি, তারপর সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তির নিকট হইতে জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করে এবং তাহা ক্রমাগত নূতন করিয়া পুনর্গঠন করিতে থাকে—এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া তাহা পরিণামে একটি সামগ্রিক সৃষ্টির রূপ লাভ করে।

এখানে সমালোচক বলিতে চাহেন যে, লোক-সাহিত্য মূলতঃ ব্যক্তিবিশেষ বা এক জনেরই সৃষ্টি, তবে সৃষ্টি মাত্র তাহা দশজনের হাতে গিয়া পড়ে এবং তখন দশজন তাহাদের নিজেদের মত করিয়া তাহা নূতন ভাবে গড়িয়া লয়; তখন তাহার যে রূপ প্রকাশ পায়, তাহা সমষ্টিরই সৃষ্টি, ব্যষ্টির নহে। কিন্তু এখানে কথা হইতেছে, দশজনের হাত হইতেই ইহা সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করিতেছে, একজনের হাত হইতে নহে; অতএব ইহার একজন রচয়িতা মূলতঃ ইহা যে ভাবে রচনা করিয়াছিল, তাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থাকিয়া যায়। সমাজের মধ্যে যখন তাহা প্রচার লাভ করে, তখন তাহা দশজনের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে, একজনের সৃষ্টি আর নাই। অতএব লোক-সাহিত্য আমরা যে রূপে লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহা সমষ্টিরই সৃষ্টি, ব্যষ্টির সৃষ্টি নহে। লোক-সাহিত্যের এই অংশই সাহিত্য সংজ্ঞালাভের অধিকারী।

---

১ Mac Edward Leach, *Standard Dictionary of Folklore. Mythology and Legend* [*SDFML*] ed. Maria Leach (New York, 1949-50). p. 401.

ব্যক্তিবিশেষের মনে যে ভাবটির উদয় হয়, তাহার প্রকাশ অপরিণত ও অপরিস্ফুট থাকিবারই কথা, ইহা দশজনের হাতে পড়িয়াই প্রকৃত সাহিত্যের রূপ লাভ করিয়া থাকে। অতএব ব্যষ্টির মনে যে সকল অপরিণত ভাবের উদয় হয়, তাহাই সমষ্টি লোক-সাহিত্যের রূপে সমাজকে পরিবেশন করে। অতএব লোক-সাহিত্যের বহিরঙ্গগত পরিচয়ের জন্য সমষ্টির দান স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহার অন্তর্নিহিত ভাব-মূলে যে ব্যষ্টির প্রেরণাই কার্যকরী হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব লোক-সাহিত্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি; ব্যষ্টির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করিয়া লয়। এই প্রসঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি—

'It is often said that there is no such thing as a village poet or a village folk-lorist, that the tales and songs of the people are very old and owe little or nothing to modern individual effort. My own experience leads me to doubt this. It is true that a great many of the songs are the possessions of the people as a whole; nobody knows when they are composed, they are repeated again and again and the only change is often a change for the worse. But at the same time gifted individuals do arise in the peasant communities. Even these do not regard their poems and songs as copyright. They compose them in the excitement and rapture of the dance and before they know what has happened, they have become public treasure. A man sings his beatitude in the excitement of a love-affair and soon every youth and maiden in the countryside is making love in the same words.'[১]

ইহার মধ্যে একটি কথা আমাদের পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী, সেই কথাটিই এখানে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এখানে বলা হইয়াছে যে,

১ **Verrier Elwin** ***Folk-songs of Chattisgarh*** **(Bombay, 1946). Introduction, p. I.**

দশজনের হাতে পড়িয়া ব্যক্তিবিশেষের রচনা যে পরিবর্তিত হইতে থাকে, তাহার ফলে ইহা ক্রমাগতই নিকৃষ্ট (change for the worse) হইতে থাকে অর্থাৎ ক্রমোন্নতি (evolution)র পরিবর্তে ক্রমাবনতি (degeneration)-বাদকেই এখানে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না; কারণ, ক্রমাবনতির পরিণামই হইতেছে বিলুপ্তি (extinction)। অতএব ক্রমাবনতির ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে, ইহা কালক্রমে একেবারেই লুপ্ত হইয়া যাইত—এই ভাবে বহু দেশের লোক-সাহিত্যই লুপ্ত হইয়া যাইবার কথা ছিল। অতএব ক্রমাবনতির পথ না ধরিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই ইহা পৃথিবীর প্রত্যেক অংশেই কেবল মাত্র যে আত্মরক্ষা করিয়া আছে, তাহাই নহে—বরং অগণিত সমাজের কোটি কোটি অধিবাসীর আনন্দ-দানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র এই দুইটি পদ,—

> কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।
> তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥

লোক-সাহিত্যের ক্রমাবনতির কোনও ফল হইতে পারে না, বরং ইহা ক্রমোন্নতির চরম নিদর্শন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তিবিশেষের অপরিণত রচনা সমষ্টির হাতে পঁড়িয়া অনেক সময় উন্নতি লাভ করে, সর্বদাই অধোগতি লাভ করে না। ক্রমোন্নতির পথেও নানা বহির্মুখী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে যেমন ইহার বাধা আসিয়া যাইতে পারে, তেমনই ইহার ক্রমাবনতির পথও সহসা রুদ্ধ হইয়া গিয়া তাহা বিপরীতমুখী হইয়া উঠিতে পারে, অর্থাৎ অবনতি রুদ্ধ হইয়া গিয়া ইহা উন্নতির পথও ধরিতে পারে। বহির্মুখী সামগ্রিক সমাজ-জীবনের অবস্থার উপরই ইহার উন্নতি এবং অবনতি নির্ভর করে।

ব্যষ্টিমন ও লোক-সাহিত্য

কেবল আমাদের দেশেই নহে, সকল দেশেই এমন সন্দেহবাদী লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, গায়েন (traditional singer)ই লোক-সঙ্গীতের উদ্ভাবক ('make it up himself')। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পল্লীর ব্যবসায়ী গায়েনগণ যে ইহাতে কোন কোন অংশ সংযোগ ও বিয়োগ করিয়া থাকে, তাহা সত্য ; কিন্তু তাহা দ্বারাই ইহার বৃহত্তর আবেদন লুপ্ত হইয়া যায় না। কারণ, গায়েন যদি প্রকৃতই ব্যবসায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাকে লোকের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার কোন অংশ পরিবর্তিত কিংবা নূতন সংযোজিত হইলে, তাহা দ্বারা লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইবে না। এমন কি, আনুপূর্বিক নূতন কোন বিষয়ও যদি গায়েন বিশিষ্ট কোন সংহত সমাজের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচনা করিতে পারে, তবে তাহাও কালক্রমে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। এই ভাবেই লোক-সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে, ইহা কেবল মাত্র ইহার সনাতন পুঁজির উপর নির্ভর করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সমাজের রস ও রুচির উপর ভিত্তি করিয়া যদি ইহা রচিত না হয়, তবে ইহা একদিনের জন্যও কেহ ধৈর্য ধরিয়া শুনিবে না, সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অপমৃত্যু হইবে। অতএব গায়েন কিংবা অন্য যে কেহই যদি ইহা সমসাময়িক কালে রচনাও করে, তাহা হইলেও কেবল মাত্র ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ইহাতে বর্তমান থাকে, তবে তাহা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে কোন বাধা হইতে পারে না। সমসাময়িক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত গীতিকা সমসাময়িক কালে রচিত হইয়াও এবং জনশ্রুতিমূলক কোন বিষয়-বস্তু অবলম্বন না করিয়াও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পল্লীর সহস্র সহস্র শ্রোতা এই সকল কাহিনী শুনিয়া আনন্দ ও বেদনা লাভ করিয়াছে। তবে ইহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

(লোক-সাহিত্যের অধিকাংশ বিষয়ই সমসাময়িক কোন সমাজ কিংবা ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভাবিত ও রচিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, সমাজের মধ্যে

লোক-সাহিত্য বিকাশ লাভ (develops) করিতে দেখা যায়, জন্মলাভ করিতে দেখা যায় না। ইহা ব্যক্তি বা সমাজ-চক্ষুর অগোচরেই জন্মলাভ করে, তারপর সমাজের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিতে থাকে। যেহেতু ইহার রচয়িতা রূপে কোন ব্যক্তিবিশেষের সন্ধান পাওয়া যায় না, সেইজন্য ইহার উদ্ভবের প্রকৃত প্রণালী যে কী, সেই সম্পর্কেও কোন জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোক-কথা (folk-tale)র উল্লেখ করা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কল্পনার দৌড় থাকিলেই লোক-কথা বিশেষতঃ রূপকথা রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই কথা আদৌ সত্য নহে। আমরা শ্রুতি-পরম্পরায় যে লোক-কথার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া থাকি, তাহার এমনই একটি রস ও ভঙ্গি আছে যে, তাহা ইচ্ছা করিলেই কেহ রচনা করিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে যাহা প্রয়োজন, তাহা 'faculty of mythic invention' অর্থাৎ প্রাচীন বা পৌরাণিক বিষয় উদ্ভাবনের শক্তি; কিন্তু আধুনিক যুগে সেই faculty বা শক্তি আমাদের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার যে একটি বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গি আছে, তাহা আমরা শুনিতেই অভ্যস্ত, কিন্তু রচনা করিতে অভ্যস্ত নহি; অতএব সেই শক্তিও আমাদের নাই। অতি আধুনিক সাহিত্যে রূপকের স্থান সংকীর্ণ, অথচ এই রূপকই লোক-সাহিত্যের জগৎ অনেকখানি অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বর্তমান পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া আমরা সত্য-কল্পনা-রূপকে মিশ্রিত লোক-সাহিত্যের জগৎ যথার্থ রূপায়িত করিতে পারি না।

লোক-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় নূতন নূতন বিষয়ও যুক্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাদের মধ্যে নূতন কিছুই নাই। যাহা নূতন বলিয়া মনে হয়, তাহা সমাজের পরিবেশ কিংবা অন্তস্তলে বর্তমান ছিল, তাহা সেখান হইতেই গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র; প্রয়োজন মত তাহা পরিবর্তনও করা হইয়াছে, তারপর সমাজের মধ্যে নূতন রূপে তাহা প্রচারিত হইয়াছে—প্রচারিত হইবার পর যথাযথ বিবেচনা করিলে সমাজ ইহা রক্ষা করিয়াছে, অন্যথায় পরিত্যাগ করিয়াছে। ব্যক্তি-প্রতিভার প্রেরণায় অভিনব উপাদান দ্বারা যে কেহই লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহাই এখানে বক্তব্য বিষয়। সমাজের সমস্ত দেহ ও মন যখন একটি ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে,

তখন সমষ্টির ভিতর দিয়াই তাহার বাণীরূপ প্রকাশ পায়, তবে অনেক সময় ব্যষ্টি ইহার উপলক্ষ্য হয় মাত্র।

একটি প্রশ্ন এখানে আলোচনা করিতে পারা যায় যে, আধুনিক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কিংবা নাগরিক জীবনে লোক-সাহিত্যের স্থান কি? বিষয়টি একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, লোক-সাহিত্য চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই রচিত হয়। রচনার বহিরঙ্গগত গঠন আধুনিক সমাজের বিচারে যতই স্থূল হউক না কেন, ইহার অন্তর্নিহিত ভাবের একটি সর্বজনীন আবেদন থাকে। বিশেষতঃ ইহার ভিতর দিয়া চিরন্তন সামাজিক নীতি ও ধর্মের জয় ঘোষিত হয়। চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা সমূহও ইহাদের ভিতর দিয়া কৌশলে প্রকাশ করা হয়। বিজয়-বসন্তের প্রতি তাহাদের বিমাতার যে বিদ্বেষের কথা বাংলা লোক-সাহিত্যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এক চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহা দেশকালোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। ইহারই ভাবটি একটি স্বতন্ত্র পরিবেশের মধ্য দিয়া ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যে রচিত সিণ্ডেরেলা (Cinderella)র কাহিনীর ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। একটি চিরন্তন মানবিক বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে বলিয়াই সিণ্ডেরেলার রূপকথা সকল দেশের অধিবাসীকেই মুগ্ধ করিতে পারে। সাহিত্যের বিষয় চিরন্তন—তাহা লোক-সাহিত্যেরই হউক, কিংবা উচ্চতর সাহিত্যেরই হউক; এই চিরন্তনতার গুণেই সাহিত্য কালজয়ী; অতএব লোক-সাহিত্য সর্বদাই সকল শ্রেণীর পাঠকেরই প্রিয় হইতে পারে। আধুনিক যুগে উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, লোক-সাহিত্যেও অনেক ক্ষেত্রেই সেই আনন্দের বীজ নিহিত থাকে। তবে উভয়ের প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, কেবল মাত্র তাহা দ্বারাই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য-বোধ সৃষ্ট হয়, গভীর ভাবে অনুধাবন না করিলে ইহাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। লোক-সাহিত্যের কোন কোন বিষয় রূপক, সংকেত বা ইঙ্গিতের ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়া থাকে। রূপক বা 'the mythical story with its symbols has an element of permanency for it brings before us, under a veil, the predicaments, the joys and the sorrows of human life; we begin to see why it is

that folk-tales, these humble sisters of written art, still have power to stir our interest and even our feelings.'[১] যাহা চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, ব্যক্তি-মানসেই হউক, কিংবা সমাজ-মানসেই হউক, তাহার আবেদন ব্যর্থ হইতে পারে না। অতএব আত্মকেন্দ্রিক আধুনিক নাগরিক জীবনে লোক-সাহিত্যের কোন সমাদর হইবে না এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

তবে একটি কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না। নাগরিক মন উচ্চতর সাহিত্য হইতেই রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গি এবং লোক-সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গি এক নহে। যদিও লোক-সাহিত্যের মধ্যে একটি চিরন্তন আবেদন আছে সত্য, তথাপি সেই আবেদনটির বহিরঙ্গগত রূপ ক্রমে নাগরিক সমাজের মধ্যে অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য রূপকথা কিংবা উপকথার মধ্যে যে শাশ্বত আবেদনই থাকুক না কেন, তাহা আধুনিক সাহিত্য হইতে রস-সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত পাঠকের নিকট কোনও কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক রুচি ও রসবোধ অনুযায়ী লোক-সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া এই বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারিলে ইহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' আলোচনাটি আধুনিক মনের নিকট এই জন্যই আকর্ষণীয় হইয়াছে।

যুগের রুচির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত সাহিত্যের বহিরঙ্গগত রূপ চিরদিনই পরিবর্তিত হইতেছে, সমসাময়িক সমাজের নিকট সমসাময়িক প্রচলিত রূপটিই আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু লোক-সাহিত্যের রূপ বহুলাংশে রক্ষণশীল, ইহার বিষয়-বস্তুর মধ্যে স্থানে স্থানে যে পরিবর্তনই স্বীকৃত হউক না কেন, ইহার বহিরঙ্গরূপ সহজে পরিবর্তিত হয় না; সেইজন্য লিখিত সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত নাগরিক শিক্ষিত সমাজের নিকট লোক-সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে সহজে আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না।

১ R. M. Dawkins, 'Some Remarks on Greek Folk-tales', *Folk-Lore*, LIX (1948), p. 68.

উপরের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, লোক-সাহিত্যের মূলতঃ কোন একজন রচয়িতা থাকিলেও তাহার যেমন কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় না, তেমনই তাহার সেই মৌলিক (original) রচনারও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না; সেই রচনা সমষ্টির হাতে পড়িয়া যে নূতন সংস্কার লাভ করে, তাহার সঙ্গেই সকলের পরিচয় স্থাপিত হয়। ইংরেজিতে এই বিষয়টি বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে বাংলায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন, লোক-সাহিত্যের কোন বিষয় ব্যক্তিবিশেষ (individual) দ্বারা রচিত (created) হইবার পর ইহা সমষ্টিগত ভাবে (communally) পুনরায় রচিত (re-created) হয়। ইংরেজিতে ইহাকেই communal recreation বলা হইয়াছে। এই পরম তাৎপর্যমূলক ইংরেজি কথা দুইটির অর্থগত উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া ইহাদিগকে যথাযথ ভাবে বাংলায় অনুবাদ করা অসম্ভব, তথাপি ইহা দ্বারা কি মনে করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হইবে না।

লোক-সাহিত্যের যে সম্প্রদায়গত (communal) সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতে এ'কথা অনুমান করা সঙ্গত হইবে না যে, ইহার মধ্যে ব্যক্তি বা ব্যষ্টি (individual)র কোন পরিচয়ই নাই, ইহা কেবল মাত্র সামগ্রিক সমাজ-চৈতন্যেরই বাহন। একজন পাশ্চাত্য সমালোচক এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, লোক-সাহিত্য 'is something which the individual has in common with his fellows, just as all have eyes and hands and speech. It is not contrary to himself as an individual but a part of his equipment. It makes possible—perhaps it might be defined as that which constitutes—his rapport with his particular segment of mankind.'[১] অর্থাৎ যে সকল বিষয় বা বস্তুর অধিকারী হইবার জন্য একই সমাজভুক্ত একজন অন্যজন হইতে অভিন্ন,

১ M. Harmon, *SDFML*, p. 400.

লোক-সাহিত্য তাহাদের অন্যতম। ইহা যেন আমাদের চক্ষু, হস্ত ও ভাষার মত; এই সকল বিষয় আছে বলিয়াই আমরা প্রত্যেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি; লোক-সাহিত্যও তাহাই।(ব্যষ্টি-জীবনের বিরোধী ইহাতে কিছু নাই, বরং ইহা তাহার জীবনের একটি অঙ্গ)। ইহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ মানব-সমাজের বিশিষ্ট একটি অংশের সঙ্গে নিজের যে একটি সম্পর্ক আছে, তাহা অনুভব করিয়া থাকে। সমাজের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে এই উক্তিগুলি বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার মত।

উপরে লোক-সাহিত্যের যে সংজ্ঞাটি লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, তাহার একটি অংশ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বক্তব্য আছে। লোক-সাহিত্য যে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াও সমষ্টির সৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই সম্পর্কে সকলেই একমত নহেন। কেহ কেহ মনে করেন, যেহেতু ইহার কোন একজন রচয়িতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা 'collective creation of the folk' অর্থাৎ সাধারণ কর্তৃক সমষ্টিগত ভাবে সৃষ্ট। কোন লোক-সঙ্গীত, গীতিকা কিংবা কথা যে মূলতঃ একজনের সৃষ্টি না হইয়া কি ভাবে সমষ্টির সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায় না। তথাপি মনে করা হয় যে, সংহত সমাজের মধ্যে প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানই দলগত ভাবে (communally) পালন করা হয়। সামাজিক কোন সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানে একজন হয়ত সঙ্গীতের একটি পদ রচনা করিয়া গাহিল, তাহা শুনিবা মাত্র সেই নর্তক গোষ্ঠীর মধ্যেই আর একজন আর একটি পদ রচনা করিল, এইভাবে প্রায় সকলের সহায়তায়ই ইহা একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রূপ লাভ করিল। সেই নৃত্যানুষ্ঠানে সঙ্গীতটি বার বার গীত হইবার ফলে তাহা সকলেরই প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গেল—রচনার দিক দিয়া যদি ইহা কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদের মুখ হইতেই ইহা সহজেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচার লাভ করে। এই পদ্ধতির রচনাকে ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলা যায় না, সমষ্টিগত রচনাই বলিতে হয়। কেহ কেহ এই ভাবেই সমগ্র লোক-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ ডার্খেম এই মতের পক্ষপাতী। তিনি 'psychology of crowds' বা জনতার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যদিও ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে লোক-সাহিত্যের

উদ্ভব সম্পর্কে এই মত কতকটা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, তথাপি পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য যে সকল অঞ্চলে লোক-সাহিত্যের ব্যাপকতর গবেষণা হইতেছে, সেই সকল অঞ্চলে এই মত আজ পর্যন্তও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

উক্ত মতবাদ সম্পর্কে একটি প্রধান আপত্তি এই হইতে পারে যে, নাতি-দীর্ঘ গীতি বা গান এই উপায়ে রচিত হওয়া সম্ভব হইলেও, দীর্ঘতর কথা (folk-tale), গীতিকা (ballad) বা আখ্যায়িকাগীতি (narrative song) এই উপায়ে রচিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, আনুপূর্বিক সুবিন্যস্ত একটি কাহিনী নৃত্যপর কোন জনতা (crowd) কর্তৃক রচিত হইতে পারে না; ইহার সঙ্গতি ও একটি সুস্পষ্ট পরিণতি নির্দেশ করিবার জন্য রচয়িতার ধৈর্য ও সংযম অবলম্বন করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয়। অতএব পূর্বোল্লিখিত ডক্টর ভেরিয়র এলুইন যে বলিয়াছেন, 'gifted individuals do arise in the peasant communities' অর্থাৎ কৃষক-সমাজের মধ্যেও প্রতিভাবান্ ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতই যে আবির্ভাব হয়, তাহা সত্য। এই সকল 'gifted individual' দ্বারাই অন্ততঃ লোক-সাহিত্যের দীর্ঘতর বিষয়গুলি যে সর্বপ্রথম পরিকল্পিত হইয়া থাকে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি তাহাই হয়, তবে ইহার ক্ষুদ্রাকৃতি সঙ্গীতগুলিও যে কেন এই প্রকার 'প্রতিভাবান্ ব্যক্তিবিশেষ' দ্বারা প্রথম রচিত হইতে পারিবে না, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ ডার্খেমের মতবাদ নির্ভরযোগ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কেহ কেহ এই মতবাদকে 'sentimental' বা কেবল মাত্র হৃদয়াবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াও নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু ডার্খেম কোম্‌তের মতই পাশ্চাত্ত্য সমাজ-বিদ্যায় এক নূতন যুগের স্রষ্টা, কেবল মাত্র হৃদয়াবেগ তাঁহার অবলম্বন হইলে তিনি পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় বিপ্লব আনিতে পারিতেন না; অতএব মনে হয়, তাঁহার উক্তি আংশিক সত্য বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে; কারণ, ক্ষুদ্রাকৃতি লোক-সঙ্গীত রচনায় তিনি যে পদ্ধতিটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কোন সময় সমাজের কোন এক স্তরে প্রচলিত থাকিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দীর্ঘতর রচনায় এই রীতি কোনদিন প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে না।

লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া একটি বিষয়ের উপর যে কেহ কেহ অতিরিক্ত জোর দিয়া থাকেন, তাহার কথা এখন উল্লেখ করিব। লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া কেহ কেহ সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, ইহা 'unwritten literature of any group, whether having writing or being without it.'[১] অর্থাৎ ইহা কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্য—এই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে লেখার ব্যবহার প্রচলিত থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। এই সংজ্ঞানুযায়ী অলিখিত সাহিত্য মাত্রই লোক-সাহিত্য। ইংরেজিতে ইহাকেই oral literature বলা হয়।

এই সম্পর্কে আরও একজন সমালোচক আরও একটু সামান্য বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন যে, ইহা 'embraces those literary and intellectual phases of culture which are perpetuated primarily by oral tradition: myths, tales, folksong, and other forms of oral traditional literature'[২] অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্যিক ও মননশীল সৃষ্টি মুখ্যতঃ মৌখিক ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া যায়, তাহাই লোক-সাহিত্য; যেমন গীতিকা, কথা, সঙ্গীত ইত্যাদি। লোক-সাহিত্যের এই সংজ্ঞাই যদি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয়, তবে এই সম্পর্কে স্বভাবতঃই একটি কথা মনে হইতে পারে যে, যে ভাবেই ইহার উদ্ভব হউক না কেন, সমাজের মধ্যে ইহা যে রূপে প্রচার লাভ করে, সেই রূপেই যদি ইহাকে লিখিয়া লইতে পারা যায়, তবে তাহার লোক-বৈশিষ্ট্য (folk-characteristic) বিনষ্ট হইয়া যায় কি না।

লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে নিশ্চয়ই এই কথাটি স্পষ্ট হইয়াছে যে, লোক-সাহিত্য কেহ লিখিয়া রচনা করিতে পারে না; যখন ইহার উদ্ভব হয়, তখন ইহা মুখে মুখেই রচিত হয় এবং প্রথম অবস্থায় ইহা মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। কিন্তু বহু সমাজেই

১ M. J. Herskovits *SDFML* p. 400.

২ G. Herzog, ibid.

যখন লেখার এখন ব্যাপক প্রচার হইয়াছে, তখন ইহা লিখিয়া লইবার পথও রোধ করিতে পারা যায় না।) প্রকৃত পক্ষে পূর্ববর্তী কালে সমাজ যখন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, তখন সকল দেশেই স্মৃতিশক্তির যে রকম অনুশীলন হইত, আজ আর কোথাও তেমন হয় না। সেইজন্যই একদিন যাহা স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহাই লিখিত হইয়া সমাজের স্মৃতির ভার লাঘব করিতেছে। লোক-সাহিত্যের উপরোক্ত সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলে ইহা এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া অর্থাৎ লিখিত হইলে ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া যাইবে কি না, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে, ইহা লিখিত হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা অভিজ্ঞ বা বিশেষ ভাবে শিক্ষিত গবেষক ('trained investigators') কর্তৃক লিখিত ('committed to writing') হওয়া চাই।[১] অনভিজ্ঞ বা অসতর্ক লেখক কর্তৃক লিখিত হইলে ইহা বিকৃত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। বহিরাগত কোন গবেষক যদি স্বতন্ত্র কোন জাতির লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তাহা সংগ্রহ করিবার যে বিশেষ শিক্ষা তাঁহার প্রয়োজন, কেহ যদি নিজস্ব লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার সেই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কারণ, ইহার খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁহার যে স্বাভাবিক জ্ঞান থাকিবে, তাহা হইতেই তাহা নিখুঁতভাবে লিখিত হইতে পারে। তবে তাঁহার পক্ষেও লিখিবার সময় তাঁহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রস-বোধ, বিচার-বুদ্ধি ও সকল প্রকার সৃজনী প্রেরণা সংযত রাখা আবশ্যক। এ'কথা সত্য, তিনি যাহা লিখিয়া লইবেন, তাহা প্রচলিত লোক-সাহিত্যের বিশেষ আর একটি রূপ (version) হইবে। কিন্তু তথাপি যেহেতু তিনি সেই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই সমাজের বিশিষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত, সেইজন্য তাঁহার লিখিত রূপ প্রচলিত রূপের বিশেষ ব্যতিক্রম হইবে না—যতটুকু একজনের মুখ হইতে আর একজনের মুখে প্রচারিত হইতে গেলেও হইয়া থাকে, ততটুকুই হইতে পারে মাত্র; অতএব তাহা একেবারে অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

১ G. P. Kurath, ibid.

বাংলাদেশের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ইতিহাস হইতে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারি। সুপ্রসিদ্ধ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সংগ্রাহক স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহ জিলার যে অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, সেই অঞ্চলেই গীতিকাগুলি প্রচলিত ছিল। তিনি গীতিকাগুলি যে ভাবে শুনিয়াছিলেন, সেই ভাবেই সংগ্রহ করিয়াছেন—ইহাদের ভাব, ভাষা, ভঙ্গি সবই তাঁহার নিজের নিকট সুপরিচিত ছিল; সেইজন্য যাহা শুনিয়াছেন, তাহা লিখিয়া লইবার পক্ষে তাঁহার কোন অন্তরায় হয় নাই; কিংবা তিনি যাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও ইহাদের প্রচলিত রূপ হইতে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ছিল না। গীতিকাগুলি এইভাবে গায়কের মুখ হইতে লিখিয়া লইয়া স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট তিনি প্রেরণ করিতেন।

স্বর্গত সেন মহাশয় বাংলাদেশের এক স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রকৃতি ও রূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন; অনেক স্থলে তিনি ইহাদের ভাষার অর্থও যে বুঝিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার লিখিত ভাষা-টীকা হইতেও জানিতে পারা যায়। লোক-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার সুগভীর অনুরাগ ও সহানুভূতি থাকিলেও, তিনি যে এই বিষয়ে 'trained investigator' ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। বর্তমানে যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে লোক-সাহিত্যের সম্পাদন হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল না। তিনি এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য কোন অভিজ্ঞ গবেষকের সহায়তা বা পরামর্শ ব্যতীতই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নিজের মতে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে বক্তব্য এই যে, স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে যে ভাবে গীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই ভাবেই সেগুলি প্রকাশিত করিয়া দিলে, কিংবা কোন 'trained investigator'এর সহায়তায় তাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিলে ইহাদের যে মূল্য প্রকাশ পাইত, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহা প্রকাশিত হওয়ায় তাহাদের সেই মূল্য প্রকাশ পায় নাই। এই বিষয়ে স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে'র যে অধিকার ছিল, স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সেই অধিকার ছিল না; অথচ তিনিই এই ভার নিজের উপর গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছামত ইহাদিগকে এক একটি ভদ্র রূপ দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে যদি কোন কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে

ইহার এই ত্রুটির জন্যই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কোন কারণের জন্য নহে।

অতএব একটি কথা এখানে স্পষ্ট হইল যে, (লোক-সাহিত্য লিখিয়া লইতে কোন বাধা নাই; কিন্তু তাহার লেখক স্বতন্ত্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলে এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ শিক্ষা থাকার প্রয়োজন; আর যদি তিনি সেই সমাজেরই লোক হন, তবে তাঁহার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাও হইতে পারে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে নিজের রস-বিচার ও সৃজনী প্রতিভা সংযত রাখিতে হইবে—) যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে, যাহা বুঝিলাম তাহা নহে। সেইজন্য বর্তমানে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ সর্বদা শব্দগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন—তাহাতে সঙ্গীত ও বাদ্য যথাযথ গৃহীত হয়, পরে গবেষণাগারে বসিয়া সেই অনুযায়ী তাহা পুনর্লিখিত হইয়া থাকে। অতএব লেখা ও সম্পাদনার ভিতর দিয়া লোক-সাহিত্য যে রূপান্তরিত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহার বিরুদ্ধে সকলেই সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহা সত্ত্বেও সমাজ হইতে নিরক্ষরতা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোক-সাহিত্য সকল দেশেই লিখিত হইয়াছে এবং লেখার ভিতর দিয়াও ইহার প্রচার হইয়াছে। সকল দেশেই ইহার লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা যথাযথ ভাবে লিখিত হইলে ইহার অপকার অপেক্ষা উপকারই বেশি হয়, ইহাতে ইহার লোক-বৈশিষ্ট্য হ্রাস পায় না। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত এই যে,

'The transference of oral tradition to writing and print does not destroy its validity as folklore but rather while freezing or fixing its form, helps to keep it alive and to diffuse it among those to whom it is not native or fundamental. For the folk-memory forgets as much as it transmits and improves. In the reciprocity of oral and written tradition and the flux of cultural change and exchange, revival plays as important a part as survival, popularization is as essential as scholarship, and the final responsibility rests upon the accumulative and collective taste and judgment of the many rather than the few.'[১]

---

১ B. A. Botkin, ibid, p. 399,

উদ্ধৃত অংশে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সম্পর্কে সমালোচক কয়েকটি নূতন কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ যাহা মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহা লিখিত কিংবা মুদ্রিত হইলেই যে লোক-শ্রুতি (folklore) হিসাবে ইহার মূল্য হ্রাস পায়, তাহা নহে; বরং তাহা দ্বারা তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ মুখে মুখে ইহা কেবলই যে পরিবর্তিত হইতে হইতে অগ্রসর হইত, লিখিত হইবার ফলে তাহার সেই পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন লিখিত রূপটি আদর্শ হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহা ভিত্তি করিয়াই ইহা সর্বত্র প্রচার লাভ করে। বাংলার লোক-সাহিত্য হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সমগ্র বাংলা ও আসামে মনসা-মঙ্গল কাহিনীর[১] কোন ব্যতিক্রম নাই, দুই এক স্থানে সামান্য যে এক-আধটু ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাও মূল কাহিনীর ব্যতিক্রম নহে, ইহার বহিরঙ্গগত ব্যতিক্রম মাত্র; কিন্তু তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয়। এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া ইহার কাহিনীগত এই ঐক্য রক্ষা পাইবার একমাত্র কারণ, লিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রচার হইয়াছে, কেবল মাত্র মৌখিক আবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহার প্রচার হয় নাই। ইংলণ্ডেও যতদিন পর্যন্ত *Robin Hood Ballad* মুখে মুখে প্রচারিত হইত, ততদিন পর্যন্ত এক এক অঞ্চলে ইহার এক এক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু ইহা লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবার পর, ইহার ক্রমপরিবর্তনের ধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বরং তাহার পরিবর্তে ইহার আখ্যানগত একটি সামগ্রিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। লোক-সাহিত্যের এই স্বাভাবিক ক্রমপরিবর্তনের ধারা লুপ্ত হইয়া যাইবার ফলে কতক যে ক্ষতিও হইয়াছে, তাহাও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। ইহার প্রধান ক্ষতি এই হইয়াছে যে, মৌখিক আবৃত্তির ভিতর দিয়া প্রচারিত হইলে ইহা যে কখনও কোনও প্রতিভাবান্ গায়কের মুখে পড়িয়া উন্নততর হইতে পারিত, ইহার সেই ভবিষ্যৎ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অবশ্য এই ক্ষতি আর এক দিক দিয়া পূরণও হইয়াছে; কারণ, মৌখিক প্রচারের ফলে অনেক সময় যে ইহার বিকৃত (degenerated) হইবার সম্ভাবনা থাকে, ইহা লিখিত হইলে ইহার সেই সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়া যায়; বিশেষতঃ সমাজে

১ মঙ্গলকাব্যের লোক-সাহিত্যগত ভিত্তি সম্পর্কে পরে আলোচিত হইয়াছে; এখানে মনসা-মঙ্গলের মূল কাহিনীর কথা বলা হইয়াছে, মনসা-মঙ্গল কাব্যের কথা বলা হয় নাই।

প্রতিভাবান্ লোকের সংখ্যা কম এবং সাধারণ লোকের সংখ্যাই বেশি; সুতরাং সাধারণের হাতে পড়িয়া ইহার বিকৃত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। অতএব এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে লোক-সাহিত্য লিখিত হইবার ফলে ইহার কোন উন্নতির আর আশা না থাকিলেও, ইহার অধোগতিও রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ে আর একটি কথা আছে—লোক-সাহিত্যের কোন লিখিত রূপ সমাজে প্রচলিত না থাকিলে ইহার প্রত্যেক গায়কই ইহার মধ্যে কিছু না কিছু অংশ নিজে যোগ করিয়া লইবার স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারে। প্রচলিত সঙ্গীত গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ক নিজেও কিছু সৃষ্টি করিবার প্রেরণা লাভ করে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করিয়া ইহাতে প্রতিনিয়তই যোগ করিয়া থাকে। ইহাতে সমাজে ব্যষ্টিমনের সৃজনী শক্তির অনুশীলন অব্যাহত থাকিতে পারে। কিন্তু লোক-সাহিত্যের কোনও লিখিত রূপ যদি সমাজের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, তবে ব্যক্তিমনের এই শক্তি (individual initiative) বিনষ্ট হয়; তাহার ফলে ক্রমে লোক-সাহিত্য হইতে ব্যক্তিমনের সকল ঔৎসুক্য দূর হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। বর্তমানে লোকসাহিত্যের জনপ্রিয়তার অভাবের ইহাও অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়।

(লোক-সাহিত্যের প্রধান ধর্মই এই যে, ইহা সজীব,—ইহার ধারা ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মৌখিক আবৃত্তি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার জীবনী-শক্তি রক্ষা পায়)—কোন নির্দিষ্ট আদর্শের বদ্ধকুণ্ডে যদি ইহা গিয়া রুদ্ধ হইয়া পড়ে, তবে অচিরেই ইহার প্রাণ-শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। …'a folk-song evolves gradually as it passes through the minds of different men and different generations.' অর্থাৎ ব্যক্তি ও বংশ-পরম্পরায় লোক-সঙ্গীত ক্রমবিকাশ লাভ করে; কিন্তু ইহার কোন একটি বিশিষ্ট রূপ একান্ত আদর্শ হইয়া পড়িলে ইহার এই ক্রমবিকাশের ধারা বাধা প্রাপ্ত হয়; ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া জীবনী-শক্তি রক্ষা যাহার ধর্ম, তাহার সেই পথই যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেও অধিক বিলম্ব থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ এমন কথা বলিয়াছেন যে, লোক-সাহিত্য লিখিত হইলে তাহা নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রচারিত (diffused) হইবার পক্ষে সুবিধা হয়।

কিন্তু পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এক সমাজের লোক-সাহিত্য সেই সমাজেরই নিজস্ব বা স্বকীয় সৃষ্টি, সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত নরনারীই তাহার প্রকৃত রসবেত্তা, নূতন ক্ষেত্র বা স্বতন্ত্র সমাজে গিয়া তাহা প্রচার লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ কাগজে কলমে লোক-সাহিত্যের বিষয় কতটুকু লিখিয়া লইতে পারা যায়? এই বিষয়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিদের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন, 'The stories live in native life and not on paper, and when a scholar jots them down without being able to evoke the atmosphere in which they flourish he has given us but a mutilated bit of reality,'[১] সমাজ-জীবনে যাহা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে, কাগজে কলমে তাহার কতটুকু পরিচয় প্রকাশ করা যাইতে পারে? অতএব যতটুকুই আমি লিখিয়া লই না কেন, তাহার ভিতর দিয়া আমি লোক-সাহিত্যের প্রকৃত রসের শতাংশের একাংশও পরিবেষণ করিতে পারিব না। যে উপায়ে লোক-সাহিত্য প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহার যথাযথ বর্ণনার ভিতর দিয়া ইহার সম্বন্ধে প্রকৃত ঔৎসুক্য জাগ্রত করা যাইতে পারে। এখানে কেবল লিখিত কিংবা মুদ্রিত পুস্তক পড়িয়া কিংবা তাহা আবৃত্তি করিয়াই ইহার রস উপলব্ধি করা যাইবে না। 'The whole nature of the performance, the vice and the mimicry, the stimulus and the response of the audience mean as much to the natives as to the text.'

(লোক-সাহিত্যের কোন লিখিত রূপের ভিতর দিয়া তাহার প্রকৃত রস কিছুতেই ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় না) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র যে কথাগুলি ছাপার অক্ষরে আমাদের চোখের সম্মুখে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করিবার স্পর্ধা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বাংলার সুদূর উত্তর-পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চলের কতটুকু রূপ ও রস নিজেদের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে? উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্তিমিত মশালের আলোকে সহস্র সহস্র পল্লীর নিরক্ষর শ্রোতা নগ্নগাত্রে কটিবাস মাত্র পরিধান ও তৃণাসন মাত্র সম্বল করিয়া গায়েনের

১ B. Malinowski, *Magic, Science and Religion and other Essays* (London, 1949) p. 82.

মুখ হইতে যে মহুয়ার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে, তাহা যে তাহাদেরও বেদনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রাণহীন ছাপার অক্ষরগুলি কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? (লোক-সাহিত্য প্রাণ দিয়া যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রাণ ঢালিয়াই প্রচারও হয়।) গায়েনের চোখে জল দেখিয়া শ্রোতার চোখে জল গড়াইয়া পড়ে, শ্রোতার চোখে জল দেখিয়া গায়েনের চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠে। এই অশ্রু দুঃখেরও যেমন হয়, আনন্দেরও তেমনি হইতে পারে। (হৃদয় অধিকার করিবার শক্তিই লোক-সাহিত্যের শক্তি); এই শক্তি কাগজে কলমে কি করিয়া প্রকাশ পাইবে? অতএব লোক-সাহিত্যের লিখিত কোন রূপের ভিতর দিয়া ইহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায় না; সুতরাং ইহার সাহায্যে ইহার নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রচার-লাভেরও কোন সহায়তা হইতে পারে না।

উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চল হইতে যে লোক-কথা (folk-tale) সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাংলাদেশে প্রচলিত বহু লোক-কথা স্থান পাইয়াছে। বাংলাদেশ হইতে যদি তাহা উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলে প্রচারিত হইয়া থাকে, তবে তাহা কোন দিনই যে তাহার কোন লিখিত রূপ অর্থাৎ হস্তলিখিত কিংবা মুদ্রিত পুস্তকের ভিতর দিয়া প্রচার লাভ করে নাই, তাহা সত্য। বাংলা-দেশের সঙ্গে মণিপুর কিংবা আরাকানের ভিতর দিয়া উত্তর ব্রহ্মের যে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সূত্রে তাহা বাংলাদেশ হইতে একদিন মুখে মুখেই সেখানে প্রচার লাভ করিয়াছিল। তেমনই সাঁওতাল পরগণার বহু উপকথা বাংলাদেশেও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও যে একদিন এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে মৌখিক প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব হইতেই বহু ভারতীয় উপকথা যে ইউরোপ মহাদেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহাও কোনও লিখিত রূপের ভিতর দিয়া প্রচার লাভ করে নাই—মৌখিকই প্রচার লাভ করিয়াছিল। (সাহিত্যের মৌখিক রূপের যে প্রাণ-শক্তি (vitality) আছে, তাহার লিখিত রূপের তাহা নাই।)

উচ্চতর সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য

এই বিষয়টি হইতেই উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের সম্পর্কের প্রশ্নটিও আসিয়া যায়। উদ্ধৃত অংশে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, লোক-কথা (folk-tale) কে 'humble sisters of written art' বলা হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাদের সম্পর্ক সহোদরের সম্পর্ক, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর স্বাধীন নহে, বরং এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। লোক-সাহিত্যের প্রকাশ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশ বিস্তৃততর ; (লোক-সাহিত্য আত্ম-নির্লিপ্ত হইয়া লেখক বা সমাজ রচনা করে, শিল্প কিংবা ভাব-বিষয়ে আত্ম-সচেতন হইয়া লেখক উচ্চতর সাহিত্য রচনা করেন। শিল্প কিংবা ভাব-বিষয়ে যেই মুহূর্তে লেখকের আত্ম-সচেতনতা (self-consciousness) দেখা দেয়, সেই মুহূর্তেই ইহা লোক-সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে।) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম সচেতন শিল্পী ; সেইজন্য তাঁহার রচনায় উচ্চতর সাহিত্যের উপকরণ যত বেশি, তাঁহার পূর্ববর্তী অন্য কাহারও রচনায় তাহা তত বেশি নাই। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদিগের পার্থক্য সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়।

প্রত্যেক দেশেই লোক-সাহিত্য উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; কারণ, ইহার মধ্যে 'the seed of all the future developments' অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে ; কিন্তু এই বিষয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র। বাংলার আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে ইহার প্রাচীনতর সাহিত্যের যোগ নাই। ইহার কারণ, বাংলার আধুনিক সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার জাতীয় সাহিত্যের ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ইউরোপের জাতীয় জীবনে যে রেনেসাঁ বা নব জাগরণের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ইউরোপের জাতীয় ভাবধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কিন্তু খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জীবনে যে রেনেসাঁ বা নব জাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রেরণা ইউরোপ হইতে আসিয়াছে, এ'দেশের ভাব-চৈতন্যের সঙ্গে তাহার কোন যোগ

নাই। সেইজন্ত আধুনিক বাংলার সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় চৈতন্তের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বাংলার লোক-সাহিত্য আধুনিক বাংলার উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তি হইতে পারে নাই। যদি তাহা হইতে পারিত, তবে আধুনিক সাহিত্যের উপর বাংলা লোক-সাহিত্যের প্রভাব অধিকতর অনুভূত হইত।

প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির দুইটি ধারা আছে—একটি লৌকিক ও আর একটি শিক্ষাগত (learned)। এ'কথা সত্য নহে যে, দুইটি ধারা স্বাধীন ভাবে সমান্তরাল হইয়া প্রবাহিত হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা হয়, তাহা ইহার বিপরীত—লৌকিক ও শিক্ষাগত ধারা দুইটি অনেক সময় পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে আদান-প্রদান চলিতে থাকে—'folklore materials being absorbed by poets and artists,'[১] কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নাই: কারণ, ইহার শিক্ষাগত (literary) ধারাটি এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেই যে কেবল উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহার সঙ্গে লৌকিক ধারাটির অনেক বিষয়ে বিরোধও দেখা দিয়াছে। সেইজন্ত বাংলায় লোক-সাহিত্য ও উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে এত বেশি ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে।

তথাপি এ'কথা সত্য যে, এক কিংবা দেড় শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতা লোক-সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর আকর্ষণ একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই। তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পূর্ব বাংলার লোক-সাহিত্যের ব্যাপক সন্ধান। ইহারই ফলে প্রভূত অর্থব্যয়ে পূর্ববঙ্গ হইতে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা,' 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' ও উত্তর বঙ্গ হইতে 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' প্রভৃতি বিস্মৃতপ্রায় লোক-সাহিত্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। কারণ, যে জাতি সংহত পল্লী-জীবনের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বাস করিয়া একটি সুপরিণত লোক-সংস্কৃতির জন্মদান করিয়াছে, আকস্মিক ভাবে তাহার উপর একটি বৈদেশিক সভ্যতা চাপিয়া বসিলেও, তাহা তাহার অন্তরের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। সেইজন্ত আমরা যতই আধুনিকতার মোহগ্রস্ত হই না কেন, এখনও আমাদের বিস্মৃতপ্রায় পল্লীর

১ A. H. Krappe, *SDFML*, p. 404.

পরিচিত একটি গানের সুর শুনিতে পাইলে মনের মধ্যে যে সাড়া অনুভব করি, তাহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব আমরা মথুরাপুরীতে বাস করিয়াও পরিত্যক্ত পল্লী-বৃন্দাবনের জন্য বেদনা অনুভব করিতেছি। সেই বৃন্দাবনের সঙ্গে আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে, ততটুকুই আমাদের সাধনার মধ্য দিয়া এখনও ফুটাইয়া তুলিতে চাই। কেবল কি আমাদের দেশেই ইহার পরিচয় পাই? ইহা মানব মাত্রেরই একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যাহাদের নাগরিক সভ্যতা আমাদের অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহাদের মধ্যেও এই ভাবের কোনও ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা ব্যাপিয়া লোক-সাহিত্যের যে এত ব্যাপক অনুশীলন দেখা যাইতেছে, তাহার মূলেও সেই পরিত্যক্ত পল্লী-বৃন্দাবনের জন্য বেদনা-বোধই বর্তমান রহিয়াছে।

কিন্তু নাগরিক সমাজের মধ্যে লোক-সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দেখা দিয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইবার জন্য ইহাতে কিছু কিছু কৃত্রিমতাও প্রবেশ করিতেছে। সংহত সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে নির্বাসিত হইবার ফলে নাগরিক সমাজের সমষ্টি বা সমাজ সম্পর্কে কোনও দায়িত্ব আর নাই। লোক-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ একটি বিশিষ্ট ধারার ভিতর দিয়াই সম্ভব হইয়া আসিয়াছে, সেই ধারাটির সঙ্গে পল্লীর সমাজ পরিচিত ছিল—এমন কি এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, সেই ধারাটি পল্লীর সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যেই নিহিত ছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে নাগরিক সমাজের পরিচিত হইবার কথা নহে। তাহার ফলে লোক-সাহিত্য কোন কোন ক্ষেত্রে একটি নাগরিক রূপ লাভ করিতেছে; বলা বাহুল্য, ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ইহা কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইতেছে। যাঁহারা লোক-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অনেক সময় কৃত্রিম লোক-সাহিত্য সৃষ্টি করিবার জন্য দায়ী। একজন ইংরেজ সমালোচক এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'Folklorists whose business it is to study folklore frequently become infected and find that instead of studying folklore they are in fact making it.'[১] বাংলাদেশেও কোন কোন পল্লী-সাহিত্যের সংগ্রাহক পল্লীকবি এবং শিশুসাহিত্য সংগ্রাহক শিশুসাহিত্য-

১ R. D. Jameson, ibid, p. 400

রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু জাতির লোক-সাহিত্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ, ইহা হইতে কালক্রমে জাতির যথার্থ সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। তবে যাঁহার মধ্যে জাতীয় রসানুভূতি খুব প্রবল, তিনি তাঁহার নিজস্ব লোক-সাহিত্যের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা থাকিলে, অতি সহজেই তাহা অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব বশতঃ এ'দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় রসানুভূতি প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য এই বিষয়ে অনেক কৃত্রিম বস্তু প্রকৃত রসানুসন্ধানকারীকেও বিভ্রান্ত করিতেছে।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে কেবল রবীন্দ্রনাথই লোক-সাহিত্যের যথার্থ শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়া ইহা তাঁহার কাব্য সাধনার কোন কোন দিক দিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

'গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষরূপে—সংকীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তিগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক, তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্ন-সাহিত্য এবং উচ্চ-সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে, তাহার ফুল ফল ডাল পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।'

এই বিষয়টিই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে গিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'নিচের সহিত উপরের এই যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি; যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য

সাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গলে ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হর-গৌরী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্য ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্যছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।' (গ্রাম্যসাহিত্য)

উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে এমন যুক্তিযুক্ত কথা এ' পর্যন্ত আর কেহ বলিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ইহা কেবল আত্মভাবপরায়ণ চিন্তার বিলাস মাত্র ছিল না, তিনি তাঁহার নিজের কাব্য সাধনার মধ্য দিয়া ইহা নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যে যুগে তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' কিংবা 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধ রচিত হয়, তাহার পূর্ব হইতেই তিনি বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রভাব নিজের সাধনার মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন। তিনি 'কড়ি ও কোমল' রচনার যুগেই তাঁহার 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' বাংলার এই ছড়াটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার এই নামীয় প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করেন। ইহাতে প্রচলিত ছড়াটির মধ্যে তিনি রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ইহাকে আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ইহার সুর, ছন্দ, ধ্বনি, এমন কি ভাষাও, লোক-সাহিত্যের; অথচ ইহার চেতনা আধুনিক। বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার ছন্দটি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আধুনিক কাব্য রচনার একটি বিশিষ্ট ছন্দরূপে গ্রহণ করিয়া লোক-সাহিত্যের বহিরঙ্গের একটি বিশিষ্ট পরিচয়ের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের যোগ রক্ষা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই ছড়ার ছন্দই পরবর্তী কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিদিগকে ছড়ার ছন্দে কবিতা রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র যুগেই প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্গত 'ছেলে ভুলানো ছড়া' ও 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধ দুইটি রচিত হয় এবং তৎসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের

এই যুগের কাব্যসাধনার মধ্যে সেই জন্তই বাংলা লোক-সাহিত্যের প্রভাব অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই যুগে রচিত 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে'. 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' প্রভৃতি কবিতার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার রূপকথার স্বপ্নজগৎকে তাঁহার অনমুকরণীয় কাব্যভাষায় রূপ দিয়াছেন। এই সংস্কার যে তাঁহার জীবনে কোনদিন দূর হইয়া যায় নাই, তাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনে রচিত 'বীরপুরুষ' প্রমুখ কবিতা এবং 'ছড়া' প্রমুখ কাব্যগ্রন্থ রচনার ভিতর দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল কাব্য-রচনায় কোন কোন স্থানে যেমন রূপকথার রস রোমাণ্টিক চেতনায় মিশ্রণ লাভ করিয়া আধুনিকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই আবার কোন কোন ক্ষেত্রে লোক-সাহিত্যের রূপ বা ছন্দের মধ্য দিয়া আধুনিক কাব্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই বাংলার লোক-সাহিত্যকে এই মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন কবি এই পথে অগ্রসর হইলেও তাঁহারা কেবল বহিরঙ্গেই দৃষ্টি দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মত অন্তরঙ্গে এবং বহিরঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পথে ইহার উপর লোক-সাহিত্যের এই প্রভাব ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

লোক-সাহিত্যের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের পার্থক্য বিষয়ে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে,(লিখিত সাহিত্য কালক্রমে যেমন প্রাচীন (classics) হইয়া যায়, লোক-সাহিত্য কদাচ তাহা হয় না। সাহিত্য লিখিত হইবা মাত্র তাহার রূপটি অপরিবর্তনীয় (rigid) হইয়া যায় বলিয়া কিছুকাল ব্যবধানেই ইহার বহিরঙ্গগত রূপ প্রাচীন বা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, ইহাকেই প্রাচীন সাহিত্য বা classics বলে ; নতুবা সাহিত্য নিত্য, ইহা প্রাচীন হইবার কোন কারণ নাই, ইহার প্রাচীনত্ব কেবল ইহার বহিরঙ্গে ; আন্তর ধর্মে সাহিত্য কদাচ প্রাচীন হইতে পারে না ;(কিন্তু সমাজের উপর দিয়া মৌখিক প্রবহমাণ লোক-সাহিত্য চিরদিনই নূতন, ইহার বহিরঙ্গেও কোনদিক দিয়াই জীর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না। ইহার কারণ, যাহা চিরপরিবর্তনশীল, তাহা কখনও প্রাচীন হয় না, লোক-সাহিত্যও তাহাই)

(লোক-সাহিত্যকে অনেকেই অত্যন্ত প্রাচীন মনে করিয়া ইহার মধ্যে প্রাচীন সমাজের চিত্র অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।) স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রংপুরের কৃষকদিগের মুখ হইতে সংগৃহীত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' বা 'ময়নামতীর গান' নামক গীতিকা (ballad)য় বাংলার খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্রের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন; কারণ, তিনি মনে করিয়াছেন. যেহেতু উক্ত কাব্যের নায়ক গোপীচন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, সেইজন্য উক্ত গীতিকাও খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই রচিত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে কেহ মনে করেন যে, লোক-সাহিত্যকে যেমন সর্বাংশে প্রাচীন বলিয়া দাবী করা যায় না, তেমনই একান্ত আধুনিক বলিয়া দাবী করাও সঙ্গত হয় না—'it is like a forest tree with its roots deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits.'[১] অর্থাৎ লোক-সাহিত্য যেন এক বিরাট অরণ্য মহীরুহ—ইহার মূল অতীতের মধ্যে নিহিত, কিন্তু ইহার কাণ্ডের মধ্যে যে নিত্য নূতন শাখাপল্লব মঞ্জরিত ফুলফল বিকশিত হইতেছে, তাহা বর্তমানের মধ্যে সমাহিত। লোক-সাহিত্যের কাল-নির্দেশ করিতে গিয়া আমাদের এই উক্তিটি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই চলিবে। (লোক-সাহিত্য জনশ্রুতি (tradition)র উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়; কোন একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ করিয়া একটি জনশ্রুতির উদ্ভব যে কখন হয়, ইতিহাস তাহার সন্ধান করিতে পারে না। (রাজপুত্র গোপীচন্দ্র ও রাজমাতা ময়নামতী সম্পর্কে সমাজের মধ্যে কখন কি অবস্থায় কে সর্বপ্রথম গীতিকা (ballad) রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যাইবে না;) তাঁহাদের সমসাময়িক কালে তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও অলৌকিক শক্তি সমাজকে প্রভাবান্বিত করিলেও এই বিষয়ক প্রথম গীতিকা-রচয়িতার আবির্ভাব আরও

---

১ R. V. Williams 'Folk-song' *Encyclopaedia Britanica*, Fourteenth Edition (1932) (EB.) p. 448.

দুই শত বৎসর পরও যেমন হইতে পারে, তেমনই সমসাময়িক কালেও হইতে পারে। এই বিষয়ক প্রথম যাহা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা গীতিকার কোন সুপরিণত রূপ নহে, বরং ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটুকু মাত্র, অবশ্য সেই ভাব অপরিণত ও অপরিস্ফুট গীতিকা আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই ভাব বা idea-টিকেই অরণ্য-মহীরুহের মূল (root) বলা হইয়াছে। মহীরুহ যেমন প্রতি বৎসরই নূতন শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া নবীন পত্রপুষ্প সৃষ্টি করিয়া বাহিরে নবকলেবর ধারণ করে, অথচ ইহার মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ মূল (root) একই থাকিয়া যায়, লোক-সাহিত্যও তেমনই একই জনশ্রুতিমূলক পুরাতন ভাব ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার বহিরঙ্গে নব নব রূপ ধারণ করে। অতএব লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া ক্রমপরিবর্তন লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম—বৃক্ষের পক্ষে জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ করিয়া মূল (root) অক্ষত রাখা যেমন ধর্ম, লোক-সাহিত্যের পক্ষেও মূল ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহিরঙ্গগত ক্রমপরিবর্তন সাধন অবশ্য পালনীয় ধর্ম; কারণ, ইহারা উভয়ই সজীব এবং জীবনের ধর্মই পরিবর্তন—যাহা মৃত ও জড় তাহাই শুধু অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। উপরোক্ত উপমাটিকেই আর একটু সহজ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহা 'always grafting the new on to the old.' অর্থাৎ পুরাতনের মধ্য হইতে ইহাতে নূতনের জন্ম হইতেছে। লোক-সাহিত্যের কাল (age) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আর একজন ইংরেজ সমালোচকও বলিয়াছেন, 'It has been carried down the centuries and like a snow-ball without losing its ancient core has gathered round it the spiritual and imaginative riches of a people of a much more advanced age, of a much more civilized culture.'[১] এই উক্তিটির মধ্যে পূর্বে যে কথাটি বলা হইয়াছে, সেই কথাটি সমর্থিত হইলেও ইহাতে একটি নূতন কথাও বলা আছে। নূতন কথাটির ভিতর দিয়া ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্যে আধুনিক সভ্য সমাজের যে কি দান আছে, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,(প্রাচীন জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া লোক-সাহিত্যের উদ্ভব কিংবা ইহা এক স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত

১ R. M. Dawkins, 'The Meanings of Folktales,' *Folk-Lore*, LXII (1951) p. 428.

হইয়া থাকে বলিয়া মনে হইলেও, ইহার সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার যে কোন যোগ নাই, তাহা নহে। অতএব লোক-সাহিত্য প্রাচীন হইয়াও নূতন, প্রাচীনের সহিত নূতনের যোগসূত্র রচনায় লোক-সাহিত্যই একমাত্র উপায়। ইহার মধ্যে প্রাণশক্তি আছে বলিয়াই ইহা অতীতের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বর্তমান ক্ষেত্রেও উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। প্রাচীন (classical) সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের এইখানেই পার্থক্য—যুগের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়া প্রাচীন (classical) সাহিত্য অচল হইয়া পড়ে, ইহা আর রচিত হইতে পারে না; কিন্তু লোক-সাহিত্য সক্রিয় প্রাণশক্তির অধিকারী বলিয়া অতীত হইতে বর্তমানে এবং বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে সহজেই অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে।) উন্নততর সমাজ ও সমৃদ্ধতর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইহা নূতনতর রূপ লাভ করিলেও ইহার অন্তর্নিহিত পরিচয় অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। অতএব যাঁহাদের ধারণা নিরক্ষর পল্লীবাসীর সাহিত্যই লোক-সাহিত্য, উক্ত সংজ্ঞানুযায়ী তাঁহাদের কথা সমর্থিত হয় না। কেহ কেহ সেইজন্যই মনে করিয়াছেন, লোক-সাহিত্যের কাল (age) সম্পর্কিত প্রশ্ন যেমন অনাবশ্যক, তেমনই অপ্রাসঙ্গিক।[১] লোক-সাহিত্যের রসগ্রাহীদের মনে ইহার রচয়িতার কিংবা ইহার উদ্ভব-কাল সম্পর্কিত কোন প্রশ্নই উদিত হয় না—কেবল মাত্র যে প্রশ্ন উদিত হয়, তাহা স্বতঃস্ফূর্তি (spontaneity) ও সৌন্দর্যের (beauty); ইহা পাইলেই রসিক মন তৃপ্ত হইয়া যায়, এই সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর কোন ঔৎসুক্য তাহার থাকে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সাহিত্য হইতে অনেকেই প্রাচীনতর যুগের সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। উপরে লোক-সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহা ভুল; ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীন তথ্য যেমন নাই, তেমনই ইহার মধ্যে প্রাচীন ভাষারও সন্ধান পাওয়া যায় না। কেন্দ্রগত ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহার বহিরঙ্গগত তথ্য ও ভাষা সর্বদাই যুগোপযোগী করিয়া লওয়া হয়; কারণ, প্রাচীনতর সামাজিক তথ্য সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বোধ যেমন গ্রাম্য শ্রোতৃবর্গের থাকিবার কথা নহে, তেমনই ভাষা-সম্পর্কিত কোন দুর্বোধ্যতাও তাহাদের সহ্য করিবার কথা নহে। শ্রোতৃবর্গ ইহার পরিবেশটি সর্বদাই যেমন

১ R. V. Williams, op. cit., p. 448.

নিজেদের পরিবেশের অনুযায়ী পুনর্গঠন করিয়া লয়, তেমনই ইহার ভাষাও সর্বদা নিজেদের সহজবোধ্য করিয়া লইয়া থাকে। গোপীচন্দ্রের গান পাঠ করিয়া স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, 'রাজমাতা ময়নামতী স্বয়ং হাটবাজারে যাইতেন। গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরা কোন সামগ্রী কিনিতে হইলে নিজেরা দোকানে উপস্থিত হইতেন।'[১] কিন্তু উত্তর বঙ্গের পল্লীর কৃষক-কবি রাজমাতা ও রাজমহিষী বুঝিতে নিজেদেরই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিত্তশালিনী নারীর কথা মনে করিয়াছেন, গোবিন্দচন্দ্রের রাজপরিবারের কথা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। উত্তর বঙ্গে ও বিহারের সর্বত্র বিত্তশালিনী কৃষক রমণীগণ হাটবাজারে গিয়া নিজেরাই ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন, ইহার অতিরিক্ত আর কোনও তথ্য ইহাতে নাই। অতএব ইহা হইতে গোবিন্দচন্দ্রের রাজপরিবারের কথা কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে।

এখানে একটি কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, (প্রাচীন কিংবা ঐতিহাসিক কোন তথ্য দ্বারা লোক-সাহিত্যের শ্রোতৃবর্গের কোনই কৌতূহল নিবৃত্ত হইবার কারণ নাই।) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের অন্তঃপুর-জীবন প্রকৃত কি আদর্শে যাপিত হইত, সেই তথ্য আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত ঐতিহাসিকদিগের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইলেও, পল্লীর লোক-গীতিকার শ্রোতৃবর্গের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাহারা গীতিকার মধ্যে নিজেদের জীবনের রূপ যদি না পাইত, তবে তাহা গ্রহণ করিত না। সাহিত্যের মধ্যে আমাদের নিজেদের জীবনেরই পরিচয় সন্ধান করিয়া থাকি এবং সেই সন্ধান পাই বলিয়াই তাহা আমাদিগকে আনন্দ দান করে। লোক-সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে। উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে রোমান্স-বিলাসিতার যে স্থান আছে, লোক-সাহিত্যের মধ্যেও তাহা আছে—কেবল শিশুসাহিত্য বা রূপকথায় তাহার মাত্রাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। অতএব লোক-সাহিত্য সমসাময়িক সাহিত্য, ইহার মধ্য হইতে পুরাতত্ত্ববিদের কৌতূহল নিবৃত্তির কোন অবিমিশ্র উপকরণের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। একজন ইংরেজ সমালোচক এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—In fact, however old these stories may be, not only is there no probability and certainly no evidence that they are anything like old

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সংস্করণ), পৃ, ৬২

enough for this, but the adaptibility they show will surely suggest that anything extremely primitive must have step by step been discarded as the story was handed down through subsequent centuries more and more out of sympathy with many things which by age would either have lost any appeal to later generations ; or even have become simply distasteful.'[১]

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া লোক-সাহিত্য প্রথম উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা কালক্রমে অপরিচিত হইয়া যাইবার ফলে লোক-সাহিত্যের অনেক বিষয়েরই তাৎপর্য সহজে বুঝিতে পারা যায় না। সাধারণ শ্রোতার নিকট ইহাদের গূঢ় তাৎপর্য বুঝিবার কোন প্রয়োজনও হয় না ; ইহাদের মধ্য দিয়া যে রসের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, তাহাতেই শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। অর্থ প্রকাশের পরিবর্তে রস-সৃষ্টিই লোক-সাহিত্যের লক্ষ্য। সেইজন্য আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বিষয় কিংবা চিত্রাংশ হইতে রস গ্রহণে কাহারও কোন বাধা হয় না। এই বিষয়ে এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্টতর হইবে। বাংলার একটি সুপরিচিত ছেলে খেলার ছড়া এই প্রকার—

আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে।
ঝাঁঝ কাঁসর মৃদঙ্গ বাজে॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহার প্রথম পদটির অর্থাৎ 'আগডুম্ বাগাডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে' ইহার কোনও অর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত কবিও যে বাংলা ছড়ার কোন অর্থের সন্ধান পাইলেন না, তাহা যে খুব বেশি লোকের বোধগম্য হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। অথচ ছড়াটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যথার্থ অর্থ পরিগ্রহ না করিয়াও ইহার রস-গ্রহণে কোন বাধা হইতেছে না। ছড়াটির একটি সঙ্গত অর্থ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা (situation)টি বর্তমান সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার ফলেই ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে আজ এত বেগ পাইতে হইতেছে। ছড়াটি একটি ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা।

১ R. M. Dawkins, 'Some Remarks on Greek Folktales', *Folk-Lore*, LIX (1948), p. 54

ইহার প্রথম পদটির অর্থ আগডুম্ অর্থাৎ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, বাগডুম্ অর্থাৎ পার্শ্ব (বাগ) রক্ষী ডোমসৈন্যদল ও ঘোড়াডুম্ অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোমসৈন্যদল। যখন বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজগণ ডোমসৈন্যদল নিযুক্ত রাখিতেন, তখন তাহাদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক এই চিত্রটি শিশুমন অধিকার করিয়াছিল। আজ বাংলার সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দূর হইয়া যাওয়ায় ডোমজাতি সমাজের অস্পৃশ্য আবর্জনা রূপে গণ্য হইতেছে; সেইজন্য একদিন যে তাহারাই বাংলার ধনমান রক্ষা করিত, সে কথাও আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, 'শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন, একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে, লোক-সাহিত্যের মধ্যে অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপাদান লাভ করিবার উপায় নাই—বিশেষ একটি যুগ কিংবা বিশিষ্ট একটি সমাজের চিত্র ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় না; ইহার মধ্যে একাধারেই অতীত যুগের ঐতিহাসিক চিত্র যেমন প্রকাশ পাইতে পারে, তেমনই সমসাময়িক কালের নিতান্ত অর্বাচীন চিত্রও প্রকাশ পাইতে পারে—কিন্তু উভয়ই এখানে সমান অস্পষ্ট হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করে। অস্পষ্টতাই যাহার ধর্ম, তাহার কোনও ঐতিহাসিক দাবী থাকিতে পারে না।

আদিম সমাজ ও লোক-সাহিত্য

পূর্বে লোক-সমাজ বা folk-society কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতে গিয়া একবার আসামের মণিপুরী সমাজের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কি ভাবে যে বিভিন্ন জাতির বিবিধ সাংস্কৃতিক উপকরণ সমূহ ইহাতে গৃহীত হইয়া তাহা নিজের মত করিয়া ব্যবহৃত হইবার ফলে, সেখানে একটি আদর্শ লোক-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও নির্দেশ করিয়াছি। এখন দেখিতে হইবে, বাংলাদেশেও ইহা কতদূর সম্ভব হইয়াছে—ইহাতেও কোন্ কোন্ জাতি বা উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ মিশ্রিত হইয়া তাহা এই দেশের নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী একটি স্বকীয় রূপ লাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে এই দেশের সমাজ আদিম (primitive) অবস্থা হইতে লোক-সমাজের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মণিপুরী সমাজের সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজের সকল বিষয়ে সঙ্গতি হইতে পারে না ; কারণ, মণিপুর অপেক্ষা বাংলাদেশের আয়তনই যে শুধু বৃহত্তর তাহা নহে, ইহার ইতিহাসও প্রাচীনতর—অতএব ইহাতে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। সেইজন্য মণিপুরের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে যে কয়েকটি মাত্র বহিরাগত জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের সন্ধান লাভ করা যায়, বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জাতির সাংস্কৃতিক উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়াছে ; মণিপুরের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস যেমন সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ধারা তত স্পষ্ট ও স্বচ্ছগতি নহে, অনেক ক্ষেত্রেই জটিল বলিয়া অনুভূত হইবে। মণিপুর ভারতের এক সীমান্তে অবস্থিত—ইহা অন্যান্য অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে ; অতএব বহিঃপ্রভাব ইহার উপর নগণ্য ; কিন্তু বাংলাদেশের চতুঃসীমা অবারিত ; সেইজন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবজাতির সঙ্গে অতি সহজেই ইহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে ; অতএব ইহার সংস্কৃতির প্রকৃতি একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মণিপুরে কেন্দ্রগত একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে—বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে

মূলগত একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকিলেও বহু বিভিন্ন বিষয়ে অনৈক্যও আছে; কারণ, ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মৌলিক জাতিগত (ethnic) পরিচয় অভিন্ন নহে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বীরভূম ও মৈমনসিংহ জিলার মধ্যে লোক-সংস্কৃতিগত বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে ঐক্য নাই। অতএব বাংলাদেশের লোক-সমাজের প্রকৃতি মণিপুরের লোক-সমাজের প্রকৃতি হইতে সকল বিষয়েই জটিলতর।

প্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশে ভাগীরথীর দুই তীর ব্যাপিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব ভাগীরথীর দুই তীর হিন্দু সংস্কৃতির অনুশীলন করিবার ফলে বাঙ্গালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাংলার লোক-সংস্কৃতি সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, ব্রাহ্মণ-বসতির পূর্বে এই অঞ্চলে বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল উপকরণ বর্তমান ছিল, তাহাও প্রবল হিন্দু প্রভাবের সম্মুখীন হইয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। সেইজন্য এই অঞ্চলে অর্থাৎ মধ্যবঙ্গে বাংলার যে লোক-সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরই বলিতে হয়। তাহার পরিবর্তে বাংলার যে সকল অঞ্চল এই ভাগীরথীতীর হইতে বহু দূরবর্তী, বিশেষতঃ বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চল সমূহেই লোক-সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টি হইয়াছিল। কেবল মাত্র দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী সীমা বাদ দিয়া বাংলার অবশিষ্ট তিনটি সীমা একবার মাত্র পরিক্রমণ করিয়া আসিলেই এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভাগীরথীতীরের বাঙ্গালীর হিন্দু-সংস্কৃতিও কালক্রমে একটি নিজস্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মত সর্ব বিষয়ে নিজেকে পারিপার্শ্বিক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। সেইজন্য কৃত্তিবাস যে রামায়ণের অনুবাদ করিলেন, তাহা বাল্মীকির রামায়ণ হইল না, বাঙ্গালীর রামায়ণ হইল; সংস্কৃত পুরাণ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এ'দেশে বাঙ্গালীর পুরাণ মঙ্গলকাব্য রচিত হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভাগীরথীতীরই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদি প্রতিষ্ঠা-ভূমি ছিল বলিয়া, এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা হিন্দুধর্মের মৌলিক আদর্শ অধিকতর পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার ফলে লোক-সাহিত্যের উপকরণ

সমূহ এখানে অপরিপুষ্ট রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদান ও ভাবের বিনিময়ের ভিতর দিয়াই লোক-সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে; যে জাতি কেবলই অন্যের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে, তাহার লোক-সাহিত্য বিকাশ লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সংস্পর্শে আসিবার ফলে ইহার মধ্যে এক সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে সকল বিভিন্ন জাতি এ'দেশের সান্নিধ্যে আসিয়া ইহার লোক-সংস্কৃতিকে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের পরিচয়ই আজ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল মাত্র অনুমান ও সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে কয়েকটি কথা আজও বলা যাইতে পারে মাত্র।

বাংলার লোক-সংস্কৃতির মধ্যে ইহার সীমান্তের অধিবাসী উপজাতি সমূহের সাংস্কৃতিক দান যে কত, তাহা আমরা সে'ভাবে বিচার করিয়া দেখি নাই। শিল্পাচার্য স্বর্গত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'বাংলার ব্রতকথা'য় ইহাদের একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তটি এখানে উল্লেখ করিতে পারি। বাংলার মেয়েলী ব্রতে 'কুক্কুটী ব্রত' নামক একটি ব্রত আছে। বাংলার হিন্দুসমাজের সঙ্গে কুক্কুট-কুক্কুটীর যে সম্পর্ক, তাহাতে ইহাদের সম্পর্কে কোন ব্রত উদ্‌যাপন করিবার মত মনোভাব যে বর্তমান থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তবে ইহা কোথা হইতে কি কারণে বাংলার হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিল? স্বর্গত অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, ইহা বর্তমান ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ জাতি হইতে বাংলার সমাজে আসিয়াছে। ছোটনাগপুর বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত; অতএব এই যুক্তির মধ্যে অসম্ভাব্যতা কিছু নাই। কুক্কুটী উর্বরা শক্তি (fecundity)র প্রতীক; কারণ, ইহা বহু ডিম্বপ্রসবিনী; সেইজন্য বাংলার মেয়েরা সন্তান কামনায় ইহারই শক্তির উদ্বোধন করিয়া ইহার ব্রত পালন করিয়া থাকে। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা গেল যে, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে আমাদের যে পার্থক্যই আছে বলিয়া মনে হয়, গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্য হইতেও আমাদের আত্মীয়তার সূত্র প্রকাশ পাইতে পারে। অতএব বাংলার সাংস্কৃতিক উপকরণের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য

সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে, তাহাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কেও আমাদের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বা মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে বীরভূম জিলার প্রায় উত্তর সীমানা পর্যন্ত একদল গীত-ব্যবসায়ী সঙ্গীত সহযোগে চিত্রিত পট দেখাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে; ইহাদের স্বরচিত সঙ্গীত (পটুয়া-সঙ্গীত) নামে পরিচিত—ইহা বাংলার আখ্যানমূলক গীতি (narrative song)র অন্তর্গত; কিন্তু আনুপূর্বিক কোন আখ্যান ব্যতীত বিভিন্ন অসংলগ্ন চিত্রও ইহাদের ভিতর দিয়া কখনও কখনও পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। পটুয়ারা নিজেরাই বিবিধ জনশ্রুতিমূলক (traditional) বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া পট অঙ্কিত করে এবং নিজেরাই স্বরচিত গীত-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে দেখাইয়া বেড়ায়।[১] এই চিত্র বা পট অঙ্কন করিবার রীতি বাংলার প্রায় সর্বত্রই কালক্রমে বিস্তার লাভ করিলেও, এই অঞ্চলেই যে ইহা সর্বপ্রথম উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই অঞ্চলের দক্ষিণ-সীমান্ত সংলগ্ন উড়িষ্যা প্রাচীন কাল হইতেই কারুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে—মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণ অঞ্চল একদিন উড়িষ্যারই স্বাধীন হিন্দুসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অতএব লোক-সংস্কৃতির এই বিষয়টি যে উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। উড়িষ্যায় পট-শিল্পের আজ পর্যন্তও ব্যাপক প্রচলন আছে। কিন্তু উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম বাংলায় এই সাংস্কৃতিক উপকরণটি গৃহীত হইলেও, বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহা স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছে। এই স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক উপকরণও দেশান্তরের সংস্কৃতির নিজস্ব অঙ্গ হইয়া পড়ে; ইহাতেই ইহা এক নূতন শক্তি লাভ করে এবং নূতন জাতির সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে উড়িষ্যার লোক-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপকরণ বাংলাদেশের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

১ পটুয়াদিগের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য *Census 1951 West Bengal. The Tribes and Castes of West Bengal* (Calcutta, 1953) pp, 307-314 দ্রষ্টব্য।

মানভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের সদর মহকুমায় বাঙ্গালী মেয়েদিগের মধ্যে ভাদুগান নামক এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে—বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে ইহা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। একটি জনশ্রুতিমূলক ক্ষীণ কাহিনী যদিও এই লোক-সঙ্গীতের ভিত্তি, তথাপি ইহার কাহিনী ইহার মধ্যে অত্যন্ত গৌণ—বাংলার প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশই ইহার মুখ্য অবলম্বন। ভাদ্রমাসে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীরই প্রধানতঃ কুমারী মেয়েরা ভাদু নামক দেবীর প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া এই লোক-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাদ্রের ভরা প্রকৃতির পটভূমিকায় কুমারী-হৃদয়ের বিচিত্র সুখদুঃখের অনুভূতিই ব্যক্ত হয়। এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েদের মধ্যে কি ভাবে উদ্ভূত হইল? এই অঞ্চলেরই সংলগ্ন ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মধ্য ভারতের গঁড়্‌জাতি অধ্যুষিত সমতল ভূমি পর্যন্ত যে দ্রাবিড় ও মুণ্ডাভাষী উপজাতিসমূহ বাস করে, তাহাদের মধ্যে ভাদ্রমাসে করম নামক এক বিশিষ্ট নৃত্যগীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অবিবাহিত যুবক-যুবতীগণই এই উৎসবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। যদিও ইহার একটি আচার অরণ্য হইতে করম্ (কদম্ব) বৃক্ষের শাখা আনুষ্ঠানিক ভাবে কাটিয়া আনিয়া তাহা কেন্দ্র করিয়াই নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান, তথাপি ইহা এই সকল উপজাতির একটি প্রকৃতি-উৎসব বা বর্ষা-উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। মধ্যভারত হইতে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বর্ষা-প্রকৃতি উপজাতীয় অধিবাসীর মনে যে আনন্দের স্পন্দন জাগাইয়া তুলে, তাহার তরঙ্গ বাংলার পশ্চিম সীমান্তের মধ্যবর্তী কুমারীদিগের হৃদয়-তটে আসিয়া যে প্রতিহত হইবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ, সাংস্কৃতিক জগৎ ভৌগোলিক সীমা দ্বারা বিভক্ত নহে। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বশতঃ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের নারীসমাজ সেই আনন্দ তাহার উপজাতীয় প্রতিবেশিনীদিগের মত করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। এক দিকে বহিরাগত নবলব্ধ হিন্দু সংস্কৃতি ও অন্য দিকে প্রতিবেশী অনার্য-সংস্কৃতি—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলের কুমারীগণ ইহার যে অভিনব রূপের পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহাই ভাদুপূজা নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার নামই যথার্থ স্বাঙ্গীকরণ বা নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়াও পরের জিনিস নিজের

মধ্যে গ্রহণ করা। এই কার্যে বাঙ্গালীর মত দক্ষ জাতি ভারতবর্ষে খুব বেশি নাই।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী উপজাতীয় অঞ্চলের করম্ ও বাংলার উপরোক্ত অঞ্চলের ভাদুগান যে একই প্রেরণা হইতে জাত, তাহা একটি করম্ ও একটি ভাদুগান পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে। ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রচলিত একটি করম্ সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়—

Today came the Karam
And was grand in the stream
Karam, tomorrow you will go
To the banks of the Ganges.[১]

বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত একটি বাংলা ভাদুগানে শুনিতে পাওয়া যায়,

আজকে এ'লে ভাদুমণি হেসে খেলিয়ে,
কাল্‌কে যাবে ভাদুমণি গঙ্গায় ভাসিয়ে।

উৎসবান্তে করম্ বৃক্ষের শাখাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্বত্য নদীতে বিসর্জন দিয়া ওরাওঁ যুবক-যুবতীগণ নৃত্যগীত সহকারে গায়—

While you were, here, Karam
The boys and girls were full of joy
Now you are going, Karam
All the boys and girls are sad.

বাংলার কুমারীগণও ভাদুকে এই গান গাহিয়া জলে বিসর্জন দেয়—

ভাদু, তোমা ধনে,
বিদায় দিতে প্রাণ কাঁদে এই দুর্দিনে॥
খাজা গজা মণ্ডামিঠাই গো,
এনেছিলাম কত কিনে,
এক রাত্রিতে মিট্‌ল আশা তোমায় নিয়ে নাচগানে॥

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদিবাসীর 'করম্' বৃক্ষের শাখাই হিন্দুপ্রভাব বশতঃ পশ্চিম বঙ্গের কুমারীদিগের ভাদুপ্রতিমার রূপ লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ বাংলার পল্লীর যুবক-যুবতীদিগের সমবেত

১ W. G. Archer, *The Dove and The Leopard* (Calcutta, 1948) p. 45
২ ibid.

নৃত্য-গীত লুপ্ত হইয়া গেলেও, বাংলার কুমারীগণ সেই সঙ্গীতের ধারা নিজেদের মধ্যে আজিও যে অব্যাহত রাখিয়াছে, ভাদুগান তাহার অন্যতম প্রমাণ। কোন কোন স্থানে নৃত্যসম্বলিত ভাদুগান আজিও শুনিতে পাওয়া যায়।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী জিলাসমূহের ডোমজাতি বাংলার লোক-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইতিপূর্বে ('আগডুম্ বাগডুম্') ছড়াটির কথা উল্লেখ করিয়া ইহার ভিতর দিয়া ডোমজাতির শৌর্য-বীর্যের পরিচয় যে কি ভাবে একদিন বাংলার শিশুমন জয় করিয়াছিল, তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়াও এই সকল প্রবাদ যেমন, 'ডোম্‌কে নেই যমের ভয়', 'ডোমের পুত যমের দূত' ইত্যাদির ভিতর দিয়া বাংলার এই অধুনা অস্পৃশ্য জাতির বিলুপ্ত গৌরবের কথা প্রকাশ পায়। কিন্তু বাংলার লোক-সাহিত্যে ডোমজাতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের গীতিকা—উচ্চতর সাহিত্যের অন্তর্গত হইয়া ইহাই কালক্রমে ধর্মমঙ্গল কাব্য নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যটি বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী কবিদিগের হাতে পড়িয়া ইহা কোন পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করিবার পূর্বে, ইহা রাঢ়ের লোক-সমাজে (folk-society) গীতিকা বা ballad আকারেই প্রচলিত ছিল এবং তাহার ভিত্তি একদিক দিয়া যেমন ছিল ডোমজাতি পূজিত ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য, আবার অন্য দিক দিয়া ছিল তাহাদেরই শৌর্যবীর্যের কাহিনী। কারণ, ধর্মঠাকুর মূলতঃ ডোমজাতিরই দেবতা ছিলেন, এখন উচ্চবর্ণের সমাজও তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়াছে এবং ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়তঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির ভিতর দিয়া দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়টি নরনারীর চরিত্রেরও মহিমা প্রচারিত হইয়াছে, তাহারা সকলই ডোমজাতিভুক্ত; কালু ডোমের বীরত্ব ও প্রভুভক্তি, লখাই ডোমনীর সাহসিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা, শাকাশুকার আত্ম-বিসর্জন, ময়ূরার তেজস্বিতা ইত্যাদিই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে লোক-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। অতএব (বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি শাখা পশ্চিম বাংলার ডোমজাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে।) এই ডোমজাতি পূর্বে কোন স্বতন্ত্র ভাষাভাষী উপজাতি ছিল, কালক্রমে ইহা বাংলাভাষা গ্রহণ করিয়া বাংলার লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত

হইয়াছে—শুধু তাহাই নহে, নিজেদের শৌর্য ও বীর্য দ্বারা ইহা বাঙ্গালীর রসবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়াছে)

(বাংলার লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি অঙ্গ কীর্তনগান ; রাঢ়দেশই কীর্তন-গানের জন্মভূমি : এই অঞ্চলে বৈষ্ণব-প্রভাব বশতঃ কীর্তনগানের বিষয়-বস্তুতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী প্রবেশ করিলেও, বৈষ্ণব-প্রভাবের পূর্ববর্তী কীর্তনগান যে এই অঞ্চলের লৌকিক প্রেম-গীতিকা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে বাংলার সমস্ত লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সঙ্গীতরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে, সেইজন্য বাংলাদেশে আজ 'কানু ছাড়া গীত নাই'। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী কীর্তনগানের মধ্যে এমন একটি নিবিড়তা লাভ করিয়াছে যে, কীর্তনগান বলিতেই আজ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত মাত্র বুঝায়। কীর্তনগান এই অঞ্চলের অধিবাসী কোন উপজাতির সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করিয়াই যে রচিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁদিগের নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি অংশের নাম কীর্তন: 'Uraon dance poems are fitted to the drum rhythms and are sung by the boys and girls while the dances revolve. Most of them are poems of four lines. In the dances which have a definite advance and reverse action the first two lines are called the *or* or opening movement and the third and fourth lines are known as the *kirtana* or reverse.[১] (ওরাওঁ জাতির সঙ্গীতাঙ্গ এই কীর্তন কথাটি হইতেই বাংলা কীর্তনগান কথার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়,) বাঙ্গালী এই সঙ্গীতরূপের ভিতর রাধাকৃষ্ণের প্রেমাখ্যান অবলম্বন করিয়া ইহাকে এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রূপদান করিয়াছে ; ওরাওঁ যুবক-যুবতীর পার্থিব প্রেমের পরিবর্তে ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী অপার্থিব প্রেমের মহিমা প্রচার করিতেছে। কিন্তু আদিম জাতির স্থূল পার্থিব প্রেমই ইহার ভিত্তি বলিয়া এখনও বৈষ্ণব কবি রচিত এই অপার্থিব প্রেম-সঙ্গীত যে কোন সময় পার্থিব বেদনার অনুভূতিতে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, তাহাই ইহার মানবিক আবেদন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—

১ W. G. Archer, *The Blue Grove, The Poetry of the Uraons* (London, 1940), p. 26.

নতুবা বাংলার বৈষ্ণবগীতি বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে ধর্মশাস্ত্রের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে গিয়া প্রবেশ করিত।

উপজাতীয় লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত যে কি ভাবে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির আধ্যাত্মিক গীতিকায় রূপায়িত হইয়াছে, এই বিষয়ে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে, এ'খানে তাহাদের দুই একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

মধ্যপ্রদেশে গঁড় উপজাতির সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়,

> Outside, the rain is pouring down,
> Inside the house, a girl sits weeping.

এই ভাব ও চিত্রটিই বৈষ্ণবকবি এইভাবে রূপায়িত করিয়াছেন,

> এ'ভরা বাদর মাহ্ ভাদর
> শূন্য মন্দির মোর।
> ঝঞ্ঝা ঘন গর্জন্তি সন্ততি—ইত্যাদি।

আদিম জাতির 'the house'ই বৈষ্ণবকবির মন্দির ও 'a girl'ই তাহার কল্পনায় শ্রীরাধায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। গঁড়জাতির প্রেম-সঙ্গীতে আছে,

> The wind and the rain are beating down,
> Take shelter or your clothes will be drenched.
> The rain is falling, falling.

ইহারই পরিচয় বৈষ্ণব-কবিতায় এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে,

> এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
> কেমনে আইল বাটে।
> আঙ্গিনার পাশে বঁধুয়া ভিজিছে
> দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

বাংলার যে অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনগানের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প, সেই অঞ্চলে ইহার বিষয়গত লৌকিক-রূপ এখনও অধিকতর প্রত্যক্ষ রহিয়াছে,

> আস্‌মানেতে কালা মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
> হায়, বন্ধু, আজি বুঝি না হইল মিলন॥
> বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।
> ঘরের পাছে মানের পাতা কাট্যা মাথায় ধর॥

ইহাদের মধ্যে যে কেবল ভাবটিই অভিন্ন, তাহা বলিতেছি না—প্রেম-সঙ্গীতের ভাব পৃথিবীর সর্বত্রই অভিন্ন—কিন্তু ভাব-প্রকাশের যে আঙ্গিক ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও এখানে যে নিবিড় ঐক্য রহিয়াছে, তাহাই এখানে নির্দেশ করিতে চাই। মধ্যভারতের গঁড়জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব মৈমনসিংহের কৃষক-সমাজ পর্যন্ত রচিত লোক-সাহিত্যের ভাব ও অঙ্গগত এই ঐক্যের মধ্যে এই অঞ্চলের মৌলিক মানব-সমাজের ঐক্যের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বাংলার লোক-সাহিত্যে কীর্তনগান ব্যতীতও বীরভূম জিলার আরও কয়েকটি বিশিষ্ট দান আছে;(একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলার লোক-সাহিত্য ইহার দুইটি জিলার বিশিষ্ট দানে সমৃদ্ধ—তাহা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ।) ইহার একটি ঐতিহাসিক কারণও আছে, তাহা এখানে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেই বাংলার লোক-সাহিত্যে উপজাতির দানের গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, (লোক-সাহিত্যের পরিপুষ্টির মূলে বিভিন্ন জাতি কিংবা উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদানের যত প্রয়োজন তত প্রয়োজন আর কিছুরই নহে।) এই দিক দিয়া বীরভূম এবং মৈমনসিংহ জিলার ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। কারণ, এই উভয় জিলারই সীমান্তে এখনও কয়েকটি প্রবল উপজাতির বাস, ইহাদের বিভিন্ন শাখা ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া ইহাদের অভ্যন্তরে বাস করিতেছে—ইহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তির উপরই এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্য শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে। বীরভূম জিলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দ্রাবিড়ভাষী মালে, মালপাহাড়িয়া ও পশ্চিম অঞ্চলে কোল-মুণ্ডা ভাষী সাঁওতাল জাতির বাস। অবশ্য সাঁওতাল জাতি এই অঞ্চলে নবাগত হইলেও মালে এবং মালপাহাড়িয়া জাতি যে এই অঞ্চলে বহু কালাবধি বসবাস করিতেছে, তাহা জানিতে পারা যায়। ইহাদের কোন কোন অংশ ক্রমে বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া বীরভূম জিলার অভ্যন্তরেই বাস করিতেছে এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপকরণ বিনিময় করিয়া ইহার বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সহায়ক হইয়াছে। মৈমনসিংহ জিলার উত্তরে গারো নামক এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির বাস, ইহারই

এক অংশ বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া ইহার উত্তরাংশের সমতল ভূমিতে বসবাস করিতেছে—তাহারা হাজং নামে পরিচিত; ইহারা বোড়ো নামক বৃহত্তর ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির শাখাভুক্ত। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে মধ্যযুগ পর্যন্তও এই বোড়ো জাতিরই এক শাখাভুক্ত জাতির বসবাস ছিল, তাহা কোচ নামে পরিচিত। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির এই সকল শাখা প্রবল মাতৃতান্ত্রিক। গারো এবং খাসি জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক জাতির সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের এখনও পরিচয় পাওয়া যাইবে। দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্বকালে ঈশা খাঁ যখন পূর্ব মৈমনসিংহ আক্রমণ করেন, তখনও এই অঞ্চলে দুইজন কোচ রাজা রাজত্ব করিতেন; একজনের রাজধানী ছিল কিশোরগঞ্জের অনতিদূরবর্তী স্থান জঙ্গলবাড়ী ও আর একজনের রাজধানী ছিল মৈমনসিংহ সহরের অনতিদূরবর্তী স্থান বোকাইনগর। ঈশা খাঁর অধিকারের পর হইতেই এই অঞ্চলের কোঁচ আধিবাসীদিগের উপর মুসলমান ধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। অতএব এই অঞ্চলের লোক-সমাজ মূলতঃ ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং ইহার উপরই এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে; কারণ, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র যে সমাজ, তাহা সেই অঞ্চলের হিন্দু কিংবা মুসলমানের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নহে, বরং তাহারও পূর্ববর্তী এক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ; সেইজন্য ইহার মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্বাধীন প্রেম ও বিবাহ-বিধি বিষয়ে শৈথিল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিশিষ্ট লক্ষণ। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এই গীতিকাগুলির সমাজ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'বিবাহের নিয়ম অত্যন্ত শিথিল ছিল। মদন সাধু ও ভেলুয়া বহুকাল স্বামী-স্ত্রীভাবে বসবাস করার পর ধনঞ্জয় সাধু তাহার পুত্র হিরণ সাধুর সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহ অনুমোদন করিতেছেন। একটি পলাতকা কুমারী সপ্তদশবর্ষ বয়সের সময় প্রণয়ীর সঙ্গে বহুস্থলে পর্যটন করিয়া এবং নানা স্থানে অত্যাচারী ব্যক্তিদিগের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকার পর যখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি সদয়ভাবে গৃহীত হইলেন। ইহা কি খুব বিচিত্র প্রথা নহে? ভেলুয়া এবং মেনকা উভয়েই সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া প্রণয়ি-মনোনয়ন করিতেছেন। এই সমাজে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ কোন

গৌরবজনক স্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিবাহ ব্যাপারটা প্রায় সমস্তই স্ত্রী-আচার।[১]

হাজং, গারো, খাসি, বোড়ো, মিশ্‌মি, আবর, ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্‌ জাতির এই সকল শাখার বিবাহ-আচারের সঙ্গে যাঁহাদের সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, উদ্ধৃত অংশে যে সকল প্রথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কিছুই 'বিচিত্র' নহে, বরং ইহাদের প্রত্যেকটি প্রথাই উল্লিখিত প্রায় প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই প্রচলিত আছে। গারো ও খাসি যুবতীগণ নিজেদের পতি নিজেরাই নির্বাচন করিয়া পরিণত বয়সে বিবাহ করে, ইচ্ছামত বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া নূতন স্বামী গ্রহণ করে, ইহাদের সকলের মধ্যেই বিবাহের পূর্বে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়; এমন কি, জারজ সন্তানও সমাজে স্বাভাবিক স্থান লাভ করে, কুলত্যাগের জন্য নারীর কদাচ সামাজিক পাতিত্য ঘটে না। ভারতের প্রায় সকল আদিম অধিবাসীর সমাজেই স্ত্রী-আচারই বিবাহের একমাত্র আচার। অতএব উচ্চতর হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক আদর্শ দিয়া ইহাদের সমাজের আদর্শ বিচার করিবার উপায় নাই, বরং এই সকল প্রতিবেশী সমাজের আদর্শ দ্বারাই ইহাদের বিচার করিতে হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার উচ্চতর সামাজিক আদর্শের সর্ববিষয়ক বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের সমাজ কি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া আছে। নূতন মুসলমান কিংবা হিন্দুধর্ম দ্বারা দীক্ষিত এই অঞ্চলের সাধারণ সমাজ ইহার অন্তস্তলে এই সত্যের অনুভূতি জাগ্রত রাখিয়াছে বলিয়া 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কাহিনীগুলি হইতে আজিও তাহারা সহজ আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছে।

কেবল মাত্র গীতিকা দ্বারাই যে পূর্ব মৈমনসিংহের লোক-সাহিত্য সমৃদ্ধ, তাহা নহে—লোক-সঙ্গীত ও লৌকিক কথা-সাহিত্যের দিক দিয়াও ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ, তাহা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে। এখানে বক্তব্য এই যে, বীরভূম এবং মৈমনসিংহ উভয় অঞ্চলই কয়েকটি প্রবল অনার্য ভাষাভাষী সমাজের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বলিয়া, ইহাদের লোক-সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

---

১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬), ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভূমিকা, পৃঃ ১২

বীরভূম হইতে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে মালদহ জিলায় প্রবেশ করিতে পারা যায়; এখানেই বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী, গৌড় প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। ইহা বড় গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং ইহারই নানা শাখা-প্রশাখা দ্বারা খণ্ডিত। এখানে বাংলার রাজধানী স্থাপনের পর হইতেই ইহার সহিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহারই ফলস্বরূপ এখানে এক শ্রেণীর লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাম গম্ভীরা। বর্তমানে ইহা আদ্যের গম্ভীরা কিংবা শিবের গম্ভীরা বলিয়া পরিচিত হইলেও, এই অঞ্চলে বৌদ্ধ কিংবা হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্বে ইহার পরিচয় স্বতন্ত্র ছিল। গম্ভীরা প্রকৃত পক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৎসরান্তে লোক-সমাজ কর্তৃক বর্ষবিবরণীর পর্যালোচনা। ইহা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য—আসামের আবর, মিশ্‌মি প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই ভাবে পূর্ববর্তী বৎসরের বিবরণীর পর্যালোচনা করা হইয়া থাকে। উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত এই অঞ্চলে যে ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির প্রভাব বর্তমান থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই; কারণ, এই অঞ্চলের মৌলিক মানব-সমাজ ইহারই জাতিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মালদহ হইতে আরও উত্তর দিকে দিনাজপুরের ভিতর দিয়া কোচবিহার পর্যন্ত যতই অগ্রসর হইয়া যাওয়া যাইবে, ততই এই অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ হইবে। কারণ, এই অঞ্চলের অধিবাসী কোচজাতি মূলতঃ ইহারই অন্তর্গত এবং ইহার মধ্যে সামাজিক সংহতি এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাংলার লৌকিক শৈব সাহিত্যের মধ্যে কোচজাতি বিশেষতঃ ইহার নারী বা কুচ্‌নীগণ অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কোচজাতি শৈবধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার পর শিবকে দেবতা রূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের পূজাচার দ্বারাই তাহার পূজাচার গড়িয়া তুলিয়াছিল। কোচজাতি পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক ছিল এবং সেই সমাজে কোচ নারী বা কুচ্‌নীরাই দেবপূজা করিত; এখনও খাসি ও শবরনারীগণ তাহাদের সমাজস্থিত বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় নিজেরাই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কোচ নারীরাই শিবপূজা করিত বলিয়া শিবকে কোচ নারীর প্রতি আসক্ত বলিয়া কল্পনা করা হইত; সেই সূত্রেই শিবের সঙ্গে কোচ নারীর

সংশ্রবের কথা বাংলার সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। যেমন, মৈমনসিংহের পটুয়া-সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়—

গিয়ে কুচ্‌নীপাড়া ভাঙ্‌ধুতুরা শিবশম্ভু খায়।
তানপুরা বাজাইয়া শিবে কুচুনী ভুলায়॥

মালদহের শিবের গাজনেও শুনিতে পাওয়া যাইবে,

কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচ্‌নীপাড়া।
কুচ্‌নীপাড়া হইতে দিয়ে এ'ল সাড়া॥

বরিশালের শিবের ছড়ায় পার্বতীকেও কোচবিহারের অধিবাসিনী বলা হইয়াছে, যেমন শিব পার্বতীকে বলিতেছেন,

কুচ্‌নী নগরে আছে তোমার বাপ ভাই।
সেইখানে যাইয়া পর শঙ্খ আমার কিছু নাই॥

অতএব দেখা যাইতেছে, উত্তর বঙ্গের কোচজাতি নিজের সাংস্কৃতিক উপকরণ দিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি বিভাগ গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছে। যে জাতি একদিন বাহির হইতে ইহার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি লইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই জাতি অচিরকাল মধ্যে এই দেশেরই সংস্কৃতি কেবল মাত্র নিজের মত করিয়াই নিজের মধ্যে যে গ্রহণ করিল, তাহাই নহে,—বরং এই দেশের লোক-সংস্কৃতির মধ্যেও নিজের সাংস্কৃতিক উপকরণ উপহার দিল—এই প্রকার বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়েই বাংলায় লোক-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

কোচবিহার জিলার সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত রংপুর জিলায় যে রাজবংশী বা বাহে সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করে—কেহ মনে করেন, ইহারা কোচজাতিরই এক শাখাভুক্ত; কিন্তু আবার অন্য কেহ মনে করেন, ইহারা পূর্বে দ্রাবিড়ভাষী কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল—দক্ষিণ অঞ্চল হইতে গিয়া কালক্রমে উত্তর বঙ্গে নিজেদের বসতি স্থাপন করিয়াছে। সে যাহাই হউক, এ'কথা সত্য যে, ইহারা মূলতঃ একই মানব-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উত্তর বঙ্গ অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিবার বহুকাল পর পর্যন্তও তাহাদের সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় ছিল। ইহাদের এই বিশিষ্ট সামাজিক সংহতির ভিতর হইতে যে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই বর্তমান রূপ এই অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান, জাগগান, যুগীযাত্রা

ইত্যাদির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুধর্মের প্রভাব ইহাদের উপর অত্যন্ত গৌণ বলিয়া ইহাদের মৌলিক রূপ অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। প্রেম ও ভাব সঙ্গীতগুলির উপর রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমের আদর্শ ততখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এইবার বাংলার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত মৈমনসিংহ জিলার লোক-সাহিত্যের কথা বলিব। ইতিপূর্বে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও তাহার সামাজিক ভিত্তির কথা আলোচনা করিয়াছি—এখানে ইহার অন্যান্য আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। গীতিকা (ballad) বাদ দিলে এই অঞ্চলে আর যে সকল লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে জারি, সারি, ঘাটু, গোপিনীকীর্তন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকটি মূলতঃ এক একটি স্বতন্ত্র জাতির সংস্কৃতি হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, ইহাদের প্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে জারি নৃত্যসম্বলিত বীররসাত্মক গীতি, সারি নৌকা বাইচের গান বা কর্ম-সঙ্গীত, ঘাটু প্রেম-সঙ্গীত ও গোপিনীকীর্তন আখ্যানমূলক গীতিকা। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইবে। এখানে একটি কথা কেবল উল্লেখ করিতে চাই যে, বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে যে মানবজাতির বিভিন্ন শাখা বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদেরই কয়েকটির মৌলিক সাংস্কৃতিক পরিচয় এই বিভিন্ন সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা এই অঞ্চলের বর্তমান হিন্দু কিংবা মুসলমান অধিবাসী কাহারও মৌলিক সৃষ্টি নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি যে, জারিগানে নূপুর পায় দিয়া বৃত্তাকারে পুরুষগণ যে ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহা আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে আজও প্রচলিত আছে—ইহা তাহারই একটি রূপ মাত্র। তবে আদিবাসী সমাজে নারীই প্রধানতঃ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে মৈমনসিংহের বর্তমান মুসলমান ধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে স্বভাবতঃই পুরুষগণ অংশ গ্রহণ করিতেছে। তাহাদের পায়ের নূপুরই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, নূপুর নারীরই অলঙ্কার, পুরুষের নহে। যে সকল স্থলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রভাব বশতঃ নারীর প্রকাশ্য নৃত্য লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে পুরুষ সেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে, সেইখানেই পুরুষকে কোন কোন সময় নারীর বেশ ধারণ করিয়া, কিংবা অন্ততঃ নূপুর বা অন্য কোন

যায়; ইংরেজিতে ইহাকে seasonal song বলা হইয়াছে। এখানে বারমাসীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

আইল আইল শাওন মাস ঘন বরিষণ।
দেওয়ার গর্জন শুন্যা কাঁপে নারীর মন॥
উলকিয়া ফিন্‌কি ঠাডা আস্‌মান্ ভাইঙ্গা পড়ে।
চমকাইয়া বেস্থরা নারী আপন স্বামী ধরে॥
গলায় সাফ্‌লার মালা আর শীতল পাটি।
ভূমিত বিছায়া শয্যা করি পরিপাটি॥
বিভোলা বন্ধেরে লইয়া ঘুমে অচেতন।
এইকালে মলয়ার দুঃখবিবরণ॥[১]

মধ্যভারতের আদিবাসী-অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া যেন ইহারই ধ্বনিটি প্রতিহত হইয়াছে,

Now comes Bhadan when it is always midnight
And the darkness is greater for the flashing lightning
No one is sure whether her husband will return by evening
'Tell me, will my love come or not?'[২]

অথবা

In Bhadan the nights are dark and the lightning flashes
My hair shines with the flash, the thunder roars, my
mind is filled with dread,
Kuar has come, but my love has not come,
O if my love came now I would hold him to my heart.[৩]

---

১ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ৪।২ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২) পৃঃ ৪২০-২১

২ Elwin and Hivale, *Folk-Songs of the Maikal Hills* (Bombay, 1944) p. 83

৩ Elwin, *Folk-Songs of Chhattisgarh* (Bombay, 1946), p. 127.

সুদূর পাঞ্জাবের লোক-সাহিত্য পর্যন্ত অনুরূপ বারমাসী গানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।[১] প্রকৃতপক্ষে আরাকান হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির লোক-সাহিত্যের ইহা একটি প্রায় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।[২] অতএব বাংলার বারমাসী রচনার সঙ্গেও এই বিস্তৃত অঞ্চলের মানব জাতির বিচিত্র পরিচয় জড়িত হইয়া আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ইহার বহিরঙ্গগত রূপের মধ্যে যে একটি সুগভীর ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অভিন্ন মানবিক বৃত্তি সম্ভূত বলিয়া মনে হইতে পারে না।

মৈমনসিংহ জিলার দক্ষিণ অর্থাৎ ত্রিপুরা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের মধ্যে নৃত্য-গীতপ্রিয় ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির অন্যতম শাখা তিপ্‌রাই ও সমুদ্রোপকূলচারী কোন জাতির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায়। এই সকল অঞ্চল হইতে যে গীতিকা (ballad)-গুলি সংগৃহীত হইয়া 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় স্থান পাইয়াছে, তাহাদের কাহিনীর মধ্যে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-সুলভ স্বাধীন প্রেমের কাহিনীর তুলনায় দুঃসাহসিক যুদ্ধবিগ্রহ ও বীরত্বমূলক কাহিনীর সংখ্যাই অধিক; ইহাদের ভিতর দিয়া এই অঞ্চলের অনার্য ভাষাভাষী পার্বত্য ও সমুদ্রচারী জাতিসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আসিয়া বাস করিবার ফলে তাহাদের যে সকল সাংস্কৃতিক উপকরণ এ'দেশের জলবায়ুতে মিশিয়া গিয়াছিল, তাহা দ্বারাই বাংলার লোক-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সেইজন্য ইহার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনই সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আর একটি কথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতি ও আদর্শের লোক-সাহিত্য বিকাশ লাভ করিলেও একই বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর একই সংস্কৃতি ইহাদের বাহন ছিল বলিয়া পরস্পর বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র গড়িয়া

১ Usborne, *Panjabi Lyrics and Proverbs* (Lahore, 1905) p. 13

২ উত্তর বিহারে প্রচলিত বারমাসী ও ছয়মাসীর জন্য Archer, 'Seasonal Songs of Patna District,' *Man in India*, XXIII (1942), pp. 233-37, দ্রষ্টব্য।

উঠিয়াছিল। সমগ্র বাংলার লোক-সঙ্গীতের উপর রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী ও রামায়ণের প্রভাব এই ঐক্য স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে) এতদ্ব্যতীত মুসলমান ধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও চৈতন্য-ধর্মের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে এক সর্বজনীন আবেদন এবং আরও বহু বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এই ঐক্য রচনার সহায়ক হইয়াছে। এই ভাবেই বিভিন্নতার ভিতরে একটি সংহতি সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেইজন্য মেদিনীপুরের পটুয়া-সঙ্গীত মৈমনসিংহের অধিবাসীর যেমন উপভোগ্য হইতে পারে, মৈমনসিংহের জারিগানও মেদিনীপুরবাসীকে আনন্দ দান করিতে পারে।

এই কথা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে কতকগুলি একীকারক (unifying) উপাদান আছে এবং তাহাদেরই প্রভাবে সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। উচ্চতর সমাজের দিক হইতে ইহাতে পারস্পরিক যে বিরোধই থাকুক না কেন, যে সমাজে লোক-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, এই দেশের সেই লোক-সমাজ এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দিক হইতে আগত বিভিন্ন প্রকৃতির মানব-গোষ্ঠী একই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া একই ভাষার মাধ্যমে এই ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার সংস্কৃতির মধ্যে উপকরণের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এক অভিন্ন ভাষা যে ইহার অবলম্বন হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খুঁটিনাটি বিষয়ে ইহার মধ্যে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, ইহার একীকারক (unifying) উপাদানগুলি তাহাদের অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী ; তাহারই ফলে ইহার সাংস্কৃতিক সকল খণ্ডতা দূর হইয়া গিয়া ইহাদের দ্বারা এক সামগ্রিক ঐক্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, (যদিও লোক-সাহিত্য মাত্রই পল্লী-সাহিত্য, কিন্তু পল্লী-সঙ্গীত মাত্রই লোক-সাহিত্য নহে।) কারণ, বাংলার পল্লীতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বহু আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, তাহা বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা সমীচীন হয় না।) বাংলার পল্লীর সহজিয়া তত্ত্বের গান, নাথধর্মতত্ত্বের গান, দেহতত্ত্বের গান, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি বাংলার লোক-সাহিত্য নহে। কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে লোক-সাহিত্য বলিয়া ভুল করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। (কারণ, (ভাবের দিক দিয়া ইহারা লোক-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত না হইলেও আঙ্গিকের (form) দিক দিয়া ইহারা লোক-সাহিত্যেরই বিভিন্ন রূপ।) লোক-সাহিত্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহা গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উল্লিখিত ধর্ম বা তত্ত্ব-সঙ্গীতগুলির মধ্যে তাহাদের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যেরই অভাব আছে। বিশেষতঃ পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সঙ্গীত স্বাধীন বলিয়া সর্বদা পরিবর্তনশীল (dynamic), কিন্তু ধর্মসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহা আচারের অধীন বলিয়া অপরিবর্তনীয় (static)। সুতরাং ইহাদের উভয়ের প্রকৃতি পরস্পর বিপরীত-ধর্মী। বিষয়টি একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে একসঙ্গে সাধারণ ভাবে কোন আলোচনা না করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, সহজিয়া সঙ্গীতের কথাই ধরা যাউক। বিশেষ একটি সাধনার প্রণালীর নাম সহজ; ইহা সহজ সাধনা বা সহজিয়া সাধনা নামে পরিচিত। অন্যান্য অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সাধনার মতই ইহাও একটি গূঢ় সাধনা। সহজিয়া কবি বলিয়াছেন,

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানয়ে কেবা।

অর্থাৎ মুখে সকলেই ইহার নাম করিলেও ইহার গূঢ় রহস্য কেহই জানিতে

পারে না। সহজিয়া গানের ভিতর দিয়া এই গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে—ইহার সর্বজনীন রস-আবেদন নাই; অতএব ইহা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নহে, সেই সূত্রেই ইহা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সাধকের ব্যক্তিমানসের মধ্যে ইহার বিকাশ হইয়া থাকে, অতঃপর শিষ্য বা গোষ্ঠি-পরম্পরায় তাহা প্রচার লাভ করে—বৃহত্তর লোক-সমাজের সঙ্গে ইহার স্বাভাবিক যোগ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত (sectarian) সৃষ্টি এবং বাংলার মধ্যযুগের কোন কোন বিষয়-বস্তুর মত ইহার এই সুনির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহা বিস্তৃততর মানবিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।

নাথ-গীতিও নাথ-সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট সৃষ্টি, এই জন্য ইহাও সাম্প্রদায়িক (sectarian) সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। সহজিয়া গীতি অপেক্ষা নাথ-গীতি অধিকতর অস্পষ্ট বা গূঢ়ার্থবাচক (mystic), ইহাতেও একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনারই কথা আছে; কিন্তু এই কথাটি এমন ভাবে প্রকাশ করা হয় যে, সাধারণ ভাবে ইহার কোন অর্থই বুঝিতে পারা যায় না; অতএব ভাব যাহাতে গূঢ় ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন এবং বহিরঙ্গগত অর্থও যাহাতে অস্পষ্ট, তাহা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত একটি নাথ-গীতি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাইবে,

> গুরু মীননাথ রে, উল্টা উল্টা ধারা।
> পুকুর মুরে ধান শুকাইয়া উগারতলে বাড়া॥
> গুরু হে, আম গাছে শৈলের পোনা বগায় ধরি খায়।
> তা দেখিয়া খুদি পিঁপড়া পল' লইয়া যায়॥
> গুরু হে, পাঁচ পণ দিয়া কিনলাম নাও, নয় বুড়ি তার জলই।
> কচু বনে রাখলাম নাও বেঙে গিল্‌ল গলই॥
> গুরু হে, একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপিনীর ঘাটে।
> মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে॥
> গুরু হে……ইত্যাদি।

এই দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর ভিতর হইতে সাহিত্য-রস অনুসন্ধান করিলে যে ব্যর্থ হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব এই সকল তত্ত্ববিষয়ক

গূঢ়ার্থবাচক গীতি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় না; কারণ, সাহিত্যের সর্বজনীন মানবিক আবেদন ইহাদের মধ্যে নাই।

দেহতত্ত্বের গান বাংলার পল্লীগীতির এক বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কালক্রমে নানা ভাবের সংমিশ্রণ হইলেও ইহার মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত দেহ সকল শক্তির আধার ও ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার একমাত্র অবলম্বন, ইহার তুষ্টিতেই সকল সাধনার সিদ্ধি। সেইজন্য ইহার মূল কথাই হইতেছে—'তরবি যদি ভবনদী নারী সঙ্গ কর।' ইহা সাধনার কথা, সাহিত্যের কথা নহে। সাহিত্যে নারী পুরুষের কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক সাধনার অবলম্বন নহে, তাহার ক্ষেত্র আরও বহু বিস্তৃত, বরং আধ্যাত্মিক সাধনা সাহিত্য রস-সৃষ্টির বিরোধী। যদিও দেহতত্ত্বের সাধনার মধ্যে একটি স্থূল বাস্তব আবেদন আছে সত্য, তথাপি যে সংযম ও সৌন্দর্যের অভাবে বাস্তব জীবনের উপকরণও সাহিত্য হইতে পারে না, দেহতত্ত্বের গীতিগুলির পরিকল্পনায় অনেক সময় তাহারই অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ইহাও একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনার প্রণালী—ইহারও সর্বজনীন আবেদন নাই—ইহাও mystic বা গূঢ়ার্থবাচক। অতএব এই সকল দিক বিচার করিয়া দেহতত্ত্ববিষয়ক গীতিও বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয় না।

কিন্তু এ'কথা সত্য যে, (দেহতত্ত্বের যে সকল গানের মধ্যে শুচি ও সংযম রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা লোক-সাহিত্যের গৌরব হইতে বঞ্চিত হয় না।) একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি,

নিশিতে যাইও ফুলবনে, রে মন-ভমরা।
জ্বালাইয়া দিলের বাতি জাগি রব সারারাতি (গো)
কব কথা প্রাণবন্ধুর কানে, রে মন-ভমরা॥[১]

ইহা একটি অপূর্ব ভাব-গৌরবে গৌরবান্বিত; তত্ত্বকথা ইহার মধ্যে থাকিলেও তাহা ইহার এই উচ্চ ভাবটি আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই; বিশেষতঃ ইহার তত্ত্বটি মানুষের 'ফুলবন' সদৃশ পবিত্র সুন্দর দেহ আশ্রয় করিয়া

১। মৌলভী সিরাজউদ্দীন কাশীমপুরী কর্তৃক ঢাকা জিলার নরসিংহদি গ্রাম হইতে সংগৃহীত। এই গানটির একটি নাগরিক (urban) রূপ অনেকের নিকটই পরিচিত আছে, তাহাতে ইহার তত্ত্বভাবটি বর্জন করিয়া ইহাকে একটি প্রেম-সঙ্গীতের রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে একটি সর্বজনীন আবেদনও আছে। ইহার অর্থ এই প্রকার—দেহ ফুলবন, মন তাহার ভ্রমর ; জীবনের নিশি যখন ঘনাইয়া আসে, তখন মনের সেই ভ্রমর জাগিয়া উঠে। জীবনের নিশিতে অন্তরের আলো ('দিলের বাতি') অনির্বাণ থাকে, তখনই প্রাণরূপ বন্ধুর সঙ্গে নিভৃত আলাপনের অবসর। এখানে 'মন', 'দিল্' ও 'প্রাণ' এই তিনটি শব্দের মধ্যে পরস্পর সূক্ষ্ম পার্থক্য কল্পনা করা হইয়াছে—সকল দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানের মধ্যেই এই তিনটি শব্দ বিশেষ অর্থবাচক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমগ্র ভাবে এই গানটি যে একটি ভাবের সৃষ্টি করে, তাহা ইহার গূঢ়ার্থ উপলব্ধি ব্যতীতও উপভোগ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। ইহার গূঢ় বা mystic ভাব ব্যতীতও ইহার একটি রসাবেদন সার্থক হইয়াছে। অতএব এই শ্রেণীর কোন কোন দেহতত্ত্বের গান নিঃসন্দেহে লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু তাহা তত্ত্ব-সর্বস্ব হইলে তাহা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক (sectarian) গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, তবে কখনও দর্শনের পর্যায়ে উঠিতে পারে এই মাত্র।

এখন বাউল গানের কথা বলিব। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নামই বাউল, যাহারা এই প্রণালীর সাধক তাহাদিগকে বাউল বলে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিশিষ্ট প্রণালীর সাধকদিগের নিকটই এই অনুভূতির উপলব্ধি হয়—ইহা ভগবানের সঙ্গে মানবের একটি অবিচ্ছেদ্য ও সুনিবিড় সম্পর্ক বোধের অনুভূতি ; সেই জন্য ইহাতে বলা হইয়াছে—'ওগো সাঁই, তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।' ভগবানই স্বামী (সাঁই) বা একমাত্র প্রভু ; তাঁহার সঙ্গে বাউল অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যস্থতা ব্যতীতই সুনিবিড় মিলনের আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। মূলতঃ এই সম্প্রদায় গুরুবাদী ছিল না, কিন্তু কালক্রমে নাথ ও সুফী ধর্মের প্রভাব বশতঃ ইহাতে গুরুবাদ, এমন কি চৈতন্যধর্মের প্রভাব বশতঃ চৈতন্যবাদও আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ফলে কালক্রমে ইহা সাধনার একটি মিশ্র রূপেই পরিচয় লাভ করিয়াছে। ভগবানকে স্বামিরূপে বা অন্তরের নিবিড়তম সান্নিধ্যে লাভ করিবার যে অনুভূতি, তাহা এক অতি সূক্ষ্ম ব্যক্তি-সাধনাজাত আধ্যাত্মিক অনুভূতি মাত্র, ইহার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমাজ বা লোক-সমাজের সামগ্রিক চৈতন্যের কোন সম্পর্ক নাই ; অতএব বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে যে

ভাবে লোক-সাহিত্যের জন্ম হয়, ইহার সঙ্গীতগুলি সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করে না—বরং ব্যক্তিমনের আধ্যাত্মিক চৈতন্যবোধ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক বোধও সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়, সহজাত প্রবৃত্তির পথে মানব-মনে তাহা উদ্ভূত হয় না। অতএব ইহাও তত্ত্বমূলক রচনারই অন্তর্গত; ইহার মধ্যেও গূঢ়ার্থ (mysticism) আছে, সেই অর্থ একমাত্র সাধকের নিকটই বোধ্য, সাধারণের নিকট বোধ্য নহে। এইজন্য বাংলার বাউলগানও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত মনে না করিয়া বরং এদেশের আধ্যাত্মিক দর্শনরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন। তবে কোন কোন দেহতত্ত্বের গানের সাহিত্যিক দাবী সম্পর্কে পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাউল গান সম্পর্কেওপ্রযোজ্যহইতে পারে।

মুর্শীত্যা এবং মারফতী গানও নাথ তত্ত্বসঙ্গীতের মত বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই সৃষ্টি, সমাজ-জীবনের সৃষ্টি নহে। মুর্শীত্যা সম্প্রদায় গুরুবাদী, মুর্শীদ শব্দের অর্থই গুরু বা ভগবানের সঙ্গে যিনি মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন—ইহার লক্ষ্য ভগবান্‌, সহায় মুর্শীদ; এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন ইহার নিকট অর্থহীন। অতএব যাহা সাহিত্যের উৎস, তাহাই এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যথার্থ সাহিত্য-রস ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। (তবে কোন কোন মারফতী গানে আধ্যাত্মিক ভাবটি প্রকট না হইয়া মানব-জীবনের কোন শাশ্বত সত্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছে; কেবল সেই গানগুলিই লোক-সাহিত্যের মর্যাদালাভের অধিকারী।) নিরক্ষর মুসলমান কবি রচিত এমন একটি মারফতী গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

মন আমার চিনির বলদ চিনি বয়, চিনে না চিনি,
ও! ভুলে কল্লি না একদিন চিনির সাথে চিনা চিনি।
কার কি কুমন্তনা পেলে,
ঘোল খেতে চাও মাখম ফেলে,
ওহে! বুঝবে মজা নোক্‌রি পেলে
(তখন) সার হবে শুধুই কাঁদুনী।
ওহে! সোনার কলম গেছ ভুলে,
মজে আছ শুক্‌নো ফুলে;
আবার সোজা পথে কাঁটা দিলে,
কি সাহসে বল শুনি

ওহে! জমির বলে অবোধ মন,
বাঁচ্‌বে যদি চিনি চিন,
কেন কড়ি দিয়ে জহর কিন,
আপন হাতে খাও আপনি।

শ্যামা-সঙ্গীতও সাধন-সঙ্গীত, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাই ইহাতে বলা হইয়াছে; ইহাও ব্যক্তি-চৈতন্য সাপেক্ষ, সমাজ-চৈতন্য সাপেক্ষ নহে; সেইজন্য ইহাও ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি কোন কোন সময় ইহাদের মধ্য দিয়া ধর্মনিরপেক্ষ এক একটি শাশ্বত মানবিক অনুভূতিও প্রকাশ পাইয়াছে; যেমন রামপ্রসাদের একটি সুপরিচিত গানে আছে,

মন তুমি কৃষি-কাজ জান না,
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।

ইহার মধ্যে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চৈতন্য-মুক্ত একটি সহজ মানবিক ভাব আছে—এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

এই বিষয়ে শ্যামা-সঙ্গীতের সঙ্গে উমা-সঙ্গীতের পার্থক্য আছে। উমা-সঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়া গানগুলি গার্হস্থ্য ধর্মবিষয়ক, ইহাদের প্রধান রস বাৎসল্য। অতএব ইহাদের একটি নিতান্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ মানবিক আবেদন আছে—এই সূত্রেই উমা-সঙ্গীত লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাবের দিক দিয়া উল্লিখিত তত্ত্বসঙ্গীতগুলি লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না, তথাপি ইহাদের রূপ লোক-সাহিত্যেরই রূপ, সুর লোক-সঙ্গীতেরই সুর; বিশেষতঃ এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে যে সাধারণ মানবিক বিষয়ক সঙ্গীতও আছে, তাহাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনেক সময় উপলব্ধি করা কঠিন। এই সকল কারণে ইহাদিগকে কেহ কেহ লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সহজিয়া, বাউল, মুর্শীদ্যা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম বাংলা দেশের জলবায়ুতেই জন্মলাভ করিয়া বাংলা ভাষা নিজেদের প্রচারের বাহন করিয়াছে, সুতরাং ইহাদের তত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতগুলি বাংলা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এ' কথা মনে রাখিতে হইবে যে,

লোক-সাহিত্য আর যাহাই হউক ইহা সাহিত্য। অলৌকিকতা ধর্ম-বোধের ভিত্তি, কিন্তু বাস্তব জীবনবোধ সাহিত্যের ভিত্তি; লোক-সাহিত্য বাস্তব জীবন চেতনা হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু ধর্মবোধ বাস্তব-জীবন-বিমুখী। অদৃশ্য সাঁই (স্বামী, প্রভু বা ভগবান), অলৌকিক শক্তির অধিকারী মুর্শীদ বা গুরু, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী প্রভৃতি ধর্মের লক্ষ্য। ইহাদের অলোক (mystic) নির্দেশ দ্বারা ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যের জীবন সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ভোগবাদী ধর্মমত যেমন সহজিয়া, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে জীবন-ভোগের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভোগের যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে প্রাকৃত জনের জীবন-ভোগের কোনও সাদৃশ্য নাই। তাহাদের জীবন-ভোগ একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুসরণ করিয়া থাকে। সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্যপালনের ভিতর দিয়া জীবন সেখানে একটি অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ দেহবাদী যখন দেহতত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রচার করেন যে, 'তরবি যদি ভবনদী নারী সঙ্গ কর', তখন তাঁহাদের একটি সুদূর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য থাকে, তাহা ভবনদী উত্তীর্ণ হওয়া; এই উদ্দেশ্যে নারীর সঙ্গ ভোগ করা এই ধর্মাবলম্বীদের একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় আচার। কিন্তু যে সকল সাধারণ মানুষের জীবন সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহাদের যেমন কোন আধ্যাত্মিক লক্ষ্য থাকে না, তেমনই জীবন-ভোগের একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী পূর্ব পরিকল্পিত হইয়াও থাকিতে পারে না। সুতরাং দেহবাদীর জীবন-ভোগ এবং সাধারণ মানুষের জীবন-ভোগ এক নহে। অতএব কেবল মাত্র বাস্তব জীবন-ভোগের কথা আছে বলিয়াই দেহতত্ত্বের গানও সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলার ধর্মসঙ্গীতগুলির লৌকিক আবেদন যত গভীরই হউক না কেন, লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহাদের প্রবেশাধিকার নাই।

রবীন্দ্রনাথ কবি-সঙ্গীতকেও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন।[১] কিন্তু কবি-সঙ্গীত লোক-সাহিত্য নহে, ইহা নাগরিক (urban)

১ লোক-সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড (১৩৪৭) পৃ, ৬৩২-৩৮

সাহিত্য।) বিশিষ্ট এক একজন কবিওয়ালা ইহাদের রচয়িতা—তাঁহাদের নাম ও পরিচয় সমাজের অজ্ঞাত থাকে না, ইহাদের মধ্যে তাঁহাদের ব্যক্তি-প্রতিভার শিল্প ও ভাগবত প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। সমগ্রভাবে কোন সংহত সমাজের মধ্যে যে কবি-সঙ্গীত পরে প্রচার লাভ করে, তাহাও নহে; কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে প্রধানতঃ কলিকাতা নগরী কেন্দ্র করিয়া যে কবিগানের জন্ম হইয়াছিল, তাহা বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র তাহারই প্রতিধ্বনি নগর হইতে পল্লীতে গিয়া কিছুকাল ধ্বনিত হইয়াছিল মাত্র, তাহাও এখন নীরব হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের কোন রূপই এত অল্পায়ু নহে; তাহা ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়, সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই ইহার শক্তি নিহিত থাকে। কবি-সঙ্গীত এই প্রকার প্রবহমাণ কোন ঐতিহ্য হইতে যেমন জন্মলাভ করে নাই, তেমন নিজেও কোন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাংলা লিখিত সাহিত্যের অধঃপতিত (decadent) একটি যুগে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা কবি গানের ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পরিচয় ছিল সাময়িক; সেইজন্য সেই সময় বা যুগের প্রয়োজন যখন দূর হইয়া গিয়াছে, তখনই তাহা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোক-সাহিত্যের ইহা ধর্ম নহে।

লোক-সাহিত্যের যে সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া কবি-সঙ্গীতকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করা যায় না। কিন্তু কবি-সঙ্গীতের মধ্যে সাধারণতঃ জনশ্রুতি-মূলক বিষয়-বস্তু (traditional matters) ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া অনেক সময় ইহা লোক-সঙ্গীত বলিয়া ভুল হইতে পারে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' নামক গ্রন্থে 'কবি-সঙ্গীত' বিষয়ক প্রবন্ধটি স্থান দিবার ফলে এই বিষয়ে পাঠক সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তবে অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায় যে, কবিওয়ালাগণ আসরে দাঁড়াইয়া স্বরচিত কোন সঙ্গীত গাহিবার পরিবর্তে কোন জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীত গাহিয়াও শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করিতেছে। কিন্তু ইহা কবি-সঙ্গীতের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং যথার্থ কবি-সঙ্গীত বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে।

এখন লোক-সাহিত্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কি সম্পর্ক, এই বিষয় আলোচনা করিব। (লোক-সাহিত্যের উপকরণ দ্বারাই মঙ্গলকাব্য রচিত হইলেও মঙ্গলকাব্য আমরা যে রূপে পাইয়াছি, তাহা আনুপূর্বিক লোক-সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না।) কতকগুলি প্রধান বিষয়ে ইহা লোক-সাহিত্য ব্যতীত কিছুই নহে, আবার কতকগুলি বিষয় বিচার করিলে ইহা ধর্মীয় (sectarian) সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মঙ্গলকাব্যও জনশ্রুতিমূলক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকে; ইহার একজন রচয়িতা থাকে সত্য, কিন্তু তিনি ইচ্ছামত ইহার বিষয়-বস্তু নিজের মত করিয়া পুনর্গঠন, এমন কি, পুনর্বিন্যাস পর্যন্ত করিয়া লইতে পারেন না, (নিতান্ত গতানুগতিক পথই তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়।) এমন কি, তিনি যে 'নূতন মঙ্গল' রচনা করেন, তাহার প্রেরণা যে তাঁহারই নিজস্ব, তাহাও তিনি প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়া ইহার মূলে দেবতার স্বপ্নাদেশের কথাই উল্লেখ করিয়া থাকেন। সমাজই এখানে দেবতা বলিয়া কল্পিত হয়; অতএব দেবতার স্বপ্নাদেশের অর্থ সমাজেরই নির্দেশ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়; সেইজন্য দেবতার স্বপ্নাদিষ্ট রচনার নামে তিনি যাহা প্রচার করেন, সমাজ তাহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারে। ব্যক্তিগত কোন কবির রচনা সমাজ কর্তৃক এইভাবে গৃহীত হইবার আর একটি কারণও আছে; তাহা এই যে, ইহার মধ্যে কবি সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত এবং প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়েন;...'the peculiarity of communal composition is that this original author is merely acting as spokesman for the group and when the ballad is complete will not claim it as his own. The ballad is important, the group is important, but the individual counts for little. সেইজন্য বহু পুঁথির রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সেইজন্যই তাঁহাদের অনুসন্ধানের জন্যও কাহারও কোন ব্যগ্রতা দেখিতে পাওয়া যায় না—কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যতীতই সমাজ তাঁহাদের কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া থাকে; কবি যাঁহা দিয়াছেন, তাহার পরিচয়ই এখানে পরিচয়, কবির ব্যক্তিগত পরিচয়ে সমাজের কোন

প্রয়োজন নাই। এমন কি, একজনের রচনা যদি আর একজনের ভণিতায়ও চলিয়া যায়, তথাপি সমাজ ইহার জন্য কোন আপত্তি করে না; কারণ, ইহার বিচারে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় কিছু নহে, তাহার রচনাই তাহার পরিচয়। অতএব এই দিক দিয়া মঙ্গলকাব্য লোক-সাহিত্যের ধর্ম হইতে বিচ্যুত নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকাব্যে যে বিষয়-বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা জনশ্রুতিমূলক; কেবল ইহার মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয়-বস্তুই যে জনশ্রুতিমূলক, তাহাই নহে, ইহার মূল বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া ইহাতে যে সকল প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহাও জনশ্রুতিমূলকই হইয়া থাকে। যেমন, প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই নায়িকার বারমাসী, নায়ক কর্তৃক দুরূহ হেঁয়ালী ও ধাঁধার উত্তর দান ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয় লোক-সাহিত্যেরই উপকরণ এবং লোক-সাহিত্য হইতেই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আসিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ, লোক-সাহিত্যের বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ, যেমন সঙ্গীত, আখ্যায়িকা, ধাঁধা ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে আসিয়াই কালক্রমে আশ্রয় লাভ করে। অতএব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ভাবগত লক্ষ্যটি ধর্মীয় (sectarian); বিশেষ এক সম্প্রদায়ের আরাধ্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেবতার পূজা-প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করাই ইহার লক্ষ্য; অবশ্য এই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে গিয়া অনেক সময় সাহিত্য-সৃষ্টিও সার্থক হইয়াছে, কিন্তু যখন ইহার সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে, তখন ইহার অন্তর্নিহিত ভাবের জন্য তাহা হয় নাই, বরং ব্যক্তি-প্রতিভার স্পর্শ দ্বারা হইয়াছে, অতএব তখন ইহা দ্বারা উচ্চতর সাহিত্য বা কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, লোক-সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। কারণ, দেখা যায় যে, কোন কোন বিশেষ কবির দৃষ্টির গুণে, ইহার অলৌকিক চরিত্রগুলি লৌকিকতার স্তরে নামিয়া আসিয়াছে এবং লৌকিক চরিত্রগুলির ভিতর দিয়াও বাস্তব মানবিকতার বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহা দুর্লভ ব্যতিক্রম মাত্র—যখন এই ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে, তখন ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি সেখানে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাহা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র তখন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যকে ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্য-

মূলক ধর্মীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে—লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হইবে না। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার উদ্দেশ্য সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া না দেখিয়া ইহার বহিরঙ্গ যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তবে ইহার মধ্যে লোক-সাহিত্যের বহু অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন উপকরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইবে। কিন্তু মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যসমূহ যে রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহাই ইহাদের মৌলিক পরিচয় নহে, ইহারা ক্রমবিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়াই মধ্যযুগে একটি পরিণত রূপ লাভ করিয়াছিল। গীতিকা বা ballad-এর আকারেই ইহাদের প্রাচীনতম রূপ সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল; ইহাদের প্রাচীনতম রূপটি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ইহাদের পরিণত রূপ তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

পূর্বে যে তত্ত্ববিষয়ক গানের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যেমন উদ্দেশ্য-মূলক, মঙ্গলকাব্যও মূলতঃ তেমনই উদ্দেশ্যমূলক, এই দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে ঐক্য আছে; কিন্তু তত্ত্বসঙ্গীত ভাব-মূলক খণ্ডগীতি এবং মঙ্গলকাব্য বস্তু-মূলক আখ্যানগীতি—উভয়ই ধর্মমূলক সাম্প্রদায়িক গীতি। প্রত্যেক দেশের জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যেই এই প্রকৃতির রচনাই সর্বাধিক। 'In primitive cultures particularly, song of religious or magical character outnumber secular class of song such as lullabies, work songs, love songs, game or drinking songs, etc., for not only must the gods be served and placated as a part of religious ritual, but there are hundreds of other beings whose effect on everyday life on farming, hunting, marriage, burial, war, and travel for instance must be dealt with.'[১] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও ধর্মীয় সঙ্গীতের সংখ্যাই সর্বাধিক, তবে বাঙ্গালীর ধর্মপালনের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে—ধর্মের প্রেরণা বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করাই তাহার বৈশিষ্ট্য; ইহার জন্যই তাহার কোন কোন ধর্মসঙ্গীতের রাগিণী লোক-সাহিত্যের সুরে বাঁধা।

১ T. C. Brakeley, 'Religious Folk Music.' *SDFML*, p. 932.

বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে লোক-সাহিত্যের কি সম্পর্ক এই বিষয় এখন আলোচনা করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। বৈষ্ণব কবিতা প্রেম-সঙ্গীত; পূর্বেই বলিয়াছি, এই দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পূর্বে ইহার কোনও প্রেম-মূলক লোক-সঙ্গীতের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ ছিল না, মানব-মানবীর মিলন-বিরহ-জনিত আকাঙ্ক্ষা ইহার ভিতর দিয়া স্থূলভাবেই প্রকাশ পাইত। বলাই বাহুল্য যে, তখনই প্রেম-সঙ্গীতে লোক-সাহিত্যগত আদর্শ সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ছিল। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের নাম মাত্র প্রবেশ করাতেই ইহাদের এই আদর্শ ক্ষুন্ন হইতে পারে নাই; কারণ, পল্লীগায়কগণ প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক ও নায়িকার নামরূপেই কৃষ্ণ ও রাধার নাম ব্যবহার করিত—কোন ধর্মীয় আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা করিত না। অতএব ইহাতে পল্লীকবিদিগের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ প্রকাশের কোন বাধা হইত না। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-সঙ্গীত জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলী বলিতে তাহা বুঝায় না; বরং ইহা বলিতে বিশিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের রচিত গীতি-কবিতাই বুঝায়; ইহা রচনার ভাব ও অঙ্গগত একটি সুনির্দিষ্ট বিধি (code) ছিল, ইহার জন্য উচ্চতর কাব্যসাহিত্যের আদর্শে একটি স্বতন্ত্র অলঙ্কারশাস্ত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল, কালক্রমে ইহার রচনা ও ভাবগত আদর্শের এমন একটি লক্ষ্য স্থির (standarized) হইয়া গিয়াছিল যে, ইহার স্বাভাবিক বিকাশের পথ তাহা দ্বারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, মিলন, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, বিরহ, ভাব-সম্মিলন ইত্যাদির গতানুগতিক ধারার ভিতর দিয়া নায়ক-নায়িকার চরিত্র প্রাণহীন কৃত্রিম পুত্তলিকার পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল। লোক-সাহিত্যের দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান আপত্তির বিষয় ইহার ভাষা। ব্রজবুলি নামক এক কৃত্রিম ভাষায় ইহার ভাব প্রকাশ করিবার রীতি প্রচলিত হইবার পর ইহার সঙ্গে লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের যোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অতএব মূলতঃ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কালে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ভাবের বাহন হইয়া এবং এক কৃত্রিম রচনা-প্রণালীর আশ্রয় লইয়া বৈষ্ণব-পদাবলী লোক-সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ইহাও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত নহে।

লোক-সাহিত্য ও সমাজ-সংহতি

একথা আমরা সকলেই জানি যে, জাতির সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জাতীয় সংহতি সৃষ্টি ও তাহা দৃঢ়তর হইয়া থাকে; যে জাতির সাহিত্য নাই, সেই জাতির সামাজিক সংহতি নিতান্ত শিথিল। অনেকে মনে করিতে পারেন, সাহিত্য নাই—এমন জাতিও নাই; কারণ, যেখানে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; সেখানে সাহিত্যের অভাব থাকিতে পারে না। কিন্তু এ কথা সত্য নহে; কারণ, আপাত দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, বিশেষ কোন জাতি বাহির হইতে একটি রূপ লাভ করিয়াছে; কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যথার্থ জাতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার উপকরণ ইহার মধ্যে নাই, কিংবা থাকিলেও তাহা তত শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য রাজনৈতিক কারণে বাহিরের দিক দিয়া কোন জাতির একটি আপাত অখণ্ড রূপ প্রত্যক্ষ করিলেও, কোন কোন বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইলেই সেই জাতির আভ্যন্তরিক শক্তির যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন দেখা যায়, যাহাকে উপর হইতে আমরা এক অখণ্ড রূপ বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম, প্রকৃতপক্ষে অন্তরের দিক দিয়া তাহার সেই পরিচয় সত্য ছিল না। অন্তরের শক্তিই বাহিরের রূপটিকে রক্ষা করে; অন্তর যেখানে শূন্য, বাহিরের কোনও অবস্থাই তাহাকে রক্ষার কার্যে সাহায্য করিতে পারে না। জাতি হিসাবে ইংরেজ যাহা, মার্কিন তাহা নহে। জনসংখ্যার আধিক্য কিংবা ভৌগোলিক বিস্তারই জাতির সমৃদ্ধি ও পরিচয় নহে; সংহতির শক্তিতেই জাতির শক্তি। সেই সংহতি ইংরেজ জাতির যেমন আছে, মার্কিন জাতির তেমন নাই। সুদীর্ঘ ঐতিহ্য অনুসরণ করিবার ফলেই ইংরেজ জাতি আজ এই জাতীয় সংহতির অধিকারী হইতে পারিয়াছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্ম বলিয়া মার্কিন জাতির মধ্যে সেই সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করিলে মার্কিন জাতির সাহিত্য যে আজও অকিঞ্চিৎকর, ইহার ইহাও অন্যতম কারণ। লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

মার্কিন দেশের সুপরিচিত একটি শিশুর ছড়া এই প্রকার—

Eeny, meeny, miny mo,
Take the Nigger by the toe.
If he hollers, let him go,
Eeny, meeny, miny mo.

এই ছড়াটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাকে মার্কিন জাতির শিশুর ছড়া বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা আছে। কারণ, মার্কিন দেশের অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতিও মার্কিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে তাহাদের উপর কটাক্ষপাত আছে। সুতরাং যে রসবস্তু সামগ্রিক জাতির আনন্দ সৃষ্টির অন্তরায়, তাহা সামগ্রিক ভাবে কোন জাতির সাহিত্য হইতে পারে না; যদি সামগ্রিক ভাবে একটি অখণ্ড জাতির সাহিত্য তাহা না হয়, তবে তাহা সাহিত্য-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়। কারণ, যখন আমরা বাংলা সাহিত্য বলি, তখন অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির সামগ্রিক সাহিত্যই বুঝি; যখন মার্কিন সাহিত্য এ কথা বলি, তখনও অখণ্ড মার্কিন জাতির সামগ্রিক সাহিত্যই বুঝাইতে চাই। কিন্তু উপরে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় অধ্যুষিত সমগ্র মার্কিন জাতির অখণ্ড সাহিত্যের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে শ্বেতকায় মার্কিন শিশু কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতিকে আঘাত করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য পরস্পরকে কখনও বিশ্লিষ্ট করে না, বরং পরস্পরকে মিলিত করে। এই ত্রুটির জন্য উক্ত ছড়াটি বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মনোভাবের বাহন হইলেও, সামগ্রিক ভাবে মার্কিন জাতির কোন পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে নাই।

যে জাতি একটি সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া নিজের সংহতিকে সুদৃঢ় করিতে পারে না, তাহার মধ্যে লোক-সাহিত্যই হউক, কিংবা উচ্চতর সাহিত্যই হউক, কিছুই যথার্থ শক্তিলাভ করিতে পারে না। মার্কিন দেশের লোক-সাহিত্য হইতে এই প্রকার আরও বহু নিদর্শন উল্লেখ করা যায়।

এ কথা সকলেই জানেন যে, শিশুর ছড়ার একটি বিশিষ্ট রূপ আপনা হইতে গড়িয়া উঠে; ইহা শিশুর প্রয়োজনেই গড়ে, শিশুর প্রয়োজনেই ভাঙ্গে, এই ভাবেই ইহার প্রাণধারা অব্যাহত থাকিয়া যায়। জাতির বহির্মুখী

জীবনের সঙ্গে শিশুর কোন যোগ নাই। জাতির বৃহত্তর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন শিশুর রস-দৃষ্টিকে কখনও আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে না; শিশুর নামে প্রচলিত যে সকল রচনায় এই প্রয়াস দেখা যায়, তাহাদের যেমন কোনও ব্যাপক আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে না, তেমনই তাহা সমাজে স্থায়িত্বও লাভ করিতে পারে না। দেশবিদেশের লোক-সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য জাতিগুলির মধ্যে মার্কিন দেশের লোক-সাহিত্যেই এই ত্রুটি সর্বাপেক্ষা বেশি। সে দেশের ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি পাঠ কবিলে দেখা যায়, রাজনৈতিক চেতনা তাহাদের মধ্যে কতখানি সজাগ হইয়া উঠিয়া তাহাদের শিশুর অকারণ আনন্দ সম্ভোগের ক্ষেত্রগুলিকে কত দূর আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন দেশের কতকগুলি শিশুর ছড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক হইতে কি ভাবে যে পরিবর্তিত হইয়া পরে যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে; এখানে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর প্রয়োজনে ইহারা পরিবর্তিত হয় নাই, বহির্মুখী রাষ্ট্রীয় ব্যবহারিক জীবনের তাড়নায় ইহারা পরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে শিশুর চিরন্তন সহজ আনন্দ লাভের যে ব্যাঘাত হইয়াছিল, তাহার ফলেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুই একটি ছড়া এখানে উদ্ধৃত করা যাক—

Eeny, meeny, Mussolini,
Hit him on the bumble beany.

বাংলাদেশের শিশুদিগের মধ্যে 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' নামক যে ছড়াটি প্রচলিত আছে, শ্বেতাঙ্গ মার্কিন শিশুর 'Eeny meeny' ছড়াটিও তাহারই তুল্য। বাংলাদেশের উপর দিয়াও যুদ্ধ বিগ্রহ, মন্বন্তর ইত্যাদি কত দুর্যোগের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে; তথাপি 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' ছড়ার একটি অক্ষরও এই সকল কোনও বহির্মুখী প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হয় নাই। ইহাই লোক-সাহিত্যের ধর্ম। পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়ের মত ছড়াও পরিবর্তিত হয় সত্য, কিন্তু তাহা শিশুর প্রয়োজনেই শিশু-জগতের নিয়মেই পরিবর্তিত হয়, সমাজের পরিণত-বুদ্ধি মানবের বহির্মুখী ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাহা কদাচ পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু এখানে

দেখা যাইতেছে, বহির্মুখী একটি রাষ্ট্রীয় চেতনার ফলে ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপর যে পরিণত বয়স্ক সমাজের প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা সহজেই অনুভূত হয়; এই ভাবেই ইহা লোক-সাহিত্যের ধর্ম হইতেও বিচ্যুত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালেই এই ছড়াটি কত ভাবে যে পরিবর্তিত হইয়াছে, আরও কয়েকটি মার্কিন ছড়া উদ্ধৃত করিলে তাহা আরও স্পষ্ট হইতে পারে। জাপানের সঙ্গে যখন মার্কিন দেশ যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িল, তখন মার্কিন শিশু এই ছড়াটি এই ভাবে পরিবর্তিত করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল—

> Eeny, meeny, miny mo,
> Catch a Jap by the toe.
> If he hollers, make him say:
> 'I surrender, U. S. A.'

এমন কি, জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ তোজোও মার্কিন শিশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছড়াটি তাহারা এইভাবে পরিবর্তিত করিল—

> Eeny, meeny, miny mo,
> Catch old Tojo by the toe.
> If he hollers, make him say:
> 'I surrender, U. S. A.'

এই ভাবে এক বহির্মুখী রাষ্ট্র-সচেতন মন লইয়া সে দেশের শিশুর ছড়া রচিত হইয়াছে; তারপর সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হইয়াছে, অর্থাৎ জাপান যুদ্ধের অবসান হইয়া জাপানের সঙ্গে মার্কিন জাতির 'মিত্রতা' স্থাপিত হইয়াছে, তখন শিশুর সমাজ স্বভাবতই ছড়াগুলি বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শিশুর একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া যদি ইহারা রচিত হইত, তবে ইহাদের আয়ু এত ক্ষণস্থায়ী হইত না।

মার্কিন জাতির লোক-সাহিত্যের এই অবস্থার সঙ্গে যে কোন প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জাতির লোক-সাহিত্যের তুলনা করিলেই ইহাদের কাহার যে কি শক্তি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই সম্পর্কে বাংলা দেশের ছেলে ভুলানো ছড়ার কথাই ধরা যাক। কারণ, বাংলা দেশ আয়তনে যত ক্ষুদ্রই

হউক, তথাপি এই সম্পর্কে ইহার যে ঐতিহ্য আছে, বৃহদায়তন মার্কিন দেশের তাহা নাই। বাংলা দেশের উপর দিয়াও যে কত রাষ্ট্রবিপ্লবের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। তথাপি এ দেশের লোক-সাহিত্যের বিপুল সংগ্রহের মধ্য হইতে তাহার কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই। সমাজের উপরিস্তরে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাহার অন্তর্লোকে লোক-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়; উপরিস্তরের ধূলি-মালিন্য ইহার অন্তর্লোক স্পর্শ করিতে পারে না। বাংলার সমগ্র লোক-সাহিত্য ইহার অন্তর্লোকেরই সৃষ্টি, বিষয়-বুদ্ধি ও ব্যবহারিক জীবনের স্পর্শহীন জননী ও শিশুসমাজ তাহাদের অকারণ আনন্দের প্রেরণায় তাহা সৃষ্টি করিয়াছে। সেইজন্য পুরুষের স্বার্থ দ্বন্দ্বের কোনও কোলাহল সেখানে শুনিতে পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে একটি ছড়া সম্পর্কে যে কাহারও একটু সন্দেহ হইতে পারে, তাহা এই—

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এ'ল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে।

কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, ইহার মধ্যে ত বাংলার সমাজের এক বহির্মুখী বিপর্যয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। এ কথা সত্য হইলেও এই ছড়াটি সম্পর্কেও দুই একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই ছড়াটি যত তথ্যপ্রধান, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রসপ্রধান। বর্গীর আক্রমণ বিষয়ক তথ্য অপেক্ষা ইহার মধ্যে শিশুর নিদ্রা যাইবার উপযোগী যে একটি স্বপ্নধর্মী চিত্র ও সুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার শক্তি বেশী এবং তাহার ভিতর দিয়াই ইহার আবেদন। 'বর্গী' শব্দটি এখানে ছন্দের সুর প্রসঙ্গে আসিয়াছে, তথ্য পরিবেশণ প্রসঙ্গে আসে নাই। এখানে 'ঘুমাল' 'জুড়াল' 'এল' 'বুলবুলি'—এই অনুপ্রাসযুক্ত শব্দগুলির ভিতর দিয়া নিদ্রার অনুকূল যে একটি পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই ইহার সাহিত্যগত রসসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে—তাহার ফলে 'বর্গী' সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যটি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই ছড়াটি বর্গীর আক্রমণের স্মৃতি দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার পরও, লোক-সমাজের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে। এমন কি, বাংলার যে অঞ্চলে বর্গীর আক্রমণ-রূপ কোন উৎপাত হয়ও নাই, সেই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াও ইহার প্রচলন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে; তথ্যই যদি ইহার একমাত্র ভিত্তি হইত,

তাহা হইলে ইহা কদাচ এইভাবে বিস্তার লাভ করা দূরে থাকুক, আজ পর্যন্ত অস্তিত্বও রক্ষা করিতে পারিত না। বাংলার যে অঞ্চলে বর্গীর আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বহু দূরবর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছড়াটি এইভাবে প্রচলিত আছে—

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গোর্‌কী আইল দেশে।
টীয়া পাখীতে ধান খাইল খাজনা দিব কিসে।

চিত্র এবং সুরকে আশ্রয় করিয়াই ইহা বাঁচিয়া আছে, একান্তভাবে তথ্যকে আশ্রয় করিলে বহু পূর্বেই ইহার বিনাশ হইত।

বাংলা দেশ দীর্ঘকাল যাবৎই হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহিরের দিক দিয়া সর্বদাই যে প্রীতির ভাব রক্ষা পাইত, তাহা নহে; অথচ বাংলার লোক-সাহিত্যের যে বিপুল সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন অংশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রসূত কোন উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি, এই বিষয়ে উচ্চতর সাহিত্যের যে ক্রটি দেখা যায়, লোক-সাহিত্যে তাহাও নাই। বাংলা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কেহ নাই, ছেলে-ভুলানো ছড়ায় চিরন্তন শিশু ও জননীরই যেমন সন্ধান পাওয়া যায়, কথা-সাহিত্য, গীতিকা ও গীতির ক্ষেত্রে সর্বধর্ম-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ চিরন্তন মানুষেরই অন্তর্বেদনার অভিব্যক্তি অনুভব করা যায়। বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাংলার অধিবাসীর ভিতরে একটি সংহতি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। বাহিরের দিক হইতে বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, মুসলমান যতই পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, বাংলার লোক-সাহিত্যে তাহাদের মধ্যে ততই ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছে। সমাজের অলক্ষিতে ইহার ক্রিয়া অব্যাহত ছিল বলিয়াই এক ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধন আজ ইহার মধ্যে এত দৃঢ় বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

সুতরাং উচ্চতর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'হিন্দু-সাহিত্য' কিংবা 'মুসলমান-সাহিত্য' বলিয়া কিছু থাকিলেও নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা চিহ্নিত হইতে পারে নাই—বাংলার হিন্দুর লোক-সাহিত্য কিংবা মুসলমানের লোক-সাহিত্য বলিয়া কিছু নাই, যাহা আছে তাহা বাঙ্গালীর লোক-সাহিত্য।

লোক-সাহিত্যের বিষয়

কি কি বিষয় লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, এখন তাহা আলোচনা করা যায়। এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই ছড়ার কথা মনে হইবে। ছড়াই প্রাচীনতম লোক-সাহিত্য; কারণ, ছড়া শিশুর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নাই।' সেইজন্য সমাজে শিশুর মনস্তুষ্টির উপকরণই সর্বপ্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল।

বাংলা দেশে ছড়ার বহু বৈচিত্র্য আছে; ইহা কেবলমাত্র শিশুর মনস্তুষ্টির জন্যই রচিত হয় নাই, বয়স্কদিগের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিবার জন্যও রচিত হইয়াছে। সেই সূত্রেই মেয়েলী ব্রতের ছড়া, নানা ঐন্দ্রজালিক (magical) ছড়া, নৈসর্গিক ছড়া, যেমন ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি রচিত হইয়াছে। বাংলার লোক-সাহিত্যের এই অংশের মূল্য, বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বাংলার পাঠক-সমাজ ইহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছেন।

ছড়ার পরই গানের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ছড়ার মধ্যে যে ভাব অসংলগ্ন হইয়া প্রকাশ পায়, গানের মধ্যে তাহাই পরিণত রূপ লাভ করে—ছড়া একটি অসংযত আনন্দোচ্ছ্বাস, গান সুসংযত ভাব-নিবেদন—এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই।

প্রত্যেক দেশেই লোক-সাহিত্যের সঙ্গীত বিভাগই সমৃদ্ধতম হইয়া থাকে, বাংলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আধ্যাত্মিক ভাব নিঃসম্পর্কিত সঙ্গীত এ'দেশে বহুকাল হইতেই রচিত হইয়া আসিতেছে। কালক্রমে এই দেশের সমাজে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রভাব বিস্তৃত হইলেও লোক-সঙ্গীত রচনার ধারাটি এখানে অব্যাহতই রহিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থলে ইহাদের উপর ধর্মীয় একটি রূপ প্রত্যক্ষ হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের মানবিকতার মূল্য অক্ষুণ্ণ আছে। ধর্ম বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ধারাটি স্বতন্ত্র; এ'দেশে ইহার চরম বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও ইহা লোক-সাহিত্যের ধারাটি কোনদিন রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণের নামেও এ'দেশে যে সকল

সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহাদের ভিতর হইতেও জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে জনসাধারণের সাহিত্যরসাস্বাদনের বাধা হয় নাই। এ'দেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই' সত্য, কিন্তু কানু লোক-সঙ্গীতেরও নায়ক। গানের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে; যেমন, পার্বণাদি উপলক্ষে গীত মেয়েলী গান, বিবাহের গান, ব্রতের গান ইত্যাদি; উৎসবাদি উপলক্ষে গীত পুরুষের নৃত্যসম্বলিত গান, যেমন ঘাটু, জারি, সারি ইত্যাদি; ব্যবসায়ীর গান, যেমন বেদের গান, পটুয়ার গান ইত্যাদি; প্রেম ও ভাব-সঙ্গীত। গ্রন্থভাগে ইহাদের বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইব।

গীতিকা (ballad) বা আখ্যান-গীতি লোক-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ; বাংলার লোক-সাহিত্যও ইহা দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। প্রেম-সঙ্গীত কিংবা অন্যান্য খণ্ডগীতির মধ্যে যেমন একটি সহজ সর্বজনীনতা আছে, গীতিকার মূল ভাবটি তাহা আশ্রয় করিয়া রচিত হইলেও, ইহার রূপটি আঞ্চলিক (regional); সেইজন্য 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' পূর্ব মৈমনসিংহের নিতান্ত আঞ্চলিক বিষয় হইলেও ইহার মধ্যে যে রস ও ভাবটি নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই উপভোগ্য। এই গুণেই 'গোপীচন্দ্রের গান' উত্তর বঙ্গের কৃষকদিগের রচনা হইয়াও বাঙ্গালী মাত্রেরই সাহিত্য হইয়াছে।

গীতিকাগুলি নানা বিষয়ে বিভক্ত। যদিও স্বাধীন প্রেমের মহিমা কীর্তনই ইহাদের মূল লক্ষ্য, তথাপি জাতীয় ভক্তিবোধ, মানব-প্রীতি—বাঙ্গালী চরিত্রের এই সকল উচ্চতর গৌরবও ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; এই গীতিকাগুলি আখ্যায়িকামূলক হইলেও গীতিরসাক্রান্ত—একান্ত গীতিরস-প্রবণ বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

কথা (tales) লোক-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ। 'The teller of stories has everywhere and always found eager listeners.' বাংলাদেশও তাহার ব্যতিক্রম নহে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এ'দেশের সমাজ যে সকল সাংস্কৃতিক উপকরণ বাহির হইতে লাভ করিয়াছে, তাহা দ্বারাই ইহার কথা-সাহিত্য বিভাগ বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাংলার লৌকিক কথা-সাহিত্য চারিটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়, যেমন—ব্রতকথা, উপকথা, রূপকথা, গীতিকথা। ব্রতকথার মধ্যে একটি সুদূর ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকিলেও ইহা মানবিকতার রসেই পুষ্ট;

সেইজন্য ইহাও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়াই নির্দেশ করিতে পারা যায়। উপকথাগুলির মধ্যে উপন্যাসের বীজ নিহিত আছে এবং ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া ইহাই কালক্রমে উপন্যাসের রূপ লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কেবলমাত্র পল্লীসমাজের উপভোগ্য নহে, উচ্চতর শিক্ষিত সমাজেরও চিত্তাকর্ষক। এই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'In some stories the realities of human life are presented under the veil of the fantastic adventures which belong to fairy land.'[১] অতএব ইহাদের একটি চিরন্তন মূল্য আছে। রূপকথাগুলির মধ্য দিয়া কল্পনার অবাধ বিস্তার রূপ লাভ করিয়াছে। ইহা শিশু-সাহিত্যের রোমান্স, সেইজন্য শিশুমনের সর্বাধিক প্রিয়। গীতিকথা রূপকথারই একটি শাখা, কেবলমাত্র ইহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে রূপকথা হইতে একটু ব্যতিক্রম আছে—রূপকথা আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, গীতিকথা গীতি ও গদ্য মিশ্র রচনা—এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। বাংলার লৌকিক কথা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহার এই সকল বৈচিত্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সর্বশেষে ধাঁধা (riddles) বা হেঁয়ালী। ইহাদিগকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে কাহারও সংশয় হইতে পারে; কিন্তু লোক-সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ এই বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "Contrary to the common assumption that they are mere word puzzles proposed by punsters at evening parties, riddles rank with myths, fables, folktales and proverbs as one of the earliest and most widespread types of formulated thought.'[২] যতই গূঢ় হউক, ধাঁধার একটি অর্থ আছে, ইহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যেও একটি অপূর্ব রস সৃষ্টি হইয়া থাকে; একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

বন হ'তে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। (আনারস)

একটি অপূর্ব চিত্র ইহার ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছে, অর্থটি বুঝিবার পূর্বেই এই চিত্রটি সহজেই হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। অতএব লোক

১ R. M. Dawkins, op. cit. p. 425
২ C. F. Potter, 'Riddles,' *SDFML* p. 938

সাহিত্যের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা ইহাতে ব্যাহত হয় নাই। সুতরাং ইহাও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে কোন বাধা নাই। বাংলায় বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিবিধ উপলক্ষে ধাঁধা বা হেঁয়ালীর ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। এ'দেশের ধর্ম ও সাহিত্য হেঁয়ালীতে পরিপূর্ণ। প্রাচীনতম বাংলায় লিখিত বৌদ্ধ চর্যাপদ সন্ধ্যাভাষায় রচিত ; সন্ধ্যাভাষা হেঁয়ালি ভাষা, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আলো-আঁধারি ভাষা—যাহার কিছু বুঝা যায়, কিছু যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই এই ধাঁধার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ইহা প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ; যেমন, লোক-ধাঁধা (folk-riddle) ও সাহিত্যিক ধাঁধা (literary riddle) ; যাহা কেবল মাত্র লোকমুখে প্রচারিত হইবার ফলে একটি লৌকিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তাহাই লোক-ধাঁধা ; আর যাহা ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই সাহিত্যিক ধাঁধা। গ্রন্থ-ভাগে উভয়েরই বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

লোক-সাহিত্য ও লোক-শিক্ষা

শিক্ষা-বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় আজ যে ভাবে ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা হইতে ঐ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে শিক্ষার যথার্থই আজ প্রসার হইতেছে, পূর্বে ইহার তুলনায় জন-শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। এ কথা সত্য যে, মধ্যযুগের স্বাধীন কিংবা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন বাংলাদেশের জন্য শিক্ষার খাতে রাষ্ট্রের এক কপর্দকও ব্যয় হইত না। কিন্তু ইহা হইতে এ'কথা যদি কেহ মনে করেন যে, সেদিন শিক্ষার কাজে রাষ্ট্রের এক কপর্দকও ব্যয় হইত না বলিয়া দেশে জন-শিক্ষার প্রচার ছিল না, দেশের মুষ্টিমেয় পণ্ডিত সম্প্রদায় ব্যতীত আপামর জন-সাধারণ সম্পূর্ণ মূর্খ ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা নিতান্তই ভুল করিবেন। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিমাণই সমাজে শিক্ষা-প্রচারের মাপকাঠি হইতে পারে না। সুতরাং আজ শিক্ষার জন্য কোন্ দেশে কোন্ বৎসর কত টাকা ব্যয় হইল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া কোন দেশের সমাজ যথার্থ শিক্ষার পথে কতখানি অগ্রসর হইল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারিবে না। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব একটি শিক্ষার ধারা আছে, তাহার জীবনের আদর্শ আছে, সমাজের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি আছে; তাহা দ্বারাই দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজ-দেহ আপনা হইতেই রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। এই পথে ইহার একটি প্রাণ-শক্তি আপনা হইতে গড়িয়া উঠে। এই ধারা হইতে বিচ্যুত হইলেই নানা দিক দিয়া সমাজের বিপর্যয় দেখা দেয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সেই ঐতিহ্যের ধারাটি আমরা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি, ততদিন আমাদের বিনাশের আশঙ্কা নাই। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর চিরাচরিত জনশিক্ষার ব্যবস্থাটি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য বিরোধী এক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ফলে, রাষ্ট্রের নিজেকেই সেদিন শিক্ষার ব্যয়ভার নিজের উপর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেদিনকার সেই শিক্ষা সমাজের তাগিদে ইহার ভিতর হইতে জন্মলাভ করে নাই, বরং এক বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির নিজস্ব স্বার্থের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার ফলে

সেই শিক্ষায় সেদিন বৈদেশিক শাসকের 'একান্ত অনুগত' এক ভৃত্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইলেও, প্রকৃত মানুষ অল্পই সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্যই চরিত্রবান্ ও নীতিবান্ মানুষ সৃষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর Young Bengal-এর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে বৈদেশিক শাসকের স্বার্থ সেদিন পূর্ণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজ বলিয়া যে একটি স্বতন্ত্র সমাজ সেদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম-কণ্টকিত এই দেশের সমাজে আর একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল। এই নব প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্যে, কৃত্রিম অভিজাত্যবোধে, খেতাব ও দাস্যসুখের মোহে নিজের দেশ, নিজের ভাষা ও নিজের ধর্মকে অস্বীকার করিয়া এক কৃত্রিম জীবনে পদার্পণ করিল। এই জীবনের কোন ঐতিহ্য বা বনিয়াদ ছিল না বলিয়া ইহা অবলম্বন করিয়া যে সমাজ গড়িয়া উঠিল, তাহার ভিত্তি কোনদিনই সুদৃঢ় হইতে পারিল না। সেইজন্য যখনই ইহা কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে লাগিল, তখনই ইহা বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। আজ যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, তাহার ইহাই কারণ। বিগত শতাব্দীতে প্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা যদি কোন দিক দিয়া জাতীয় শিক্ষাধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত, তবে আজ কোন দিক দিয়াই ইহার মধ্যে 'সঙ্কটের' উদ্ভব হইতে পারিত না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অরাজকতা কিংবা অন্ধকার যুগের আবির্ভাব হইলেও তাহার মধ্য দিয়াও ইহার জন-শিক্ষার ধারা যে অব্যাহত থাকিত, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

এমন কি, আধুনিক কালেও পাশ্চাত্ত্য প্রবর্তিত শিক্ষাধারার সমান্তরালবর্তী জন-শিক্ষার একটি ধারা এদেশে যত ক্ষীণভাবেই হউক, এখনও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির অন্তরাল দিয়া অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহা নিরক্ষর সমাজের লোক-শিক্ষার ধারা। রাষ্ট্র বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার ফলস্বরূপ দেশে যে পরিমাণ শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এক কপর্দক ব্যয় না করিয়া ইহার ভিতর দিয়া দেশে এখনও যে জন-শিক্ষা

প্রচার লাভ করিতেছে, তাহার মূল্য অপরিসীম। তাহারই কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতে পারে। পল্লীর জন-সমাজের সংহতি রক্ষা করিবার জন্য যে শিক্ষার প্রথম প্রয়োজন, তাহা ধর্ম ও নীতিশিক্ষা। কেবলমাত্র সমাজের সংহতি নহে—পারিবারিক সংহতি রক্ষার জন্যও ধর্ম ও নীতি শিক্ষাই যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা সর্বদা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে প্রধানতঃ বাংলার যৌথ পরিবার প্রথা উচ্ছেদের মূল, তাহা ত সকলেই আজ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং যাহা দ্বারা সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সংহতি রক্ষা পাইয়াছে, তাহা এদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে, বরং নিরক্ষর সমাজ-প্রসূত জনশিক্ষা। লোক-সাহিত্যের ভিতর দিয়া জনশিক্ষার ধারাটি কি ভাবে যে এ'দেশে অব্যাহত থাকিত, তাহার একটি মাত্র নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একথা সকলেই জানেন, বাংলাদেশের সর্বত্র সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে পট দেখাইয়া এক সম্প্রদায়ের লোক জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পটুয়া বলে। ইহারা নিরক্ষর, কিন্তু চিত্রাঙ্কনের একটি বিশেষ নৈপুণ্য তাহাদের আছে; উজ্জ্বল ও গাঢ় রং ব্যবহার করিয়া তাহারা চিত্রগুলি অঙ্কিত করে এবং ইহাদের মধ্য দিয়া প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতির কোন কোন কাহিনী রূপায়িত করা হয়। কাহিনীগুলি নির্বাচন করিতে গিয়া চিত্রকরগণ সর্বদাই সমাজের জীবন ও তাহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ কাহিনীগুলি নীতিস্পর্শ-হীন কেবলমাত্র অহেতুক কৌতুককর নহে; এমন কি, কৌতুককর বা লঘু হাস্যরসোপযোগী কোন বিষয়ই তাহাতে থাকেই না। বরং যাহার ভিতর দিয়া উচ্চ একটি সামাজিক ও পারিবারিক নীতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই চিত্রকরণের বিষয় বলিয়া গৃহীত হয়। এই চিত্রগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন শিল্পসম্পদ নহে, যে কাহিনীটি আশ্রয় করিয়া চিত্রটি অঙ্কিত হয়, তাহা চিত্রকর গীতিসহকারে দর্শকদিগের নিকট পরিবেষণ করে। গীতিগুলি চিত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। গীতি ব্যতীত চিত্রের যেমন কোন মূল্য নাই, চিত্র ব্যতীত গীতি অর্থহীন এবং ব্যবহারের অযোগ্য। চিত্রগুলি যেমন মঙ্গলকাব্য-রামায়ণ-পুরাণ প্রভৃতি কাহিনীর সম্পূর্ণ অনুকরণ

নহে, তেমনি গীতিগুলিও চিত্রের হুবহু বর্ণনা নহে। চিত্রকর যে ইহাদিগকে নিজে গাহিয়া প্রচার করে, তাহার অর্থই এই যে, চিত্রের মধ্যে নিজে যে বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিতে পারে না, গীতির মধ্য দিয়া তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া লয়। চিত্রের মধ্য দিয়া যে সকল বিষয় কিংবা ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না, মৌখিক গীতির ভিতর দিয়া তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। চিত্রগুলি কেবলমাত্র তুলিতে টানিয়া টানিয়া আঁকা হয় বলিয়া ইহাদের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মতম ভাবের অভিব্যক্তি কখনও প্রকাশ পাইতে পারে না—সেইজন্য কেবলমাত্র গীতি-সহচর হইয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে, পটুয়ার গীতি-ব্যবসায় যেদিন লুপ্ত হইয়া যায়, তাহার পটুয়ার ব্যবসায়ও সেই জন্যই সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়। ইহাই বাংলার লোক-সাহিত্য পটুয়ার গান বা পটুয়া সঙ্গীত বলিয়া পরিচিত।

পূর্বে বলিয়াছি, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ ও ভাগবতের বিষয়ই চিত্রিত হয়, মহাভারতের বিষয় কদাচ চিত্রিত হয় না। কিন্তু কাহিনীগুলি সর্বদাই বাঙ্গালীর জীবন-রসে জারিত করিয়া লওয়া হয়; সুতরাং ইহাদের মধ্যদিয়া কেবল মাত্র যে কোন শিক্ষাগত (academic) দাবীই পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা নহে—বরং তাহার পরিবর্তে ইহাদের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আদর্শ বা নীতির কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্য দিয়া একটি মানবিক আবেদন প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যেই ইহার সাহিত্যিক মূল্যও সার্থকতা লাভ কবিতে পারে। শিক্ষার সঙ্গে যখন আনন্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে, তখন শিক্ষামাত্রই কেবল যে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে, তাহাই নহে—ইহার উদ্দেশ্যও চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে। মঙ্গলকাব্যের বিষয় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ইহার সকল দিকই নিরক্ষর বাঙ্গালী পল্লী-বাসীকে যথার্থ আনন্দ দিয়া থাকে; রামায়ণের মধ্যে পারিবারিক জীবনের যে আদর্শের কথা আছে, কেবলমাত্র তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই পটুয়ার চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়, তাহার ফলে ইহারও একটি গার্হস্থ্য আবেদন প্রকাশ পায়। কৃত্তিবাস রামায়ণের কাহিনীর যে ভাবে বাঙ্গালীকরণ করিয়াছেন, পটুয়াগণ তাহা হইতে আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী পল্লীবাসীর গার্হস্থ্য জীবনের সন্নিকটবর্তী করিয়া লইয়াছেন।

পটুয়াগণ নিরক্ষর, মূল রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন; সুতরাং রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পরিচ্ছদে তাহারা বাঙ্গালী পরিবারের ভ্রাতা ও পত্নীর সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের কথাই প্রকাশ করিয়াছে। তাহার ফলে তাহাদের পরিকল্পিত রামায়ণ-কাহিনী বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবনায়ন কাব্যমাত্র হইয়াছে। এই চিত্র দেখিয়া কিংবা তদাশ্রিত সঙ্গীত শুনিয়া কেহ বৈকুণ্ঠ লাভের পুণ্য সঞ্চয় করে না সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে অপরিসীম মাধুর্যের স্বাদ আছে, তাহার সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠে। এমন কি, যে ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি, তাহার মধ্য হইতে নিরক্ষর পটুয়াগণ আধ্যাত্মিকতা কিংবা ভক্তিবাদের কোন সন্ধান করিবার পরিবর্তে কেবল মাত্র বাৎসল্য রসটিকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের কাব্য রচনা করিয়া থাকে। সেখানে যশোদা নন্দ ও গোপালের সম্পর্কের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রটি মনোরম হইয়া প্রকাশ পায়। প্রত্যেক পটের মধ্যেই একটি যমপুরীর চিত্র থাকে—ইহাকে দিয়াই চিত্র-দর্শন সম্পূর্ণ হইয়া থাকে; চিত্রদর্শনের উপসংহারে সমাজকে পটুয়াগণ জীবনের অসারতা ও পরিণামের বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলে। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যমপুরীর কথা ভুলিয়া গিয়া কত পাপাচরণ করি, তাহার ইয়ত্তা নাই, পটুয়াগণ সমাজের সম্মুখে তাহার চিত্রটি তুলিয়া ধরে—তাহার ফলে সমাজের অশিক্ষিত জনসাধারণ চকিতের জন্য হইলেও নিজের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পায়। চিত্র ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সমাজ-শিক্ষার বিষয় যে ভাবে পরিবেষণ করা হইত, তাহাতে শিক্ষাও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত এবং ইহার ভিতর দিয়া সমাজ যে শিক্ষা লাভ করিত, জীবনে তাহার ফল সুদূর-প্রসারী হইত। এইভাবে মঙ্গলগান রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির কথকতার মধ্য দিয়া একদিকে যেমন নীতিকথা, অন্যদিকে তেমনি আনন্দ পরিবেষণের যে ব্যবস্থা একদিন সমাজ আপনা হইতে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাতেই একদিকে যেমন সহজে অন্যদিকে তেমনই ব্যাপক-ভাবে লোক-শিক্ষা প্রচারিত হইত। এই শিক্ষা সমাজের বিশেষ কোন স্তর অবলম্বন করিয়াই যে বিস্তারলাভ করিত, তাহা নহে—ইহা সমাজের সকল স্তর সমানভাবে স্পর্শ করিত; কেবল লঘুভাবে যে স্পর্শ করিত, তাহা নহে—বরং গভীর ভাবে স্পর্শ করিত। অর্থাৎ বেহুলা কিংবা সীতার

দুঃখ বেদনার চিত্র দেখিয়া এবং কাহিনী শুনিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনার মধ্যে পল্লীবাসী সান্ত্বনা লাভ করিত। যখন দেখিয়াছে, রাজবধূ হইয়া সীতা আজীবন দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, রাজপুত্র হইয়াও রামচন্দ্র জীবনের চরম লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তখন তাঁহারা নিজেদের দুঃখ বেদনার অগ্নি-পরীক্ষা তাহা দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার শক্তি পাইয়াছে। নিরক্ষর সমাজ শিক্ষাকে জীবনে অকপটে আচরণ করিতে পারিত। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে এইখানেই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। আজ শিক্ষা অন্তর স্পর্শ করে না, বাহিরের পোষাক মাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু নিরক্ষর সমাজের মধ্যে একদিন মৌখিক সাহিত্য যে ভাবে প্রচার লাভ করিত, তাহা অতি সহজেই অন্তর অধিকার করিয়া লইত। আজ যথার্থই যাঁহারা জাতির কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা যদি জাতির এই ঐতিহ্যটির সন্ধান করিতে না পারেন, তবে বাহির হইতে তাঁহারা যে বস্তু ও উপকরণই সঞ্চয় ও সংগ্রহ করুন না কেন, তাহা কাহারও কাজে আসিবে না।

লোক-সাহিত্যে অনুরাগ

আধুনিক নাগরিক জীবনে বাস করিয়াও আমরা লোক-সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি, একজন ইংরেজ পণ্ডিত তাহার চারিটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।[১] তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমত: আমাদের চরিত্রের মধ্যেই এমন একটি গুণ আছে, যাহা দ্বারা আমরা যে পথ একবার গ্রহণ করি, তাহা সহজে পরিত্যাগ না করিয়া ক্রমাগত অনুসরণ করিয়াই যাই। ইংরেজিতে ইহাকে 'sense of continuity' বলা হইয়াছে। ইহাকে ঠিক রক্ষণশীলতাও বলা যায় না, ইহা মানুষ মাত্রেরই একটি চারিত্র গুণ বলা যায়। ইহা ব্যক্তিগত চরিত্রগুণ হইতেই সংহত সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীগত পরিচয় লাভ করে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে আচার আচরণ একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে তাহাদের অনেক কিছুরই মূল্য হ্রাস পাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিতান্ত বহির্মুখী প্রতিকূল কোন অবস্থার দাবী আসিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত আমরা তাহা অনুসরণ করিয়া যাওয়া কদাচ অনাবশ্যক বিবেচনা করি না। ইংরেজের সামাজিক জীবন হইতে এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া উক্ত লেখিকা বলিয়াছেন, 'Consider our civic traditions, our Lord Mayor's coaches, our city trumpeters; consider our Law traditions, the wigs, the robes, the stiff bouquest; consider our regret widely spread when ancient families are compelled to break the continuity of life in their own ancient homes, and must open these to crowds of strangers and these strangers themselves often express their sympathy.' আধুনিক বাঙ্গালীর নাগরিক জীবনের সম্পর্কেও এই কথা বহুলাংশে সত্য। আধুনিক সভামঞ্চে চন্দন, ধানদূর্বা, শঙ্খধ্বনি, মঙ্গলঘট, স্বস্তিকাচিহ্ন, চাঁদমালা, আলপনা

---

১ Violet Alford, 'Why do we study folklore?' Folklore vol. LXIV (1953) p p 478–483

প্রভৃতির ব্যবহার এই উক্তিরই পরিপোষক। একদিক হইতে নূতন জীবনের আচার আচরণ আমাদের মধ্যে আসিয়া যেমন প্রবেশ করিতেছে, ততই আমরা প্রাচীন আচারকেও তাহার মধ্যে যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া চলিবার প্রাণপাত প্রয়াস পাইতেছি; যখন তাহাকে রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন তাহা পরিত্যাগ করিলেও তাহার প্রতি মমতা আমাদের কোনদিনই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে না। এই মনোভাব হইতেই লোক-সাহিত্যের প্রতিও আমাদের অনুরাগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, আধুনিকতম নাগরিক সমাজের আসরেও লোক-সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দলাভ করা সম্ভব হয়।

এই লেখিকার মতে লোক-সাহিত্যের প্রতি সমাজের অনুরাগ প্রকাশ পাইবার দ্বিতীয় কারণ মানব-চরিত্রের অন্তর্নিহিত অনন্ত অনুসন্ধিৎসা বা কৌতূহল (curiosity)। পুরুলিয়া জিলার পাকবিড়্ড়া গ্রামে কালো পাথরে নির্মিত প্রায় আট ফুট উচ্চ এক জৈন মূর্তি পড়িয়া আছে। জৈন ধর্ম বাংলাদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত যে মূল্য ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সে অঞ্চলে এখন আর কোন জৈন নাই, কিংবা দূরাঞ্চলের জৈনগণ আসিয়াও মূর্তিটিকে তীর্থঙ্করের মূর্তি রূপে উপাসনা করে না। কিন্তু আধুনিক গ্রামবাসী ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী হইলেও এই জৈন মূর্তিটি সম্পর্কে যে নির্লিপ্ত হইয়া জীবন যাপন করে, তাহা নহে। প্রস্তর নির্মিত এত বিশাল একটি মূর্তি তাহাদের গ্রামের মধ্যে পড়িয়া আছে, তাহারা ইহার সম্পর্কে কোন দিক দিয়াই উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে না। ইহার সম্পর্কে তাহারা নানা কাহিনী মৌখিক রচনা করিয়া প্রচার করিল, প্রাচীন গ্রামবাসী কর্তৃক রচিত এই সকল কাহিনী পরবর্তী গ্রামবাসিগণ বিশ্বাস করিতে লাগিল এবং সেইভাবে তাহাদের জীবনের কোন কোন আচারও নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসীর এই সহজাত অনুসন্ধিৎসা হইতেই ইহাকে আশ্রয় করিয়া লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ জন্মলাভ করিল, তাহা পুরাকাহিনী বা myth. সেই অনুযায়ী এই দেবতার নাম হইল কালভৈরব, তাঁহার সম্পর্কে কাহিনী পরিকল্পিত হইল যে, তিনি গভীর রাত্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কৃষকের ক্ষেত হইতে বন্য শূকর তাড়াইয়া দেন, তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেই বন্য শূকরের দল প্রাণ ভয়ে

পলাইয়া যায়; তিনি ক্ষেত্ররক্ষক দেবতা, সেইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে ক্ষেত্রপাল বলিয়া জানে, ইত্যাদি। ইংরেজ লেখিকাও লিখিয়াছেন, 'Can you imagine a person who, all unprepared, comes into sight of the Cerne Abbas Giant, the Bershire White Horse or the lorn and sinister stone avenues at Carnac, so little curious that he will not be compelled to enquire into the meaning of these overpowering objects? The answers to his enquires will be local folk-lore.'

মানব-চরিত্রের এই অনন্ত কৌতূহল বোধের ভিতর দিয়াই লোক-সাহিত্যের প্রতি সমাজের অনুরাগ অনিবার্য হইয়া উঠে; নিরক্ষর কিংবা শিক্ষিত উভয়ের মধ্যেই এই কৌতূহল বোধ সক্রিয় থাকে বলিয়াই মানুষের চিন্তাধারায় লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কখনও শিথিল হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় না।

উক্ত ইংরেজ লেখিকার মতে লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের তৃতীয় কারণ প্রয়োজনীয়তা বা necessity. তিনি লিখিয়াছেন, 'A history student comes up against some popular movement he does not understand, seasonal fighting, fighting between town faction or mass depression as when the Scoppio del Carro fails in Florence.'

এই কারণটির সক্রিয়তা আমাদের দেশে তত প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না। কারণ, আমাদের শিক্ষা প্রণালীর মধ্য দিয়া এইভাবে আমরা চিন্তা করিতে অভ্যাস করি নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার যৌক্তিকতা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশের আধুনিক ইতিহাসের রচয়িতা প্রধানতঃ ইংরেজ জাতি, তাহাদের সঙ্গে এ'দেশের রীতি-নীতি, সামাজিক প্রথা ও আচারের কোন সম্পর্ক ছিল না, এই দিক দিয়া তাঁহারা যেমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাখ্যা করেন নাই, তেমনই আমাদিগকেও ব্যাখ্যা করিতে শিখান নাই। সুতরাং অন্ততঃ এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি করিবার জন্য আমাদের দেশে কোন পাঠক সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। লোক-সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান যে ভাবেই রহিয়াছে, তাহা ব্যবহার

করিয়া ইতিহাস রচনা করিবার পদ্ধতিটি যে দিন আমরা আয়ত্ত করিতে পারিব, সে দিন লোক-সাহিত্যের যথার্থ মূল্য আমরা স্বীকার করিতে পারিব।

লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের যে চতুর্থ কারণটি নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত সহজ-বোধ্য। ইহা লেখিকার ভাষায় বলিতে গেলে 'is a seasonal urge which requires us to do certain things at certain times.' নাগরিক জীবনেও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বর্ষা ঋতুতে বর্ষা নৃত্য ও সঙ্গীত, শরৎকালে আগমনী গান, পৌষমাসে পৌষ পার্বণের ছড়া, চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের গান যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার ইহাই কারণ সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া জাতীয় 'ঐতিহ্য' অনুসরণ করিবার ফলে বাঙ্গালীর মধ্যে বারমাসে তের পার্বণের সংস্কার স্থান লাভ করিয়াছে, নাগরিক জীবনে তাহা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও, কদাচ তাহা লুপ্ত হইয়া যায় না। সেইজন্য মনের মধ্যে ইহার সম্পর্কিত কতকগুলি ভাব ও চিন্তা সর্বদাই প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কোন দিক দিয়া অনুকূল অবসরের সৃষ্টি হইলেই তাহা এক ভাবে বিকাশ লাভ করে।

জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াও সংহত লোক-সমাজ সৃষ্ট লোক-সাহিত্যের প্রতি কেন যে আমরা অনুরাগ প্রকাশ করি, মানব-চরিত্র-ভিত্তিক তাহার বহু সূক্ষ্ম কারণও আছে। তাহা সর্বদা বিশ্লেষণ করাও সম্ভব হয় না।

লোক-সাহিত্যের অনুশীলন

জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের মত লোক-সাহিত্যও যে অনুশীলন ও অধ্যয়নের বিষয়, তাহা আজ পর্যন্তও যে আমরা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, এ কথা সত্য। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সাহিত্যের যে সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বতোভাবেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত লিখিত সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াছে—এই জাতির ঐতিহ্য ইহাতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। অথচ এই বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষাকেই আমরা রেনেসাঁ বা জাতীয় নবজাগরণ বলিয়া অভিনন্দন করিয়া লইয়াছিলাম। প্রত্যেক দেশেই লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপরই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়। যদিও লিখিত সাহিত্যধারা সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৌখিক প্রচলিত লোক-সাহিত্যের ধারাটি ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, তথাপি বহুকাল পর্যন্ত তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, লিখিত সাহিত্য জাতির লোক-সাহিত্য হইতেই তাহার প্রাণ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালীর তথাকথিত নব-জাগরণ দেখা দিল, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের ধারা প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই প্রধানতঃ এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিল। জীবন-ধারা একটি নির্দিষ্ট স্রোতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইবার পর, তাহা যখন নানা কারণে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতির সম্মুখে এমন একটি শক্তিশালী আদর্শ আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল যে, স্বভাবতই জাতি পশ্চাতের দিকে আর কোন প্রকার লক্ষ্য না করিয়া একান্তভাবে তাহাই নিবিড় ভাবে আশ্রয় করিল। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা হইতে ইহার বিচ্যুতি এই কারণেই প্রধানতঃ আসিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই শ্রেণীর জাতীয় আত্মবিস্মৃতি তাহাদের কোন কালেই ঘটে নাই, প্রত্যেক জাতিরই নবজাগরণের শক্তি আসিয়াছে জাতির অন্তরের প্রেরণা হইতে, বাহিরের প্রেরণা হইতে নহে। সেই জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নব-

জাগরণের প্রকৃতির সঙ্গে বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর এই তথাকথিত নব-জাগরণের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডে সাহিত্যচিন্তা ও তাহার সৃষ্টির ভিতর দিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে যে জাতীয় নবজাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের ইংরেজ চারণ কবি চসার ও জন গাওয়ার প্রভৃতির রচনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় নাই—রেনেসাঁ যুগের প্রথম ভাগ ব্যাপিয়া ইঁহাদের উপকরণই নানা ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি, রেনেসাঁ যুগের অন্তর্ভুক্ত সেক্সপীয়রের মত ব্যক্তিও ইংরেজ জীবনের বিচিত্র ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার সাহিত্য-সৌধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীতে যে নব-জাগরণের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে মধ্যযুগের সাহিত্যধারার মত এত শক্তিশালী একটি ঐতিহ্যেরও কোনই স্থান ছিল না। সুতরাং সেদিন জাতিকে বাদ দিয়া জাতীয় জাগরণ এবং দেশকে বাদ দিয়াই দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইজন্য জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া সে দিন বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের মধ্যে যাহা কোন রকমে তখনও আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা এই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মুখে সম্পূর্ণ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হইয়া পড়িল।

কিন্তু যে জাতির আত্মমর্যাদাবোধ এত প্রবল, তাহার মধ্যে আত্মবিস্মৃতির ভাব যে কারণেই সাময়িক-ভাবে সৃষ্টি হউক না কেন, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না—এ' দেশেও তাহা পারিল না। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের একান্ত আনুগত্যের ভিতর দিয়াই ক্রমে ইহার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নানাভাবেই ইহার সূচনা দেখা দিয়াছিল, তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাবের ভিতর দিয়া ইহার কর্মকাণ্ড যথার্থ সুরু হইল। এই যুগেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের অন্ধ আনুগত্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস জীবনে স্বীকার করিয়া লইল। তাহার ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম মোহ কাটিয়া গিয়া স্বদেশের কেবল স্বাধীনতা নহে, ইহার ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রাণান্তকর প্রয়াস দেখা দিল। বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতিও তখনই এদেশের শিক্ষিত সমাজের সজাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু সে যুগে বাঙ্গালীর সাধনায় অনেক বিষয়ের মত

এই বিষয়েও রবীন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির ভিতর দিয়া জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া ইহাকে আত্মমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন। সেই জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় প্রথম সংখ্যার মধ্যেই 'বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া' নামক একটি সুদীর্ঘ আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইহাই যে বাংলার লোক-সাহিত্যের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা, তাহাই নহে—এই শ্রেণীর আলোচনা ইহার পরও প্রকাশিত হয় নাই। এই আলোচনাটি বাঙ্গালী পাঠকের কেবল একটি অপরিচিত বিষয় সম্পর্কে যে সামান্য কৌতূহল দূর করিল, তাহা নহে—ইহা বাংলার বিদগ্ধ সমাজের চিত্তভূমিতে এক অনন্ত রসের উৎস খুলিয়া দিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলা লোক-সাহিত্যের কিছু কিছু সংগ্রহ যে প্রকাশিত না হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু উদ্দেশ্যহীন সংগ্রহ পাঠকের মনে স্থায়ী কোনও প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে না। আলোচনার ভিতর দিয়াই বিষয়ের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের আলোচনার একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা তত্ত্ব কিংবা কথামূলক নহে—বরং রসোপলব্ধি মাত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মত ইহাও সাহিত্য; রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশিষ্ট আবেদন ইহার মধ্য দিয়াও ব্যর্থ হয় নাই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধটি বাংলার শিক্ষিত সমাজে সেদিন এক অতি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য যে সর্বাংশেই সার্থক হইল, তাহা বলা যাইতে পারে না; তবে আংশিক সার্থক হইয়াছিল, এ পর্যন্ত বলা যায়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী ক্রমাগত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এ'দেশের লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আলোচনার ভিতর দিয়া জাতীয় সংস্কৃতির সাধনায় ইহার অপরিহার্যতার কথা যেভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরবর্তী লোক-সাহিত্য প্রেমিকদের কেবল ইহাদের সংগ্রহের ভিতর দিয়া তাহার গুরুত্বটুকু প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

এদিকে পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্যের অনুশীলন শিক্ষার একটি

অপরিহার্য বিষয়রূপে গণ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের দেশে তাহার প্রভাব আসিয়া তখন পর্যন্তও পৌঁছাইতে পারে নাই। সুতরাং যদিও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাই আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম, তথাপি জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পথে নূতন নূতন উপকরণ যে ভাবে শিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিয়াই আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস আমরা পাঠ করিলাম না। শিক্ষার ভিতর দিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ যখন অপরিচয়ের ব্যবধান উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন আমাদের প্রতিবেশীর পরিচয়কেই আমরা উপেক্ষা করিলাম। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্যুত আমাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষাই আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রধান অন্তরায় হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া আমরা আজও চলিতেছি, ইহার পর জগতের মধ্যে কত সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের যে উত্থান পতন ঘটিল, পুঁথির ভিতর দিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপিত হইল সত্য, কিন্তু, আমাদের জীবনে তাহা সত্য হইয়া উঠিল না। যদি তাহা হইত, তবে বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া জগতের দিকে তাকাইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম।

যাই হউক, পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্য অনুশীলনের প্রেরণা বিগত শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইলেও আমাদের দেশে তাহার প্রভাব আজ পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই। সুতরাং আজ হইতে ষাট বছরেরও আগে যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই এ দেশের লোক-সাহিত্য সম্পর্কে আজও শেষ কথা হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই ষাট বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত ইহার রস ও গুরুত্ব যেমন আর কাহারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই, তেমনি পাশ্চাত্ত্য জগতের অনুকরণেও এদেশে ইহার অনুশীলন সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সুতরাং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষার ইহা আজও একটি বিষয় বলিয়াই গণ্য হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে,

কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি কুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও, তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানী সভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর অগণিত ছাত্র বাহির হইয়া আসিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তাহাদের কেহই 'বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ ছাত্র' নহে; কারণ, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে আজ পর্যন্ত কাহাকেও অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখা যায় নাই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব প্রত্যেকেরই পোষাকের উপর চক্চক্ করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী কালেও যাঁহারা বাংলা লোক-সাহিত্য লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন নিঃসন্দেহে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু লোক-সাহিত্যের যথার্থ অনুশীলনের পথে দীনেশচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যেই কতকগুলি অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ তিনি একান্ত আবেগ-প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যের যথাযথ পরিচয় প্রকাশ করিবার পক্ষে আবেগ প্রবণতা যে একটি দুরন্ত বাধা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি লোক-সাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাংলার পল্লীজীবন হইতে লোক-সাহিত্যের কোন উপকরণই নিজে সংগ্রহ করেন নাই। সুতরাং লোক-সাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্র যে কোথায় নিহিত আছে, তাহা তিনি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ একাধারে সংগ্রাহক ও সমালোচক দুইই ছিলেন, লোক-সাহিত্যের যথার্থ ক্ষেত্র যে কোথায়, তাহার সংবাদ তিনি রাখিতেন। সেই জন্য তাঁহার আলোচনার মধ্যে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, দীনেশচন্দ্রের আলোচনায় সে শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কেবল মাত্র তাহার অন্ধ হৃদয়াবেগ অবলম্বন করিয়া দীনেশচন্দ্র এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন—এই হৃদয়াবেগ প্রত্যক্ষ বিষয় বস্তুর অভাবে অনেক সময় সম্পূর্ণ অনাশ্রিত ও নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য কর্তৃক সংগৃহীত উপকরণই তাঁহার আলোচনার ভিত্তি ছিল, ইহাদের প্রয়োগক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁহার কোনও পরিচয় ছিল না। যে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' লোক-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ, তাহা তিনি সম্পাদনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করিলেও, যে সমাজ জীবনে ইহার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিৎ পণ্ডিতগণ কখনও এমন কাজ করিতে সাহসী হইতেন না। কারণ, লোক-সাহিত্য প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট রস-সম্পদ মাত্র; সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে ইহারও ক্রমবিকাশের সূত্র গ্রথিত হইয়া থাকে। সুতরাং সমাজের মর্মকোষের সন্ধান জানিতে না পারিলে, ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। সমগ্র বাংলা দেশ ব্যাপিয়া বঙ্গ ভাষাভাষী জন-সমাজ বাস করা সত্ত্বেও, ইহার একটি মাত্র অঞ্চলে যদি বিশেষ একশ্রেণীর রসবস্তু জন্ম ও পুষ্টিলাভ করে, তবে সেই দেশের বিশেষ প্রকৃতিই যে ইহার জননী, তাহা ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি ইহার রস-বিশ্লেষণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে যদি সেই বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করা সম্ভব না হয়, তবে তাঁহার বিশ্লেষণের যে মূল্য প্রকাশ পায়, তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এমন কি, এই বিষয়ে 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রমুখ রূপকথা সংগ্রাহক স্বর্গত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও উপকথা সংগ্রাহক স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি যে দাবী করিতে পারেন, স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন তাহা পারেন না। অথচ এই বিষয়ক অনুরাগের কথা বিবেচনা করিলে ইঁহারা প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের সমকক্ষ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং লোক-সাহিত্যের অনুশীলনের পক্ষে অনুরাগই যথেষ্ট নহে। যে নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা লিখিত বা উচ্চতর সাহিত্যের রস বিশ্লেষণ করা আবশ্যক, ইহার মধ্যেও সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয়—অন্ধ অনুরাগীদিগের দ্বারা তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁহার এই বিষয়ক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব, অন্যদিকে তেমনই এই অন্ধ অনুরাগের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; সেইজন্য তাঁহার আলোচনা অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত ভাবাতিশয্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন সেদিন এই অনুরাগ দ্বারাই ইহাকে

বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; যদি ইহাদের প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ না থাকিত, তবে তাহা বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টিপথের অন্তরালবর্তী হইয়া থাকিত এবং তাহার ফলে বাংলা দেশের একটি অমূল্য সম্পদ আজ জনসাধারণের অপরিচিতই থাকিয়া যাইত।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক কালেই বাংলার লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা যথাক্রমে ব্রতকথা, উপকথা ও রূপকথার সংগ্রাহক—রবীন্দ্রনাথের মত কেহই ছড়া কিংবা গানের সংগ্রাহক নহেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিধর্ম তাঁহাকে বাংলার লৌকিক ছড়া ও গানগুলির দিকে যে ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, কথাসাহিত্য সেভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একথা সত্য নহে। কারণ, বাংলার রূপকথা সম্পর্কে তাঁহার একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি তাঁহার সুগভীর অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি যে তাঁহার ছড়া ও গানের সংগ্রহের মত রূপকথার কোনও সংগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, ইহার তাৎপর্য এই যে, ছড়া ও গান সংগ্রহ করিবার তাঁহার যে সুযোগ সুবিধা হইয়াছিল, কথা সংগ্রহ করিবার তাঁহার সেই সুযোগ হয় নাই। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই যে লোকসাহিত্যের একই উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা নহে। দেখা যায়, গীতিকার মত ব্রতকথা, রূপকথা ও উপকথার দিক দিয়া মৈমনসিংহ জিলার বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ। কারণ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ব্রতকথা সংগ্রহ 'ঠানদি'র থলে', রূপকথা সংগ্রহ 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদার ঝোলা' এবং উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর উপকথা সংগ্রহ' 'টুনটুনির বই' প্রত্যেকটিই মৈমনসিংহ জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। এই বাংলাদেশের মাটির উপর বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন ফসল ফলে, তেমনই সমাজ-মনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশেও তেমনই নানা জাতির রসোপকরণের সৃষ্টি হয়। যাঁহারা একই জাতীয় জিনিষ সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহারা এই বিষয়টিই বুঝিতে পারেন না। বাংলা দেশের বিশেষ একটি পল্লী অঞ্চল হইতে রবীন্দ্রনাথ একদিন ছড়া ও গীতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে অঞ্চলে কথা-সাহিত্যের অভাব ছিল, হয়ত তাহা নহে, তবে তাহা সংগ্রহ

করিবার সুযোগ হয়ত তাঁহার ছিল না, কিংবা সেই অঞ্চলে সংগ্রহ করিবার মত উপকরণেরও হয়ত অভাব ছিল, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার রূপকথা সংগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক অনুরাগ কেবল তাঁহার ছড়া ও গীতি-সংগ্রহের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংগ্রহের কার্য হইয়াছে। এই সংগ্রহের কার্য সম্পূর্ণ না হইলে ইহার সম্পর্কে কোন আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। সুতরাং সে দিন সংগ্রহেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রয়োজন আর আছে কি না, তাহা নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যে প্রাচীন কৃষি-ভিত্তিক সমাজ-জীবন অবলম্বন করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্য আপনার রস ও রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা পশ্চিমবঙ্গে আজ লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে এখানে এক নূতন সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা যে কেবল কৃষিভিত্তিক জীবন হইতে স্বতন্ত্র, তাহা নহে—বরং ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী, তাহা শিল্প-কেন্দ্রিক। কৃষিভিত্তিক সমাজে গোষ্ঠী-চেতনা (Community consciousness) যে ভাবে বিকাশ লাভ করে, শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজে তাহা সেভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কৃষি-ভিত্তিক জীবনে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থ বড়, শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বার্থই বড়, এখানে সমাজ-বোধ অনেকাংশে ম্লান হইয়া যায়। বাঙ্গালীর মনীষা এতকাল যাবৎ বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, আজ তাহার সম্মুখ হইতে সেই সমাজ-জীবনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। লোক-সাহিত্য বৃহত্তর সমাজ-মানসেরই সৃষ্টি, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি নহে। সুতরাং বৃহত্তর সমাজ-জীবনাশ্রিত হইয়া একদিন যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্প-জীবনের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। যেখানে মানুষে মানুষে সহজ মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়, সেখানে সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয় না; কারণ 'সহিত' বা মিলনের ভাব প্রকাশ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। যেখানে মানুষে মানুষে এই সুনিবিড় মিলন ও সহযোগিতার ভাব লুপ্ত হইয়া যায়, সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু যে সাহিত্য সামগ্রিক

সমাজ-সংহতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়, তাহা সৃষ্টি হইতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক জীবনে আজ এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। শিল্প-জীবন ইহার নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রদেশটির সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং যে পল্লীজীবনের সংহতির ভিতর দিয়া ইহার লোক-সাহিত্য একদিন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিল, সেই জীবন আজ অন্তর্হিত হইয়াছে। অতএব আজ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোক-সাহিত্যের নামে যাহা রচিত হইতেছে, তাহা পূর্ববর্তী রীতি মাত্রের অনুসরণ হইলেও প্রাণহীন; সুতরাং ইহাদের সংগ্রহ যেমন সাহিত্যিক পরিচয়কে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে না, তেমনই বৃহত্তর সমাজ-জীবনেরও কোন পরিচয় বহন করিতে পারে না।

কিন্তু পূর্ব বাংলার অবস্থা পশ্চিম বঙ্গের অনুরূপ নহে। এখনও সেখানে কৃষি-ভিত্তিক সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়া শিল্প-কেন্দ্রিক জীবনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেখানে নগর আছে সত্য, কিন্তু সেখানকার নগর-নগরীগুলি পল্লী জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া এখন পর্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতেছে, সেই জন্য সেখানকার লোক-সাহিত্যে বাহির ও অন্তরে এখনও কোন সুস্পষ্ট পরিবর্তন অনুভব করা যায় না। সাহিত্যের উপকরণরূপে তাহা এখনও অনুশীলনের যোগ্য। সুতরাং সেখানকার সংগ্রহের যে মূল্য, পশ্চিম বঙ্গের সংগ্রহের সে মূল্য নাই।

কিন্তু সংগ্রহের এখনও যে নিতান্ত প্রয়োজন আছে, তাহা বলা যায় না। কেবলমাত্র নির্বিচার সংগ্রহের মধ্য দিয়াই যথার্থ সাহিত্য-বিচার হয় না, আর সাহিত্যে বিচার না হইলে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে না। বাংলা দেশে এ পর্যন্ত যে সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু এই বিপুল সংগ্রহ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক আলোচনা ব্যতীত, সাহিত্যে আর কোনও স্থায়ী কীর্তি স্থাপিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া যদি তাহাই শেষ কথা হইয়া থাকে, তবে নূতন সংগ্রহেরও কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কেবল সংগ্রহ রাশীকৃত করিয়া তুলিলেই এই বিষয়ে আমাদের

কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্বন্ধে তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনা প্রবন্ধটি যদি না লিখিতেন, তবে তাঁহার ছড়ার সংগ্রহ দীর্ঘকাল ধরিয়া পাঠকচিত্তে কৌতূহল জাগ্রত রাখিতে পারিত না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই সংগ্রহের কাজ বহু পূর্বেই শেষ হইয়াছে, এখন সেই সংগ্রহের ভিত্তিতে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহার মধ্য দিয়াই জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরম আত্মীয়তার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহারা কি ছিল, তাহা নহে—ইহাদের ভিতর দিয়া কি পাইলাম, তাহাই বড় কথা। আমাদের বিপুল সংগ্রহের মধ্য দিয়া যদি আমরা ইহাই অনুভব করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের সঞ্চয় যতই বাড়াইয়া তুলি না কেন, তাহার কোনও মূল্য পাইব না।

বাংলার সংস্কৃতি বাংলার পল্লীতেই জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে; সেইজন্য আজ যে নাগরিক সংস্কৃতি এদেশের উপর ইহার স্পর্ধিত শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তাহা কিছুতেই জাতির মর্মমূলে নিজের শিকড় প্রবেশ করাইতে পারিতেছে না; উপরের দিক হইতে ইহাকে যতই শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছে, ভিতরের দিক হইতে তাহা ততই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। অতএব কল্যাণের পথে সমাজকে যাহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, ধ্বংসোন্মুখ পল্লীজীবনের মধ্যেই এখনও তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের সন্ধান করিতে হইবে।

লোক-শ্রুতি (Folklore) জাতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট উপকরণ। লোক-মনের (Folk-mind) পরিচয় ইহার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। পল্লীর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, জনশ্রুতি, উৎসবানুষ্ঠান ইত্যাদি ইহারই অঙ্গ। অতএব ইহার অনুশীলনের ভিতর দিয়াই বাংলার জাতীয় লোক-সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে তাহার নিজস্ব লোক-শ্রুতির পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের বৈদেশিক শিক্ষা ও সাধনার প্রভাব তাহার জীবনে এতই সুদূরপ্রসারী হইয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার পক্ষে এখন আর তাহার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি একথা সত্য যে, সে পরিচয় ব্যতীত কোন জাতিরই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার লোক-সাহিত্য

জাতির বিলুপ্ত-প্রায় সাংস্কৃতিক উপকরণগুলির ব্যাপক সংগ্রহ ও সতর্ক সংরক্ষণ করিবার বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেরই এক অপরিসীম দায়িত্ব আছে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই দেশের জাতীয় আদর্শের প্রতি কোনও শ্রদ্ধাবোধ লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। সেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাবিধির মধ্যে কেবল ইংরেজি ভাষাই শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাই নহে—শিক্ষার বিষয়ের মধ্যেও ভারতীয় কোন বস্তুর বিশেষ কোনই স্থান ছিল না। সেইজন্য প্রথম হইতে আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি পঠন-পাঠনের কোনও সুব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতের দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্য যে আজও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের নিকট তেমন আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহার কারণ, এই সকল বিষয়ের উপর নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোন দিনই কোনও গুরুত্ব আরোপ করে নাই। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই আলোচনার ক্ষেত্র হইয়াছে। অতএব ইহারা ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিলে ভুল বলা হইবে। প্রকৃতপক্ষে বাহির হইতে ইহারা এদেশের উপর আরোপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিজের দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা বিশ্বের হইয়া জাতির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত বলিয়াই মনে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই কালক্রমে এই জাতীয়তা বিরোধী আদর্শ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের সুকঠিন দায়িত্ব কতকটা সার্থকভাবে পালন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখানে তাহার একটি দিকেরই শুধু আলোচনা করা যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া জাতির যে সাহিত্যের অনুশীলন হইয়া থাকে,

তাহা স্বভাবতঃই উচ্চতর সাহিত্য—লিখিত ধারা অনুসরণ করিয়াই তাহা বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় ১৯১৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্বোধন হয়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবারও ষাট বছরের অধিক কাল পর জাতির সাহিত্য বিষয় লইয়া অনুশীলন করিবার সর্বপ্রথম প্রয়াস দেখা দেয়। এই কথা সকলেই জানেন যে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও প্রাণপাত পরিশ্রমের জন্যই অন্ততঃ এই সময়ের মধ্যেও এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের দায়িত্ব পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, নতুবা এই কাজ যে কত বিলম্বিত হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। বাংলাদেশ প্রধানতঃ নিরক্ষরেরই দেশ একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার এই বিশ্ববিদ্যালয় চারিদিকে নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দেশের বেশির ভাগ লোকই যে এখনও নিরক্ষরই রহিয়া গিয়াছে, এ কথা সকলেই জানেন। অতএব ১৯১৯ সনে বাংলার নিজস্ব সাহিত্যের লিখিত ধারার অনুশীলন আরম্ভ হইলেও, দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর নরনারীর সাহিত্যের কোনও সন্ধানই যে তাহার মধ্যে থাকিবার কথা ছিল না, তাহাও সত্য। অথচ বাংলার যে সাহিত্যের ধারা চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব ও শাক্তের সাহিত্যের ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্যের সিংহদ্বার পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া আসিল, তাহার মধ্যে বাংলার বৃহত্তর অর্থাৎ নিরক্ষর জন-সমাজের সাহিত্যকৃতির কতটুকু পরিচয় ছিল? বাংলার মধ্যযুগের একান্ত ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্যে জাতির স্বাধীন রস-চেতনার কতটুকু অভিব্যক্তি অনুভব করা যায়? আর সেই জ্ঞান যদি সম্পূর্ণ না হয়, তবে জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর পরিচয় কি ভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় কর্তব্য পালনের দায়িত্ববোধ যাঁহার মনে সর্বপ্রথম উদিত হইয়াছিল, সেই স্বর্গত স্যর আশুতোষ এই বিষয়টি সম্পর্কে গোড়া হইতেই অত্যন্ত সচেতন হইয়াছিলেন। সেইজন্যই দেখা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য বিষয়ক অনুসন্ধান করিবারও তাঁহার উৎসাহ দুর্বার হইয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক আর্থিক অবস্থার কথা উপেক্ষা করিয়াও তিনি এই বিষয়ে অর্থব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। তাহার ফলে সে দিন বাংলার বিস্মৃতপ্রায় যে অমূল্য লোক-

সাহিত্যের সম্পদ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা জাতি হিসাবে বাঙ্গালীকে নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্যর আশুতোষ সেদিন এ'কার্যে একজন দরদী কর্মীর সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন। স্যর আশুতোষের উৎসাহ ও ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অল্প দিনের মধ্যেই বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির এক অনাবিষ্কৃত রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিল—বাংলার নিরক্ষর সমাজ শিক্ষিত সমাজের নিকট এক নূতন মর্যাদার অধিকারী হইল।

যখন স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম উদ্বোধন হইল, তখন হইতেই স্বর্গত ডক্টর সেন মহাশয় বাংলার মৌখিক সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্যকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পথে আনিবার যথার্থ সুযোগ লাভ করিলেন। ১৯১৯ সনেই তিনি পূর্ব মৈমনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ পালাগান সংগ্রাহক স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে'র প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসেন। আগেই বলিয়াছি, এই বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্বোধন হয়। স্বর্গত ডক্টর সেন মহাশয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষতার পদ লাভ করিয়া তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি আজন্ম অনুরাগকে বিশেষ একটা পরিকল্পনার ভিতর দিয়া রূপ দিবার সকল রকম সুযোগই নিজের হাতের মধ্যে পাইলেন। তিনি উক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে পালাগান সংগ্রহ করিবার কাজে নিয়োগ করিলেন। এই বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার স্যর আশুতোষের বদান্যতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন। পূর্ব মৈমনসিংহের পালাগান বা গীতিকা সংগ্রহের ভিতর দিয়াই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার প্রয়াস সর্বপ্রথম কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করিল। প্রবল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহ ছিন্ন করিয়াও যে কয়জন মনীষী সে দিন বাংলার শাশ্বত রস-সম্পদের সন্ধান পাইয়াছিলেন, স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। বাংলার পল্লীসাহিত্যের প্রতি ডক্টর সেনের যে সুগভীর মমতা ছিল, সেদিনকার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজের পক্ষে তাহা বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। সেদিন বাংলার এই অবহেলিত লোক-সাহিত্যের প্রতি যদি তাঁহার এই সুগভীর অনুরাগ প্রকাশ না পাইত, তবে

বাংলা দেশের এক বিপুল সম্পদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপিত হওয়া কোন মতেই সম্ভব ছিল না। বাঙ্গালীর এই জাতীয় সম্পদের প্রতি তাঁহার যে কী সুগভীর অনুরাগ ছিল, তাহা তাঁহার নিজের কথায়ই প্রকাশ করি। তিনি ইহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'বঙ্গ সাহিত্যে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুম্‌কি দেওয়া বেনারসী চেলি পরিয়া ঝল্‌মল্ করিতেছে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সকল সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুকুও ধার করা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব সুন্দর, তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম! নানাদিক দিয়া এই সকল পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিতপূর্ব মাধুর্য ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভাণ্ড নহে, ইহা আমাদের আম গাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে।' ('মৈমনসিংহ গীতিকা' ভূমিকা, পৃঃ ।০)।

১৯২৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হইল। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র আবিষ্কারের ভিতর দিয়া বাংলার মৌখিক সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট ধারারই যে পরিচয় লাভ করা গেল, তাহাই নহে—বাংলার বিস্তৃত সমাজ-জীবনেরও একটি পরিচয় ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। আমাদের দেশের পুরাতত্ত্ববিদ্‌ কিংবা ঐতিহাসিকগণ কেবল শিলালিপি ও তাম্রশাসনকেই তাঁহাদের ঐতিহাসিক আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু জনশ্রুতিমূলক (Traditional) সাহিত্যের মধ্যেও যে ঐতিহাসিক উপাদান থাকিতে পারে, এ' কথা তাঁহাদের কেহ মনে করিতে পারেন না—ইহার অর্থ এই যে, জনশ্রুতিমূলক সাহিত্যের ভিতর হইতে কি ভাবে যে ইতিহাস কিংবা সমাজতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারা যায়, সে শিক্ষা তাঁহারা কোথাও লাভ করেন নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, এই প্রকৃতির সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান কিছু নাই। 'মৈমনসিংহ শ্রেণীর কাহিনীগুলির মধ্যে নারীর যে বিশেষ একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কি কোনও সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য নাই? গারো, খাসি প্রমুখ প্রবল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিবেশিরূপে বাস করিয়া পূর্ব মৈমনসিংহের সমাজ তাঁহার নিজ ভিত্তিমূলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আদর্শকে যে একদিন স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, সে কথা কি ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় না?

বাংলার মৌলিক জন-সমাজ যে সকল উপাদান দিয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দানই বা কত, আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দানই বা কি, এ'সব বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যখন আলোচনার প্রয়োজন হইবে, তখন বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির এই উপাদান 'মৈমনসিংহ গীতিকা'কে কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। এইত গেল ইতিহাস কিংবা সমাজতত্ত্বের কথা; যে রসসৃষ্টি ও জীবন-দর্শনের পরিচয় এই গীতিকাগুলির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালী মনীষার একটা নূতন দিকের সন্ধান দিয়াছে। নিরক্ষরতাই যে জীবনবোধের কোন অন্তরায় নয়, অক্ষর জ্ঞানের অভিমান যে এই বিষয়ে অর্থহীন, এ' কথাও ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কাহিনীগুলি বাঙ্গালীর মন বাংলার উপেক্ষিত পল্লী-জীবনের প্রতি মমতায় ভরিয়া দিয়া গিয়াছে; বাংলার পথে ঘাটে নলখাগড়ার বনে, হাওরের বুকে প্রাণের এত প্রাচুর্য্য, সৌন্দর্যের এত লীলা, প্রেমের এত তরঙ্গ যে প্রবাহিত হয়, তাহা এমন করিয়া ইহার আগে আর কেহ বুঝিতে পারে নাই।

কেবল পূর্ব মৈমনসিংহের বিশেষ একটি অঞ্চলেই যে বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট এই সম্পদগুলি সীমাবদ্ধ আছে, এ কথা মনে না করিয়া স্বর্গত দীনেশচন্দ্র বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতেও অনুরূপ সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অর্থকৃচ্ছ্রতা যাহাই থাকুক না কেন, এই কার্যে অর্থব্যয় করিতে স্যর আশুতোষ কোনদিক হইতেই নিরস্ত হইলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সংগ্রাহকগণ উত্তর-বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই লোক-সাহিত্যের সন্ধান ও সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই বিপুল শ্রম ও নির্বিচার অর্থব্যয় ব্যর্থ হইল না। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই জাতির লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগৃহীত হইতে লাগিল। তবে এ' কথা সত্য যে, পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে যাহা সংগৃহীত হইল তাহার অনুরূপ বস্তু অন্যত্র হইতে আবিষ্কৃত হইল না। দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে কতক-গুলি গীতিকা সংগৃহীত হইল সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রাণ-ধর্ম স্বতন্ত্র। পূর্ব মৈমনসিংহের গীতিকাগুলির মধ্যে যে সুনিবিড় প্রাণরসের স্ফূর্তি

দেখা যায়, দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত গীতিকাগুলির মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। নারীশক্তির যে বিভিন্ন দিকের সঙ্গে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ভিতর দিয়া আমাদের পরিচয় হয়, ইহাদের মধ্যে তাহার পরিবর্তে পুরুষের দিকটা স্পষ্টতর হইয়াছে। ইহারও সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে—তাহাও বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলির ভিতর দেখা দিয়াগেল যে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া বাঙ্গালী প্রাচীন কাল হইতেই তাহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও অখণ্ড বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উন্মুক্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী সমাজ-জীবন যে পূর্ব মৈমনসিংহের নদ-নদী-হাওর বিধৌত অরণ্যপর্বতের প্রান্তশায়ী প্রকৃতি-লালিত সমাজ-জীবন অপেক্ষা স্বতন্ত্র, বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলির প্রাণধর্মে বিভিন্নতা আছে, সে কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের গীতিকা-সংগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টাকে যাঁহারা কার্যকরভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত আশুতোষ চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সংগৃহীত গীতিকাগুলি চারি খণ্ডে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় স্থান পাইয়াছে। স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সবগুলি খণ্ডেরই সম্পাদনা করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিপুল অর্থব্যয় করিয়া সেগুলি ভদ্রসমাজে পরিবেষণ করিবার মত যোগ্য করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব, জনসাধারণের অবহেলা কিছুই স্যর আশুতোষের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত "চৈতন্য-ভাগবতের" দুইটি পদে উল্লেখিত ছিল—

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত।
শুনিতে সকল লোক হয় আনন্দিত॥

এই পদ দুইটিতে কয়েকজন বাংলার স্বাধীন বৌদ্ধ পালরাজের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই পালরাজদের কীর্তিকাহিনী বাংলার সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। মৌখিক ধারা অনুসরণ করিয়াই ইহারা অগ্রসর হইয়াছিল। তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বিশেষ

সংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। উত্তর বঙ্গেই পালরাজদের রাজধানী ছিল, সেইজন্য উত্তর বঙ্গে ব্যাপক অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কোনও ফল হইল না। কোনও সূত্র হইতেই তাহাদের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। তাহার পরিবর্তে উত্তর বঙ্গ হইতে যুগীযাত্রার পালা বা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ময়নামতীর গান এবং জাগগান প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেল। রংপুরের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পাদনা করিয়া 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করিলেন। বাংলার লৌকিক গীতিকা-সাহিত্যের একটি নূতন দিকের সন্ধান ইহার ভিতর দিয়া পাওয়া গেল।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র অনুভব করিলেন, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র বিষয়গুলি কেবল বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করার ফলে বিশ্বের লোক-সাহিত্য রসিকদের নিকট তাহা পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে না। তখন তিনি ইহাদিগকে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। স্যর আশুতোষের দাক্ষিণ্য এইদিকেও অগ্রসর হইল। তাঁহারই উৎসাহে ও অর্থ ব্যবস্থায় দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় *Eastern Bengal Ballads* নামে তিনটি বৃহদায়তন খণ্ডে ইহারা প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালী তখন পর্যন্তও তাহার ঘরের জিনিষের মূল্য দিতে শিখে নাই। গীতিকাগুলির যে মূল্যই থাকুক না কেন, এদেশের শিক্ষিত সমাজ তখনও ইংরেজি সাহিত্যের স্বপ্নেই বিভোর ছিল। ইহাদের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর বিশ্বের সুধীমণ্ডলী যখন ইহাদিগকে অভিনন্দন জানাইলেন, তখন দেশের লোক ইহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইল। বিশ্বের লোক-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার অবহেলিত পল্লীর অবজ্ঞাত সাহিত্য একাসনে স্থান লাভ করিল। তখনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইলে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন *Folk-Literature of Bengal* নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করিলেন। এই সময়ে দীনেশচন্দ্র বাংলার বিশিষ্ট কয়েকজন লোক-সাহিত্য রসিককে আরও ব্যাপকভাবে বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহের কার্যে নিয়োগ করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে পল্লীকবি জসিমুদ্দীন অন্যতম।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহের যে প্রেরণা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়েছিলেন, তাহার ধারা অব্যাহত ভাবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল এবং তাহার সূত্র ধরিয়া স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত পশ্চিম বঙ্গের পটুয়াদের গীতি ও মুনসুর উদ্দীন পূর্ববঙ্গের বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতি নামক আধ্যাত্ম গীতি যথাক্রমে 'পটুয়া সঙ্গীত' ও 'হারামণি' নাম দিয়া বিশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করিলেন। স্যর আশুতোষ ও ডক্টর দীনেশচন্দ্রের এই পুণ্য কীর্তির কথা সংস্কৃতি অনুরাগী বাঙ্গালী জাতি চিরদিনই সুগভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিবে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষায় লোক-সাহিত্য একটি বিশেষ পাঠ্যবিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোক-সাহিত্য

১৩০১ সালে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইহার মুখপত্র 'সাহিত্য পারষৎ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তাহারই নাম 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। ইহার পূর্ব হইতেই যে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছড়া সংগ্রহ করিবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ, ইহাতে যে বিপুল সংখ্যক ছড়া তিনি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার অনন্যুকরণীয় ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা একদিনে সংগৃহীত হইতে পারে নাই; কিংবা তখন তাঁহার সম্মুখে বাংলা ছড়ার কোন সংগ্রহও বর্তমান ছিল না। সংগ্রহের কার্য তাঁহাকে নিজেকেই করিতে হইয়াছে, তারপর সংগৃহীত উপাদানের তিনি রস-বিচার করিয়াছেন। ইহার পূর্বে প্রায় দশ বারোখানি ছোট বড় বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু একখানিও ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। বিদেশী ধর্ম-প্রচারকদিগের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে প্রবাদগুলি সংগৃহীত হইয়া ইহাদের দ্বারা সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদেরও যে অন্য আবেদন আছে, তখন পর্যন্তও তাহার সন্ধান কেহই জানিতেন না। প্রবাদগুলি তত্ত্বপ্রধান রচনা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি—তত্ত্ব অপেক্ষা রসের আবেদনই তাঁহার নিকট অধিক। সেইজন্য প্রবাদ সংগ্রহের গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগ করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র রূপ যে ছড়া তাহার অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।' ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন সাময়িক—রসের আবেদন চিরন্তন। কাব্যরসের অস্তিত্বের মধ্য দিয়াই রচনা চিরন্তনত্ব লাভ করে। সুতরাং ছড়াগুলির মধ্য হইতে তিনি সেদিন বাঙ্গালী পাঠককে যে কাব্যরসের সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহার প্রতি অতি সহজেই বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া আরও অনেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রায় সমসাময়িক কালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুতঃ দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন যে, দেশের এই জাতীয় সম্পদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্য ইহার ভিতর দিয়াই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। দেশের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি যখন সম্পূর্ণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ দেশের এই অবহেলিত রসোপকরণগুলির প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ইহাদের প্রতি দেশবাসী সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু প্রবন্ধ রচনা করিয়া নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি প্রকাশই নহে, তিনি নিজেও যে প্রকৃত সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় তাঁহার নিজস্ব ছড়া-সংগ্রহ প্রকাশের ভিতর দিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না; এমন কি, এই বিষয়ে পূর্ববর্তী কোন ধারাও আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিবার যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে তখন পর্যন্তও কোন পরিচয় স্থাপিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই দুরূহ কার্যের প্রণালী নিজেই উদ্ভাবন করিয়া লইয়া তাহা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ সেদিন সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ ও তাঁহার নিজস্ব ছড়ার সংকলন প্রকাশিত হইবার সুফল অচিরে দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। ইহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ এক প্রকার নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংগ্রাহক কর্তৃক সংকলিত হইয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া ও গান 'সাহিত্য

পরিষৎ পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইভাবে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া 'ছেলেভুলানো ছড়া'র এক অতি মূল্যবান সংকলন্ ইহাতে প্রকাশিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া' প্রকাশিত করেন। কুঞ্জলাল রায় ও অম্বিকাচরণ গুপ্ত বর্ধমান ও হুগলী জেলার ছড়া সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করেন। সুদূর চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বহুসংখ্যক ছড়ার এক অতি মূল্যবান্ সংগ্রহ পরিষৎ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিতে থাকেন। এই পথ অনুসরণ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামপ্রাণ গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরিদাস পালিত, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি বহু সংগ্রাহক প্রত্যেকে নিজেদের অঞ্চল হইতে ছড়া ও গীতি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতে থাকেন। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পরবর্তী দশ বৎসর কালের পরিষৎ পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি কি সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তবে এ কথা সত্য, আলোচনা ও সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি ধারারই প্রবর্তন করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আলোচনার ধারাটি কেহই অনুসরণ করিবার প্রয়াস পর্যন্ত পান নাই, প্রত্যেকেই কেবলমাত্র সংগ্রহের পথটিই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার সরস আলোচনাই সংগ্রহের প্রেরণা দিয়াছিল, নতুবা কেবল তাঁহার সংগ্রহ দ্বারা এত ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারিত না। ছড়াগুলির কাব্যরসই রবীন্দ্রনাথকে ইহাদের প্রতি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও, ইহাদের সংগ্রহেরও যে প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহারা যে সমাজ-মানস হইতে ক্রমাগতই লুপ্ত হইয়া গিয়া জাতির আত্মপরিচয় লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সংগ্রহের কার্যটিও যে উপেক্ষণীয় নহে, বরং অনুসরণীয়, কবি হইয়াও সমাজতত্ত্ববিদের এই দায়িত্বটি তিনি বিস্মৃত হন নাই।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের কেবলমাত্র সংগ্রহ-কার্য চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথও উক্ত প্রবন্ধ রচনার পূর্বে ছড়ার সংগ্রহকার্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁহার উক্ত

প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন, 'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলী ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' অতএব দেখা যাইতেছে, সংগ্রাহক রূপেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইতিপূর্বে বাংলা ছড়ার কোন সংগ্রহ তাঁহার সম্মুখে বর্তমান ছিল না; সেইজন্য সংগ্রহের আদর্শ তাঁহার নিজেকেই স্থির করিয়া লইতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্যের যে ভাবে সংগ্রহকার্য নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা নিতান্তই যান্ত্রিক (mechanical)। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য-সংগ্রাহকগণ লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া শব্দগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করিবারই পক্ষপাতী। সেই দেশে ইহার বিষয়ে গবেষণা করিবার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহা নিতান্তই মস্তিষ্ক-জাত, হৃদয়ের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই। কিন্তু লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া হৃদয়ের অনুভূতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া কেবলমাত্র মস্তিষ্ককেই সক্রিয় রাখিলে যে সুফল পাওয়া যাইতে পারে না, তাহা যে কত সত্য, রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। 'যে বিপুল লোক-সাহিত্যের উপকরণ-সম্ভার আজ পাশ্চাত্ত্য দেশের সংগ্রাহকদিগের পরিশ্রমের ফলে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত ও শ্রেণীবিভাগ করিবার দুরূহ কার্যে পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণের সময় আজ অতিবাহিত হইতেছে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ইহাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ও রসোপলব্ধি, সেখানে তাহা উপেক্ষিত হইতেছে। (সাহিত্যের আবেদন হৃদয়ের নিকট,) কিন্তু উক্ত সংগ্রাহকগণ যে-ভাবে ইহাদের সংগ্রহ-কার্য নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহাতে হৃদয়ের নিকট ইহাদের কোন আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে না, কেবলমাত্র মস্তিষ্কের নিকটই ইহাদের আবেদন প্রকাশ পায়। সুনির্দিষ্ট একটি পণ্ডিতগোষ্ঠীর নিকটই ইহার এই মস্তিষ্কের আবেদনটি প্রকাশ পাইবার যোগ্য—বৃহত্তর বিদগ্ধসমাজের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর সংগ্রাহকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের একটি স্থূল পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কাব্যরসের দিক হইতেই ইহাদিগকে বিচার করিয়া তাঁহার সংগ্রহকার্য করিয়াছেন, এই কাব্যরসের আবেদন হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নহে। নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিচারের দিক হইতে

যাঁহারা লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেরই কাব্যরসবোধ বলিয়া কিছু থাকে না, থাকিলে তাঁহারা হৃদয়কে বাদ দিয়া মস্তিষ্ককেই অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এমন কি, যদি কাব্যরসবোধ বলিয়া কাহারও কিছু থাকেও, তথাপি তিনি তাহা সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে এ কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহারা সমাজের মধ্যে যাহা যেমনটি পাইবেন, অবিকল সেইটি তেমনই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন; ব্যক্তিগত রস-বিচারবোধ দ্বারা কোন কারণেই কিছুই পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। কারণ, মানব-সমাজে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিবার জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি উপকরণেরই বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং এই সকল সংগ্রাহকগণ অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ উপকরণ কিংবা গালিগালাজের ভাষাও নির্বিচারে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইয়া থাকেন। সম্প্রতি মার্কিন দেশীয় কথ্য ভাষায় slang বা অশ্লীল শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে একখানি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; পাশ্চাত্ত্য ভাষায় কেবলমাত্র অশ্লীল শব্দের অভিধান পর্যন্ত সংকলিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকদিগের নির্বিচার সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়াই সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা তাঁহার বিশিষ্ট কবি-মানসের সৌন্দর্য, সংযম ও রুচিবোধদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তাঁহার নিজস্ব আদর্শের যাহা সমর্থক, কেবলমাত্র তাহাই তাঁহার সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে—নির্বিচার সংগ্রহের পথ তিনি অনুসরণ করেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের সংগৃহীত একটি ছড়া এই ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
>
> সেই যে বোন—

ছড়াটি যে আকারে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার পর এমন একটি গ্রাম্যভাবাপন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজে এখানে উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি পাঠকদিগের নিকট এই কৈফিয়ত দিয়াছেন,—'এইখানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন,

তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভাল, তথাপি সাধারণতঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি। তথাপি সেই ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম—

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে ॥

ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য কোন্ শব্দটিকে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'স্বামীখাকী' বলিয়া পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, এই সংগ্রহ ও ইহার বিশ্লেষণ সৌন্দর্যবিলাসী ও আদর্শবাদী কবির সংগ্রহ ও বিচার—পাশ্চাত্ত্য জগতে নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্বালোচনার উপকরণ হিসাবে লোক-সাহিত্যের উপকরণ যে ভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে, ইহা তাহা নহে।

সুতরাং দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব রস, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ীই প্রধানতঃ ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; যে সকল ছড়া তাঁহার মতে অতিরিক্ত গ্রাম্যতা-ভাবাপন্ন, তাহা তাঁহার সংগ্রহ ও আলোচনায় স্থান লাভ করিতে পারে নাই। তবে তাঁহার সংগ্রহের একটি প্রধান গুণ এই যে, তিনি গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট কোন কোন ছড়া তাঁহার সংগ্রহ হইতে পরিত্যাগ করিলেও কোন ছড়াই নিজে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ করেন নাই। ইহা তাঁহার ছড়াগুলির মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কিত সুগভীর জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সুতরাং তাঁহার সংগ্রহ পরিমিত হইলেও ইহার উপর নির্ভর করিয়া সর্বপ্রকার আলোচনাই সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলার ছড়াগুলির সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইহাদের দ্বারা নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বমূলক কোন গবেষণা সম্ভব হইতে

পারে বলিয়া এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে কোনও ধারণাই সৃষ্টি হইতে পারে নাই। নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের আলোচনা আমাদের দেশে খুব ব্যাপক ভাবে তখনও যেমন আরম্ভ হয় নাই, এখনও তেমনই বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। বিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্য জগতের সর্বত্রই যখন লোক-সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন হইতে দেখা যাইতেছে, তখনও এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও লোক-সাহিত্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণারই সৃষ্টি হইতে পারে নাই। অতএব রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির মধ্য হইতে কোনও তত্ত্বকথার অনুসন্ধান না করিয়া যে কাব্যরসই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ইহাদের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি অতি সহজেই সেদিন আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছিল। সেদিন কবির দৃষ্টি লইয়া ইহাদের মধ্য হইতে কাব্যরস অনুসন্ধানের পরিবর্তে যদি কেহ তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা সামাজিক তথ্য অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে ইহাদের আবেদন ব্যর্থ হইত। ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে বৈদেশিক ধর্মপ্রচারকগণ একদিন এ দেশের সমাজ হইতে যে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আজ পুরাতত্ত্ব গবেষকের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়াছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ সাহিত্য-পাঠকের নিত্য সঙ্গী হইয়া আছে। ইহা যে বিদগ্ধসমাজে এই স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা ইহার কাব্যরসের আবেদনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর লোক-সাহিত্য আলোচনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাশালী কবির মত কোনও ব্যক্তিকে লোক-সাহিত্য সম্পর্কে এমন সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। পাশ্চাত্ত্য জগতেও যাঁহারা লোক-সাহিত্য লইয়া বর্তমানে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রধানত জ্ঞান-তপস্বী অধ্যাপক, কিংবা তথ্যানুসন্ধানকারী গবেষক। সুতরাং তাঁহাদের আলোচনা কোন সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করিয়া সর্বজনীন রসোপভোগের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহারা প্রধানত সংগৃহীত উপাদানগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন, দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত উপাদানগুলির সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা করেন, ইহাদের উৎপত্তি ও বিস্তার (diffusion) সম্পর্কে নানাপ্রকার সম্ভাব্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

থাকেন, বিরোধী মতাবলম্বী গবেষকগণ তাঁহাদের সেই যুক্তি খণ্ডন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজের কবি-হৃদয়টি খুলিয়া দিয়া ইহাদিগকে তাহার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছেন, রবীন্দ্র-কবি-মানসের শৈশব-স্মৃতির পটভূমিকা হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরিণত বয়সে ইহাদের রসাস্বাদন করিয়াছেন। মানুষ বয়সের দিক দিয়া যতই প্রবীণ হইতে থাকুক না কেন, শৈশব-সংস্কার হইতে সে কোনদিনই পরিত্রাণ পায় না। সেইজন্য যে রসানুভূতি লইয়া রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই অনুভূতি দ্বারাই পাঠকসমাজ সর্বান্তঃকরণে তাহা গ্রহণ করিয়াছে।

একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, যদিও রবীন্দ্রনাথ কাব্যরসের দিক দিয়াই ছেলেভুলানো ছড়ার বিচার করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কোন কোন উক্তির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণের এই বিষয়ক আধুনিকতম সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে বিচার করেন নাই; এমন কি, তিনি নিজেও যে বলিয়াছেন যে, রসের দিক হইতেই তিনি ইহাদের বিচার করিয়াছেন, এ কথাও পুরোপুরি সত্য নহে; রসের অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যেও তিনি প্রবেশ করিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও স্বাধীন গবেষণা দ্বারা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ তাহারই সন্ধান পাইয়াছেন। এই প্রকার কয়েকটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—'এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই।' আধুনিকতম সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণও এই কথাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, লোক-সাহিত্যের কোন কালেই কোন রচয়িতা থাকে না। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ ডার্খেম সামগ্রিকভাবে সমাজ-মানসই লোক-সাহিত্যের জনক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিবিশেষের ইহাতে কোন দান নাই; অনেকেই তাঁহার এই মত স্বীকার করিয়া লইয়া লোক-সাহিত্য

যে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টিরই সৃষ্টি, অর্থাৎ collective creation of the folk, তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, লোক-সাহিত্য 'কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল, এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না।' পাশ্চাত্ত্য সমাজতত্ত্ববিদ্গণও এই সম্পর্কে আধুনিকতম কালে একই কথা বলিয়াছেন যে,

"A folk-song evolves gradually as it passes through the minds of different men and different generations."

ইহার অর্থ এই যে, লোক-সঙ্গীত ব্যক্তি ও বংশ-পরম্পরায় ক্রমবিকাশ লাভ করে, ইহা কদাচ বিশেষ কোন সময়ে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সৃষ্ট হয় না। এই বিষয়টিই এখনও অনেকে বুঝিতে পারেন না, অথচ রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথাটি বুঝিয়াছিলেন, তখন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই প্রবন্ধের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, 'যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সে কালের পাখীদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নরেখাসমেত, পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গিয়াছে: কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসি-কান্না আপনি অঙ্কিত রহিয়াছে।' আধুনিকতম কালে একজন ইংরেজ পণ্ডিত লোক-সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যটি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন; তিনি ইহাকে বলিয়াছেন, 'folk-memory in folk-tales' অর্থাৎ লোক-সাহিত্যে যে আমরা অধুনা অপ্রচলিত বহু বিষয়, যেমন—নরবলি, নরমাংসাহার, রাক্ষস-খোক্কস ইত্যাদির কথা শুনিতে পাই, তাহার অর্থই এই যে, বহু প্রাচীনকালে সমাজ-জীবনে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়াও লোক-সাহিত্য হইতে ইহাদের সংস্কার সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইতে পারে নাই। আধুনিক জীবনের সংস্কারের সঙ্গে ইহারা কোন দিক দিয়াই সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না বলিয়া ইহাদের উদ্ভট বলিয়া আমাদের মনে হয়, কিন্তু ইহারা উদ্ভট নহে; প্রস্তরীভূত জীবের যে কঙ্কাল দেখিয়া আজ আমরা বিস্মিত হই, তাহা একদিন যখন জীবিত ছিল, তখন তাহার বিষয়ে

বিস্ময়ের কিছুই ছিল না; লোক-সাহিত্যের মধ্যে বিস্মৃত জগতের বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ এই ভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত উক্তির ভিতর দিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও ইহাকেই 'folk-memory in folk-tales' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজ-বিবর্তনের ধারা যাঁহারা গভীরভাবে অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন, কেবল রসবিচার দ্বারা ব্যবহারিক জীবনের এই সুগভীর সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, 'একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই।' ইহাও কেবলমাত্র রসজ্ঞের রসোপলব্ধি নহে, ইহার মধ্য দিয়াও সূক্ষ্ম সমাজ-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিকতম সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণও লোক-সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাই বলিয়া থাকেন। ক্রমপরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়াই লোক-সাহিত্যের প্রাণশক্তি রক্ষা পায়, সুতরাং ইহার কোন পরিবর্তিত রূপই পরিত্যক্ত কিংবা পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যেকটি পরিবর্তিত রূপই সমাজ-মানস কর্তৃক স্বীকৃত। লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা অনেক সময় অগ্রগতি এবং অনেক সময় অবনতির পথ অনুসরণ করিয়া থাকে, অগ্রগতির ধারা অনুসরণ করিবার ফলে ইহার বিকাশ এবং অবনতির ধারা অনুসরণ করিবার ফলে ইহার বিনাশ সাধিত হয়। লোক-সাহিত্যের প্রত্যেকটি পাঠের মধ্য দিয়াই ইহার অবনতিরই হউক, কিংবা উন্নতিরই হউক এক একটি বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। সুতরাং ইহার কোন রূপই পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে একই ছড়ার বিভিন্ন পাঠও গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের তুলনামূলক আলোচনাও করিয়াছেন। 'আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম' এবং শিবু ঠাকুর বিষয়ক ছড়াগুলিই ইহার প্রমাণ। এই সকল আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত কাব্যরসের দিকে আকৃষ্ট হইয়াই বাংলার লোক-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবল কাব্য-বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টি নহে, সমাজ-জীবন-বিষয়কও তাঁহার যে

সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাহা দ্বারাই তিনি অতি সহজে ইহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ইহার সম্পর্কিত তাঁহার যে উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবল কবিজনসুলভ নহে, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান দ্বারাও সমর্থিত হইবার যোগ্য। সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের যে একটি সম্পর্ক আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের চেতনায় যে ভাবে ধরা পড়িয়াছিল, আধুনিকতম পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য গবেষকদিগের চেতনার মধ্যেও সেইভাবেই ধরা দিয়াছে। সুতরাং অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে রচিত হইয়াও রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা এই বিষয়ক আধুনিকতম গবেষণার ভিত্তি হইতে পারে।

রবীন্দ্র কাব্যে লোক-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-প্রতিভার যে একটি বিশিষ্ট দান, তাহা সকলেই সাধারণভাবে স্বীকার করিলেও ইহার অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার বিশিষ্ট রূপটিও যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমরা অনেক সময়ই গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখি না। অথচ এ'কথা সত্য, রবীন্দ্র-কবি-মানসের বিশিষ্ট পরিচয়টি ইহার মধ্য দিয়া যতখানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার অন্যান্য রচনার ভিতর দিয়াও তাহার অতিরিক্ত কিছুই প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং রবীন্দ্র-কবি-মানসের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা যেমন আমরা বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখি, তাঁহার 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্গত প্রবন্ধ কয়টিও তেমনই বিশ্লেষণ ও বিচারের যোগ্য। কিন্তু এই দিক দিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকের দৃষ্টি আজ পর্যন্তও যথার্থ আকৃষ্ট হইতে পারে নাই।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। ১৩০১ সাল অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি রচিত হয়। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই যুগ প্রথমত 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' রচনার যুগ, কথা-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তখন তাঁহার 'গল্পগুচ্ছ' রচনার যুগ। একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, সেই যুগেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পগুলি রচিত হয়। পত্রসাহিত্য রচনার দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথের তখন 'ছিন্নপত্র' রচনার যুগ। কারণ, তাঁহার 'ছিন্নপত্র' ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও, ইহা সেই যুগেই রচিত হইয়াছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আরও একটি বিষয় তাঁহার সেই যুগের জীবনেতিহাসের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে—তাহা এই যে, সেই যুগেই তিনি জমিদারী দেখা শোনার কাজে শিলাইদহের পল্লীতে জীবনযাপন করিয়া বাঙ্গালার সাধারণ জীবনের নিবিড়তম সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন—ইহার পূর্বে কিংবা পরে তিনি এই সুযোগ তাঁহার জীবনে আর লাভ করেন নাই। সুতরাং

দেখা যায়, রবীন্দ্রসাধনার সমৃদ্ধতম যুগেই তাঁহার 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রবীন্দ্রসাধনায় তাঁহার 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'গল্পগুচ্ছ', 'ছিন্নপত্র' রচনার যুগই রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধতম রচনার যুগ। এই যুগে তিনি জগৎ ও জীবনের একান্ত নিকটবর্তী হইয়া বাস করিবার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার অনুভূতিশীল হৃদয়ের মধ্যে ইহাদের রস ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার নিকট মানুষ, প্রকৃতি ও জগৎই সত্য ছিল, কোন প্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার ধ্যানলোক তখনও আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই, সুতরাং তাঁহার সেই যুগেরই সাহিত্যসৃষ্টি সর্বাধিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই যুগেরই রচনা 'লোক-সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিও এই দৃষ্টি দ্বারাই বিচার করিতে হইবে।

'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথের উপর বাংলা লোক-সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পাইলেও, ইহার পূর্ববর্তী যুগ হইতেই যে তাঁহার মধ্যে ইহার প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' এর একটি কবিতা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। 'কড়ি ও কোমল' ১৮৮৬ সনে রচিত হয়, ইহার প্রায় দশ বৎসর পর তাঁহার 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি রচিত হইলেও তাহার সঙ্গে যে ছড়াগুলি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা ইহার বহু পূর্ব হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। মনে হয়, 'কড়ি ও কোমল' রচনার যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলেভুলানো ছড়া ও গ্রাম্য গীতিসমূহ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই যুগেরই তাঁহার একটি কবিতার ভিতর দিয়া বাংলার ছড়াগুলি সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবের প্রথম অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল।

'কড়ি ও কোমলে'র 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান' এই কবিতাটির ভিতর দিয়া বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের প্রথম পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ছড়াটি যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার সূচনাকাল হইতেই তাঁহার অনুভূতিশীল হৃদয় কি ভাবে অধিকার করিয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার পরবর্তী কালে রচিত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের মধ্য দিয়াও এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার

নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারি না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে অথচ এই সকল অসঙ্গত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, 'এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহ-মন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি না' এই কথাটি বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ, আমরা জানি, রবীন্দ্রসাধনা তাঁহার জীবনের পর্বে পর্বে বিচ্ছিন্ন নহে, অংশে অংশে খণ্ডিত নহে,—সূচনা হইতেই ইহার ধারা বিকাশ লাভ করিয়া ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-কবি-মানস একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অনুসরণ করিয়া অব্যাহতভাবে সম্মুখের দিকে চলিয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে বাল্যকালে তাঁহার পক্ষে যাহা সত্য ছিল, পরিণত জীবনেও তাহা মিথ্যা হইয়া যায় নাই; বরং তখন তাহা পূর্ণতর রূপ লাভ করিয়াছে। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন, বাল্যকালে যেমন ইহা তাঁহার নিকট মোহমন্ত্রের মত ছিল, তখন অর্থাৎ পরিণত জীবন পর্যন্তও তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই যে তিনি তাঁহার সাধনার মধ্য দিয়া বাংলার ছেলেভুলানো ছড়াগুলির প্রভাব অনুভব করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্যসৃষ্টি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। 'বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান; বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান'—একথা কেবলমাত্র তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' যুগের পক্ষেই সত্য ছিল না, সমগ্র জীবনের পক্ষেই সত্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি; রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে বাংলার অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষাঋতুর প্রভাবই যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহা অতি সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁহার সমগ্র বর্ষার কবিতার পটভূমিকায় যে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান' বাংলার ছড়ার এই চিত্রটি সজীব হইয়া ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের

সমগ্র বর্ষাপ্রকৃতির রসানুভূতি তাঁহার 'বাল্যকালের মোহমন্ত্র' স্বরূপ বাংলার এই ছেলে-ভুলানো ছড়াটি অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

'কড়ি ও কোমল'-এর যুগ অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন 'মানসী'র যুগে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন বাংলার প্রকৃতি ও সহজ জীবনের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তিনি তখন তাঁহার একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাবসাধনার মাঝখানেও বাংলার প্রকৃতি ও জীবনকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের সংগ্রহকার্য তখন তাঁহার চলিতেছিল; সুতরাং তাহারই পটভূমিকায় তাঁহার কবি-মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাঁহার সেই অনুভূতি সেদিন যে কত গভীর ছিল, তাহা তাঁহার 'মানসী'র একটিমাত্র কবিতা অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার 'বধূ' কবিতার মধ্য দিয়া বাংলার রূপকথা সম্পর্কে এই উল্লেখ করিয়াছেন,

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো;
উঠিলে নব শশী ছাতের পরে বসি,
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!

বাঙ্গালী জননীর কণ্ঠে উচ্চারিত রূপকথা যেন বাংলার প্রকৃতি, তাহার আকাশ বাতাস ফুল লতাপাতারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—সব কিছু মিলিয়াই বাঙ্গালীর জীবনকে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে। দূরে বাঁধের অস্পষ্ট জলরেখা, রাত্রির আকাশের বাঁকা রেখা চাঁদ, ঘনসারিবদ্ধ শ্যামল তালবন—ইহাদের সব কিছুকেই আশ্রয় করিয়া বাংলার সহজ জীবনটি যেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে, বাংলার রূপকথাও যেন তাহারই মধ্যে নিজের আসনটি সহজভাবেই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জীবন হইতে তাহার রূপকথাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিবার একটি উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বাংলার সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের চেতনার মধ্যে এই সত্যটি ধরা দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া এইখানেই বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যত সার্থক যোগ রক্ষা করিয়াছেন, অন্য কোথাও তাহা তত সার্থক ভাবে পারেন নাই।

'সোনার তরী' রচনার যুগেই রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ'কথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে 'সোনার তরী'র মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপর লোক-সাহিত্যের সর্বাধিক প্রভাব সক্রিয় হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে প্রথম 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' কবিতাটির উল্লেখ করিতে হয়। বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া আধুনিক-ধর্মী কবিতা রচনায় বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি সার্থক প্রয়াস। বাংলার রূপকথা যে প্রাচীন রক্ষণশীল কিংবা নিরক্ষর সমাজেরই উপভোগ্য নয়, ইহার ভিতর দিয়া যে সর্বকালীন জীবন-সত্য প্রকাশ করা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার ভিতর দিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন। ইংরেজ কবি কীট্স্ যেমন আধুনিক জগতের কবি হইয়াও কল্পনায় প্রাচীন গ্রীসের জীবনের ভিতর হইতে সৌন্দর্য ও নিত্যত্ব সন্ধান করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বাংলার নিরক্ষর সমাজের অলিখিত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাঁহার কবি-প্রতিভা অনুযায়ী সৌন্দর্য ও জীবন সন্ধান করিয়া আধুনিক পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

> সযত্নে সাজিল রাণী বাঁধিল কবরী,
> নব ঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
> পরিল অনেক সাধে। তারপরে ধীরে
> গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
> মায়াময় কনক-দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
> শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি
> সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, ইহা ইউরোপীয় রূপকথা Cinderella-র বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, সমগ্র ইউরোপ দেশব্যাপী প্রচলিত এই রূপকথাটি ভারতবর্ষ হইতেই একদিন সেখানে গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল; সেইজন্য ইহার মধ্যে ভারতীয় জীবনের সংস্কার এত প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করা যায়। বাংলা দেশের রূপকথার মধ্যেও এই কাহিনী আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। একটি গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করিয়া আসিবার ফলে বাংলা রূপকথায় এই

কাহিনী যখন প্রাণশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন তাহার মধ্যে আধুনিকতম জীবন ও শিল্পচেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ইহাকে পুনরায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অভিমানে যখন বাংলার রূপ-কথাগুলি এ দেশের শিক্ষিত সমাজ বিস্মৃত হইয়া যাইতেছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মনোভাব ও রসবোধের অনুগামী করিয়া বাংলার এই রূপকথাটিকে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন; একদিক দিয়া ঐতিহ্য ও অপর দিক দিয়া আধুনিকতা এই উভয়ের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' কবিতাটি বিশেষ শক্তিশালী রচনা বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।

'সোনার তরী'র কবিতাগুলি রচনাকালে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা রূপকথা-গুলির রসতীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি সেই যুগে বাংলার নিভৃত পল্লীজীবনের মধ্যে নিজের সাধনার আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেও 'ছিন্নপত্রে' লিখিয়াছেন,

'এখানে এসে আমি এত "এলিমেণ্ট্স অব পলিটিক্স্" এবং "প্রব্লেম্স্ অব দি ফ্যুচার" পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেক্‌তে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে। যেটা খুলে দেখি, সেই ইংরেজি নাম, ইংরেজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িং রুম, এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাইনে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানব-চরিত্রকে মুচ্‌ড়ে নিংড়ে কুঁচ্‌কে মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্তস্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো রূপকথা জানতুম এবং সরস ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি দিয়ে সরস

ক'রে লিখতে পারতুম, তা' হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হতো। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চ হাসি মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটো খাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আম বাগানের ঘনচ্ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষে ক্ষেতের গন্ধের মতো—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণতায় পরিপূর্ণ।'

উপরের উদ্ধৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি যে মেয়েলী রূপকথা নিজে খুব বেশি জানিতেন, তাহা নহে—অথচ যে কয়টিই জানিতেন, তাহাদের ভিতর দিয়াই ইহাদের সম্পর্কে আরও জানিবার আগ্রহ বোধ করিতেন। কিন্তু সেদিন তাঁহার পক্ষে এই বিষয়ে আরও বেশি করিয়া জানিবার কোন সহজ উপায় ছিল না। বাংলার রূপকথার সঙ্গে যে সামান্য জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' কবিতাটির মত আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' অন্যতম। এই কবিতাটির মধ্য দিয়াও রবীন্দ্রনাথ একটি প্রাচীন ও গতানুগতির বিষয়বস্তুর মধ্যে আধুনিক রোমাণ্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু-জনে দেখা হোত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা।

ইহার মধ্য দিয়াও রূপকথার চিরন্তন প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করা হইয়াছে। রূপকথার চরিত্র মাত্রই রূপক, এখানেও রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে রূপক চরিত্র—ইহারা শাশ্বত জীবনের চিরন্তন প্রেম-কাহিনীর নায়ক-নায়িকা মাত্র

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা হাসি।

করিছে আনাগোনা সুখ দুখ
কথনো দুরু দুরু করে বুক
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।

এইভাবে 'সোনার তরী'র 'নিদ্রিতা' কবিতার ভিতর দিয়াও বাংলার রূপকথার চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে,

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবার।

রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই রূপকথাটি আশ্রয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই যে, আমার যৌবন-কল্পনার অভীষ্টজন অবাস্তব আদর্শ বা স্বপ্নপুরীর অধিবাসী, বাস্তব জগৎ কিংবা সূর্যালোকিত পৃথিবীর অধিবাসী নহে—

দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি,
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপনভরা লাবণ্যে নিরালা।

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী'র অন্যান্য বহু কবিতার ভিতর দিয়াই বাংলার প্রাচীন রূপকথার নিদ্রিত পুরীটিকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাতেও তিনি লিখিয়াছেন,

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখী
কুসুমে মধুকর।

অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া
হস্তীশালে হাতী।
মল্লশালে মল্ল জাগি
ফুলায় পুন ছাতি।

এই ধারা যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনদিন শুষ্ক হইয়া যায় নাই, তাঁহার শেষ জীবনে রচিত 'ছড়া' ও অনুরূপ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় দীক্ষা লাভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, মধুসূদন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র কেহই ইহার ব্যতিক্রম নহেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনায় একদিক দিয়া যেমন অখণ্ড ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ ছিল, আর এক দিক দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গেও যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই দিক দিয়াও যে এক বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা অনেক সময় আমরা গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখি না।

আমাদের দেশে লোক-সাহিত্যের অনুশীলন, প্রধানত ইহার সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রেভারেণ্ড উইলিয়ম মর্টন বাংলার প্রাচীনতম প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত করেন, তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লঙের আবির্ভাব হয়। রেভা মর্টনের সংগ্রহ প্রাচীনতম হইলেও রেভা লঙের সংগ্রহ বৃহত্তম। পর পর তিন খণ্ড সংগ্রহের মধ্য দিয়া রেভা লঙ প্রায় সাত হাজার প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহে ইহাই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সংকলন। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রেভা লঙের এই সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা লোক-সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রথম প্রকাশ পায়—তাহা গীতিকা। স্যর জর্জ গ্রীয়রসন এই বৎসর উত্তর বাংলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এক গীতিকাহিনী শুনিতে পাইয়া তাহা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশিত করেন। দেব-নাগরী অক্ষরে ইহার মূল কাহিনীটি মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদও তিনি প্রকাশিত করেন। ইহার মধ্য দিয়া কেবল মাত্র যে ভাষাতত্ত্বগত কৌতূহলই নিবৃত্ত হইবার যোগ্য ছিল, তাহা নহে—ইহার সাহিত্যগত যে আবেদন ছিল, প্রধানত তাহাতেই জনসাধারণের দৃষ্টি বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত বাঙ্গালী মনীষাও এই দিকে আকর্ষণ অনুভব করিল, তাহার ফলে প্রথমেই রেভা লালবিহারী দে'র সুপ্রসিদ্ধ রূপকথা সংগ্রহ *Folk-tales of Bengal* প্রকাশিত হইল। তাঁহার সংগ্রহ সেদিন ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার জন্য একদিকে সেদিনকার বাংলা ভাষা-বিমুখ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ যেমন ইহা পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, আবার আর এক দিকে পাশ্চাত্ত্যের লোক-সাহিত্য রসিক-সমাজ বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব রসবস্তুর সন্ধান লাভ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই

প্রধানত বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং এ পর্যন্ত বাংলা লোক-সাহিত্যের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কোন দিক দিয়াই যে সুসম্পূর্ণ ছিল, তাঁহা বলিবার উপায় নাই। বিদেশী ভাষায় অনুবাদের ফলে ইহাদের অনেকখানি রসই প্রকাশ পাইতে পারিত না। ১৩০১ সাল অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৫ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরই সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা কেবল ছড়ার সংগ্রহ নহে—তাহার রসবিশ্লেষণ। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালেও বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সংগ্রহ কার্য ব্যাপক ভাবে অনুসরণ করা হইলেও সংগৃহীত উপাদানগুলির তত্ত্ব, তথ্য ও রসগত যে মূল্য আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় নাই। পাশ্চাত্ত্য জগতে আজ প্রধানত ইহাদের শ্রেণী বিভাগ এবং তুলনা মূলক আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে; সেই অনুযায়ী এ'দেশে তাহার অনুশীলনের আজও সূত্রপাত হয় নাই। সংগৃহীত উপাদানগুলির ভিতর দিয়া জীবন তথা সাহিত্যের কি শাশ্বত বাণী প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাদের মধ্য হইতে কি সুর অখণ্ড ভাবে ধ্বনিত হইতেছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে কেবল উদ্দেশ্যহীন সংগ্রহ দ্বারা ইহাদের যথার্থ মূল্য কোনদিনই উপলব্ধি করা যাইবে না।

লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

এখন সর্বশেষে আলোচ্য লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি? নাগরিক বা যান্ত্রিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কি একেবারেই লোপ পাইবে এবং উচ্চতর সাহিত্যই ইহার স্থান সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইবে? প্রত্যেক বিষয়ের মতই সাহিত্য সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। সাহিত্য সমাজ-চৈতন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই সমাজ-চৈতন্য বর্তমান জগতে নিত্য পরিবর্তনশীল। তবে এ কথা সত্য যে, নাগরিক জীবনও যদি এইভাবে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতে থাকে, তবে একদিন ইহার মধ্য হইতেও একটি সামাজিক সংহতি গড়িয়া উঠিবে; কারণ, সমাজের ধর্মই সংহতি সৃষ্টি। মানুষও মূলত সামাজিক জীব। অতএব পাশ্চাত্ত্য নাগরিক জীবনাদর্শের প্রাথমিক সংঘাতের ফলে আমাদের মধ্যে যে বিপর্যয়েরই সৃষ্টি হউক না কেন, পরিণতিতে ইহাও স্থৈর্য্য লাভ করিয়া একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিবে—তাহাতে নাগরিক জীবন লইয়াই একটি সামাজিক ঐক্য গড়িয়া উঠিবে এবং কালক্রমে সেই সমাজের অনুযায়ীই বাংলার নূতন লোক-সাহিত্য সৃষ্টি হইবে। বাংলার প্রচলিত লোক-সাহিত্যে যে সকল বস্তুর মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, তাহা নূতন সমাজেও পরিত্যক্ত হইবে না, নূতন উপকরণের সঙ্গে তাহাদেরও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে; কিন্তু যাহাদের মধ্যে ভাব কিংবা রসের দিক দিয়া চিরন্তনত্ব নাই, তাহারা পরিত্যক্ত হইবে। এই সম্পর্কে মার্কিন দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন দেশ বিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার অগ্রদূত; মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক উপকরণ সম্বল করিয়া ইংরাজ জাতি এ'দেশের বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহার সঙ্গে কালক্রমে আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির সংস্কৃতিও আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, তারপর ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতির উপকরণের সঙ্গে মার্কিন দেশীয় উপজাতীয় সংস্কৃতির উপকরণও মিশ্রিত হইয়াছে। বিংশতি শতাব্দীতে আজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংলণ্ডের লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে আফ্রিকা ও মার্কিন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের সংস্কৃতির মিলনের ফল স্বরূপ মার্কিন দেশে এক নূতন লোক-শ্রুতি

(folklore) গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্তমান ইংলণ্ডের লোক-শ্রুতি হইতে স্বতন্ত্র। মার্কিন দেশের এই লোক-শ্রুতি নূতন মার্কিন জাতির নাগরিক ও শিল্পজীবন কেন্দ্র করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং ইহাতে ইতিমধ্যেই মার্কিন জাতির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যেই ইংরেজ জাতির ঐতিহ্য যেমন অন্ধ ভাবে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না, তেমনই আফ্রিকা কিংবা মার্কিণ দেশের উপজাতির প্রভাবকেই সর্বতোভাবে স্বীকার করিবারও প্রয়াস দেখা যায় না। বাংলা দেশের আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস যদিও মার্কিন দেশের ইতিহাসের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে, তথাপি ইহার লোক-সংস্কৃতিগত পরিবর্তন এই ধারাতেই যে সূচিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব বাংলা দেশে লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। ইহার ভবিষ্যৎ আছে, তবে ইহার রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে, এই মাত্র।

বাংলা দেশে লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যায় যে, বিগত প্রায় সত্তর বৎসর যাবৎ এ'দেশে লোক-সাহিত্যের যে উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে, তাহা বিচার করিলে দেখা যায়, বঙ্গবিভাগের পূর্ব হইতেই এ'দেশে ইহার ক্রমাবনতি আরম্ভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেভুলানো ছড়ার সংগ্রহের সঙ্গে আধুনিকতম ছড়া সংগ্রহের তুলনা করিলেই এ'কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এমন কি, যে ময়মনসিংহ জিলা হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্তও বাংলার সমৃদ্ধতম লোক-সাহিত্য সংগৃহীত হইয়াছে, তথাকার আধুনিকতম সংগ্রহ কোন দিক দিয়াই ইহার পূর্ব মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম হইতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনই ইহার কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বঙ্গবিভাগের পথ ধরিয়া এই পরিবর্তনের ধারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, ইহার রূপ প্রায় আনুপূর্বিক পরিবর্তিত হইয়াছে বলিলেও চলে , কিন্তু এই সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারায় লোক-সাহিত্য বিকাশ লাভ করিবার পথে ইহা ক্রমোন্নতি লাভ না করিয়া বরং ক্রমাবনতি লাভ করিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ক্রমাবনতিই বিনাশের সূচক; সুতরাং এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে দেখা যাইবে যে, বাংলার যে অঞ্চল লোক-সাহিত্যের দিক দিয়া সমৃদ্ধতম ছিল, তাহার লোক-সাহিত্যবিষয়ে গৌরব করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ; তারপর দীর্ঘকাল সাধনার ফলে সেখানে আর এক নূতন

সমাজ ব্যবস্থা যখন গড়িয়া উঠিয়া এক অবিচল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবে, তখনই তাহার মধ্যে নূতন এক শক্তিশালী সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এই সাধনার পথে সমাজ-জীবনের যদি কোন বিঘ্ন দেখা দেয়, তবে তাহার সিদ্ধিলাভ করিতেও স্বভাবতঃই বিলম্ব হইবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার ছড়াগুলি সংগ্রহ করেন, তখন বাংলার সমাজ-জীবনের একটি সংহত পরিচয় ছিল, জমিদারী প্রথা অবলম্বন করিয়া বাংলার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন একটি স্থিতি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির ভিতর দিয়াও তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। একদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত বাংলার ছেলেভুলানো ছড়াগুলি তাঁহার সে যুগে রচিত ছোটগল্পগুলিরই পরিপূরক বা Complement বলা যায়। তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলির ভিতর দিয়া সেদিনকার বাঙ্গালীর গৃহের যে মাধুর্যের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ছেলে-ভুলানো ছড়া সংগ্রহের ভিতর দিয়া তাহারই আর একটি দিকের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতেই এই সংহত সমাজ রূপটি বিপর্যস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তারপর ক্রমে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দেশবিভাগ, ব্যাপক বাস্তত্যাগ, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ, শিল্পনগরীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাংলার সমাজ-জীবন নূতন নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া ইহার মৌলিক পরিচয় শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে সমাজ-জীবন হইতে তাঁহার ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তিমূল রবীন্দ্রনাথ বর্তমান থাকিবার কাল হইতেই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়াগুলির মধ্যে যে রস নিবিড় হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের অন্যান্য সংগ্রহের মধ্যেই তাহার অভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই ক্রমাবনতির পথ ধরিয়াই ইহা অগ্রসর হইতে হইতে ইহার মৌলিক শক্তি আজ বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সেইজন্য যদিও লোক-সাহিত্যের একটি মাত্রই কাল অর্থাৎ আধুনিক কাল, ইহার অতীতও যেমন অস্পষ্ট তেমনই ভবিষ্যৎও প্রচ্ছন্ন, তথাপি বাংলার লোক-সাহিত্যের যথার্থ শক্তি অনুভব করিবার পক্ষে কেবল আধুনিক সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিলেই চলিতে পারে না, পূর্ববর্তী সংগ্রহগুলির

আলোকে আধুনিক রূপকে বিচার করিলেই ইহার যথার্থ পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইবে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ যে ভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে এবং এই দ্বিধা বিভক্ত অঞ্চলের মধ্যে যে ভাবে সকল প্রকার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এ দেশের লোক-সাহিত্যে ভাব ও রূপগত যে অখণ্ড ঐক্য এতদিন রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে, আজ তাহা আর রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই—অচিরকাল মধ্যেই এই উভয় বঙ্গের লোক-সাহিত্যের মধ্যে বিষয়, ভাব ও রূপগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। পশ্চিম বাংলা যে ভাবে ইহার মৌলিক কৃষিজীবনের ধারা পরিত্যাগ করিয়া শিল্পকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে ইহার লোক-সাহিত্যেরও মৌলিক পরিচয়টি বিপর্যস্ত হইবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান এখনও কৃষিভিত্তিক জীবনাশ্রয়ী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাহার কোন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নাই, সুতরাং সেখানেই বাংলার লোক-সাহিত্যের মৌলিক রূপ আরও কিছুকাল রক্ষা পাইবার অধিকতর সুযোগ দেখা দিয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

ছড়া

প্রত্যেক দেশের লোক-সাহিত্যেরই ছড়া একটি বিশিষ্ট অংশ। ইহার অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিচয় এত সুস্পষ্ট যে, ইহা অতি সহজেই লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়। ইহার অন্তরগত পরিচয় সম্পর্কে একটি কথা সহজেই বলিতে পারা যায় যে, ইহা সমগ্রভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নহে, বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয়-সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারা যায় যে, ইহার শিল্পরূপও ব্যক্তি কিংবা সমাজের কোন সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি বলিয়া কদাচ ভুল হইতে পারে না। লোক-সাহিত্যের দলগত রচনা (communal authorship) সম্পর্কে যে দাবী উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহা ছড়ার মত আর কোন বিষয়ের উপর এত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভাবের দিক দিয়া যেমন ইহাতে পরিণতি নাই, কেবলমাত্র অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিত মাত্র আছে, রূপের ভিতর দিয়াও ইহার তেমনই অপরিণতি রহিয়াছে; অথচ ইহার এমনই ধর্ম যে, ভাবের দিক দিয়া ইহার অস্ফুটতা, কিংবা রূপের দিক দিয়া ইহার অপরিণতি ইহার রসগ্রাহীকে আঘাত করে না। কারণ, ইহা যাহাদের সাহিত্য তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা রসের মূল্য বেশি, মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় বড়; অতএব হৃদয় ভরিয়া হৃদয়ের সৃষ্টি তাহারা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

ছড়ার সঙ্গে সাধারণ লোক-সঙ্গীতের পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নটির উত্তর অত্যন্ত সহজ। যাহা মৌখিক আবৃত্তি (recite) করা হয়, তাহাই ছড়া, যাহা তাল ও সুর সহ গান করা যায়, তাহাই সঙ্গীত। তবে ছড়ার আবৃত্তিতেও যে সুর এবং তাল ব্যবহৃত হয়, তাহা কবিতার সুর ও তাল (rythm); কোন কোন ছড়া সুর করিয়া গানের মত গাওয়া হয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। ছড়ার আবৃত্তিতে কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন

হয় না, সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হইতে পারে; ছড়ার সুর বৈচিত্র্যহীন, সঙ্গীতের সুর বৈচিত্র্যময়। ছড়ার সঙ্গে লোক-সঙ্গীতের এই পার্থক্যগুলি অতি সহজেই চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলা-বিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র-নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভাবহীনতা, অর্থবন্ধন-শূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।'

রসের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ছেলে-ভুলানো ছড়ার ইহা অপেক্ষা সার্থক বিশ্লেষণ আর কিছুই হইতে পারে না। এই উদ্ধৃতির মধ্যে ছেলে-ভুলানো ছড়ার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে কয়টি প্রধান বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য—ইহা পরিবর্তনশীল, ইহাদের রচনা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নহে—অকারণ আনন্দরসের অভিব্যক্তিই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, ইহা সমাজদেহে সুগভীর ভাবে প্রবিষ্ট হইবার পরিবর্তে ইহার উপরি স্তরে যদৃচ্ছা ভাসিয়া বেড়ায়, অথচ অলক্ষিতে ইহাদের মধ্য দিয়া একটি সুমহান্ সামাজিক উদ্দেশ্যও সাধিত হয়; ইহা লঘুভার, অর্থহীন ও বিচিত্র বলিয়া শিশুর হৃদয় অধিকার করিয়া চিরন্তনত্ব লাভ করে।

ছড়ার সঙ্গে লোক-সাহিত্যের আরও দুই একটি বিষয় সংক্ষেপে তুলনা করিয়া দেখিলেই এই কথাগুলি স্পষ্টতর হইতে পারে। আকারের দিক দিয়া লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ছড়ার পার্থক্য নাই, কিন্তু ইহাদের অন্তঃপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে উভয়ের পার্থক্য অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়—

একটি বিশিষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়া লোক-সঙ্গীত রচিত হয়, কিন্তু ছড়ায় কোন বিশিষ্ট একটি ভাবের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ভাবই ইহাতে নাই, যদি থাকে তবে তাহাও অসংলগ্ন ভাবে প্রকাশ পায়। গীতিকায় একটি আনুপূর্বিক কাহিনী থাকে, ছড়ায় কোন কাহিনীও থাকে না; ইহার মধ্যে যাহা থাকে, তাহা চিত্র বলিতে পারা যায়; কিন্তু সেই চিত্রও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, একই চিত্রপটের উপর যেন খেয়ালী শিশু ইহাতে বিভিন্ন চিত্রের রেখা কাটিয়া রাখে; কিন্তু রেখাগুলি স্পষ্ট ও বর্ণোজ্জ্বল—এই গুণেই ইহা অতি সহজেই শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিশুর সঙ্গে ছড়ার সম্পর্কের কথা বিচার করিলে ছড়াই লোক-সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ ও শিশু-সাহিত্যই সাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয় বলিয়া অনুমান করা ভুল হয় না; কারণ, শিশুই পরিণতবুদ্ধি মানবের অগ্রজ। ছড়ার রচনার ভিতর দিয়া বহিরঙ্গগত পারিপাট্যের যে অভাব লক্ষিত হয়, তাহাও ইহার সাহিত্য রচনার প্রাচীনতম ধারা অনুসরণ করিবারই ফল—যুগে যুগে দেশে দেশে শিশু অভিন্ন, সেইজন্য অতীত ও বর্তমানের ছড়া, দেশ ও দেশান্তরের ছড়া এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ—জগতের লোক-সাহিত্যে এমন সুনিবিড় ঐক্য আর কোন বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাংলার লোক-সাহিত্যেও ছড়ারই যে সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক কালে সংগৃহীত ছড়াগুলির ক্রমপরিবর্তিত রূপের মধ্যে ইহাদের উদ্ভবের কাল যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম প্রান্তে যে ডাক ও খনার নামে প্রচলিত ছড়াগুলি অবস্থিত, সে বিষয়ে কেহই সংশয় প্রকাশ করেন না। অতএব বাংলার লোক-সাহিত্যের আলোচনায় ছড়াই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনার ভিতর দিয়া বিস্তৃত ছড়া-সাহিত্যের একটি মাত্র বিষয় যে অপূর্ব রসোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার সমগ্র পরিচয় কত বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। শিশু-সম্পর্কিত ছড়া মাত্রই ছেলে-ভুলানো ছড়া নহে। যতদিন পর্যন্ত শিশুর মুখে ভাষা অস্ফুট থাকে, ততদিন জননীই ছড়া বলিয়া শিশুকে ভুলাইয়া থাকেন—তাহা শিশু-বিষয়ক ছড়ার একটি অংশ মাত্র; এই ছড়ার আবৃত্তি-কারিণী শিশু নহে, বরং শিশুর জননী। কিন্তু শৈশব অতিক্রম করিয়া শিশু

যখন বাল্যে প্রবেশ করে, তখন সে কেবল মায়ের মুখ হইতেই ছড়া শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করে না, নিজেও ছড়া আবৃত্তি করিতে শিখে। তখন তাহার খেলার জীবন; অতএব বাল্যক্রীড়া অবলম্বন করিয়াই তখন তাহার ছড়া রচিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমোক্ত ছড়া যদি ছেলে-ভুলানো ছড়া বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে শেষোক্ত শ্রেণীর ছড়া ছেলেখেলার ছড়া বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছেলে-ভুলানো ছড়া ও ছেলেখেলার ছড়া এক নহে; ছেলেকে অন্যে ভুলায়, কিন্তু ছেলে নিজে খেলে; এক ক্ষেত্রে অন্যের মুখ হইতে ছড়া শুনিয়া শিশুকে তৃপ্তি পাইতে হয়, কিন্তু অপর ক্ষেত্রে নিজেই ছড়া আবৃত্তি করিয়া সে আনন্দ লাভ করে। ইহাদের বিষয়ও স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

ছেলে-ভুলানো ছড়া কতকগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে ঘুমপাড়ানি ছড়া একটি প্রধান ভাগ। শিশুর ঘুম জননীর একটি প্রধান সমস্যা। জননীকে সংসারের দশ কাজ নিজের হাতে করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শিশু সর্বদা যদি দুরন্তপনা করে, তবে জননীর কাজে বাধা হয়। সেইজন্য হাতে কাজের চাপ যখন বাড়িয়া যায়, তখন জননী শিশুকে ঘুম পাড়াইতে লইয়া বসেন। দুই হাঁটুর উপর শিশুকে শোয়াইয়া হাঁটু দুইখানি মৃদু মৃদু দুলাইতে দুলাইতে তিনি দুরন্ত শিশুর কানে একটি অপূর্ব সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেন; শিশুর দেহ মৃদু দুলিতে থাকে, জননীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সে সেই বিচিত্র সুরের জালে জড়াইয়া পড়ে—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেও।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভ'রে খেও॥
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতাপাতা।
দু' দুয়োরে ঘুম যায় দুটি মোগল পাতা॥
হেঁশেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী॥

এই প্রকার শিশুকে দুধ খাওয়ানোও মায়ের একটি সমস্যা। শিশু কিছুতেই খাইতে চাহিবে না, ঝিনুক দিয়া মুখে তুলিয়া দিলে দুই গাল গড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবে, তখন শিশুকে জননীর ছড়া বলিয়া ভুলাইতে হইবে,

ধন গেছে গো বেড়াতে।
পায়ের নূপুর হারাতে॥
যাক্‌গে নূপুর হারিয়ে।
আবার দেব গড়িয়ে॥
আয়রে গোপাল ঘরে আয়।
আওটানো দুধ জুড়িয়ে যায়॥

ইহাই যথার্থ ছেলে-ভুলানো ছড়া, ইহার আবৃত্তিকারিণী জননী অথবা শিশুধাত্রী। আরও একটি দৃষ্টান্ত দিই। মাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কেবল ব্যবহারিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া দিয়াই শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্ক শেষ হইয়া যায় না। সন্ধ্যার পর গৃহ-কর্ম হইতে মা যখন একটু অবসর পান, তখন শিশুকে লইয়া তাঁহার খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলায় দুই পক্ষ সমান নহে—অতএব সাধারণ খেলা হইতে ইহার একটু ব্যতিক্রম আছে। এই খেলার দুই পক্ষের মধ্যে একজন পরিণত বয়স্কা নারী, আর একজন অস্ফুটবাক্‌ শিশু। এই খেলায় জননী যে ছড়া আবৃত্তি করেন, শিশু তাহার শ্রোতা মাত্র; সে নিজে যেমন আবৃত্তি করিতে পারে না, তেমনই তাহার অর্থও পরিগ্রহ করিতে পারে না। জননীর নিবিড় সান্নিধ্য শিশু সর্বদাই কামনা করে, এই মুহূর্তে সেই সান্নিধ্য নিবিড়তম হইয়া উঠে, সেইজন্যই শিশুর মন তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই খেলায় জননী ছড়া আবৃত্তিচ্ছলে শিশুকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন এবং শিশুর পক্ষ হইতে নিজেই তাহাদের জবাব দেন। জননীর কণ্ঠস্বরের ভিতরে শিশু নিজের কণ্ঠের স্বর শুনিতে পায়, সেইজন্য মাতৃ-কণ্ঠের সেই আবৃত্তি শুনিয়া শিশুর আনন্দের আর অবধি থাকে না।

মাতা ও শিশুর এই ক্রীড়ার ক্ষেত্রটি শয্যা। ইহার ভিতর দিয়াই জননী শিশুর নিদ্রার ভূমিকা রচনা করেন। খেলায় ক্লান্ত হইয়া শিশু সহজেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মাতা শয্যার উপর শুইয়া দুই হাঁটু উঁচু করিয়া শিশুকে দুই হাতে ধরিয়া হাঁটুর উপর বসান। তারপর হাঁটু দুইটি কখনও সম্মুখ হইতে পিছনে, কখনও দুই পাশে দুলাইতে দুলাইতে এই ছড়া আবৃত্তি করিতে থাকেন—ছড়ার মধ্য দিয়া নিজেই প্রশ্ন করেন, নিজেই তাহার

জবাব দেন। মায়ের হাঁটুর উপর দুলিতে দুলিতে ছড়া শুনিয়া শিশু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে।

ঝিঁ ঝিঁ সই।
তোর পুত কই ?
আম গাছে।
কি কাজ করে ?
পীঁড়ি চাঁচে।
কার পীঁড়ি ?
ছোট বউর পীঁড়ি।
ছোট বউ কই ?
ঘাটে গেছে।
ঘাট কই ?
ভাউকে খাইছে।
ভাউক কই ?
বনে গেছে।
বন কই ?
পুড়ে গেছে।
ছাই কই ?
ধোপায় নিছে।
ধোপা কই ?
হাটে গেছে।
হাট কই ?
ভেঙ্গে গেছে।

এইবার জননী হাঁটু দুইটি কাত করিতে করিতে একেবারে শয্যার সঙ্গে মিশাইয়া দিতে দিতে বলিবেন—

বুড়ী লো বুড়ী।
কি লো।
হাঁড়ি পাতিলগুলি সরা লো।

কেন লো ?

তাল গাছটা পড়্লো।

এই বলিয়া শিশুকে কোমল শয্যার উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিবেন—

ঝুপ্ পুর।

অর্থাৎ তালগাছটা মাটিতে পড়িল। কোমল শয্যার উপর লুটোপুটি খাইয়া শিশুর হাসি আর কিছুতেই রোধ মানিতে চাহিবে না। জননী পুনরায় শিশুকে দুই হাতে টানিয়া তুলিয়া লইয়া গোড়া হইতে এই খেলা আবার সুরু করিবেন। ক্রমে ক্লান্ত শিশুর চোখে নিদ্রা জড়াইয়া আসিবে। এই ছড়াটিও ছেলে ভুলানো ছড়ার অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু শিশু-সম্পর্কিত আর এক শ্রেণীর ছড়া আছে, তাহাদের আবৃত্তিকারক শিশু বা বালক স্বয়ং। খেলার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ছড়া সে আবৃত্তি করিয়া থাকে, যেমন, 'আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম্ সাজে' কিংবা 'ইকিড় মিকিড় চাম চিকির' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই উভয় শ্রেণীর ছড়াই তাঁহার 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

ছেলেখেলার ছড়ার মধ্যেও দুইটি প্রধান বিভাগ আছে—প্রথমতঃ ঘরোয়া (indoor) খেলার ছড়া ও দ্বিতীয়ত বাইরের (outdoor) খেলার ছড়া। ঘরের খেলার ছড়াগুলির মধ্য দিয়া যেমন একটি সহজ গীতিসুর ধ্বনিত হইয়া থাকে, বাইরের খেলার ছড়াগুলির ভিতর দিয়া তাহার পরিবর্তে সামান্য একটু বীররসের স্পর্শ অনুভব করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিব। সন্ধ্যার পর ছোট ছোট ভাই-ভগিনীরা যখন গৃহের ভিতরে একত্র মিলিত হয়, তখন একজন হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক করিয়া ডান হাতটি বিছানার উপর উপুড় করিয়া ধরে, অন্য একজন সেই আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে নিজের তর্জ্জনীটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব পায়—

এই ঘরে আগুন আছে ?—না!

এই ঘরে আগুন আছে ?—না!

তারপর কনিষ্ঠার ফাঁক দিয়া যখন নিজের আঙুলটি প্রবেশ করাইয়া এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে, তখন শুনিতে পায়—আছে। তখন সে বলে, 'আমার

মাছটি এখানে পোড়া দিয়ে গেলাম।' তারপর একটু পরই দুইজনে প্রশ্নোত্তর-রূপে এই ছড়া কাটিতে থাকে—

আমার মাছ কৈ গো?—বকে নিছে।
বক কই গো?—ডালে বইছে।
ডাল কই গো?—ভাইঙ্গ্যা পড়ছে।
খড়-কুটা কই গো?—ধোপায় নিছে।
ধোপা কই গো?—হাটে গেছে।
হাট কই গো?—ভাইঙ্গ্যা গেছে।

ইহা ঘরোয়া খেলার ছড়া, ইহার সঙ্গে ছেলে-ভুলানো ছড়ার পার্থক্য আছে, এই পার্থক্য রসেরই পার্থক্য—বিষয়ের পার্থক্য নহে।

বাইরের খেলার মধ্যে হা-ডু-ডু-ডু খেলা সুপরিচিত। দম বা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ইহাতে যে ছড়া আবৃত্তি করা হয়, তাহা উদ্ধৃত ছড়া হইতে স্বতন্ত্র—এই স্বাতন্ত্র্যও রসেরই স্বাতন্ত্র্য—

চু যাব চরণে যাব।
পাতি নেবুর মাতি খাব॥

ছেলেখেলার ছড়ার আর একটি প্রধান বিভাগ—ছেলেদের খেলার ছড়া ও মেয়েদের খেলার ছড়া। বয়স যতই বাড়িতে থাকে, ছেলে ও মেয়ে ততই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সজাগ হইতে থাকে—অতএব প্রথম অবস্থায় ইহারা একত্র মিশিয়া খেলাধূলা করার সঙ্গে একই ছড়া আবৃত্তি করিলেও, কালক্রমে ইহারা যখন নিজস্ব খেলা বাছিয়া লয়, তখন তাহারা তাহাদের সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র ছড়াও আবৃত্তি করিতে শিখে। এইভাবে ছেলে ও মেয়েদের খেলার ছড়াও পৃথক্ হইয়া যায়। একটির মধ্যে বহির্মুখীনতার কথা আর একটির মধ্যে অন্তর্মুখীনতার কথা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি যে মেয়েদের খেলার ছড়ার একটি অংশ তাহা ইহার ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

পঞ্চে পাখা মেঘে ঢাকা,
ছয়ে রেখা সাতে সাত সমুদ্র।
আটে অষ্ট বসু।
নয়ে নোতুন ঘোড়া।

দশে পড়ল জোড়া।
এগারোয় এক ফুলি,
বারোয় ক্ষীরের পুলি।
তেরোয় তেরছি কাঁটা।
চৌদ্দয় রূপোর বাটা।
পনেরোয় পানের পাতা,
ষোলোয় শোলোকলতা।
সতেরোয় সতরঞ্চি,
আঠারোয় বাঁশের কঞ্চি।
উনিশে নাথ,
বিশে ঝাঁক।

কিন্তু খেলার প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে কেবল মাত্র ছড়ার ভিতর হইতে ইহাদের এই স্বাতন্ত্র্য অনেক সময়ই উপলব্ধি করা যায় না।

শিশুর ছড়ার পরই মেয়েলী ছড়ার কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহার জগৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; ইহা 'ইচ্ছানন্দময়' শিশুকে অবলম্বন করিয়া রচিত নহে ; অতএব ছেলে-ভুলানো ছড়ার রস ইহাতে নাই, ইহার একটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে বলিয়া রসের অংশ ইহাতে অপ্রচুর ; কিন্তু তথাপি ইহাদের একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে—সেই মূল্যটি ব্যবহারিক (practical) ও বাস্তব (real)। ছেলে-ভুলানো ছড়াকে যদি লোক-সাহিত্যের রোমান্স বলিতে পারা যায়, তবে মেয়েলী ছড়াকে ইহার উপন্যাস বলিব ; কারণ, বাস্তবমুখীনতা ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, অবশ্য এই কথাগুলি এখানে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

মেয়েলী ছড়ার প্রধান একটি অংশ ব্রতের ছড়া। বাস্তব জীবনের কল্যাণ ইহাদের লক্ষ্য বলিয়া ইহাদের ভিতর দিয়া নারীজীবনের ব্যবহারিক সুখ-দুঃখের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে ; অতএব ইহারাও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—কেবল অন্তর্ভুক্তই নহে, একটি প্রধান অংশের অধিকারী। সেঁজুতি ব্রতে বাংলার কুমারী মেয়েরা আবৃত্তি করে,

দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥

বাপের বাড়ীর দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ী যায়।
আস্‌তে যেতে দোলাখানি
ঘৃত মধু খায়॥
কোঁড়ার মাথায় ঢালি মউ।
আমি যেন হই রাজার বউ॥
কোঁড়ার মাথায় ঢালি চিনি।
আমি যেন হই রাজার রাণী॥

ইহার মধ্যে পারত্রিক কল্যাণের কোন কামনার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, বাঙ্গালী কুমারী-হৃদয়ের একটি বাস্তব কামনা ইহার ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে। মানব-হৃদয়ের বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আশা-নৈরাশ্যের কাহিনী লইয়াই উপন্যাস। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির মধ্যে উপন্যাসের বীজ রহিয়াছে। কুমারী, সধবা এবং বিধবা ইহাদের সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক নহে; অতএব সেই অনুসারে তাহাদের ছড়াগুলিও পৃথক্ হইয়া থাকে।

মেয়েলী ছড়ার পরই নৈসর্গিক ছড়াগুলির কথা উল্লেখ করিতে হয়। নৈসর্গিক ছড়াগুলি ফলিত জ্যোতিষ, রৌদ্রবৃষ্টি, কৃষিকার্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিয়ম-বিষয়ক, ইহারাই প্রধানত খনার বচন নামে পরিচিত। যেমন,

চৈত্রেতে থর থর।
বৈশাখে ঝড় পাথর॥
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে।

কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে ইহাদের একটি বিশেষ ব্যবহারিক মূল্য ছিল। সেইজন্য শ্রুতি-পরম্পরায় ইহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ এই ছড়াগুলিকে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যিক প্রয়াস বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে; তবে এ'কথা সত্য যে, ইহাদের বহিরঙ্গগত রূপের মধ্যে প্রাচীনত্বের লক্ষণ নাই, কিংবা থাকিবার কথাও নহে। এই প্রকার নৈসর্গিক ছড়া প্রত্যেক দেশের

লোক-সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইংরেজি লোক-সাহিত্যেও অনুরূপ ছড়া আছে—

The south wind brings wet weather,
The north wind wet and cold together,
The west wind always brings up rain,
The east wind blows it back again.

ইহাদের সঙ্গে ডাকের বচন বা ছড়াগুলির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাকের বচন প্রধানত নীতিমূলক। ডাক কোন ব্যক্তির নাম নহে, তিব্বতীয় ভাষায় ডাক শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান[১], এই সূত্রেই ডাকের বচন শব্দের অর্থ হয় জ্ঞানের বচন (words of wisdom)। বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশেই ডাকের ছড়াগুলির প্রচার হইয়াছিল; যেমন—

বাংলা

নিয়ড়ে পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥

অসমীয়

ওচরত পুখুরী দূরক যায়।
পরক আশায়ে বাট চায়॥
পর ঘর হস্তে রাখিব নারী।
তেবেসে ধর্মকে রাখিতে পারি॥

ওড়িয়া

নিয়ড় পোখরি দূরে যাএ।
পথিক দেখি আউড়ে চাএ॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বোলে এ নারী ঘররে না টিকে॥

আজিকের দিক দিয়া খনা ও ডাকের বচনগুলির মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাইয়া ইহাদিগকে সকলেই এক সঙ্গে বিচার করিয়া থাকেন; কিন্তু ডাক

১ *Dakarnava*, Ed. N. N. Sastri (Calcutta, 1935), P. (5).

এবং বিষয়ের দিক দিয়া লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া বিচার করাই সঙ্গত। ডাকের ছড়াগুলি নীতিমূলক ছড়া বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে ; পূর্ববঙ্গের গাজীর কীর্তনে অনুরূপ ছড়া শুনিতে পাই,

রান্ধি বাড়ি যেবা নারী পুরুষের আগে খায়।
ভরা কলসীর জল তার তরাসে শুকায়॥
এলায়ে মাথার কেশ ফিরে পাড়া পাড়া।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী জেনো লক্ষ্মীছাড়া॥

ইহাদিগকে নৈসর্গিক ছড়ার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া সামাজিক নীতি-মূলক ছড়ার অন্তর্গত নির্দেশ করাই সঙ্গত।

সর্বশেষে ঐন্দ্রজালিক ছড়া ; ইহাদিগকে প্রকৃত লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় কি না, তাহাই প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে। সাধারণতঃ সাপের মন্ত্র, বাঘবন্দীর ছড়া, হাতিবন্দীর ছড়া, হিরালীর ছড়া, বৃষ্টির (rain-invoking) ছড়া ইত্যাদিই ঐন্দ্রজালিক (magical) ছড়া বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন মেয়েলী ব্রতের ছড়ারও ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য আছে ; অতএব তাহাও এই শ্রেণীর ছড়ারই অন্তর্গত। পূর্বের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ছড়া যদৃচ্ছা সৃষ্ট, অন্তরের সহজ আনন্দই ইহাদের সৃষ্টির মূল উৎস, কোন ব্যবহারিক লক্ষ্য ইহাদের উৎস নহে ; কিন্তু মেয়েলী ছড়াগুলি সম্পর্কে বলিয়াছি, শিশুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়া ছড়াগুলি সেখানে ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনীয়তাও সাধন করিয়াছে ; সেই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা জাগতিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয় নাই বলিয়াই ইহাদের সম্পর্কিত ছড়াগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক ছড়াগুলির মধ্যে ভাব ও অর্থগত গূঢ়তা (mysticism) আছে, জাগতিক ধর্মের নিয়মে ইহাদিগকে সর্বত্র ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই জন্য ইহাদিগকে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না। তবে ঐন্দ্রজালিক ছড়ার বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাদের সম্পর্কে এই কথা সর্বত্র প্রযোজ্য নহে—কেবল সাপের মন্ত্রগুলি সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে সত্য, কিন্তু অন্যান্য কোন কোন বিষয়ক ছড়ার মধ্য দিয়া যতই অপরিস্ফুট হউক না কেন, একটি ক্ষীণ রস-আবেদনও প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে

কোন কোন সময় যতই অস্পষ্ট হউক একটি চিত্রও থাকে, অনেক সময় একটুকু রসের অনুভূতিও জাগিয়া উঠে। কৃষকের ক্ষেত্রে যাহাতে হস্তী প্রবেশ করিয়া শস্য বিনাশ করিতে না পারে, সেইজন্য ছড়া বলিয়া হস্তীর গতি রোধ করা হয়, ইহাই হাতিবন্দীর ছড়া; এই ছড়া গীতের রূপেও প্রকাশ করা হয়। ছড়ার সাধারণ নিয়মানুযায়ী ইহাদের মধ্যেও ভাবগত অনৈক্য থাকে এবং অনেক সময় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র ইহাদের ভিতর দিয়া ভাসিয়া যায়—এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহারা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। হাতিবন্দীর ছড়ার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

হাতী বান্ধ, হাতী বান্ধ, দেবী তোরে ডাকে রে।
কি কারণে দেবী মাগো আমার তলব রে ॥
তুমি কি পারিবা উষাব ব্রত ভাঙ্গিবারে।
আমি মাগো না পারিলে, পারিবে কেমুন জনে রে।
হাতিবাণ মারিল উষা দুই হাত খেঁচিয়া রে ॥

ইহার লোক-সাহিত্যগত মূল্য একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সাপের ছড়াগুলি স্বতন্ত্র, ইহাদের মধ্যে চিত্র কিংবা রস কিছুই নাই, একটি দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ—

মথন মথন বিষ সাত সমুদ্রের জলে।
তোর তেজে নীলকণ্ঠ পড়েছিল ঢলে ॥
পাতাল ফুঁড়ে সেঁধিয়ে পড়ে রক্ত করে জল।
ভাজ্‌ড়ার কাছে যতেক বিষ হয় হীনবল ॥
যে তোরে গড়িল বিষ তার মুখে যা।
নাতিনা পাতিনা ভেকা ছেঝা ধরি খা ॥
মাথা ছেড়ে ঘা ছেড়ে উড়ে বিষ যা।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ফিরে ঘরে যা ॥

সাপের ছড়াগুলির মধ্যে কোন কোন সময় ভাষাগত যে প্রাচীনত্ব আছে, তাহাও ইহাদের সাহিত্য-রসোদ্রেকে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। 'অতএব ঐন্দ্রজালিক ছড়ার মধ্যে সাপের ছড়াগুলি বাদ দিয়া অন্যান্য ছড়াগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। বিষয়টি পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।' ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির তিনটি স্বতন্ত্র পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর ইহার আরও কয়েকটি স্বতন্ত্র পাঠ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া তাঁহার এই উক্তিরই পোষকতা করিয়াছে। লোক-সাহিত্যের মধ্যে ছেলেখেলার ছড়াই সর্বাধিক পরিবর্তনশীল; কারণ, ইহা শিশুর সাহিত্য এবং শিশুর মত চঞ্চল আর কিছুই নাই; সে যত সহজে গ্রহণ করিতে পারে, তত সহজেই ত্যাগ করিতে পারে—তাহার কোন বিষয়ে আসক্তি নাই; কিন্তু পরিণত-বুদ্ধি মানব রক্ষণশীল—যে যাহা একবার গ্রহণ করে, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহে না; অতএব ছেলেখেলার ছড়াগুলির মত ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি তত সহজে পরিবর্তিত হয় না; তবে স্বতন্ত্র পরিবেশের সম্মুখীন হইলে ইহারাও পরিবর্তিত হয়—ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঁকুড়া জিলার বেলেতোড় গ্রাম হইতে ১৩০২ সালে এই ঘুমপাড়ানি ছড়াটি সংগৃহীত হইয়াছে—

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এ'ল দেশে।
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে কেসে ॥[১]

বর্গীর হাঙ্গামা বিষয়টি বাঁকুড়া জিলার একটি ঐতিহাসিক বিষয়, জনশ্রুতিতে এই বিষয়টি এখনও সেখানে জীবন্ত হইয়া আছে, তাহা হইতে রস আহরণ করিয়া এই অঞ্চলেই ছড়াটির উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব। ছড়াটি আজ হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে প্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবার ফলে ইহার এই রূপটি নির্দিষ্ট বা standardized হইয়া গিয়াছে, ইহার আর বিকৃতি বা পরিবর্তনের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহার মুদ্রিত রূপ সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার লাভ করিবার পূর্বেই ১৩০৯ সালে বা পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে, বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল চট্টগ্রাম জিলা হইতে ইহার দুইটি স্বতন্ত্র রূপ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (সা-প-প) ২, ৩৬৯

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
গুল্‌গুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে॥
ঘুমাইল ঘুমাইল পরাণ, ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে।
টিয়া পাখী ধান খাইছে খাজনা দিব কিসে॥[১]

রাজসাহী জিলা হইতে ইহার এই পাঠান্তরটিও সংগৃহীত হইয়াছে—

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে,
ধান ফুরুল পান ফুরুল খাজনার উপায় কি ?
আর কিছুকাল সবুর কর রসুন বুনেছি।

১৩১৪ সালে পাবনা জিলা হইতেও ইহার একটি রূপ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা এই প্রকার—

মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আ'ল ত্মাশে।
টিয়ায় ধান খাইলে খাজনা দেবো কিসে॥[২]

দেখা যাইতেছে যে, ছড়াটি বাঁকুড়া হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া দুইটি বিষয়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বরগী শব্দটি পরিবর্তিত হইয়া উভয় ক্ষেত্রেই 'গরকী'তে পরিণত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ বুলবুলি পাখীর নাম পরিবর্তিত হইয়া একস্থলে গুল্‌গুলি ও অন্যস্থলে টিয়াপাখীতে পরিণত হইয়াছে। পাবনায় বুলবুলি টিয়ায় পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের কারণ অনুমান করিতে একটুকুও বেগ পাইতে হয় না। প্রথমতঃ বর্গী কথাটি পশ্চিমবঙ্গের জনশ্রুতিতে যেমন পরিচিত, চট্টগ্রামে তেমন নহে; এমন কি, সেখানে ইহা সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিলেই চলে। অতএব পশ্চিমবঙ্গবাসী কোন পারবার বর্গীর হাঙ্গামার সময়ই হউক, কিংবা তাহার পরবর্তী কালেই হউক, চট্টগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিবার কালে এই ছড়াটিও সঙ্গে করিয়া সেখান হইতে লইয়া আসিয়াছিল। এক পুরুষের নিকট মূল ছড়াটি অবিকৃত ছিল, কিন্তু পরবর্তী পুরুষই ছড়াটি আবৃত্তি করিবার কালে বর্গী কথাটির তাৎপর্য আর বুঝিতে পারে নাই। তাহার প্রতিবেশিগণও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; অতএব তাহারাও ইহা শুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। তখনও পূর্বপুরুষশ্রুত বর্গী

---

১ ঐ ৯, ৮৯
২ ঐ ১৪, ২০১

কথাটির উচ্চারণগত সুরটি পরবর্তী পুরুষের কানে বাজিতেছে; সেই অনুসারে বর্গী 'গরকী'তে পরিণতি লাভ করিয়াছে, ইহাতে পূর্বপুরুষের কণ্ঠাগত সুরটি আছে, তাহার অর্থ নাই। তারপর বুলবুলি; চট্টগ্রাম অঞ্চলে বুলবুলি পাখীও অপরিচিত, কতকটা mythical bird বা কল্পরাজ্যের পাখীর মত—তাহার সঙ্গে সেই সমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, অথচ বুলবুলি কথাটির সুর তখনও কানে লাগিয়া আছে; অতএব প্রথম অবস্থায় ইহা গুল্‌গুলিতে পরিণত হইয়াছে। তারপর কেবলমাত্র সুরে যখন রস জমাট বাঁধিতে পারিল না, তাহার একটি প্রত্যক্ষ চিত্রও চাই, তখনই 'গুল্‌গুলি টিয়া পাখীতে পরিণত হইয়া গেল—'টিয়া পাখী ধান খাইছে খাজনা দিব কিসে।'

অপরিচয়ের জন্য ভবিষ্যতে 'গরকী' কথাটি যে লোক-সমাজে সেখানে কি রূপ লাভ করিবে, তাহা অনুমানও করা যাইতে পারে না; কারণ, ইহার মূল সামাজিক ভিত্তি হইতে ইহা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই ভাবেই ছেলে-ভুলানো ছড়াও ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে।

ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার একটির অংশের সঙ্গে আর একটির অংশ অতি সহজেই সংলগ্ন হইয়া যায়, তাহার ফলেই একই ছড়ার মধ্যে ভাব ও চিত্রগত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। ছড়ার পদগুলি পরস্পর সুদৃঢ় ভাবে সংবদ্ধ নহে, বরং নিতান্ত অসংলগ্ন; সেইজন্য একটি পদ হইতে আর একটি পদ যেমন সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, তেমনই বিভিন্ন স্থান হইতে নূতন নূতন পদ আসিয়াও নূতন ছড়ার অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিই—রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে একটি ছেলেখেলার ছড়া এই প্রকার,

আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধর্‌তে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই॥
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি গুণ্‌তে গুণ্‌তে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারেতে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে॥
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

বাঁকুড়া জিলার বেলেতোড় গ্রাম হইতে ছড়াটির এই পাঠান্তর সংগৃহীত হইয়াছে—

আয় রে রে ছেলের খাতা মাছ ধরনে যাব।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলে দোলায় চড়ে যাব॥
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি গুণ্‌তে গুণ্‌তে যাব॥
ছোট শাঁখা বড় শাঁখা রুণু ঝুণু বাজে।
দুর্গা হেন জলটুকু ঝিকিমিকি করে॥[১] ইত্যাদি।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহার প্রথম তিনটি চরণ ইহার মৌলিক অংশ, উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তী পদগুলি স্বতন্ত্র ছড়ার অংশ ছিল, কালক্রমে ইহার মধ্যে আসিয়া জুড়িয়া গিয়াছে। হয়ত মূল ছড়াটি প্রথম তিনটি পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কালক্রমে ইহা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে নূতন নূতন অংশ ইহাতে যোজনা করিয়া লইয়াছে। ইহা ছড়ারই বৈশিষ্ট্য—লোক-সাহিত্যের অন্য কোন বিষয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নহে। ভাব ও চিত্রগত এই প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও ছড়ার রসগত একটি অখণ্ডনীয়তা আছে; ইহার ভাব ও চিত্র যতই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ুক না কেন, ইহার এই রসগত অখণ্ডতা অব্যাহতই থাকিয়া যায়।

এইবার ছড়ার ছন্দের কথা কিছু বলিব। ছড়ার ছন্দই বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ছন্দ। আধুনিক বাংলা কাব্যরচনার মধ্যেও ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া যায় নাই; বরং বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবির কাব্য-রচনায় ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই প্রধান। রবীন্দ্রনাথও ছড়ার ছন্দে বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। বাংলা কবিতার ছন্দের মধ্যে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

ছড়ার ছন্দের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, ইহা শ্বাসাঘাত-প্রধান। এই শ্রেণীর ছন্দে প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে একটি করিয়া শ্বাসাঘাত পড়ে। এইজন্য ইহাকে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বলা হয়। প্রতি পর্বের স্বর-সংখ্যা গণনা করিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে ইহাকে স্বরমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত ছন্দ বলেন। ইহার প্রত্যেক পর্বের আদিতে ঝোঁক পড়ে বলিয়া ইহাকে প্রাস্বরিক ছন্দ বা বল-প্রধান ছন্দও বলে; এতদ্ব্যতীত ইহা ছড়ার

১ সা-প-প ২, ৩৭৬

ছন্দ, লৌকিক ছন্দ, প্রাকৃত ছন্দ ইত্যাদি নামেও পরিচিত তবে স্বরবৃত্ত ছন্দ নামটিই ইহার বহুল প্রচলিত। পর্বের আদিতে শ্বাসাঘাতের জন্য ইহাকে দ্রুত লয়ের ছন্দ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই ছন্দ হাল্‌কা ভাবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং কথ্য ভাষার ব্যবহার ইহাতে অধিক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,

। ।।।   ।।। ।   ।। । ।   । ।
ঘুম্ পাড়ানী   মাসিপিসি   আমার বাড়ী   যেয়ো।   =১৪
।।। ।   । ।।।   । । ।   । ।
সরু সুতোর্   কাপড়্ দেব   ভাত্ রেঁধে   খেয়ো॥   =১৩+১

ইহার প্রথম চরণে চৌদ্দ ও দ্বিতীয় চরণে তের বার স্বর উচ্চারিত হইয়াছে, চারিটি স্বরধ্বনির পর যতি পড়িয়াছে, অতএব ইহা তিনটি পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ পর্বে বিভক্ত হইয়াছে। অসম্পূর্ণ বা চরণের অন্ত্য পর্বটি সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব। ইহার প্রতি পর্বের আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাত হইয়াছে।

পর্বের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা এই ছন্দে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। প্রতি চরণে ইহার এক পর্ব হইতে চারি পর্ব পর্যন্ত থাকিতে পারে, ইহাদের মধ্যে সব পর্বই যে দৃশ্যত সম্পূর্ণ হইবে তাহা নহে, কোন কোন পর্ব অসম্পূর্ণও থাকিতে পারে। বিভিন্ন সংখ্যক পর্বদ্বারা গঠিত এই ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

ইচিং বিচিং।   =৪
।। ।।
জামাই চিচিং॥   =৪
॥ ।।
তায়্ পল্লো।   =৩+১
।। । ।
মাকড় বিচিং॥   =৪

ইহা এক পর্বের পদ দ্বারা গঠিত; প্রতি পদে চারিটি মাত্রা বা স্বর-স্থান

ধ্বনিত হইয়াছে। আধুনিক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই এক পর্বের ছন্দটি এইভাবে অনুকরণ করিয়াছিলেন—

পাল্কী চলে। =৪
পাল্কী চলে॥ =৪
গগন তলে। =৪
আগুন জ্বলে॥ =৪

দুই পূর্ণ পর্বের পদ এই প্রকার—

বড় বৌগো রান্না চড়া। ॥ =৪+৪
ছোট বৌগো জল্‌কে যা॥ =৪+৩+১
জলের্ ভিতর্ লেখা জোকা। =৪+৪
ফুল্ ফুটেছে চাকা চাকা॥ =৪+৪

ইহার দুই পর্বের প্রতি চারিটি করিয়া মাত্রা বা স্বর-স্থান ধ্বনিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সমান স্বর-স্থান ধ্বনিত হইবার জন্য ইহার পদগুলিতে একটি ধ্বনিগত সাম্য (balance) রক্ষিত হইয়াছে। সমমাত্রিক দ্বি-পর্ব পদের আর একটি দৃষ্টান্ত,

অবু তবু গিরি সুতা। =৪+৪
মায়ে বলে পড় পুতা॥ =৪+৪
পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি। ॥ =৪+৪
না পড়্‌লে ঠেঙ্গার্ গুতি॥ =৪+৪

তিন পর্বের স্বরবৃত্ত ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের ত্রিপদী বলিয়াও কেহ কেহ উল্লেখ করিবার পক্ষপাতী—

। । । । । । । । । । । । । ॥
ধূলোর্ দোসর নন্দকিশোর ধূল্ লেগেছে গায়্। =১৪(১৩+১)
। । । । । । । । । । । । । ॥
ধূলো ঝেড়ে নে রে কোলে প্রাণ্ জুড়োবে তায়॥ =১৪ (১৩+১)

ইহার চতুর্থ পর্বে মাত্র একটি মাত্রা বা একটি স্বর উচ্চারিত হইয়াছে, অতএব ইহা একটি পূর্ণ কিংবা অর্ধ-পর্ব বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

সুতরাং ইহা চারি পর্বের পদ নহে; ইহা তিন পর্বের পদ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

| | | | | | | | | | | | | ‖
তাল্‌গাছেতে হুটুটুমাটুম্ হুলো পাঁদা রু। =৪+৪+৪+২
‖ | | | | | | | | | | | ‖
চোত্‌ মাসের গরমীতে মলো মাচা রু॥ =৪+৪+৪+২

এইবার সমমাত্রিক চারি পর্বের একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

| | | | | | | | | | | | | | | |
হাত্‌ ঘুরুলে নাড়ু পাবে নৈলে নাড়ু কোথা পাবে। =৪×৪=১৬

ইহার চারিটি পর্ব—প্রত্যেক পর্বে চারিটি মাত্রা বা স্বরস্থান ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার সমমাত্রিক চারি পর্বের পদ ছড়ায় খুব সুলভ নহে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রথম তিনটি পর্ব সমমাত্রিক হইলেও চতুর্থ পর্বটি ইহাদের সমান মাত্রাযুক্ত না হইয়া বরং অপূর্ণ মাত্রা যুক্ত হইয়া থাকে, যেমন,

| | | | | | | | | | | | | |
ধন্‌কে নিয়ে বন্‌কে যাব থাক্‌ব বনের মাঝে। =১৪
| | | | | | | | | | | | | |
আয়্‌ দেখিনি নীলমণি কেমন্‌ ঘুঙুর্‌ বাজে॥ =১৪

ইহাতে প্রথম তিনটি পর্বে চারিটি করিয়া মাত্রা থাকিলেও চতুর্থ পর্বটিতে মাত্র দুইটি মাত্রা, সেইজন্য চতুর্থ পর্বটিকে অপূর্ণ পর্ব বলা হয়।

বাংলা ছড়ার হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণের মত নহে, অতএব ইহাতে 'আ' কিংবা 'এ' স্বর হইলেই দীর্ঘ উচ্চারণ ধরিতে হইবে, 'অ' কিংবা 'ই' দীর্ঘ উচ্চারিত হইবে না তাহা নহে, 'অ' স্বরও, অন্ত্যপর্বে থাকিলে 'অ—' এই প্রকার দীর্ঘ উচ্চারিত হইতে পারে। যেমন,

| | | | | | | | | | | | ‖
এপার্‌ গঙ্গা ও পার্‌ গঙ্গা মধ্যিখানে চ—র্‌। =১৪

এ'খানে 'চ'র স্বর-ধ্বনিটিকে প্রয়োজনানুরূপ দীর্ঘ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, ছড়াতে তাহা শ্রুতিকটু শুনাইবে না; কারণ, সুরের ভিতর দিয়াই ছড়ার প্রকাশ। অতএব সুরের মর্যাদা রক্ষার জন্য উচ্চারণের গতানুগতিক

নিয়ম বিসর্জিত হইতে পারে। শিশুর শ্রবণ তাহার নিজস্ব ধ্বনি-তত্ত্বের নিয়মে গঠিত।

উপরে যে নিয়ম ও দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহা ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম মাত্র ; ইহাদের বহু ব্যতিক্রমও আছে, প্রকৃত পক্ষে এই সকল ব্যতিক্রম দ্বারাই ছড়ার ছন্দে বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব—

| | | | | | |
পুঁটু আমার্ কেঁদেচে। =৪+৩
| | | | | | |
কত মুক্তো পড়েছে ॥ =৪+৩

ইহা দুই পর্বের পদ—প্রথম পদে চারি মাত্রা ও দ্বিতীয় পদে তিন মাত্রা। দুই পর্বের পদের মধ্যে আরও একটি বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন,

॥ | | | |
আক্ বাড়ীর্ পাশে। =৪+২
| | | | | | |
ভুঁড়্ শেয়ালী নাচে ॥ =৪+২

ইহার প্রথম পর্বে চারিটি ও দ্বিতীয় পর্বে দুইটি করিয়া মাত্রা। সমমাত্রিক দ্বি-পর্বের পূর্বে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি, এখানে আরও একটি দিতেছি, তাহা উপরের উদ্ধৃত দুইটি দৃষ্টান্তের সঙ্গে তুলনা করিলে পরস্পরের মাত্রাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইবে—

| | | | | | | |
পুঁটু আমার মেঘের বরণ। =৪+৪
| | | | | | | |
পুঁটু আমার চাঁদের্ কিরণ ॥ =৪+৪
| | | | | | | |
চাঁদ বলে ধায়্ চকোরিণী। =৪+৪
| | | | | | | | | |
মেঘ্ বলে ধায় চাতকিনী ॥ =৪+৪

কেবলমাত্র একটি করিয়া মাত্রার তারতম্য সৃষ্টি দ্বারা একই প্রকৃতির ছন্দের মধ্যে কি প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, তাহা উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অতএব এই বিষয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

শিশু

শিশু-সম্পর্কিত ছড়ার কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই দোল্‌নার ছড়ার কথা উল্লেখ করিতে হয়; ইংরেজিতে ইহাকেই cradle song বলে। শিশুর জগৎ কোন ভৌগোলিক সীমা দ্বারা আবদ্ধ নহে, সেইজন্য এই বিষয়ক ছড়াগুলির মধ্যে অঙ্গ ও ভাবগত একটি সর্বজনীনতা আছে। ইহারা সংক্ষিপ্ত—জননী কর্তৃক ইহারা আবৃত্ত হয় বলিয়া ইহারা ছেলেখেলার ছড়ার মত অসংলগ্ন ভাব ও বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাবেশে রচিত নহে। ইহা সুর-প্রধান হইলেও আনুপূর্বিক একটি স্নিগ্ধ-মধুর ও সহজ সরল ভাব কেন্দ্র করিয়াই রচিত হয়। দোল্‌নার মধ্যে শিশুকে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যেই হউক কিংবা শান্ত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই হউক জননী কিংবা জননী স্থানীয়া অন্য কেহ দোল্‌নাটিকে একটু একটু দোল্ দিতে থাকেন, সেই দোলার তালেই মনের মধ্যে সুর জাগিয়া উঠে, বয়স্ক লোকের রচনা বলিয়া একটু পরিণত ভাব বা সাংসারিক কোন কথার ইঙ্গিত ইহাদের ভিতর দিয়া কোন কোন সময় প্রকাশ পায়—

> দোল্ দোল্ দোল্ দোলন হরি;
> কে দেখেচে হরি।
> ঝুল্‌নাতে ঝুল্‌ছে আমার ঐ গিরিধারী॥

এখানে শিশুর সম্পর্কে হরি ও গিরিধারী কথাগুলি পরিণত মনোভাবের পরিচায়ক; ইহা অনায়াস-রচিত নহে, বরং সচেতন মন দ্বারাই এখানে শিশুকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিংবা যশোদা-দুলালের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে শিশু-সম্পর্কিত ছড়ার যে একটি সর্বজনীনত্বের ভাব আছে, তাহার সহজ প্রকাশে একটু বাধা হইয়াছে। ইহার কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, দোল্‌নার ছড়া শিশু-সম্পর্কিত ছড়া হইলেও তাহা শিশুর রচিতও নহে, কিংবা শিশুকর্তৃক আবৃত্তও হয় না—ইহা পরিণত-বয়স্কা শিশু-ধাত্রীর রচনা; অতএব ইহার ভিতর দিয়া অনেক সময় পরিণত মনোভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ঘুমপাড়ানি ছড়া ও দোল্‌নার ছড়ায় বিশেষ পার্থক্য নাই, কেবল ছেলেখেলার ছড়ার সঙ্গে ইহাদের উভয়েরই পার্থক্য আছে। এখানে আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

দোল্ দোল্ দোলানি।
কানে দেব চৌদানি ॥
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ।
ফেটে মরবে পাড়ার লোক ॥

শিশুকে অলঙ্কার পরিধান করাইবার মধ্যে এখানে পাড়ার লোকের যে হিংসা উদ্রেক্ করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও পরিণত মনোভাবের পরিচায়ক। শিশুর সঙ্গে হিংসার কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে না; কিন্তু যিনি শিশুর ধাত্রী, তিনি তাহার জননীই হউন কিংবা মাসিপিসিই হউন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রতিবেশিনীদিগের যে সকল সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক, তাহাদের মধ্যে হিংসার সম্পর্কটিই প্রধান—সেইজন্য শিশুর অলঙ্কার সজ্জার একটি সুন্দর চিত্রের মধ্যেও এখানে ঈর্ষা-ভাবের একটি মসীরেখা পাত হইয়াছে।

তবে দোল্নার ছড়ার মধ্যে সকল সময়েই যে এমন পরিণত বুদ্ধির মসীরেখা পাত হইয়া থাকে তাহা নহে, কোন কোন সময় এই পরিণত বুদ্ধি ছড়ায় স্বাভাবিক রসসৃষ্টি করিতেও একেবারে ব্যর্থকাম হয় না; মনে হয়, উল্লিখিত ছড়াটির ইহা এইরূপ একটি পাঠান্তর—

দোল্ দোল্ দোলনি।
কাল যাব বেল্নি ॥
কিনে আন্ব দোলনি ॥
বেল্নির পাকা আম্ড়া।
খেয়ে অম্বলে বুক চাব্ড়া ॥

এখানে বেল্নির পাকা আম্ড়া খাইয়া অম্বলের ব্যথায় বুক চাব্ড়ানোর কথা পরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই, তথাপি ইহার মধ্য দিয়া ছড়ার স্বাভাবিক রসসৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না—ইহার মধ্যে একটি বাস্তব দৃষ্টি থাকিলেও, তাহা দ্বারা ইহাতে কোন রূঢ় সত্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

পরিণত বুদ্ধির স্পর্শে সকল দেশের দোল্নার ছড়াই কিছু না কিছু প্রবীণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, কেবল বাংলা ছড়ারই ইহা বৈশিষ্ট্য নহে—একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

Who would beat you, baby ?
Swing swing in your cradle.
I am going for water
I'll give you scented oil
Swing swing in your cradle.
What widow's eye has caught you
That you cry so much ?
Swing swing in your cradle.[১]

এখানে ঈর্ষা-ভাবাপন্না কোন প্রতিবেশিনী বিধবার উপর অহৈতুক ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

শিশুদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য দোল্‌নার ব্যবহার সাধারণ বাঙ্গালীর গৃহে খুব ব্যাপক নহে বলিয়াই দোল্‌নার ছড়ার সংখ্যাও বাংলাতে খুব বেশি নাই। বিশেষতঃ সাধারণ বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে শিশুর জন্য দোল্‌নার ব্যবহার নিতান্ত আধুনিক। সেই জন্য এই শ্রেণীর ছড়া এ'দেশের সমাজে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এ'দেশে দোল্‌নার পরিবর্তে মাতৃক্রোড়ই শিশুর চিত্তবিনোদনের স্থান। যে দেশের শিশু মাতৃস্তন্য অপেক্ষা ধাত্রীস্তন্যের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল, সেই দেশেই মাতৃক্রোড় অপেক্ষা দোল্‌নাই শিশুর বিনোদনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এ'দেশে মায়ের কোল ছাড়া শিশু ঘুমাইতে চাহে না—

হেঁশেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায়রে দুদের কুমারী॥

মাতৃস্তন্য পানতৃপ্ত শিশু সহজেই মাতৃ-অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়ে। অতএব পাশ্চাত্ত্য দেশের মত বাংলায় ঘুমপাড়ানি ছড়া ও দোল্‌নার ছড়া (cradle song) এক নহে ; বাংলার দোল্‌নার ছড়ার মধ্যে দোল্‌নায় দুলিবার তালটিই মুখ্য, চিত্র এবং সুর বিশেষ কিছুই নাই, থাকিলেও তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না ; উপরে যে তিনটি দোল্‌নার ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই এই কথাটি প্রত্যক্ষ হইবে ; কিন্তু ঘুমপাড়ানি ছড়ার একটি বিশিষ্ট সুর আছে,

[১] Elwin and Hivale, *Folk-Songs of the Maikal Hills*, op. cit. p. 227.

ইহার চিত্রগুলি যতই সংক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন হউক, অনেক সময় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাদের মধ্য দিয়া একটি ঘন রসও অনেক সময় জমাট বাঁধিয়া উঠে বলিয়া অনুভব করা যায়—

> ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ী যেয়ো।
> বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো॥
> শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ো।
> শীতল পাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো॥
> আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
> চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে ক'রে নেবে॥
> দুই দুই বাঁদী দেব পায়ে তেল দেবে॥
> উড়্কি ধানের মুড়্কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
> গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি ভরা দই॥

এই ছড়াটির মধ্য দিয়া সমগ্র ভাবে যে একটি চিত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দুরন্ত শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার জন্য একটি ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রয়োজন, এই শক্তি সকলের নাই; যাহার এই শক্তি আছে, তাহাকে এই ছড়ায় মাসিপিসি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি নারী—কারণ, শিশুকে ঘুম পাড়াইবার বিষয়ে নারীরই দক্ষতা থাকিবার কথা। তিনি নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অতএব তিনি বিলাসিনী; কারণ, নিদ্রা বিলাসের অঙ্গ। বাটাভরা পান তিনি গাল ভরিয়া খাইয়া থাকেন, শীতল পাটিতে নিদ্রা যান ইত্যাদি। অতএব ইহার মধ্য দিয়া একটি পরিপূর্ণ চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, চিত্রটি আশ্রয় করিয়াই একটি রস ইহাতে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রার সঙ্গে শীতল পাটি, ছায়াময় পথ, বেয়ারার কাঁধে চড়িয়া পাল্কীতে করিয়া দুলিতে দুলিতে যাত্রা, পায়ে তেল মাখা ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; অতএব ছড়ার এই পদ কয়টির ভিতর দিয়া একটি সুস্নিগ্ধ নিদ্রার পরিবেশ রচনা করা হইয়াছে—মাতৃক্রোড়ের মতই এই পরিবেশটি স্নেহ-কোমল। বাংলার দোল্নার ছড়ায় এই রসটি নাই, তাহাতে একটি তাল মাত্রই আছে, তাহা দোল্নার দুলিবার তাল। এইজন্য বাংলার ঘুমপাড়ানি ছড়া আমি দোল্নার ছড়া হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলির একটি ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে বলিয়া অনুভূত হয়,

অর্থাৎ ইহার সুর, চিত্র ও রসের ভিতর দিয়া যেন নিদ্রার একটি মধুর আবেশ শিশুদেহ স্পর্শ করিয়া যায়, এই স্পর্শেই শিশুর চক্ষু নিদ্রায় জড়াইয়া আসে। ঐন্দ্রজালিক (magical) মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সম্মোহন (hypnotise) করিবার যে কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যেও যেন সেই সম্মোহনী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়—

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি।
ঘুমরতুন্ উঠিলে যাদু কত খাইবা ননী॥
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের বাছামণি।
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোনার বাজুমণি॥
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমরতুন্ উঠিলে বাছা ননী দিমু মুই॥

বার বার ঘুম কথাটি উচ্চারণের মধ্যে শিশুর মনে একটি ঘুমের মোহ সৃষ্টি হয়; একটি অলস নিদ্রাতুর স্বরে ছড়াটি আবৃত্তি হয়, নিদ্রা যেন জননী বা ধাত্রী রূপে মূর্তিমতী হইয়া শিশুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখেন, দুরন্ততম শিশুও নিদ্রার মোহ আর কাটাইয়া উঠিতে পারে না।

নিদ্রার রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য। সেই রাজ্যে হুমো ও লেজঝোলা পাখীর বাস, এই অচেনা পাখীরা শিশুদের চেনা; কারণ, তাহারা যে সবে মাত্র স্বপ্নের রাজ্য হইতেই আসিয়াছে—

আয়রে পাখী হুমো।
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো॥
আয়রে পাখী লেজঝোলা
আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা॥

ঘুমপাড়ানি ছড়ার ভিতর দিয়া এই স্বপ্নরাজ্যটি সজীব হইয়া উঠে; এই জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন সম্পর্ক নাই; কিংবা কোন সম্পর্ক থাকিলেও বাস্তব জগতের ধরা-বাঁধা নিয়মে ইহার কোন চিত্র রচিত হয় না। সেখানে শেওড়া গাছের নুন ও কুসুম গাছের তেল দিয়া ভালুকে তেঁতুল খায়,

আয় ঘুমানি আয়।
ভালুকে তেঁতুল খায়॥

তারা হুন কোথা পায়।
শাওড়া গাছের হুন॥
কুসুম গাছের তেল।
তারা তাই দিয়ে দিয়ে খায়॥

সেই নিদ্রার জগতের যিনি অধিষ্ঠাত্রী, তিনি দেবীও নহেন, রাণীও নহেন—তিনি আমাদের আত্মীয়া, মাসিপিসি কিংবা মা। তিনি ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি কিংবা নিদ্রালী মা বলিয়া আমাদের কাছে পরিচিত, তাঁহার গুণের পরিচয় এক রকম স্পষ্ট হইলেও তাঁহার রূপের পরিচয়টি কিছু অস্পষ্ট। যতটুকু তাঁহার রূপের পরিচয় পাই, তাহা বড় সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত। তিনি সরু সুতার কাপড় (শাড়ী নহে) পরিয়া থাকেন, অন্ন তাঁহার ভোজ্য—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ী যেয়ো।
সরু সুতার কাপড় দেবো ভাত রেঁধে খেয়ো॥

সরু সুতার কাপড় পরিয়া ভাত রাঁধিয়া খাইবার মধ্য দিয়া ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির জীবনে বিশেষ কোনও অবাস্তবতা দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি সুতার কাপড়টি যেন মাসিপিসির দেহে কেমন বেমানান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার বাটা ভরিয়া পান গাল ভরিয়া খাইবার চিত্রটি আরও বাস্তব—তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখিতে পাইলাম, এতটুকুন শিশু পুঁটুর চোখ তাঁহার আসন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই তাঁহার উক্ত বাস্তবতার পরিচয়টুকু বাষ্পের মত কোথায় উড়িয়া গেল—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ী এ'সো।
শেষ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে বসো॥

গৃহে শয্যা কিংবা আসনের অভাব থাকিলেই যে শিশুর চোখের উপর কাহারও বসিতে হইবে, তাহা যেমন কোন কথা হইতে পারে না, তেমনই চোখ যে কোনদিনই আসনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাহাও অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না—এখানেই সত্য গিয়া স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, স্বপ্নের রাজ্যে সম্ভব ও অসম্ভবের কোন প্রশ্নই নাই।

কখনও কখনও মনে হইতে পারে যে, স্বপ্নরাজ্যের এই মাসিপিসি কোন মানবীই নহেন, পুঁটুর চোখের উপর যেমন তাঁহার আসন স্থাপিত হইতে পারে, তেমনই বৃক্ষশাখাও তাঁহার আসনরূপে ব্যবহৃত হয়—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ী যাইও।
পাক্না কাঁঠাল ভাইঙ্গ্যা দিয়াম ডালে বইসা খাইও॥

পাকা কাঁঠাল খাইবার সাধ যদি কাহারও হয়, তাহা হইলে সেই সাধ যে তাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়াই পূরণ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? এখানে তিনি যদি মানবী বলিয়া কল্পিত হইতেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে এমন বিসদৃশ ধারণা করা হইত না। ঘুমের সঙ্গে যাহার সম্পর্ক আকাশ-পথে উড়িয়া আসাই তাহা দ্বারা সম্ভব, সেইজন্য তাহাকে এখানে পক্ষিণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, অতএব বৃক্ষশাখাই তাহার আসন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। শিশুও ত ছড়ায় পক্ষী—

থকন থকন পায়রাটি কোন বিলেতে চর।
থকন বলে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পড়॥

অতএব পক্ষিণী রূপিণী ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির উপরই এই পক্ষিরূপ শিশুর নিদ্রার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে। পক্ষীই ত স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে বাস্তব জগতের যোগসূত্র রচনা করে—ইহা আকাশ হইতে উড়িয়া আসিয়া ধূলির ক্ষুদ-কুঁড়া খুঁজিয়া খায়। ইহার পথ অনুসরণ করিয়াই আমরা স্বপ্ন-রাজ্যের সন্ধান পাই; শিশুও স্বপ্নরাজ্য হইতে সদ্য আগত, সেইজন্য শিশুর সঙ্গে পক্ষি-প্রকৃতির যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই শিশুর সম্পর্কিত সকলের সঙ্গেই পক্ষীর একটি মৌলিক সম্পর্ক আছে, সেইজন্য ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিও পক্ষিণী।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই ঘুমপাড়ানি পক্ষিণী কখনও মাসিপিসি, কখনও মা—এতদ্ব্যতীত আর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক তাহার সঙ্গে নাই, তিনি কদাচ খুড়ী জ্যেঠী কিংবা দিদি, দিদিমা, ঠাকুমা নহেন। মাসিপিসি কথারও একটি বিশেষ অর্থ আছে, ইহার অর্থ মাসি এবং পিসি নহে, বরং কেবল মাত্র মাসিই—পিসি কথাটি এখানে ধ্বনি-সাম্য রক্ষা করিবার জন্য কিংবা মাসির একটি অর্থহীন অলঙ্কার মাত্র রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তুলনীয় টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি; এখানে 'কড়ি' এবং 'চোপড়' কথা দুইটি যেমন ইহাদের ব্যবহারিক বা প্রকৃত (real) অর্থে গৃহীত হয় না, পিসি শব্দটিও তেমনই। মাসিপিসি বলিতে কেবল মাত্র মাসি বুঝায়, অতএব ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি বলিতে ঘুমপাড়ানি মাসিই বুঝিতে হইবে,—মাসি কথাটিই এখানে প্রথম আছে এবং ছড়ার বর্ণনা হইতে ইহার একজনই যে নায়িকা তাহা বুঝিতে

পারা যায়। মাসি এবং পিসি কথা দুইটি প্রায় সমোচ্চার্য বলিয়া এক সঙ্গে এই ভাবে উচ্চারিত হইলেও এই দুইটি সম্পর্কের মধ্যে একটি সুদূর ব্যবধানও আছে। মাসি মাতার ভগিনী—এই সূত্রে মাতুলালয়েরই অধিবাসিনী, পিসি পিতৃগৃহ-বাসিনী। শিশুর ছড়ায় মাতুল বা মামার কথাই আছে, পিতার কথা নাই—তেমনই মাসির কথা আছে, পিসির কথা নাই। ইহার সুগভীর সামাজিক তাৎপর্যের কথা পরে আলোচনা করিব। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, ঘুমপাড়ানি পক্ষিণী মাসি এবং মা বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন, অন্য কোন আত্মীয়ার সম্পর্কে কল্পিত হন নাই।

পূর্বোদ্ধৃত ছড়াগুলির মাসিপিসির উল্লেখের মধ্যে মাসির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এই বার ঘুমপাড়ানি বা নিদ্রালি মা'র কথা উল্লেখ করিব। চট্টগ্রাম হইতে শিশু-সম্পর্কিত যে সকল ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের নায়িকা ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি কিংবা মাসি নহে, নিদ্রালি বা ঘুমপাড়ানি মা—

নিদ্রালি মাউরে, আমার বাড়ীত আইও।
খাট নাই পালঙ্ নাই, পিড়ি দিতাম জাগা নাই,
আমার মণির চখের উপর বৈস॥
ও নিদ্রালি মা, আমার বাড়ীত আইও।
গাল ভরি সুপারি দিয়ম,
বাটা ভরি পান দিয়ম,
বাচার চক্ষুর উপর বৈও॥
ডাইল দিয়ম্ চাউল দিয়ম্ রসাই করি খাইও॥

এই প্রকার আরও আছে,

নিদ্রালি মাওরে আঙারো বাড়ীত যাইও।
উঠানেত শঙ্খনদী পা পাখালিয়া যাইও॥
হাতিনাতে কানির বোচ্‌কা পা মুছিয়া যাইও।
বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা মাথাত তৈক্যা দিও।
সোনার ঢুলন পীড়ি দিয়ম্ পড়িয়া ঘুম যাইও॥

কচিৎ মার সঙ্গে মাসিরও উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়,

নিদ্রালি মা-মই (মাসী) আমার মাথা খাইও।
আসন দিবার শক্তি নাই পাগ্‌লার চোখে বইও॥

কিন্তু এখানেও মই বা মাসি শব্দ অর্থহীন অলঙ্কার মাত্র, মা-ই এখানে প্রকৃত বক্তব্য। এই অঞ্চলেরও কোন ছড়াতেই পিসি কথাটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিশু-সম্পর্কিত ছড়ার মধ্যে ঘুমপাড়ানি ছড়াই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার সঙ্গে আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক (magic) ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। চোরেরা কাহারও গৃহে চুরি করিবার উদ্দেশ্যে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে গৃহস্থকে ঘুম পাড়াইয়া লয় বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা পরের অনিষ্ট সাধন করা যায়, তাহাকে black magic ও যাহা দ্বারা ইষ্ট সাধন করা হয়, তাহাকে white magic বলে। চোরের গৃহস্থকে ঘুম পাড়াইবার ছড়া black magic-এর অন্তর্ভুক্ত ও জননীর শিশুকে ঘুম পাড়াইবার ছড়া white magic-এর অন্তর্ভুক্ত ধরিতে হইবে। একই ক্ষেত্র হইতে ইহাদের উভয়ের উদ্ভব হইলেও ইহারা কালক্রমে দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাংলা দেশে এই উভয় প্রকৃতির ঘুমপাড়ানি ছড়া যে একদিন সমান প্রচলিত ছিল, বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ধর্মমঙ্গলকাব্য হইতে black magic-এর অন্তর্ভুক্ত একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে, ছড়াটি কবির হাতে একটু সংস্কার লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইলেও ইহার লৌকিক রূপ একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ঘুমপাড়ানি ছড়ার এক নূতন রূপের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গৌড়ের মন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত তস্কর ইন্দা মেটে শিশু লাউসেনকে অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই ছড়া বলিয়া নগরবাসীকে নিদ্রায় অভিভূত করিতেছে, সে ছড়া বলিতে বলিতে ইঁদুর মাটি ছড়াইতেছে—

> জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
> ময়নানগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রা ঘোর ॥
> আগম ডাখিনাতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
> কালিকাদেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিচুটি ॥
> লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
> যেখানে যে রূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥

খাটে বাটে ভূমে প'ড়ে যে জন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগ তায়॥
শয্যায় আসনে শুয়ে ব'সে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিদুটি নয়নে তার লাগে॥
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায়।
কাঙুরে কামিখ্যা দেবী চণ্ডীর আজ্ঞায়॥
মাটি পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে সহরে সবার উঠে হাই॥
হাটিলা বাজারি কুন্দু কাবাড়ি কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া॥
সুখবাসী চাষী কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিদুটি লেগে নিদ্রায় কাতর॥
জীবজন্তু যত আছে অচেতন গড়ে।
থাকুক অন্যের কথা পাতা নাহি নড়ে॥[১]

কোন ঐন্দ্রজালিক নিদুটি বা নদ্রালি দিবার ছড়ার উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে, অতএব শিশুর ঘুমপাড়ানি ছড়ার সঙ্গে ইহার ভাবগত পার্থক্য আছে।

শিশুর ঘুম পাড়ানো যেমন মায়ের এক সমস্যা, সময়ে অসময়ে তাহার কান্না নিবারণ করাও তাঁহার আর একটি সমস্যা। শিশু কাঁদিয়া উঠিলেই পরিবারের মধ্যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়া যায়, কেন কাঁদিল? কেন কাঁদিল? কিন্তু শিশু যেমন অকারণেই হাসে, তেমনই অকারণেই কাঁদে; তথাপি কার্যকারণসূত্রধৃত মানুষের সংস্কার ইহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু শিশুকে শান্ত করা মায়ের সমস্যা—যে কান্নার কোন কারণ নাই, সেই কান্না দূর করাও ত অসম্ভব; কিন্তু মায়ের কাছে ইহার মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র ছড়া—

পুঁটু যদিরে কাঁদে।
আমি ঝাঁপ দেবরে বাঁদে॥

---

১ ঘনরাম চক্রবর্তী, 'ধর্মমঙ্গল' (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৮) পৃঃ ৫৪-৫৫

পুঁটু যদিরে হাসে।
উঠ্‌ব হেসে হেসে ॥
পুঁটু নাকি রে কেঁদেচে।
(আমার) ভিজে কাঠে রেঁধেচে ॥
এ'বার যাব হাট।
কিনে আন্‌ব রাঙা খাট ॥

হাট হইতে একটি রাঙা খাট কিনিবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া পুঁটুবাবু যে তাঁহার রোদন সংবরণ করিলেন, তাহা নহে—তিনি মায়ের সুধাকণ্ঠ-নিঃসৃত একটি জটিল সুরের জালে জড়াইয়া পড়িলেন ; ইহাতেই তাঁহার কণ্ঠ নীরব হইল। মনে হয়, পুঁটুবাবু নিজে হাসিয়া উঠিয়া এ'বার মাকেও হাসাইতে অধিক বিলম্ব করেন নাই। এই শ্রেণীর ছড়াই প্রকৃতপক্ষে ছেলে-ভুলানো-ছড়া—যে ছড়া শুনিয়া শিশু কান্না ভুলিয়া যায়, তাহাই ইহা। /অতএব পূর্বালোচিত ছড়াগুলি ঘুমপাড়ানি ছড়া বলিয়া নির্দেশ করিয়া এই শ্রেণীর ছড়াগুলি ছেলে-ভুলানো ছড়া বলিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ছেলে-ভুলানো ছড়া সর্বপ্রাচীন না হইলেও যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত এমনই একটি ছড়ার উপর ভিত্তি করিয়া 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী একটি ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। কেবল ভাবের দিক দিয়া নহে, বহিরঙ্গের ভিতর দিয়াও ইহার লৌকিক রূপটি আনুপূর্বিক রক্ষা পাইয়াছে। ছড়াটি এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য। শিশু শ্রীমন্ত সম্পর্কে ছড়াটি উল্লেখিত হইয়াছে—

আয় আয়রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ, বাছা, কি ধন চায় ॥
তুলিয়া আনিব গগন ফুল।
একেক ফুলের লক্কেক মূল ॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর ॥
গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ।
ধরিয়া আনিব গগন চান্দ ॥

সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোঁটা।
কালি গড়াইয়া দিব সোনার ভেটা॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাথাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাথায় গায়॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায়॥[১]

এই ছড়াটিই প্রায় চারি শত বৎসর পর বাঁকুড়া জিলার বেলেতোড় গ্রাম হইতে এই রূপে সংগৃহীত হইয়াছে—

আয় রে আয়।
কি লেগে কাঁদিস রে বাছা কি ধন তোর চাই॥
খাওয়াইব ক্ষীরখণ্ড মাথাইব চুয়া।
পাকা পাকা পান দিব সরেস গুয়া॥
রাজার দুহিতা করাইব বিয়া।
কুঙ্কুম কস্তূরী চন্দন দিয়া॥
তুলে এনে দিব গগন-ফুল।
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল॥
সে মূলে গড়াব হার সোনার।
আমার যাদু রে কেঁদ না আর॥[২]

মনে হয়, এই প্রকার একটি লৌকিক ছড়ার উপর ভিত্তি করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার ছড়াটি রচনা করিয়াছিলেন; লিখিত হইয়া প্রচারিত হইবার জন্য তাহার বিশিষ্ট একটি রূপ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যে ছড়াটি মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছিল, তাহা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আসিয়া আজ হইতে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে উপরি-উদ্ধৃত আকারে সংগৃহীত হইয়াছে।

১ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'চণ্ডীমঙ্গল' (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৩২), পৃঃ ২১১—১২
২ সা-প-প ২, ৩৭৪

শিশু মায়ের কাছে আনন্দের খনি, তাহার কান্নায় মার কণ্ঠে যেমন ছড়া ফোটে, তেমনই তাহার চোখের জলের মধ্যেও তিনি মুক্তার ঝর্না দেখিতে পান। যখন পুঁটু ছিল না, তখনকার রিক্ততার কথা স্মরণ করিয়া মাতা এখনও শিহরিয়া উঠেন—

পুঁটু আমার কেঁদেছে।
কত মুক্তা পড়েছে ॥
যখন পুঁটু আমার হয় নাই।
ভিখারীতে ভিখ্ নেয় নাই ॥
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে।
ভিখারীতে ভিখ্ নিয়েছে ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি জননীর রচনা বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিষ্ণুভাবের স্পর্শ আছে—

খিদেয় গোপাল কাঁদে।
দে গো মা তুই নবনী।
কেঁদোনা কেঁদোনা বাপা কোলে এস আপনি ॥
তুমি আমার ধন।
কোলে করে নিয়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন ॥

এই ভাবে বাংলার জননীদিগের রচিত ছড়াগুলির উপর কোন কোন সময় বৃন্দাবনের কস্তূরী-চন্দনের স্পর্শ লাগিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলার ধূলিমাটির পরিচয় তাহা হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

ঘুমপাড়ানি মাসির মত কুঁদুলে মাসিও একজন আছেন, তিনিই শিশুকে সময়ে অসময়ে কাঁদাইয়া বেড়ান। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে কেহই সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বাটাভরা পান দিয়া অভ্যর্থনা করে না, বরং তাঁহাকে গঙ্গাপার করিয়া দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে—

আঁদুলে কুঁদুলের মাসি কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড় আশা ॥
হাতে না মেলাম ভাতে না মেলাম কল্লেম গঙ্গাপার।
রেতে না কেঁদো ছেলে দিনে একটি বার ॥

এখানে আঁদুলে কথাটি দেখিয়াই যদি কোন তত্ত্ববিৎ এই সিদ্ধান্তে আসিয়া

উপনীত হন যে, এই ছড়ার মধ্যে হাওড়া জিলার আন্দুল গ্রামের কোন শিশুত্রাসকারিণী কলহ-প্রিয়া নারীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়ার রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য। সত্যের জগতে কাহাকেও ব্যঙ্গ কিংবা আঘাত করিবার মত পরিণত বুদ্ধির পরিচয় ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় না; অতএব আঁদুল গ্রামের কোন কলহ-প্রিয়া নারীর সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

কিন্তু সর্বদাই জননীর আশঙ্কা হয় যে, তাঁহার শিশুকে কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া অনিষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে; সে যে কে, তাহা তাঁহার জানা নাই, তথাপি তাহার প্রতি তাঁহার অভিসম্পাৎ সর্বদাই উদ্যত হইয়া আছে—

সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে।
খোকনকে যে খোঁড়ে॥
তার মুখটি পোড়ে।
আর যে খোঁড়ে মনে মনে।
পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে॥

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শিশুকে দুধ খাওয়ানো মায়ের একটি সমস্যা। শিশু-সম্পর্কিত সকল সমস্যাই জননী যে ভাবে কাটাইয়া উঠেন, ইহাতেও তিনি তাহাই প্রয়োগ করেন; তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত ছড়ার সুরে যে সম্মোহনের সৃষ্টি হয়, তাহাতেই অবাধ্য শিশু বশীভূত হয়। দুধ খাওয়ানোর ছড়া পূর্বে একটি উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রকার আরও বহু উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

শিশু মায়ের কেবল সমস্যাই নহে, তাঁহার আনন্দও বটে। শিশুর নৃত্য জননীর সেই আনন্দের একটি উৎস, এই আনন্দের প্রেরণায় আপনা হইতেই জননীর মুখ দিয়া ছড়া ফুটিতে থাকে—

সাইর নাচে শালিক নাচে মাদার পুষ্প খাইয়া।
দুধর ছাবাল নাচে মায়ের কোল পাইয়া॥

এই নৃত্য ত আর কিছুই নয়—যে শিশু দাঁড়াইতে পারে না, জননী তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া দাঁড় করাইতে চাহেন, তাহাকে দাঁড়াইতে শিখান, কিন্তু বারবার সে হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, আর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে, মা'র মুখে তখন ছড়া ফুটে,

নাচে রে মাল।
চন্দনী কপাল ॥
ঘৃত মধু খায়া তোমার,
টোবা টোবা গাল ॥

ইহাই শিশুর নাচ। শিশুর গাল যেমন 'টোবা' 'টোবা', তাহার পেটটিও ভোঁদড়ের মত মোটা, সেইজন্য জননী এই নৃত্যকে মানব-জগতের কোন সভ্য নৃত্যের সঙ্গে তুলনা না করিয়া পশুজগতের নৃত্যের সঙ্গেই তুলনা করিতেছেন,

আক বাড়ীর পাশে।
ভুঁড়শিয়ালী নাচে ॥
বাড়ীর বেগুন ডোবার মাছ।
তা খেয়ে খেয়ে ভোঁদড় নাচ ॥

একটি অপূর্ব উপমা! ভোঁদড় যখন পিছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে মানব শিশুর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যে বড়ই সার্থক হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; বিশেষতঃ শিশুর জগৎ ও প্রকৃতি-জগতে কোন পার্থক্য নাই; অতএব সেখানে পশু-শাবক ও মানব-শিশু একাকার হইয়া বাস করে। এমন কি, জননী নৃত্যপর শিশুকে লইয়া বনের মধ্যে গিয়া বাস করার কল্পনাকেও অসঙ্গত ও অসামাজিক বলিয়া বোধ করেন না,

ধন্‌কে নিয়ে বনকে যাব থাক্‌ব বনের মাঝে।
আয় দেখিনি, নীলমণি, তোর কেমন ঘুঙুর বাজে ॥
তোরে নাচ্‌লে কেমন সাজে।
ঝুনুক ঝুনুক বাজে ॥

শিশুর নৃত্য জননীর হৃদয়ে যেন ছড়ার এক অনন্ত উৎস-মুখ খুলিয়া দেয়। শিশুর নৃত্যের যেমন তাল নাই, এই ছড়ারও তেমনই কোনও বাঁধুনি নাই; ইহা কখনও শিশুর কোমল চরণের আঘাতের মত মৃদু, কখনও তাহার চরণাশ্রিত নূপুরের নিক্কণের মত দ্রুত সঞ্চারিত—শরতের মেঘের মত যখন শিশু যে ভাবে থাকে, জননীর হৃদয়ে তখন সেই ভাবেরই তাল সঞ্চারিত হয়। শিশু-সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ কোন কারণ অবলম্বন করিয়াই যে ছড়ার জন্ম হইয়া থাকে, তাহা নহে—প্রত্যক্ষ কোন কারণ ব্যতীতও শিশুকে অবলম্বন করিয়া

ছড়ার জন্ম হয়। শিশুর রূপ মাতৃ-হৃদয়ে যে আনন্দ-প্রেরণার সৃষ্টি করে, তাহাও বহু ছড়ার জননী,

পুঁটু আমার মেঘের বরণ।
পুঁটু আমার চাঁদের কিরণ॥
চাঁদ বলে ধায় চকোরিণী।
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী॥
পাড়ার লোক পুঁটুর রূপ।
কে দেখবি দেখ্‌সে আয়।
নব ঘন মিশেছে তায়॥

বারবার মেঘ বা ঘনর উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পুঁটু আর যাহাই হউন, গৌরকান্তি নহেন—তিনি মেঘেরই বরণ বা কৃষ্ণকায়, কিন্তু তথাপি তাঁহার রূপের সীমা নাই, সেই রূপ দেখিবার মত। বাংলার শ্যামল বক্ষে ধূলি-মলিন শিশুই সরল সৌন্দর্যের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছে—কেলে সোনা নীলমণির মধ্যেই বাংলার শিশু-সৌন্দর্য রূপ লাভ করিয়া অমরত্বের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু শিশু শ্যামল হউক, গৌরবর্ণই হউক, তাহাকে সর্বদাই আকাশের চাঁদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে,

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ
হিঞ্চে বনে শচী।
ঐ এক চাঁদ ঐ এক চাঁদ
চাঁদে মেশামিশি॥

শিশুর ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে কত অস্পষ্ট স্বপ্ন জননীর চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যায়, কোন কোন সময় একটি স্বপ্ন ছড়ার মধ্য দিয়া গোধূলি-আলোকের মত আপনার স্বর্ণ-কিরণ বিস্তার করে—

পুঁটুরাণীর বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে॥
তারা সোনায় দাঁত ঘষে।
রুই মাছ পটল কত ভারে ভারে আসে॥

এইখানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখিতেছি,—একই ছড়া ছেলে ও মেয়ের উপলক্ষে আবৃত্তি করা হয়, সেইজন্য বাংলার ছড়ায় পুঁটু

কখনও ছেলে, কখনও মেয়ে—কখনও পুঁটুবাবু, কখনও পুঁটুরাণী, পূর্বে একবার পুঁটু বাবুর পরিচয় পাইয়াছি, এইবার পুঁটুরাণীর সঙ্গে পরিচয় হইল।

পুঁটুরাণীর যে দেশে বিবাহ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তাহা স্বপ্নরাজ্য হইলেও অমরাবতী নহে, ধরণীর ধূলিজাল দিয়াই সেই স্বপ্নরাজ্য-রচনা করা হইয়াছে। একত্র গাই ও বলদ দিয়া চাষ করার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু মাত্র নাই, একটু স্বাতন্ত্র্য আছে মাত্র। সোনায় দাঁত ঘষার মধ্য দিয়া সেদেশের অধিবাসীদিগের একটু ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। স্বপ্ন-রাজ্যের দন্তধাবন করিবার এই প্রণালীটি সর্বজনস্বীকৃত নহে বলিয়া ইহাতেই সমগ্র চিত্রটির উপর স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে; তারপর রুইমাছ ও পটলের সম্ভারের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অবাস্তবতা কিছু মাত্র নাই। অতএব সত্য লইয়া এখানে স্বপ্ন রচিত হইয়াছে, কেবল মাত্র কল্পনার স্বপ্ন রচনা করা হয় নাই। সত্য ও কল্পনা লইয়াই শিশুর সৌন্দর্য—একটিকে বাদ দিয়া আর একটি কদাচ প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য তাহার সম্পর্কিত ছড়ায়ও সত্য ও স্বপ্ন এমনই ভাবে মিশিয়া যায়।

মুসলমান সমাজে গিয়া এই ছড়াটি যে কি ভাবে সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায়,

> নারগিস্‌কে বিয়া দিব উজানতলীর দেশে।[১]
> তারা গাই বলদে চষে।
> তারা পায়ে টাকা ঘষে॥
> এত টাকা নিমু না।
> নারগিস্‌কে বিয়া দিমু না॥

এই ছড়াটির মধ্যে একটি গূঢ় সামাজিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত আছে। নার্গিস্‌কে বিবাহ দিয়া অর্থলাভের কথা এখানে অস্পষ্ট হইয়া নাই। অর্থাৎ এই সমাজে কন্যা-বিক্রয় বা bride price গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দু-সমাজের কোন কোন সূর্যব্রতের ছড়াতেও কন্যা-বিক্রয় প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান মুসলমান এবং হিন্দু সমাজ হইতে এই প্রথা লুপ্ত হইয়া গেলেও যে সমাজ হইতে একদিন এই ছড়াগুলির উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সমাজে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা

১ বেগুনতলীর দেশে এবং কাইয়ামারার দেশে পাঠও প্রচলিত আছে।

যায়। কন্যা-বিক্রয় প্রথা আদিম সমাজের একটি সুপ্রাচীন প্রথা ; ছড়াগুলির মধ্যে আদিম সমাজের বহু পরিচয় যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। বলাই বাহুল্য যে, অর্থ-লাভ সম্পর্কিত ব্যবসায়-বুদ্ধি ছড়াটির মধ্যে প্রবেশ করিবার ফলে ইহার সৌন্দর্য ও স্বপ্নের আবেদনটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ছেলে ভুলানো ছড়ার পরই খেলার ছড়াগুলির কথা উল্লেখ করিব। খেলার প্রকৃতি অনুসারে খেলার ছড়া বিভিন্ন হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, খেলার প্রকৃতির মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ—ছেলেদের খেলা এবং মেয়েদের খেলা। কিছুকাল পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের খেলা অভিন্ন থাকিলেও, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের খেলা ক্রমে পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়—ইহাদের মূল পার্থক্য সম্বন্ধে পূর্বেও একটু আভাস দিয়াছি। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য খেলাধূলা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় খেলাগুলি অধিকাংশ লুপ্ত হইয়া গেলেও ইহাদের সংক্রান্ত যে সকল ছড়া ইতিপূর্বেই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের ছেলে কিংবা মেয়ে কাহার সঙ্গে মৌলিক সম্পর্ক ছিল, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এই ছড়াটি যে মেয়েদের খেলায় প্রচলিত ছিল, তাহা পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে না,

ইচিং বিচিং।
জামাই চিচিং ॥
তায় পল্লো মাকড় বিচিং ॥
মাকড়েরা লড়ে চড়ে।
সাত কুমড়ায় ডিম পাড়ে ॥
এলের পাত।
বেলের পাত ॥
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ ॥
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি।
দুয়ারে বসে চাল কাড়ি ॥
চাল কাড়িতে হ'লো বেলা।
খল্‌সে মাছের চোকা।
উড়ে বসে পোকা ॥

এখানে জামাইর উল্লেখ, ঠাকুরের (শ্বশুর) জগন্নাথ বা পুরী যাত্রা ও দুয়ারে বসিয়া চাল কাড়িবার কথা হইতেই ছড়াটি কাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। মেয়েদের খেলার ছড়ার মধ্যে অন্তর্মুখী জীবনের অর্থাৎ ঘর-সংসার ও পারিবারিক নানা সম্পর্কের উল্লেখ থাকে, ছেলেদের খেলার মধ্যে বহির্মুখী জীবনের একটু স্পর্শ অনুভব করা যায়, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। ছেলেমেয়েদের মিশ্র খেলার ছড়ায় দুইটি ভাবেরই অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায়। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাঁই মিরগেল ঘাঘর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে প'ল ঠুলি।
ঠুলি গেল কমলাফুলি॥
আয়রে কমলা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই॥
কচি কুম্‌ড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল্‌॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, কদমতলায় কেরে।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দেরে॥

এই ছড়াটির প্রথম দুই পদের ব্যাখ্যায় আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ইহা ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা; অতএব ইহার মধ্যে একটি পৌরুষ বা বীরত্বের স্পর্শ আছে, তাহা অল্পবয়স্ক ছেলেদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া তাহা লইয়াই তাহাদের খেলার ছড়া রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ছড়াটির শেষাংশের মধ্যে মেয়েলী ভাবের স্পর্শ রহিয়াছে; পান-গুয়া খাওয়া, কচি কুম্‌ড়োর ঝোল রাঁধা, মাথায় কাপড় দেওয়া ইত্যাদির উল্লেখ হইতে কালক্রমে ইহার মধ্যে যে মেয়েদেরও অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই প্রকার মিশ্র ছড়ার আর একটি রূপ প্রশ্নোত্তর-বাচক; যেমন,

কি কথা? বেঙের মাথা।
কেমন বেঙ্‌? সুরু বেঙ্‌
কেমন সুরু? বামন সুরু।
কেমন বামন? ভাট বামন।

কেমন ভাট? ঘোড়ার চাট।
কেমন ঘোড়া? আচ্ছা ঘোড়া।
কেমন আচ্ছা? বাঁদর বাচ্চা।
কেমন বাঁদর? মুড়ার বাঁদর।
কেমন মুড়া? পাতা মুড়া।
কেমন পাতা? মিছা কথা।

ইহার একটি পাঠান্তর এই—

একটা কথা জানি।
কি কথা?
ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ?
সরু ব্যাঙ।
কি সরু?
দামড়া গরু।
কি দামড়া?
পিঁয়াজ কাম্‌ড়া।

যাহাকে পিঁয়াজ কামড়াইতে বলা হইবে, সে এই খেলায় পরাজয় স্বীকার করিবে। সাধারণতঃ বাদ্‌লার দিনে কিংবা সন্ধ্যার পর স্বল্পালোকিত গৃহকোণে বসিয়া ভাই-ভগিনী মিলিয়া এই প্রকার প্রশ্নোত্তরের খেলা খেলিয়া থাকে। অন্তর যখন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, তখন সামান্য উপকরণের স্পর্শেই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সামান্য কয়েকটি কথা, অথচ ইহাদের আবৃত্তির ভিতর দিয়া আনন্দের আর সীমা থাকে না। সকল সময়ই যে এই শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর-বাচক ছেলেখেলার ছড়া সমবয়স্ক ভ্রাতা ও ভগিনী কিংবা অন্যান্য সম্পর্কিত বালক-বালিকাদিগের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা নহে—নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি মাতা ও শিশুর মধ্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া মনে হয়, অবশ্য জননীই এখানে শিশুর পক্ষ হইয়া প্রশ্নের জবাবগুলি দিয়া থাকেন; যেমন,

কেমন বাঁদর? বনের বাঁদর।
কেমন বন? সুন্দর বন।

কেমন সুন্দর? খোকার বদন।
কেমন খোকা? আচ্ছা খোকা।
এই খোকাটি কাদের?
কপাল ভাল যাদের।

শেষ দুইটি পদে স্বতন্ত্র একটি ছড়ার অংশ আসিয়া এখানে যুক্ত হইয়াছে।

ছেলে ও মেয়ে যতই বয়সের দিক দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহাদের আমোদ-প্রমোদের ধারাও সুস্পষ্টরূপে পৃথক্ হইয়া যায়। ক্রমে পূর্বে যে তাহারা এক সঙ্গে মিলিয়া খেলাধূলা করিত, তাহার আর কোন সংস্কারই তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। নিজস্ব খেলার দিক দিয়া তখন বালকের মন অগ্রসর হইতে থাকিলেও, বালিকার মন তখন গৃহকর্মে নিবিষ্ট হইয়া যায়, খেলার চাপল্য তাহার অল্পদিনের মধ্যেই তিরোহিত হয়। ছেলেদিগের বিশিষ্ট প্রকৃতির খেলার মধ্যে হা-ডু-ডু-ডু খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহার কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ছড়ার মধ্যে একটু পুরুষোচিত প্রাণশক্তির স্পর্শ অনুভব করা যায়—

ছি মারুম শিকলের গোটা।
হাতি মারুম মোটা মোটা॥
মইষ মারুম লাফে।
তরওয়াল কাঁপে॥
তরওয়ালের ঝিকিমিকি।
বাবুই নাচে............

যতক্ষণ নিঃশ্বাস রাখিতে পারে, ততক্ষণ খেলোয়াড় কেবল শেষ চরণটি বার বার আবৃত্তি করিতে থাকে। তারপর আরও একটি ছড়া—

এক হাত বোল্লা বার হাত শিং।
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং॥
ধা তিং তিং............

এক নিঃশ্বাসে এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করিবার নাম পশ্চিম বঙ্গে 'চু টানা', পূর্ববঙ্গে 'ছি দেওয়া'—শব্দটি একই সূত্র হইতে উদ্ভূত। ছেলেদের বিশিষ্ট আরও অনেক খেলার মধ্যে এই প্রকার ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এ'কথা সত্য যে, ছড়া রচনার মধ্যে মেয়েদের একটি বিশিষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগে, তখন আর তাহাদের খেলিয়া বেড়াইবার অবসর থাকে না, অধিকাংশই গৃহ-সংসারে প্রবেশ করে, সেইজন্য খেলার পরিবর্তে তাহাদের রচনা শিশু ও সংসার-সম্পর্কিত বিষয় অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব মেয়েদের স্বতন্ত্র খেলার ছড়ার সংখ্যা অধিক নাই।

এইবার শিশু-সম্পর্কিত ছড়াগুলি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিব। কতকগুলি সাধারণ চিত্র (common image) শিশু-সম্পর্কিত ছড়াগুলির ভিতর দিয়া প্রায়ই পরিবেশন করা হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, তাহা চাঁদ বা চন্দ্র। শিশু কখনও নিজেই চাঁদ,

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন-চাঁদ।
হিঞ্চে বনে শচী॥
ঐ এক চাঁদ ঐ এক চাঁদ।
চাঁদে মেশামিশি॥

কিন্তু এই চাঁদ আকাশ হইতে ধরিয়া আনা চাঁদ নয়, মাটিতে কুড়াইয়া পাওয়া—

ছুল্‌তে ছুল্‌তে এল বান।
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ॥
এ চাঁদটি কাদের।
কপাল ভাল যাদের॥

আবার শিশু যখন কাঁদিতে থাকে, তখন জননী আকাশের চাঁদের দিকে হাত তুলিয়া ডাকিতে থাকেন। আকাশের চাঁদ হইলে কি হইবে, পার্থিব বস্তুতেই তাহার প্রলোভন!

আয় চান্দ আয় চান্দ।
কলা দিম মোলা দিম।
ধেয়ন গাইয়ের দুধ দিম॥
গাইয়ের নাম চুঙ্গুরী।
ভেকার নাম ভুঙ্গুরী॥ পুড়ুস্‌।

'পুডুস্' শব্দটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জননী তাঁহার ডান হাতের অঙ্গুলি কয়টি একত্র করিয়া তাহা দ্বারা সহসা শিশুর কপাল স্পর্শ পূর্বক একটি ফোঁটা পরাইবার অভিনয় করেন; সঙ্গে সঙ্গে শিশু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, আকাশের চাঁদ মায়ের কোলের উপর পড়িয়া লুটোপুটি খাইতে থাকে।

কলা, মূলা ও ধেয়ন গাইয়ের দুধের মত মাছের মুড়িটির প্রতিও চাঁদের লোভ আছে, মনে করা হয়।

আয় চাঁদ আয়।
আয় চাঁদ আয়॥
আগ কুড়িলে মেজা দিয়ম্।
মাছ কুড়িলে মুড়ি দিয়ম্॥
উইর তলে বাঁধি থইয়ম্।
আয় চাঁদ আয়॥—(চট্টগ্রাম)

সকল দেশের ছেলে ভুলানো ছড়াতেই চাঁদের সঙ্গে শিশুর একটি সম্পর্ক কল্পনা করা হইয়া থাকে। শিশু-সম্পর্কিত ছড়ায় চাঁদ একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও সাধারণ চিত্র (image), এই চাঁদ শিশুর নিবিড়তম আত্মীয়—

আয় আয় চাঁদ মামা
টি দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ
টি দিয়ে যা॥

বাংলার শিশুর নিকট চাঁদ মাতুল। বাংলা প্রবাদে বলে, 'মামার মত কুটুম্ নাই।' অন্যত্র কোন কোন স্থানে চাঁদ জননী এবং আয়ু ও অন্নদাত্রী—

Mother Moon, bless baby
Let him live a hundred thousand years
Moon give him milk and *basi*
Let it come swaying this way
Let it come swaying that way
And straight into baby's mouth.[১]

[১] Elwin and Hivale. op. cit., p. !

শৃগাল বাংলার শিশু-সম্পর্কিত ছড়ার আর একটি সাধারণ চিত্র (common image)। পাখীর মধ্যে টিয়া, পায়রা, শালিখ, কিন্তু বাস্তব জগতের পশুর মধ্যে কেবলমাত্র শৃগালই ছড়ার মধ্য দিয়া নানাভাবে শিশুর বিস্ময় ও রহস্য-বোধের উদ্রেক করিয়াছে—

এক যে ছিল শিয়াল।
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল॥
রৌদ্র উঠে বৃষ্টি পড়ে,
শিয়াল মামা বিয়া করে,
পাতলা (টোকা) মাথায় দিয়া।
শিয়ালের বিয়া হ'ল ক্ষীর নদীর কূল।
এক ছিয়ালী রান্ধে বাড়ে দুই ছিয়ালী খায়। ইত্যাদি।

এখানে দেখা যাইতেছে, কোন শৃগালের পিতা দেয়াল নির্মাণ করিবার মত ব্যয়সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, শৃগাল-মাতুল রৌদ্র-বৃষ্টির খরা ও ঝরার একটু দুর্লভ মুহূর্তের সুযোগ লইয়া নিজের পরিণয়োৎসব নিষ্পন্ন করিতেছেন এবং এই কার্যে চিরাচরিত শোলার মুকুটের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কৃষকের ব্যবহৃত একটি পাত্‌লা বা টোকা দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। সর্বশেষ পদটিতে শৃগালের গৃহকন্নার যে একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে-কোনও গৃহস্থের লোভনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। শৃগালকে শিশু চোখে না দেখিলেও সন্ধ্যায় ঘুমাইবার পূর্বে তাহার ডাক শুনিতে পায়, শৃগালের ডাকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জননী নির্ভয় শিশুর মনে প্রথম ভয়ের সঞ্চার করেন ; সেইজন্য এ'দেশের ছেলেমেয়ের মনে শৃগাল-সম্পর্কিত একটি বিস্ময় ও রহস্যবোধ শিশুকাল হইতেই জন্মলাভ করে— বড় হইয়া শৃগালের ভীরুতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া সেই ভাব বাহিরের দিক দিয়া কাটিয়া গেলেও শৈশবের এই সংস্কার কোনদিন তাহার একেবারে দূর হয় না—একটু বড় হইয়া শৃগাল সম্পর্কে উপকথা বা লৌকিক কাহিনী (folk-tales) শুনিতে ভালবাসে। সেইজন্য বাংলার কথা-সাহিত্যে পশুর মধ্যে শৃগালই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

নাগরিক জীবনের প্রসারের জন্যই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, শৃগাল-সম্পর্কিত প্রাচীন ছড়াগুলি ইতিমধ্যেই বাহ্যতঃ কিছু কিছু

পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার একটি বড় সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। তাহা এখানে উল্লেখ করিব—ইহা হইতে শৃগালের নামটিই যে কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা যে শুধু দেখা যাইবে, তাহা নহে—শিশু-সম্পর্কিত ছড়াগুলিও যে কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত সুপ্রসিদ্ধ ছড়াটির এই পাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন—

(১)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান॥[১]

কোন সময় শিব ঠাকুর নামক কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ অনুমান করিয়াছেন এবং আর একটি ছড়ায় শিব সদাগরের উল্লেখ পাইয়া ইহারা যে একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব, তাহাও মনে করিয়াছেন। কিন্তু নিম্নের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শিব ঠাকুর কোন ব্যক্তির নাম নহে, ইহার অর্থ শিয়াল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত 'খুকুমণির ছড়া'য় এই বিষয়ক এই দুইটি ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে,

(২)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোঁসা করে বাপের বাড়ী যান॥
বাপেদের তেল সিন্দুর মালীদের ফুল।
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো হাজার টাকা মূল॥ (পৃ. ১২)

(৩)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিয়ালের বিয়ে হ'চ্ছে তিন কন্যা দান॥

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ (১৩৪৭), ৫৮৩-৪

এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে এক শিয়ালে খায়।
আর এক শিয়ালে গোঁসা করে বাপের বাড়ী যায় ॥
বাপের বাড়ীর তেল সিন্দুর মালীর বাড়ীর ফুল।
শিয়ালের বিয়ে হ'ল ক্ষীর নদীর কূল ॥
বাপ দেয় ধানদূর্বা মা দেয় ফুল।
এখন খোঁপা বেঁধে দিছে হাজার টাকা মূল ॥ (পৃঃ ১৩)

রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে যেখানে 'শিব ঠাকুর' পাঠ গৃহীত হইয়াছে, সেখানেই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগ্রহে প্রথমত 'শিব ঠাকুর' ও দ্বিতীয়ত 'শিয়ালের' পাঠ গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের একটি অভিমত উল্লেখ করিতেছি,—'আমাদের অঞ্চলে (২৪ পরগণা জিলায়) শিয়ালকে উপহাস করিয়া "শিবরাম পণ্ডিত" বলা যায়। এখানে প্রকৃত পাঠ শিব ঠাকুরের; "শিবু ঠাকুরের" কিংবা "শিয়ালে"র পাঠে ছন্দে ব্যাঘাত হয়: কিন্তু শিব ঠাকুর অর্থে শিয়াল বটে। "বাপেদের তেল সিন্দুর, মালীদের ফুল" পাঠে ছন্দ পতন হয়। "বাপের বাড়ীর তেল সিন্দুর, মালীর বাড়ীর ফুল"— এই পাঠই প্রকৃত। তৃতীয় পাঠে পূরা ছড়াটি রক্ষিত হইয়াছে।'[১] তৃতীয় পাঠে অর্থাৎ শেষ পাঠে পূরা ছড়াটি যদি রক্ষিত হইয়া থাকে, তবে ইহাই প্রাচীনতম এবং 'শিয়ালের' পাঠটি এই পূরা ও প্রাচীনতম ছড়াটিরই অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 'শিয়ালের' দ্বারা ইহার ছন্দ পতন হয় বটে, কিন্তু ছড়ায় ছন্দ সর্বদা নিখুঁত ভাবে রক্ষা পায় না; হ্রস্বকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া ইহাতে মাত্রার ক্ষতিপূরণ করা হয়। অতএব আধুনিক ছন্দোবোধ জাগিবার পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই যে এখানে 'শিব ঠাকুর' বা "শিবু ঠাকুরে'র পরিবর্তে 'শিয়ালের' পাঠই ব্যবহৃত হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ছন্দোবোধে 'শিয়ালের' পাঠে ত্রুটি আছে বলিয়াই ইহা শিয়াল অর্থবাচক 'শিব ঠাকুরের' পাঠে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই ছড়ার একটি পদ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও শিয়ালই যে উক্ত ছড়ার নায়ক, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যথা—

এক ছিয়ালি রান্ধে বাড়ে দুই ছিয়ালি খায়।
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত চড়ি যায়।[২] ইত্যাদি

---

১ "সভাপতির অভিভাষণ," পূর্বময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনী, একাদশ অধিবেশন (কিশোরগঞ্জ, ১৩৪৫) পৃঃ ১০

২ সা-প-প ৯, ৮৩

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, তিন শিয়ালের মধ্যে এক শিয়ালের রাঁধা বাড়া ও অন্য শিয়ালদের খাইবার কথা বাংলার ছড়ার মধ্যে নূতন কিছুই নহে। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, শিয়ালের বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই উক্ত ছড়ায় উদ্দেশ্য, শিব ঠাকুর কিংবা শিব সদাগর নামক কোন ব্যক্তির বিবাহের বর্ণনা এই ছড়ার উদ্দেশ্য নহে।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। শিয়ালের বিবাহ বাংলা ও বাংলার চতুষ্পার্শ্ববর্তী আদিবাসী বিশেষতঃ সাঁওতাল জাতির লোক-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট বিষয়—ইংরেজিতে ইহাকেই motif বলে। বাংলার লৌকিক কথা-সাহিত্যে শিয়ালের বহু বিচিত্র বিবাহের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রৌদ্রের সময় যখন কখনও কখনও বৃষ্টিপাত হয়, তখন শিয়াল মামা কি অভিনব প্রণালীতে বিবাহ করেন, পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়ায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশে শিয়ালের বিবাহ (Jackal's marriage) লোক-সাহিত্যের একটি নিতান্ত সাধারণ ও সুপরিচিত কৌতুককর বিষয়। অতএব এই ছড়াটিতেও শিয়ালের বিবাহের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে, শিব-ঠাকুর কিংবা শিব সদাগর নামক কোন ব্যক্তির বিবাহের কথা নহে। বিষয়ের অসঙ্গতি দ্বারাই ছড়ায় রসসৃষ্টি হইয়া থাকে; শিব নামক কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান কিংবা সদাগরপুত্রের তিন কন্যা বিবাহের মধ্যে কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্বাভাবিকতা নাই; অতএব ইহাতে ছড়ার রস ফুটিতে পারে না—শিয়ালের তিন কন্যা বিবাহের পরিকল্পনার ভিতর দিয়া শিশু-হৃদয়ে কৌতুক-রস স্বভাবতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিয়াল সম্পর্কিত কিছু কিছু ছড়া ইতিপূর্বেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়া ইহাদের মৌলিক রূপ প্রায় প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে—এই ছড়াটি তাহাদের অন্যতম।

পারিবারিক আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শিশু-সম্পর্কিত ছড়ায় মা, মাসি ও মামারই অধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। বাপ, ভাই, ভাই-বৌ ও ভগিনীর উল্লেখ সেই তুলনায় অত্যন্ত বিরল। বলাই বাহুল্য যে, মা-ই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারিণী—

কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে জানিলাম মা বড়ো ধন॥

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, বাংলার ছড়ায় মা'র পরই মাতুলের স্থান, পিতার নহে—

মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।

এখানে 'নয়' কথাটি নিষেধার্থক নহে, বরং তাহার বিপরীত অর্থই জোর দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। মাতুল-সম্পর্কিত আরও একটি ছড়া এই—

মামাগো বাড়ী বউরা বাঁশ।
কাটতে লাগে ছয় মাস॥
মামা তুমি সাক্ষী।
পানির তলে পক্ষী॥
উটকন আনো বাইট্যা দেই।
কন্যা আনো বিয়া দেই।
আলু পাতায় থালুথুলু ভ্যান্না পাতার কস।
এমন কইরা লেইখা দিমু সাত রাজায় বশ॥

মামার সঙ্গে মামীও ছড়ায় বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছেন,

তেতই পাতা তুলসী।
আমার মামী উর্বশী॥
উর্বশী ঝির লম্বা চুল।
বান্‌তে বান্‌তে চাম্পা ফুল॥

চাঁদ মামা, সূর্য মামা, শিয়াল মামা—ছড়ার ভিতর দিয়া শিশুর সকল শ্রেষ্ঠ আত্মীয়ই মাতুল। ইহার যে একটি সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা এখানে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে; তথাপি সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) সমাজ-ব্যবস্থাই যে বাংলার সমাজের মৌলিক ভিত্তি, তাহাই ইহা হইতে প্রমাণিত হয়। ছড়াগুলির মূল প্রেরণা বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী; সেইজন্য ইহাতে শিশুর সম্পর্কে পিতার উল্লেখ প্রায় নাই বলিলেই চলে। মামার পরই মাসির স্থান। পিতার স্থান ইহাতে যেমন সঙ্কুচিত, পিসির স্থানও তেমনই। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মা, মাসি ও মাতুল এক পরিবার-ভুক্ত হইয়া বাস করে, এখনও বাংলার পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চলের আদিবাসী গারো ও খাসি জাতি এই সমাজ-ব্যবস্থারই অধীন। বাংলাদেশেও যে এই সমাজ-

ব্যবস্থাই একদিন প্রচলিত ছিল, এই ছড়াগুলি তাহারই অন্যতম প্রমাণ মাত্র। পরবর্তী কালে উচ্চতর সমাজে কুলীন সন্তানদিগের মাতুল-গৃহে লালিত পালিত হইবার ইতিহাসও ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

সমসাময়িক কালে ছড়া বিশেষ রচিত হয় না, ছড়া পূর্ববর্তী কাল হইতে চলিয়া আসে—তাহা সময়োপযোগী করিয়া কিছু কিছু বাহিরের দিক হইতে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হয় মাত্র ; এই পরিবর্তনেও ইহার অন্তর্নিহিত রস অব্যাহতই থাকিয়া যায়। পরিবর্তনও কেহ সচেতন ভাবে করে না—আপনা হইতেই যেন ইহা পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য কোন সচেতন মন যখন কোন ছড়া রচনা, কিংবা পরিবর্তন করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন করিতে উদ্যোগী হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক রসও যেমন থাকে না, তেমনই তাহাতে সহজ সৌন্দর্যও ফুটিয়া উঠিতে পারে না। অতএব এই সকল প্রয়াস স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। দেশান্তরে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেও শিশুর ছড়া সামান্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন্ ছড়া যে কখন কোথায় প্রথম উদ্ভূত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বাংলার সুপরিচিত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি বাংলার প্রতিবেশী আর্য ও অনার্য ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রচলিত আছে—

বাংলা

আমার কথাটি ফুরা'ল।
নটে' গাছটি মুড়াল ॥
কেন রে নটে' মুড়ালি ?
গরুতে কেন খায় ?
কেন রে গরু খাস ?
রাখাল কেন চরায় না ?
কেন রে রাখাল চরাস না ?
বৌ কেন ভাত দেয় না ?
কেন লো বৌ ভাত দিস না ?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না ?
কেন রে কলাগাছ পাত্ত ফেলিস্ না ?
ব্যাঙ কেন ডাকে না ?
কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না ?

সাপে কেন খায় ?

কেন রে সাপ খাস ?

খাবার ধন খাব নি' ?

গুড়্‌গুড়ুতে যাব নি' ?

ওড়িয়া

মো কথাটি সইলা, ফুল গাছটি মইলা।

হইরে ফুল গছ তু কাহিঁকি মলু ?

মোতে কালী গাই খাই গলা।

হইলো কালী গাই, তু কাহিঁকি খাই গলু ?

মোতে গউড় জগিলা নাহি।

হইরে গউড় তু কাহিঁকি জগিলু নাহি ?

বড় বহু ভাত দেলা নাহিঁ।

হইলো বড় বহু তু কাহিঁকি ভাত দেলু নাহি ?

পুঅ কান্দিলা।

হইরে পুঅ তু কাহিঁকি কান্দিলু ?

মংতে ধূলিয়া জন্দা কামুড়ি দেলা।

হইরে ধূলিয়া জন্দা তু কাহিঁকি কামুড়ি দেলু ?

মু মাটি তলে থাএ, কঁঅল মাউঁস পাইলে রট কার
কামুড় দিএ।[১]

তেলেগু

তারা ধর্‌লে সাতটা মাছ।

সাতটা মাছ দিলে শুকুতে॥

তার মধ্যে একটা মাছ শুকুয় না।

মাছ! মাছ! কেন তুই শুকাস না ?

ডুব্‌লার ডগা কেন ছায়া কর্‌লে ?

ডুব্‌লার ডগা, ডুব্‌লার ডগা, কেন রে ছায়া কর্‌লি ?

গরু কেন চরে নি ?

[১] Kunja Behari Das, *A Study of Orissan Folklore* (Santiniketan, 1953), p. 7.

গরু, গরু কেন রে চরিস্ নি ?
ঠাকুমা কেন আমানি দেয় নি ?
ঠাকুমা, ঠাকুমা, কেন আমানি দিস্‌নি ?
ছেলে কেন কাঁদে ?
ছেলে, ছেলে, কেন রে কাঁদিস্ ?
পিঁপড়া কেন কাম্‌ড়ালে ?
পিঁপড়া, পিঁপড়া, কেন রে কামড়ালি ?
কেন না কাম্‌ড়াব ?
সে কেন আমার গুড় চোরালে, আর আমার ঢিপিতে আঙ্গুল দিলে ?[১]

ওরাওঁ

Cowherd boy
Why do you cut a flute ?
The cow does not come
And so I cut a flute.
Cow
Why do you wait ?
The grass does not sprout
And so I wait.
Grass
Why do you not spring up ?
The rain does not fall
And so I do not sprout.
Rain
Why do you keep away ?
The frog does not call
And so I do not come.

১ South Indian Research, Vol II, No. 1. p. 18. অনুবাদ— মুহম্মদ শহীদুল্লা বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা, ১৯৫৩), পৃ. ১৬০-৬১ ।

Frog

Why do you not cry ?

The snake does not bite me

And so I do not cry.

Snake

Why do you not bite him ?

His wail of pain

Winds in the ear

And so I do not bite.[১]

এতদ্ব্যতীত ছোটনাগপুর ও মধ্যভারতের অন্যান্য কোন কোন আদিবাসীর মধ্যেও এই ছড়াটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মনে হয়, দ্রাবিড়ভাষী উপজাতীয় অঞ্চল হইতে ইহা উড়িষ্যা ও বাংলায় বিস্তার লাভ করিয়াছে।

১ W. G. Archer, *The Dove and the Leopard*, op. cit, p. 85.

ছড়ার একটি নূতন দিক মেয়েলী ব্রতের ছড়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। শিশুর জগৎ অকারণ হাসি-আনন্দের জগৎ, কুমারী কিংবা বিবাহিতা নারীর জগৎ তাহা নহে। কুমারীর চোখে ভবিষ্যৎ ব্যবহারিক জীবনের স্বপ্ন নাচিয়া বেড়ায়, বিবাহিতা নারীর জীবনেও ঐহিক সুখ সমৃদ্ধিই একান্ত কাম্য হইয়া উঠে। অতএব তাহাদের জীবনের আচার-আচরণ ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করিয়া যে ছড়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা শিশু-সম্পর্কিত ছড়া হইতে যে স্বতন্ত্র হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কুমারী ও সধবা নারীদিগের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্যান-ধারণা যাহার ভিতর দিয়া রূপ পায়, তাহার নামই মেয়েলী ব্রত। মেয়েলী ব্রতের কোনও সুদূর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নাই, যে-সকল কামনা নারী প্রত্যক্ষভাবে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রতের আচার পালনের ভিতর দিয়া তাহাই অকপটে প্রকাশ করিতে পারে; কারণ, ব্রতের ছড়াগুলি ব্রতের মন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয়। নারী-হৃদয়ের সহজাত আকাঙ্ক্ষা হইতে ইহারা জাত হইলেও একটা আচারগত (ritualistic) আবরণ ইহাদের উপর আছে বলিয়া ইহারা প্রত্যক্ষ জগতের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহারা এতই প্রত্যক্ষ যে, ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কাহারও নিকট গোপন থাকে না। সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় একটি দোলা আঁকিয়া কুমারী তাহার উপর একটি প্রদীপ স্থাপন করে, তারপর হাতে দূর্বা লইয়া যখন ছড়া বলে—

দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই॥
বাপের বাড়ীর দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ী যায়।
আস্‌তে যেতে দোলাখানি
ঘৃত মধু খায়॥

তখন ইহার উপর আচারগত আবরণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহার বাস্তব উদ্দেশ্য আর গোপন থাকে না। অতএব মন্ত্রের ছড়া (যেমন সাপের মন্ত্র প্রভৃতি) ও ব্রতের ছড়া যে এক নহে, তাহা অনুভব করিতেও বেগ পাইতে হয় না। সুতরাং ব্রতের ছড়াগুলি বিশেষ বিশেষ আচার পালন করিয়া আবৃত্তি করা

হইলেও, ইহারা মন্ত্র নহে—ইহাদের মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, ইহাদের ভিতর দিয়া মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সহজ বিকাশ হইয়াছে বলিয়া ইহারাও লোক-সাহিত্যের ছড়া বিভাগের অন্তর্গত।

মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্রত লুপ্ত হইয়া গেলেও ছড়াগুলি সহজে পরিবর্তিত হয় না; কারণ, ছড়াগুলির একটি ঐন্দ্রজালিক (magical) শক্তি আছে বলিয়া মনে করা হয়, ইহারা পরিবর্তিত কিংবা কোন উপায়ে বিকৃত হইলে ইহাদের সেই শক্তি বিনষ্ট হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছড়াগুলির ভাষা যে প্রাচীন, তাহা নহে। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ইহাদেরও ভাষা যে বাহিরের দিক দিয়া ক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা সত্য—তবে ইহাতে ইচ্ছামত নূতন নূতন বিষয় প্রবিষ্ট ও প্রচলিত বিষয় পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। ভাষার দিক দিয়া যদি ইহাদের প্রাচীনত্ব রক্ষা পাইত, তবে ইহারা ছড়া না হইয়া মন্ত্র হইত; কৃত্রিম আচার পালন অপেক্ষা সহজ মানবিক অনুভূতির সঙ্গে ইহাদের অধিকতর যোগ বলিয়া মানবিক ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে ইহারাও যুক্ত হইয়া চলিয়াছে; সেইজন্য ইহাদের ভাষা সহজেই পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে।

ভাষার পরিবর্তন অলক্ষ্যে ঘটিয়া থাকে, বিষয়ের পরিবর্তন অনেক সময় সচেতন মনের ক্রিয়া। মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলি সম্পর্কে বর্ষীয়সী নারীদিগের মনে যে সংস্কার আছে, তাহা হইতেই কোন সচেতন মন ইহাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; সেইজন্য নূতন উপকরণ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথও রুদ্ধ হইয়া যায়—পুরাতন বিষয়-বস্তু লইয়াই ইহাদের ব্যবসায় চলিতে থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বর্তমান সমাজে বহু-বিবাহ প্রথা লুপ্ত হইয়াছে, সতীনের বিড়ম্বনা বাঙ্গালী নারীদিগকে আর সহ্য করিতে হয় না। তথাপি আজ পর্যন্ত যে সেঁজুতি ব্রতের ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সতীন সম্পর্কে এই প্রকার উল্লেখ থাকে—

অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আল্‌তা পরি॥
সাত সতীনের সাত কৌটা।

তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটা ॥
অভ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি ॥

বাংলার হিন্দু মেয়েদের স্বামী যে যুগে ফার্সি পড়িলে উচ্চ রাজকার্য লাভ করিয়া ব্যবহারিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিত, সেই যুগ আজ আর নাই; কিন্তু তথাপি সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় একটি আর্‌শি আঁকিয়া তাহার উপর দূর্বা দিয়া কুমারী মেয়েরা আবৃত্তি করিয়া থাকে,

আর্‌শি আর্‌শি আর্‌শি।
আমার স্বামী পড়ুক ফার্সী ॥

বর্তমানে ফার্সী পড়িবার পরিবর্তে বরং অন্য ভাষায় জ্ঞানার্জন করিলে ঐহিক উন্নতি-লাভ সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ব্রতের ছড়া সেই অনুসারে পরিবর্তন হইবার উপায় নাই—প্রয়োজন বোধ করিলে ব্রত পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহার ছড়া পরিবর্তিত হইতে পারে না। বাংলার কুমারীরা কোন কোন অঞ্চলে আজ পর্যন্তও সেঁজুতি ব্রত পালন করিয়া থাকে এবং তাহাতে আজিও তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বামীর ফার্সী ভাষায় জ্ঞানলাভের প্রার্থনা জানায়।

নূতন নূতন ব্রত যেমন প্রয়োজনানুসারে পরিকল্পিত হয় না, তেমনই ইহার জন্য নূতন ছড়াও রচিত হয় না। ব্রতের ছড়াগুলির অন্য আর কোন প্রয়োজন নাই; সেইজন্য ব্রত লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলিও লুপ্ত হইয়া যায়। শিশু-সম্পর্কিত ছড়া হইতে ব্রতের ছড়াগুলি অল্পায়ু এবং অল্প পরিসরের মধ্যে প্রচার লাভ করে—ব্রতানুষ্ঠান ব্যতীত ছড়াগুলি কদাচ আবৃত্তি করা হয় না, সেইজন্য কুমারী মেয়েরা অধিকাংশ ব্রত পালন করিলেও বর্ষীয়সী মহিলাদিগের সহায়তা ব্যতীত তাহারা ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতে পারে না। শিশু-সম্পর্কিত ছড়ায় অনেক সময় যেমন একটি সর্বজনীন আবেদন থাকে, মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির তেমন থাকে না। অকারণ আনন্দ হইতে শিশু-সম্পর্কিত ছড়ার উদ্ভব হয়; কিন্তু প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির জন্ম হয়—ভাবের দিক দিয়া ইহাদের এই পার্থক্য সর্বত্রই সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। শিশুর চড়ার জগৎ স্বপ্নের জগৎ—ব্রতের ছড়ার জগৎ সত্যের জগৎ; শিশুর

প্রত্যেক ছড়ায় আনুপূর্বিক এক একটি রস ফুটিয়া উঠে, মেয়েলী ব্রতের ছড়ায় সেই রস প্রায়ই থাকে না—প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষিপ্ত ভাষণে ইহাদের ভিতর প্রকাশ পায়—ভাষায় কিংবা চিত্রে ইহাতে রস-সৃষ্টির বিশেষ কোন অবকাশ পাওয়া যায় না।/

নারীর ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সকল দিক অবলম্বন করিয়াই ব্রতের ছড়াগুলি রচিত হইয়া থাকে। কুমারী-জীবনে যমপুকুর ব্রতানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া পিতৃ-সংসারের সম্পদ কামনা করা হয়—

শুষনী কলমী ল ল করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
মারণ পক্ষী সুকোর বিল।
সোনার কৌটা রূপার খিল॥
খিল খুল্‌তে লাগ্‌ল ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক্ লক্ষেশ্বর॥

সন্ধ্যামণি ব্রতের ভিতর দিয়া সাত ভায়ের বোন্ হইবার কামনা জানায়—

সন্ধ্যামণি কনক তারা।
সন্ধ্যামণি জলের ঝারা॥
সন্ধ্যামণি করে কে।
সাত ভায়ের বোন যে॥
আলো ধানে কাল পুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োতে॥

ব্রতের কোন কামনাই ইহজগৎ অতিক্রম করিয়া পরলোকে গিয়া পৌঁছায় না। মাতাপিতা, ভাইভগিনী, স্বামিপুত্র, ধনৈশ্বর্য, রূপ, যশ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াই ইহার সকল কামনা-বাসনা প্রকাশ পায়। কুমারীদিগের হরিচরণ ব্রতের এই ছড়াটির মধ্য দিয়া নারীহৃদয়ের সকল কামনাই যেন এক সঙ্গে কথা কহিয়া উঠিয়াছে—

হরির চরণ হরির পা, হরি বলেন ওগো মা।
আজ কেন মা পা'টি শীতল, কোন রমণী পূজছে মা বল্।

সে যুবতী কি চায় বর, চায় বুঝি তার মনোমত বর।
রামের মত স্বামী পাবে, লক্ষ্মণের মত দেবর হবে।
কৌশল্যার মত শাশুড়ী চায়, আর কি চায় মা আর কি চায়।
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়, সবার সেরা জামাই চায়।
আন্‌লার কাপড় দল্‌দল করে, সিঁথির সিঁদূর ঝল্‌মল্‌ করে।
পায়ের আল্‌তা টকটক করে, ঘটী বাটী সব ঝক্‌ঝক্ করে।
গোয়ালে গরু খামারে ধান, যুগ যুগ যেন বাড়ে মান।
বছর বছর পুত্র হোক, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে রোক।
এক গলা গঙ্গার জলে, মরণ হবে স্বামী-পুত্রের কোলে।

ব্রতের ছড়াগুলির ভিতর দিয়া এই প্রকার সহজ মানবিক কামনা সর্বত্র ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাদের এই মানবিকতার সম্পর্কের জন্যই ইহারা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করা যায়। তবে ইহাদের সম্পর্কে একটি কথা এই যে, ইহাদের প্রকাশ অত্যন্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ, ইহাদের আঙ্গিকের মধ্যে অনাবশ্যক জটিলতা নাই। আঙ্গিকের যে অনাবশ্যক বিস্তারের মধ্যে ছেলে-ভুলানো ছড়ার রস সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাদের সেই বিস্তার নাই বলিয়াই ইহাদের মধ্যে রস জমাট বাঁধিতে পারে না; তথাপি ছড়ার স্বাভাবিক ধর্ম ইহাদের মধ্যে সকল সময় পরিত্যক্ত হয় না। একটি দৃষ্টান্ত এই—

কুঁচকুচুতি কুঁচুই বন।
কেন রে কুঁচুই এতক্ষণ॥
মোহর এল ছালা ছালা।
তাই তুল্‌তে এত বেলা॥

এখানে কুঁচকুচুতি কিংবা কুঁচুই বনের সঙ্গে ছালা ছালা মোহর আসিবার কোন সম্পর্ক নাই। কেবল মাত্র ধ্বনি-রস সৃষ্টি করিবার জন্য ছড়ায় যেমন অনাবশ্যক চিত্র যোজনা করা হইয়া থাকে, ইহাতেও তাহাই করা হইয়াছে—কুঁচকুচুতি কুঁচুই বন—ইহা এই ছড়ার মধ্যে একটি অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্ন চিত্র, কিন্তু তাহা দ্বারা যে ইহাতে একটি রস সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ছড়ার পক্ষে অনাবশ্যক নহে বরং নিতান্ত আবশ্যক। ছড়ার এই বিশিষ্ট ধর্মটি ব্রতের ছড়ার ভিতর দিয়া কোন কোন সময় প্রকাশ পাইয়াছে—শিশুর ছড়ার মত সর্বদা প্রকাশ পায় নাই।

পূর্বে বলিয়াছি যে, ব্রতের ছড়া সচেতন ভাবে কেহ পরিবর্তন করে না, কিন্তু যে সাহিত্য কেবল মাত্র মুখে মুখে প্রচার লাভ করে, অজ্ঞানতঃও তাহা যে পরিমাণ পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহার মাত্রাও নিতান্ত অল্প নহে। মৌখিক সাহিত্য (oral literature) মাত্রই পরিবর্তনের অধীন। ব্রতের ছড়াগুলি পরিবর্তনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, তাহা যে রক্ষা পাইতে পারে নাই, তাহা যমপুকুর ব্রতের এই কয়টি বিভিন্ন পাঠ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নলিখিত ইহার তিনটি পাঠের মধ্যে প্রথমটি অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনী'তে, দ্বিতীয়টি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত 'খুকুমণির ছড়া'য় ও তৃতীয়টি বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সচিত্র মেয়েদের ব্রতকথা'র সংগৃহীত পাঠ। গ্রন্থকার-সংগৃহীত ইহার চতুর্থ একটি পাঠ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১)

শুষুণী কল্‌মী ন ন করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী সুখের বিল ;
সোনার কৌটা রূপোর খিল।
খিল খুল্‌তে হাতে ছড়।
আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর।

(২)

হেলেঞ্চা কল্‌মী লক্ লক্ করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
মারেন পক্ষী, শুকোয় বিল,
সোনার কৌটা, রূপোর খিল ;
খিল্ খুল্‌তে লাগ্‌ল ছড়,
আমার ভাই বাপ—ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর।

(৩)

শুষ্‌নী কল্‌মী ল ল করে,
রাজার বেটা পাখী মারে।

মারণ পাখী স্থকোর বিল,
সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল্ খুল্তে লাগ্ল ছড়,
আমার বাপ-ভাই হোক লক্কেশ্বর।

কিন্তু এই পরিবর্তনের ধারার মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ইহাতে কখনও এক ছড়ার অংশ অন্য ছড়ায় যুক্ত হয় না, প্রচলিত পদটি আনুপূর্বিক পরিবর্তিতও হয় না। ইহার পরিবর্তন শব্দের পরিবর্তন মাত্র, পদের পরিবর্তন নহে, যেমন শুষ্‌নী শাকের পরিবর্তে একস্থলে হেলেঞ্চা শাক হইয়াছে, লক্ষেশ্বরের স্থলে লক্কেশ্বর হইয়াছে। মৌখিক সাহিত্যের এই পরিবর্তন অপরিহার্য; কারণ, অনেক সময় উচ্চারণের অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার জন্য একটি শব্দের পরিবর্তে সমোচার্য অন্য একটি শব্দ শ্রুত হইতে পারে। যতই সতর্কতা অবলম্বন করা যাউক না কেন, লিখিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুরই বিশিষ্ট কোনও রূপ স্থিরীকৃত (standardised) হইতে পারে না। শিশুর ছড়াগুলির মত ব্রতের ছড়াগুলি ইচ্ছামত পরিবর্তিত হয় না, এই কথাই এখানে আমার বক্তব্য।

মাগনের ছড়াগুলিকেও ব্রতের ছড়ার অন্তর্গত আলোচনা করা যাইতে পারে। বিশেষ কোন কোন লৌকিক দেবতার পূজার উদ্দেশ্যে ছড়া আবৃত্তি করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে চাউল ডাইল ইত্যাদি ভোজ্য সংগ্রহ করা হয়। ইহা কোন কোন অঞ্চলে পল্লীর কৃষক ছেলেরাও করিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের ঘেঁটুর ছড়া ও পূর্ববঙ্গের বাঘাইর ছড়া ইহাদের অন্তর্গত। ছড়ার সমস্ত আঙ্গিক ইহাদের মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে রক্ষা পাইয়া থাকে। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত বাঘাই ব্রতের মাগনের ছড়াটি এখানে আংশিক উদ্ধৃত করিতেছি—

এই বাড়ীতে আইলাম আগে।
দুষ্‌মন বাদীরে খাইলো বাঘে॥
বড় ঘর বড় ঘর।
বড়ঘরের উলুছানি।
লক্ষ্মী আইলাইন চারিখানি॥
আইলাইন লক্ষ্মী দিলাইন বর্।
চাউল কড়িটি বাইর কর॥

চাউল না দিয়া দিলে কড়ি।
তারে করলাম্ লড়িধরি॥ ইত্যাদি

গোর্খ বলিয়া পরিচিত গো-রক্ষক এক দেবতার নামে পূর্ববঙ্গে কতকগুলি ছড়া প্রচলিত আছে। নবপ্রসূতি গাভীর দুগ্ধ দ্বারা লাড্ডু প্রস্তুত করিয়া গোর্খকে নিবেদন করা হইয়া থাকে, এই সম্পর্কেই ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়। নাথগুরু গোর্খনাথ বা গোরক্ষনাথের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ইনি গো-রক্ষক স্থানীয় লৌকিক দেবতা মাত্র। ইহার ছড়ার কতক অংশ এই প্রকার—

থুব থুব থুব।
থুব রাণা থুব বাজে।
তাল বাজে কি ঝুমুর বাজে॥
বাজে থুব করতাল।
আমার গোরখ জগত মাল॥
জগত মাল নিমি ঝিমি।
সোনার বাঁধুম পাঁচটিমি॥ ইত্যাদি

উপরি-উদ্ধৃত মাগনের ও গোর্খের ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে; ইহারা বিশেষ এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ মাত্র—এই দিক দিয়া ইহাদিগকে আঞ্চলিক (regional) বলা যাইতে পারে। ব্রতের ছড়াগুলি যেমন হিন্দু সমাজের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া একদিকে কাছাড় হইতে মানভুম ও অপর দিকে জলপাইগুড়ি হইতে খুলনা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহাদের সেই সুযোগ হয় নাই। উচ্চতর হিন্দুসমাজের মধ্যে ইহারা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া ইহারা ইহাদের নিজস্ব অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রচারিত হয় নাই। নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিবার ফলে ইহাদের ভাষায় যেমন প্রাদেশিকতা দেখা যায়, ইহাদের ভাবের মধ্যেও তেমনই সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা যায়। মাগনের ছড়াগুলি কোন কোন অঞ্চলে ছেলেরা আবৃত্তি করে বলিয়া অনেক সময় অনেক ছেলেখেলার ছড়াও ইহাদের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন,

ঘরত বাইর অইল বুড়ী।
বুড়ীরে খাইল বাঘে॥

হেই বাঘ কি অইল ?—জঙ্গলায় পলাইল।
হেই জঙ্গল কি অইল ?—রাখালে পুড়িল।
হেই ছাই কি অইল ?—ধুবায় কাপড় ধুইল।
হেই কাপড় কি অইল ?—বাইড়া বল্‌দে খাইল।
হেই বলদ কি অইল ?—গাঙ্গে সাঁতার দিল।
হেই গাঙ্গের মাছ কি অইল ?—কাগ্‌ বগায় খাইল।
হেই কাগ কি অইল ?—গাছের ডালে বইল।
হেই ডাল কি অইল ?—ঝইরা পড়্‌ল।
থুবো থুবো ॥

নিম্নোদ্ধৃত ছেলেখেলার প্রশ্নোত্তর-বাচক ছড়া দুইটির সঙ্গে উপরি-উদ্ধৃত মাগনের ছড়াটির তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খেলার ছড়াই সাধারণতঃ মাগনের সময়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বদা রক্ষা করা হয় না। ইহার অর্থ এই যে, ছেলেদের নিকট মাগনও খেলারই অঙ্গ—ইহার কোন ধর্মীয় পরিচয় নাই।

(১)

ঘুগ্‌ঘু—ঘু।
ঘুগ্‌ঘু—ঘু ॥
কি ছ্যালা হইল ?
ব্যাটুটা হইল।
ব্যাটুটা কই ?
মাছ মার্‌তে গেল।
মাছ কই ?
চিলেহ্‌ লিল।
চিল কই ?
উইড়া ধুইড়া গেল।
ধোবার মাগো ধোবার মা।
কাঠ কুড়াতে গেলি ॥
ছ'খান কাপড় পেলি।
ছ' বহুকে দিলি।

আপনি মলি জাড়ে।
ঠিক ঠিক দুপ্পহরে ॥
লাল ঘোড়ার বাছারি।
তুল্যা তুল্যা আছাড় দিই ॥ —(রাজসাহী)

(২)

ঘু-ঘু-র-ঘু মইষর ছা।
মইষ কডে চরে ?—খালে নালে।
দুধ কঁতাইন পায় ?—থোরা থোরা।
বেচে কি দর ?—কড়া কড়া।
গা কা মেড়া ?—ভাতে মেড়া।
ভাত কনে ন দেয় ?—বউএ ন দেয়।
বউয়রে ধরি মারিত্ না পারস্ ?—পোআ ছা কাঁদে।
পোআর নাম কি নাম ?—অলম্ মলই।
তোর নাম কি নাম ?—নাউট্টা চড়ই। —(চট্টগ্রাম)

অতএব দেখা যাইতেছে, অনেক খেলার ছড়া ও ব্রতোপলক্ষে মাগনের ছড়া এক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, মেয়েলী ব্রতের কোন কোন ছড়াও মূলত ছোট ছোট মেয়েদের খেলার ছড়া হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল; কারণ, প্রথম খেলা, তারপর ব্রত। অতএব পূর্বালোচিত শিশুর ছড়ার সঙ্গে ব্রতের ছড়াগুলিরও একটি আভ্যন্তরিক যোগ আছে।

গাজন বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ইহা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অনুযায়ী শিবের গাজন, আদ্যের গাজন, নীলের গাজন, ধর্মের গাজন ইত্যাদি নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা আদিম কৃষিজীবী সমাজের একটি বর্ষা-বোধন উৎসব (rain-invoking ceremony) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ছোটনাগপুরের আদিবাসী জাতির সহ্রুল উৎসবেরই ইহা একটি বাঙ্গালী সংস্করণ মাত্র। অবশ্য ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে আরও কিছু কিছু স্বতন্ত্র আচার গিয়াও প্রবেশ করিয়াছে। আদিম সমাজের ঋতু-বোধন উৎসব মাত্রই নানা ঐন্দ্রজালিক (magical) ক্রিয়ার ভিতর দিয়া নিষ্পন্ন করা হয়—গাজন উৎসবেও নানা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার কিছু কিছু অবশেষ

এখনও বর্তমান আছে। এই উৎসবের বিবিধ ক্রিয়া উপলক্ষে বহুকাল যাবৎই এ'দেশে বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি করা হইতেছে। ছড়াই ইহার মন্ত্র। 'শূন্য-পুরাণ' নামক গ্রন্থে এই উৎসবের কিছু কিছু প্রাচীন ছড়া সংকলিত হইয়াছে। ধর্মের গাজন উপলক্ষে চাষ করিবার যে একটি আচার পালন করা হয়, তাহার একটি প্রাচীন ছড়া এই প্রকার—

যখন আছেন গোঁসাই হয়া দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশর॥
রজনী পরভাতে ভিক্ষার লাগি যাই।
কোথাএ পাই কোথাএ না পাই॥
হর্তুকী বএড়া তাহে করি দিন পাত।
কত হরষ গোঁসাই ভিক্ষাএ ভাত॥
আমার বচনে গোঁসাই তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হয় গোঁসাই কখন উপবাস॥ ইত্যাদি

আধুনিক কালে মালদহ জিলায় অনুষ্ঠিত শিবের গাজনে অনুরূপ প্রসঙ্গে এই ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়—

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচ্‌নীপাড়া।
কুচ্‌নীপাড়া হইতে দিয়ে এল সাড়া॥
কার্পাস তুলিয়া দিল গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা বুনিল স্তা মহাদেব বুনিল তাঁত।
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানী।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী॥ ইত্যাদি

গাজন উপলক্ষে নানা লৌকিক দেবদেবী-পূজার বিবিধ উপকরণ প্রভৃতি বন্দনায় এই প্রকার বিভিন্ন ছড়া আনুষ্ঠানিক ভাবে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত গাজনোৎসবের মধ্যে যে সকল ছড়া ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সর্বত্রই যে ঐক্য আছে, তাহা নহে; বরং সর্বত্রই পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের কেন্দ্রগত যে একটি ঐক্য আছে, তাহা অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না।

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই শিবের ছড়া নামক এক প্রকার ছড়া প্রচলিত আছে, তাহাতে পার্বতীর শঙ্খ-পরিধানের অভিলাষ ও এই সম্পর্কে তাঁহার সহিত পার্বতীর কলহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়া থাকে। এই বিষয়টি কালক্রমে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি আনুপূর্বিক কাহিনী সংবদ্ধ আছে ; অতএব ইহা ছড়া নহে, বরং গীতিকা (ballad)। অতএব গীতিকার মধ্যেই ইহাদিগের আলোচনা করা যাইবে।

ছোট মেয়েরা ঝগড়া করিয়া যখন আড়ি দেয়, তখনও ছড়া বলে,

আড়ি আড়ি আড়ি।
আমি চলি বাড়ী॥
তুই চল ঘর।
কি করবি কর॥
হনুমানের লেজ ধ'রে
টানা টানি কর॥

যখন 'কিরা' কিংবা দিব্যি দেয়, তখন বলে,

তোর উপর চড়া।
কিরা থাক্‌ল কড়া॥
ঢেঁকির উপর রক্ত।
আমার কিরা শক্ত॥
কাঁচা কঞ্চি পাকা বাঁশ।
কিরা থাক্‌ল বার মাস॥

এই 'কিরা' কাটাইবারও ছড়া আছে—

এ' পারে কলার গাছ, ও পারে কলার গাছ।
তোর কিরা কাট্‌ল ঘাসাঘাস॥
কড়া পাইলের হাইস্যা।
গেল তোর কিরা ফাস্যা॥
ঠিলির উপর ঠিলি।
তোর কিরা গিলি॥

প্রকৃতি

বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ, কৃষি-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় বাংলার কতকগুলি ছড়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল ছড়া 'খনার বচন' নামে পরিচিত। খনা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহে—খনার অর্থ খাঁদা ; বাঙ্গালী কৃষকের শস্যগণনা, হলচালনা, শস্যরোপণ ও কর্তনের সময় নিরূপণ, আলিবন্ধন প্রণালী, বন্যাগণনা, বৃষ্টি গণনা, কুয়াশা-গণনা, ধান্যাদি, মড়ক গণনা ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান খনা নামের মধ্যে যেন একটি মূর্তি লাভ করিয়াছে। অতএব তাঁহার অবির্ভাব-কাল সম্পর্কে কোন অনুমান করিয়া এই ছড়াগুলির উদ্ভবের সময় নির্ণয় করিবার প্রয়াস অর্থহীন। বাঙ্গালীর ফলিত জ্যোতিষ ও কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানই ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ; অতএব পূর্বালোচিত অন্যান্য ছড়ার তুলনায় ইহাদের ব্যবহারিক (practical) মূল্য অনেক বেশি। ইহাতে ধান্যরোপণ করিবার এই নির্দেশ পাওয়া যায়, যেমন,

শ্রাবণের পূরো, ভাদ্রের বারো।
এর মধ্যে যত পারো॥

অর্থাৎ পূরা শ্রাবণ মাস ও ভাদ্র মাসের বার তারিখের মধ্যে ধান্য রোপণ করিবার সময়। কোন্ শস্যে কত চাষ দেওয়া প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

ষোল চাষে মূলা। তার অর্ধেক তূলা॥
তার অর্ধেক ধান। বিনা চাষে পান॥

কোন্ কোন্ দিন কি কারণে হাল চাষ করিতে নাই, সেই সম্পর্কে শুনিতে পাওয়া যায়,

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ হয় চিরকাল॥
তার বলদের হয় বাত। ঘরে তার না থাকে ভাত॥
খনা বলে আমার বাণী। যে চষে তার হবে হানি॥

কৃষি-কার্যে রৌদ্র ও ছায়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে,

ডেকে ডেকে খনা গান। রোদে ধান ছায়ায় পান॥

কদলী চাষ করিবার প্রণালী ও উপকারিতা সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে,

সাত হাতে তিন বিঘতে। কলা লাগাবে মায়ে পুতে॥
লাগিয়ে কলা না কাটো পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

এই ভাবে বাংলাদেশে যে সকল শস্য জন্মে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই চাষ করিবার প্রণালী ও সেই শস্য গৃহে তুলিয়া আনিবার পূর্ব পর্যন্ত কি কি বিবিধ উপায়ে তাহাদের পরিচর্যা করা উচিত, তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই ছড়াগুলি হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী কৃষকের নিত্য-সঙ্গী; যখন যে ফসল তাহারা চাষ করে, তখনই এই সম্পর্কিত ছড়া তাহারা স্মরণ করে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করিয়া এই ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের প্রচার সাধারণতঃ বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও, কোন কোন ছড়া উড়িষ্যা ও আসামে প্রচার লাভ করিয়াছিল। নিম্নে একটি বাংলা ছড়া উড়িষ্যায় গিয়া কি রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা নির্দেশ করিতেছি,

বাংলা

হাত বিশে করি ফাঁক।
আম কাঁঠাল পুতে রাখ॥
গাছাগাছি ঘন সবে না।
ফল তাতে ফল্‌বে না॥

ওড়িয়া

হাত বিশো করি ফাঁক।
অম্ব কণ্ঠল পুথি রাখ॥
গছ গছলি ঘন হেবো না।
গছ হেব ত ফল হেব না॥

এই ছড়াগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের পরিবর্তন প্রায় হয় না বলিলেই চলে। এমন কি, যে ছড়াটি বাংলাদেশ হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত গিয়াছে, তাহাও আশানুরূপ পরিবর্তিত হয় নাই—কেবল কয়েকটি বাংলা শব্দের স্থলে ওড়িয়া শব্দ গৃহীত হইয়াছে—অতএব ইহাও প্রকৃত পক্ষে পরিবর্তন নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেকটি শব্দেরই এক একটি

ব্যবহারিক মূল্য আছে। শব্দটি পরিবর্তিত হইলে, সেই মূল্যটি লোপ পায়। সেইজন্য ইহার পরিবর্তনের কোন উপায় নাই—তবে ভাষার পরিবর্তন যে হইয়াছে, তাহা সত্য। তাহারও একই কারণ। ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য আছে বলিয়া ইহাদের অর্থ সর্বদা বোধগম্য থাকা আবশ্যক। অপ্রচলিত প্রাচীনতর শব্দদ্বারা অর্থোপলব্ধির ব্যাঘাত হয় বলিয়াই সর্বদাই ইহাদের ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইতে হইতে অগ্রসর হইয়াছে, তবে যেখানে রূপান্তর একেবারেই অসম্ভব হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন শব্দটিও কোন কোন সময় রক্ষা পাইয়াছে। যেমন,

অঘ্রাণে পৌটী। পৌষে ছেউটী॥
মাঘে নাড়া। ফাল্গুনে ফাঁড়া॥

'পৌটী' ও 'ছেউটী' শব্দ দুইটি প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ হইলেও ইহাদের পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই বলিয়া শব্দ দুইটি রক্ষা পাইয়াছে। তথাপি ছড়াটির অর্থ-পরিগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না বলিয়া ইহা আজিও অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই, নতুবা দুর্বোধ্য ও অপরিবর্তনীয় প্রাচীন শব্দ থাকিলে সেই ছড়া পরিত্যক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

কতকগুলি অনুরূপ ছড়া রাবণের নামেও প্রচলিত আছে, যেমন—

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ। কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ॥
তিনশত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গৃহস্থ ঘরে শুয়ে॥
রুয়ে কলা না কাট পাত। তাতেই হবে কাপড় ভাত॥

একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায় যে,

ভাদ্রমাসে রুয়ে কলা।
সবংশে মলো রাবণ শালা॥

রাবণ প্রথম ছড়াটিতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কদলী রোপণ প্রশস্ত বলিয়া প্রচার করা সত্ত্বেও, নিজে যে কেন দ্বিতীয় ছড়াটিতে তাহা ভাদ্র মাসে রোপণ করিয়া নিজের বিনাশ অনিবার্য করিয়া তুলিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না; অতএব এই শ্রেণীর ছড়ায় রাবণ চরিত্র একটি হেঁয়ালী। তিনি যে রামায়ণের চরিত্র রাবণ নহেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কৃষি-বিষয়ক ছড়া ব্যতীতও গর্ভস্থ সন্তানগণনা, তিথিভেদে মাসফল, ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, ধর্মার্থে উপবাসের দিন নির্ণয়, অতিবৃষ্টি ও সুবৃষ্টির লক্ষণ, বারদোষে মাসফল

ইত্যাদি বিষয়ক কতকগুলি ছড়াও খনার নামে প্রচলিত আছে। ইহারা কতকটা হেঁয়ালীর লক্ষণাক্রান্ত—অর্থ সহজবোধ্য নহে, ব্যবহারিক মূল্যও ইহাদের সীমাবদ্ধ, সেইজন্য প্রচারও ইহাদের ব্যাপক হয় নাই—

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ। পেটের ছেলে গণে আন॥
নামে মাসে করি এক। আটে হরে সন্তান দেখ॥
এক তিল থাকে বাণ। তবে নারীর পুত্র জান॥ ইত্যাদি।

যাত্রাকালীন শুভাশুভ নির্দেশক কতকগুলি ছড়াও খনার নামে প্রচলিত আছে, যেমন,

শূন্য কলসী শুক্‌নো না। শুকনা ডালে ডাকে কা॥
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা। এক পাও না বাড়াও বাপা॥
খনা বলে এরেও ঠেলি। যদি না দেখি সম্মুখে তেলি॥

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ডাকের নামেও কতকগুলি ছড়া প্রচলিত আছে। ডাকও কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, ডাক বলিতে তিব্বতী ভাষায় জ্ঞান বা প্রজ্ঞা বুঝায়, ডাকের বচন শব্দের অর্থ জ্ঞানের বচন (words of wisdom)।

ডাকের বচন আসামেও প্রচার লাভ করিয়াছিল, আসাম প্রদেশে ডাক সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ডাকের ছড়াগুলি নীতিমূলক, এই হিসাবে ইহারা খনার বচন হইতে ভাবের দিক দিয়া স্বতন্ত্র। একটি ছড়ার বাংলা ও অসমীয় পাঠ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,

বাংলা

পানী ফেলিয়া পানীকে যায়।
আন পুরুষে আড়ে চায়॥
তারে নাহি বলিহ সতী।
স্বরূপে সে দুষ্ট মতি॥

অসমীয়

পানীক পেলাই পানীক যায়।
ডাকে বোলে তাইক নি দিবা ঠাই॥

উদ্ধৃত ছড়াটি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে যে, খনার বচনের যেমন একটি প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মূল্য আছে, ডাকের বচনে তাহা নাই—ডাকের বচন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রচিত বলিয়া ইহাদের মধ্যে নীতিকথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সামাজিক নীতিবোধ বিভিন্ন যুগে পরিবর্তনশীল বলিয়া ডাকের বচন নূতন নূতন সামাজিক আদর্শ দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহারা যুগোচিত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া না আসিলে নূতন সামাজিক আদর্শের সম্মুখীন হইয়া ইহারা পরিত্যক্ত হইত। খনার বচনের সঙ্গে ইহাদের এখানেও পার্থক্য অনুভূত হইবে।

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিক (magical) ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বাংলায় কতকগুলি ছড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের লোক-সাহিত্যগত দাবী কতদূর সমর্থনযোগ্য, সে সম্বন্ধে পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি ; তাহাতে বলিয়াছি, সাহিত্যের যাহা প্রধান উপজীব্য অর্থাৎ রস, ইহাদিগের মধ্যে তাহারই অভাব আছে। ইহাদের মধ্যে কোন চিত্র রূপায়িত হইতে পারে না, কোন রস সৃষ্ট হয় না, কিংবা কোন ভাবেরও স্পর্শ নাই,—কতকগুলি প্রচলিত, অর্ধ-প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের যথেচ্ছ সংযোজন দ্বারাই ইহাদের রচনাকার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—তবে একথা সত্য যে, ইহাদের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে এবং সেই রূপটি ছড়ারই রূপ, সাহিত্যের অন্তর্গত অন্য কোন বিষয়ের রূপ নহে। অতএব ইহাদের সম্বন্ধে যদি কিছু আলোচনা করিতেই হয়, তবে ছড়ার অন্তর্গতই আলোচনা করিতে হয়, অন্য কোন বিষয়ের অন্তর্গত নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দুই প্রকারের হয়—এক প্রকার ক্রিয়া ইংরেজি white magic ও অন্য প্রকার ক্রিয়াকে ইংরেজিতে black magic বলা হয়—বাংলায় এই শব্দ দুইটি শুক্ল ইন্দ্রজাল ও কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল রূপে অনুবাদ করা যাইতে পারে। শুক্ল ইন্দ্রজাল হিতকারক ও প্রকাশ্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল অনিষ্টকারক, সেইজন্যই ইহা গোপনে নিষ্পন্ন হয়, ইহার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা কঠিন। শুক্ল ইন্দ্রজালের মধ্যে মন্ত্রদ্বারা রোগে টোট্‌কা ঔষধ দান, বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টি রোধ, বিষঝাড়া, সর্প, ব্যাঘ্র ও হস্তীর গতিনিয়ন্ত্রণ বা মুখবন্দী করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য—কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের মধ্যে অভিচার, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি ক্রিয়া প্রসঙ্গেই

ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, এই ছড়াই ইহাদের মন্ত্র। ইহাদের কতকগুলি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঐন্দ্রজালিক ছড়ার মধ্যে সর্পদংশনের ঝাড়া বা বিষঝাড়ার মন্ত্রই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। বাংলার সাপের ছড়া বাংলা দেশের বাহিরেও অনেকদূর প্রচার লাভ করিয়াছিল। কোলমুণ্ডা ভাষাভাষী সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সেরাইকেলার হো জাতির মধ্যে পর্যন্ত বাংলা সাপের ছড়া প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচলিত না থাকিলেও বাংলা ছড়াগুলি তাহারা গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ করিয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রচলিত একটি সাপের ছড়ার প্রথমাংশ এই প্রকার—

হুঁকা বলে গড়গড়া কল্‌কে বলে ছাই।
হুঁকার পানী চাহে গুরু তোর বিষ নাই॥
ওরে নিতাই ধোবিনীর বিষ, কালকুটির বিষ,
ঘা মুখে যারে, কার দয়ায়।
মা মনসা দেবীর দয়ায়॥[১] ইত্যাদি

বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের কোন কোন স্থানে পল্লী অঞ্চলে বিষবৈদ্য বা ওঝাগণ সাপের মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই সকল ছড়া প্রচলিত আছে। মুসলমান ওঝাগণ যেমন আল্লা রসুলের নাম উল্লেখ করিয়া ছড়াগুলি আবৃত্তি করে, হিন্দু ওঝাগণও শিব এবং মনসার উল্লেখ করিয়া ছড়াগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকে। হিন্দু ওঝার একটি ছড়া—

গঙ্গা বলে দুর্গা তুমি বড় লঘু।
বিষ খাইয়া মরেছেন ঘরের প্রভু॥
কাঁদেন গঙ্গা কাঁদেন দুর্গা কাঁদেন বিষহরি রায়।
বাপের বিষ ঝি ঝাড়ন॥ ইত্যাদি

---

১ P. O Bodding. 'The Santals and Disease,' *Memoires of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. X., No. 1. pp. 118—122 দ্রষ্টব্য।

মুসলমান ওঝার একটি ছড়া—

শয়তান টুট্‌কে গিরিয়া না ডরে।
তেরি ইজ্জত বল্লাক জাহান্নমকে উতরি ॥
(অমুক) কা দেল দরিয়া কো বিষ।
ফতেমা হুকুম সে মলিয়া দিশ দিশ ॥ ইত্যাদি

সাপের ছড়ার এই প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শুক্ল ইন্দ্রজালের মধ্যে সাপের ছড়ার পরই হিরালি বা শিলারির ছড়া উল্লেখযোগ্য। হিরালি বা শিলারিরা পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ওঝা, ইহাদের আর কোন বৃত্তি নাই। ইহারা মন্ত্র দ্বারা মেঘের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়া দাবী করে এবং সেই অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত করিতে সহায়তা করে; কিন্তু তাহাদের প্রধান কার্য শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ করা। শিলাবৃষ্টি (hailstorm) পূর্ববঙ্গের বোরো ধানের সর্বাধিক অনিষ্টকারী শত্রু। আকাশে মেঘোদয় হইলে হিরালি বা শিলারিগণ হাতে একটি শিঙ্গা লইয়া বোরো ধান ক্ষেতের কিনারায় গিয়া শিঙ্গায় ফুঁ দিয়া ছড়া আবৃত্তি করিতে থাকে, এই ছড়ার ভিতর দিয়া অনেক সময় মেঘের প্রতি শিলাবর্ষণ হইতে বিরত থাকিবার জন্য কাতর অনুনয় ব্যক্ত করা হয়। পূর্ব মৈমনসিংহের এক অপ্রকাশিত পালাগানে হিরালিদের এই পরিচয় পাওয়া যায়—

ভাটী দেশে নানান গাঁয় হিরালিরার ঘর।
কেহ্ কেহ্ শিখতে যায় কেউ বা জবর ॥
নমঃশূদ্র যুগী নাথ গুরুমন্ত্র লৈয়া।
হিরালিরার পেশা করে সাধনা করিয়া ॥
পাড়ায় পাড়ায় হিরালিরা গুণমন্ত্র জানে।
ওস্তাদের বাড়ীত গিয়া শিখ্যা ছাখ্যা আনে ॥
মাথাত মানসিক চুল, নিয়ম সেবা খায়।
দাঁড়ি চুল নৌখ রাখ্যা গুরুর বাড়ীত যায় ॥
মন্ত্র দিয়া গাঁও বান্ধে শিখে মন্ত্রের গান।
মন্ত্রের রাগিণী শিখে নানান গুণজ্ঞান ॥
আশমান চিনে, জমিন চিনে, চিনে সকল দিক।
তারা চিনে, চান্দ চিনে, বাতাস চিনে ঠিক ॥

কি রকমের দেওয়ার সাজ কি রঙ্গের বাতাস।
কিবা বার, কিবা তিথি, কোন বাইরা মাস ॥
কোন তিথিতে মাসের পরথম কিবা বার হয়।
জলেতে চান্দের রেখা কোন কথাটা কয় ॥[১]

হিরালিরা তাহাদের কার্যের বিনিময়ে কৃষকদিগের নিকট হইতে পারিশ্রমিক লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে বত্যা হিরালির পালা এক কালে কৃষকদিগের মুখে মুখে গীত হইত। সাপের মন্ত্রগুলির মত ইহারা নীরস নহে, বরং ইহাদের একটি সার্থক রস-আবেদন আছে, এই গুণেই ইহারা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অনাবৃষ্টির সময় ছেলেরাও নানাপ্রকার ছড়া বলিয়া থাকে. যেমন,

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ধান দিব মেপে ॥
নেবুর পাতা করমচা।
যা বৃষ্টি ধরে যা ॥
খাজুর পাতা হল্‌দি।
মেঘ নাম জল্‌দি ॥
এক বিড়া পাণ।
ঝুপ ঝুপাইয়া নাম ॥
কাণা মেঘারে, তুইন আমার ভাই।
একটুখানি পানি দেরে শাইলের ভাত খাই ॥ ইত্যাদি

চব্বিশ-পরগণা ও খুলনা জিলার দক্ষিণ ভাগে নিম্নশ্রেণীর লোকগণ সুন্দরবনে মধু, কাঠ ও গোলপাতা আহরণ করিতে যায়; অনেকের জীবিকাই ইহার উপর নির্ভর করে; অনেক সময় তাহাদিগকে বন্য জন্তুর কবলে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তাহাদের মধ্যে 'বাঘের মুখ খিলানি'র উদ্দেশ্যে কতকগুলি ছড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই ছড়া আবৃত্তি করিলে সম্মুখস্থ ব্যাঘ্র নিষ্ক্রিয় হইয়া

---

১ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পড়ে বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকে বাঘবন্দীর ছড়া বলে, একটি ছড়া এই প্রকার—

আদি বন্ধম্ অনাদি বন্ধম্।
ষোড়শ ডাকিনী ব্যাঘ্র বন্ধম্॥
আমার গায়ে আমার অঙ্গে করে ঘা।
কালিকা চণ্ডির মাথা খা॥
আমার আঁচলি লড়ে।
শিবের জটা ছিঁড়িয়া পার্বতীর নখে পড়ে॥

ছিপে মাছ ধরিবার এবং কাল-বৈশাখীতে আম কুড়াইবার সময়ও ছেলেরা ছড়া বলিয়া থাকে। তাহাও ঐন্দ্রজালিক ছড়া বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়,

(১)

থুর থুরি বিন্দা বুড়ী।
মাছ ধর্‌ব কুড়ি কুড়ি॥
যেখানে মাছের ঘর।
সেখানে যাইয়া বনশী পড়॥
আমার নাম বান্যা।
মাছ তুল্‌ব টান্যা।

(২)

আয় রে ঝড় লইড়্যা।
হাতীর উপর চইড়্যা॥
হাতীর মার কাটা কান।
কুলা ভরা বাতাস আন॥
এঁটেল মাটির ঘর।
বোঁটা ছিড়্যা আম প'ড়॥
হাতে চুড়ি কানে বালি।
আম কুড়াব ডালি ডালি॥

প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়, যেমন বন্যা কিংবা ভূমিকম্পের কোনও সমসাময়িক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াও ছড়া রচিত হয়। এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের দামোদরের

বন্যার ছড়া ও পূর্ববঙ্গের ভূমিকম্পের ছড়া উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও ইহাদের আবেদন যেমন আঞ্চলিক, তেমনই সাময়িক মাত্র। এই সকল বিপর্যয়-জাত দুর্ভাগ্যের স্মৃতি সমাজের মধ্যে যতদিন জাগরূক থাকে, ততদিনই ইহারা লোকমুখে প্রচারিত হয়, অনুরূপ নূতনতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলেও পূর্ববর্তী দুর্ভাগ্যের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব ছড়ার মধ্যে ইহাদের আয়ুই ক্ষীণতম। ইহাদের রচনায়ও বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা বলিয়া কোন কোন সময় ইহাদের মধ্যে বাস্তবগুণ প্রকাশ পায়। ১২৩০ সালে দামোদরে যে বন্যা হইয়াছিল, তাহার একটি ছড়ার কতকাংশ এই প্রকার—

নদী সে দামোদরে বরাকরে কর্‌ছে আনাগোণা।
দু'ধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা॥
এল বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে ভাঙ্গ্‌লো রাজার গড়।
দুড়্ দুড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্বত পাথর॥
মিশায়ে নালাখোলা, বানের খেলা, নদীর হ'লো বল।
দামোদরে জড় হ'লো চৌদ্দ তাল জল॥[১] ইত্যাদি

কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও অনুরূপ ছড়া রচিত হইতে পারে। যেমন, বীরভূমের সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া। ইহার প্রথম কয়েকটি পদ এই—

শুন, ভাই, বলি তাই সভাজনের কাছে।
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল যুঝেছে॥
বেটারা কোক ছাড়িল জড় হইল হাজারে হাজার।
কখন এ'সে কখন লোটে থাকা হল্য ভার॥
হ'লো সব দুর্ভাবনা রাড় কান্দনা সবাই ভাবে বসে।
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে॥

আকারের দিক দিয়া সাধারণ ছড়া হইতে ইহারা দীর্ঘ; তবে ইহাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন একটি কাহিনী কিংবা ভাব নাই বলিয়া ইহারা গীতিকা কিংবা গীতি নহে, ছড়ার মধ্যেই ইহাদের আলোচনা করিতে হয়।

[১] গৌরীহর মিত্র, বীরভূমের বিবরণ, ১ম খণ্ড (শিউড়ী, ১৩৪৩), পৃঃ ১৯৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

গীতি

যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোক-সমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোক-গীতি (folk-song) বলে। প্রত্যেক দেশের লোক-সাহিত্যে গীতি অপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় আর কিছুই নাই, বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে নহে—সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বাংলার লোক-গীতি নানা দিক দিয়া অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে।

লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়ের মত লোকগীতিও মৌখিক প্রচার লাভ করিলেও, এই বিষয়ে ইহার এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যধিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হইয়া থাকে। বর্তমানে পল্লীগ্রামেও শিক্ষা প্রচার লাভ করিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই পল্লী-সমাজেরও কেহ না কেহ ইহার গীতিগুলি লিখিয়া লইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাথ-গীতিকা যে লিখিত হইয়া গীত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পল্লীর অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেও গীতি বহুল প্রচার লাভ করিলেও, ইহা লিখিয়া লইবার রীতি কদাচ প্রচলিত হয় নাই—শিক্ষিত পল্লী-গায়কও কেবল মাত্র তাহার স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ইহা গান করিয়া থাকে, লিখিত কোন পুঁথি কিংবা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা কদাচ গীত হয় না। সেইজন্য গীতিকা কিংবা অন্য কোন কোন বিষয়ের হস্তলিখিত পুঁথি কদাচিৎ আবিষ্কৃত হইলেও, লোক-গীতির কোন লিখিত পরিচয়ের সন্ধান পাইবার উপায় নাই। পল্লীবাসীর মুখে মুখেই ইহার রচনা, মুখে মুখেই প্রচার ও কেবল মাত্র তাহাদের স্মৃতির মধ্যেই ইহার অবস্থান। এই রীতি পুরুষানুক্রমিক চলিয়া আসিতেছে এবং আজিও ইহার ধারা অব্যাহত আছে।

লোক-গীতি মৌখিক প্রচারিত হইলেও, ইহা যে কেবল মাত্র মৌখিকই রচিত হইতে হইবে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ তাহা স্বীকার করিতে

চাহেন না। কারণ, লোক-সাহিত্য যে কি ভাবে কোথা হইতে সর্বপ্রথম রচিত হইল, তাহা বড় কথা নহে—সমাজের মধ্যে ইহার প্রচারই ইহার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা। একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন, 'Folk-songs are best defined as songs which are current in the repertory of a folk group ; the study of their origin is another matter.'[১] বর্তমান কালে সহর হইতেও নূতন নূতন গীতি নানাভাবে গিয়া পল্লীর সমাজে প্রবেশ করিতেছে। পল্লীর সমাজ যদি সম্পূর্ণভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের আনন্দানুষ্ঠান কিংবা সুখ-দুঃখানুভূতির মধ্যে বরণ করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাও কালক্রমে সেই পল্লীরই লোক-সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—কোথায় কিংবা কে কোন্ গীতি রচনা করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া পল্লীর সমাজ কোন গীতি তাহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করে না—কেবল মাত্র পল্লীজীবনের রসানুগামী হইলেই তাহা ইহার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, পল্লীর সমাজ যদি লোক-সমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে, নাগরিক জীবন দ্বারা তাহা যদি কোন ভাবেই প্রভাবিত না হয়, তবে সহর হইতে সেই পল্লীতে কোন গীতি গিয়া প্রচারিত হইলেও, তাহা পল্লী-সমাজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারিবে না—অচিরেই তাহা বিলুপ্ত হইবে। কিংবা কদাচিৎ কোন কোন সঙ্গীতের ভাব যদি পল্লীজীবনেরও কোন দিক দিয়া অনুকূল হয়, তবে তাহা সেখানে গিয়া এক নূতন রূপ লাভ করিয়া স্থায়িত্ব লাভও করিতে পারে। কিন্তু তাহার উপর পল্লীগীতির নিজস্ব সুর আরোপ করা হইবে এবং কিছুকালের মধ্যেই ইহার বহিরঙ্গগত নাগরিক পরিচয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়া ইহা পল্লীরই নিজস্ব লোক-গীতির বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে ; তখন ইহার সম্বন্ধে কাহারও কোনও দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচের ভাব বর্তমান থাকিবে না। অতএব নাগরিক সমাজ হইতে কোন গীতি পল্লীর সমাজে প্রবেশ করিবা মাত্রই যে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইবে, তাহা নহে। প্রত্যেক সাহিত্য-রূপেরই একটি জীবনশক্তি আছে, নানাদিক হইতে নানা ভাব ও উপকরণ ইহা নিজের শক্তিদ্বারা নিজের মধ্যে আহরণ করিতেছে—লোক-সাহিত্যও তাহার দ্বার চারিদিক দিয়াই উন্মুক্ত রাখিয়া সর্বদা নূতন নূতন ভাব ও উপকরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে ; তবে যে

১ George Herzog *SDFML* op. cit. p. 1088.

সকল ভাব ও বিষয় ইহার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারিতেছে না, তাহা অবিলম্বে পরিত্যক্ত হইতেছে এবং যাহা স্বাঙ্গীকৃত হইতেছে, তাহা একান্ত ভাবে নিজের বলিয়াই গৃহীত হইতেছে—ইহা মূলত কোথা হইতে আসিয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে এই প্রশ্নের কোন অবকাশ রাখিতেছে না। আধুনিক কালে নাগরিক সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের এই ভাব ও বিষয়গত আদান-প্রদান সর্বদাই চলিতেছে; কিন্তু বহিরাগত উপকরণ সমূহ স্বাঙ্গীকৃত না করিয়া লোক-সমাজ কোনদিনই গ্রহণ করিবে না। কেবল মাত্র যে সকল পল্লী-সমাজের সংহতি বিনষ্ট হইয়া তাহাদের উপর নাগরিক সমাজের প্রভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার নিজস্ব লোক-গীতিই যে বিকৃত হইয়াছে, তাহা নহে—বহিরাগত নাগরিক গীতিসমূহও আর্তনাদ করিয়া মরিতেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বহিরাগত উপকরণ ব্যতীত লোক-সংস্কৃতির কোন বিষয়ই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না; সেইজন্য 'খাঁটি', 'অকৃত্রিম' বা একান্ত নিজস্ব অথবা জাতীয় বলিয়া লোক-সাহিত্যে কিছু নাই। মিশ্র উপকরণ লইয়াই লোক-সংস্কৃতির যেমন গঠন, তেমনই মিশ্র উপকরণ দ্বারাই লোক-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে; লোক-গীতিতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না। বহিরাগত উপকরণ স্বাঙ্গীকৃত হইলেই তাহা নিজস্ব হইল, অতএব স্বাঙ্গীকৃত উপকরণ কৃত্রিম কিংবা বহিরাগত বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না—বহিরাগত কোন উপকরণ থাকিলেই লোক-গীতি কৃত্রিম হইবে, এমন মনে করা যাইতে পারে না। সেইজন্য লোক-গীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছিলেন, 'whatever the sources, however, it is oral circulation that is the best general criterian of what is a folk song.' অর্থাৎ যে কোন ক্ষেত্র হইতেই উদ্ভূত হউক না কেন মৌখিক প্রচারই লোক-গীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণ বাহির হইতে সংগৃহীত হইয়া লোক-সমাজে স্বাঙ্গীকৃত হওয়ার ফলে যেমন জাতীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া পুরুষ-পরম্পরায় অগ্রসর হইতে থাকে, ইহার লোক-গীতিও তেমনই নানাদিক হইতে বিভিন্ন উপকরণ লাভ করিয়া জাতীয় জীবনে স্বাঙ্গীকরণের দ্বারা শ্রুতি-পরম্পরায় অগ্রসর হইতে থাকে।

লোক-গীতি কাহারও শিক্ষা করিতে হয় না, ইহা শিক্ষাদানের কোন বিধিবদ্ধ প্রণালীও নাই। ইহা কি ভাবে রচনা করিতে হয়; কি ভাবে স্মরণ

রাখিতে হয় কিংবা কি ভাবে ইহার সুর ও তাল শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহার কোনও বিধিবদ্ধ প্রণালী নাই। কেবল মাত্র কানে শুনিয়া সহজাত বৃত্তির দ্বারাই এই সকল বিষয় আয়ত্ত করা হইয়া থাকে। তারপর সমাজ-মনের উপর ইহা হাল্কা মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। মৃত্তিকার রসের প্রয়োজনে যেমন মেঘ বারিবর্ষণ করে, তেমনই সমাজ-মনে রসের উদয়েই ইহাদের যথার্থ বিকাশ হয়। মেঘের যেমন কোন রূপ নাই, লোক-গীতিরও কোন বিশিষ্ট রূপ-সম্পর্কে সমাজ-মন সচেতন নহে; সমালোচকগণ যেমন উচ্চতর সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া থাকেন, লোক-গীতির কোন বিশ্লেষণকারী কিংবা সমালোচক নাই। আধুনিক কালে উচ্চতর সাহিত্যের সমালোচকগণই কিংবা উচ্চতর শিক্ষালব্ধ মনই লোক-সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র; নতুবা লোক-সাহিত্য যে সমাজের রস-পরিবেষণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই সমাজে ইহার কোন সমালোচক (critic) থাকে না—কোন বিষয় উপযোগী বিবেচনা করিলে সমগ্রভাবে সমাজই তাহা গ্রহণ করে, অনুপযোগী বিবেচিত হইলে সমাজই তাহা পরিত্যাগ করে—ব্যক্তিগত রস-বোধ কিংবা রস-বিচারের সেখানে কোন স্থান নাই। উচ্চতর সঙ্গীত পরিবেষণ করিবার পূর্বে তাহা যেমন বার বার অভ্যাস (rehearsal) করা হইয়া থাকে, লোক-সঙ্গীতে তাহা করা হয় না। অর্থাৎ লোক-গীতি শিক্ষাদানের কিংবা শিক্ষালাভের কোন প্রণালীই অবলম্বন করা হয় না। মনের মধ্যে যখন গানের আবেগ কিংবা বাহিরে যখন ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন তাহা সমাজ-মনের স্বাভাবিক উৎস খুলিয়া দেয়,—আপনা হইতে তখন অন্তরের সহজাত অনুভূতি আপনার সাধা সুরে উৎসারিত হইতে থাকে। লোক-সমাজের মধ্যে লোক-গীতি চর্চার অধিকার সকলেরই সমান। উচ্চতর সঙ্গীত যেমন ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারা গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিতে হয়, লোক-সঙ্গীতে তাহার প্রয়োজন হয় না। সমাজের প্রত্যেক অধিবাসীই লোক-সঙ্গীতের গায়ক; তবে যাহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট কিংবা স্মৃতিশক্তি প্রখর, সে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ফলেই গায়েন বা সঙ্গীত-পরিচালক হইতে পারে; কিন্তু তাহার সঙ্গে বসিয়া ধুয়া ধরিবার অধিকার ও শক্তি সকলেরই সমান। সেই-জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, পল্লীগীতির আসরে প্রায় সকলেই গায়ক, কেহই

কেবলমাত্র শ্রোতা নহে—যে গলা ছাড়িয়া গাহিতে পারিতেছে না, সেও মনে মনে গাহিতেছে; কারণ, তাহার গান অন্যকে শুনাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও, নিজের গাহিয়া আনন্দ লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে গলা ছাড়িয়া গাহিতে পারিতেছে না, এমন লোকের সংখ্যা লোক-সমাজে নাই বলিলেই চলে; কেবল নাগরিক শিক্ষা-প্রভাবিত সমাজের মধ্যেই তাহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। লোক-গীতির সঙ্গে উচ্চতর গীতির এখানে একটি স্থূল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। কারণ, লোক-গীতি নিজস্ব সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টি মাত্রেরই নিজস্ব রস-বস্তু; সে নিজে তাহা রচনা না করিলেও, সে তাহা গাহে বলিয়াই তাহা তাহার আপনার; কিন্তু নাগরিক সমাজের মধ্যে ইহার কোন রস-বস্তুর সঙ্গে ব্যষ্টির যোগ এমন অঙ্গাঙ্গী নহে। সেইজন্য নাগরিক সমাজের অধিবাসীর একান্ত নিজস্ব রস-বস্তু বলিয়া কিছু নাই, কোন কিছুর সঙ্গেই তাহার যোগ অন্তরের দিক দিয়া স্থাপিত হইতে পারে না; অতএব তাহা স্থায়িত্বও লাভ করে না।

লোক-গীতি মাত্রই লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব রস-বস্তু বলিয়া বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন কোন বিশেষ প্রকৃতির গীতি বিশেষ এক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়াও বিকাশ লাভ করে। যেমন, মেয়েলী সঙ্গীত পুরুষ কদাচ গান করে না; এমন কি, কুমারী মেয়েদিগের ব্রতগীতিও বিবাহিতা মেয়েরা গান করিবে না। একদিন তাহারা ইহা গান করিত, ইহার সংস্কার তাহাদের মনের মধ্যে থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট ইহাদের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়া যায়। পটুয়ার গান পটুয়া ব্যতীত কিংবা বেদের গান বেদে ব্যতীত আর কেহ গাহিবে না; এমন কি, পট দেখানো ব্যতীত পটুয়া এবং সাপ দেখানো ব্যতীত সাপুড়েও তাহা স্বতন্ত্র ভাবে কোথাও গাহিবে না। বৃদ্ধেরা প্রেম-সঙ্গীত গাহিবে না, বিধবাগণও কুমারী ও সধবাদিগের মত ব্যক্তিগত ঐহিক আশা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত কোন বিষয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবে না। লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়া লোক-সঙ্গীতের কোন কোন বিষয় প্রকাশ পাইলেও লোক-সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম হইতে ইহারা বিচ্যুত হইতে পারে না। কারণ, এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী দ্বারাই লোক-সমাজের বৃহত্তর অঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে এবং লোক-সমাজেরই শিরা-উপশিরা

ইহাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়া এক অখণ্ড সমাজ-চৈতন্যের সঙ্গে ইহাদের যোগ রক্ষা করে। কোন কোন দেশে কোন লোক-সঙ্গীত সমষ্টি কিংবা এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কর্তৃক গীত হওয়ার পরিবর্তে কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষ দ্বারাও গীত হয়। উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে বিবাহানুষ্ঠানে কন্যা পতিগৃহে যাত্রাকালে নিজেই বিদায়-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে, এই সঙ্গীতে সে নিজে ব্যতীত অন্য কেহ অংশ গ্রহণ করে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনও কোনও অঞ্চলেও অনুরূপ সঙ্গীত প্রচলিত আছে।

একাগ্র সাধনা দ্বারা উচ্চতর সঙ্গীতে ব্যক্তি-বিশেষ যেমন দক্ষতা লাভ করিতে পারে, লোক-সঙ্গীতে সে'ভাবে কেহই দক্ষতা লাভ করিতে পারে না। ব্যক্তিপ্রতিভা দ্বারা লোক-সঙ্গীতে সাধনা করিবার কিছু নাই—লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি মাত্রই সেই শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, যাহার স্বভাব-প্রদত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও স্মৃতিশক্তি আছে, সে সহজেই সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন বিষয় শিক্ষালাভ করিবার তাহার প্রয়োজন হয় না; কারণ, লোক-সঙ্গীতের সুরে নূতনত্ব বা অভিনবত্ব কিছু নাই, প্রচলিত সুরেই তাহা গাহিতে হয়। লোক-সঙ্গীতের প্রচলিত (traditional) সুর দুঃসাধ্য অনুশীলনের বস্তু নহে বরং স্বাভাবিক শক্তি দ্বারাই তাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। অতএব এই বিষয়ে কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। লোক-সঙ্গীতের কোন কোন বিষয়ে যে একজন মূল গায়েন থাকে, সে সাধারণ গায়কদিগেরই একজন মাত্র। তাহার সঙ্গে সাধারণ গায়কদিগের এইমাত্র পার্থক্য যে, গান গাওয়া তাহার একটি বিলাস (hobby) কিংবা ব্যবসায় (profession)। সর্বদাই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও প্রখর স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই যে এই বিলাস কিংবা ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহা নহে; তথাপি এই দুইটি গুণ যাহাদের আছে, লোক-সঙ্গীত পরিবেষণে তাহারাই সার্থকতা লাভ করিতে পারে। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কিংবা স্মৃতিশক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারা যায় না বলিয়া লোক-সাহিত্যে গুরুবাদ জন্মলাভ করিতে পারে নাই।

তত্ত্বের জগতে গুরুবাদ স্বীকৃত হয়, কিন্তু রসের জগতে গুরুবাদ নাই; কারণ, রস সহজাত সম্পদ, গুরুদত্ত বিদ্যা নহে। উচ্চতর সঙ্গীতের রাজ্যে সঙ্গীত রচয়িতা, ইহার সুরকার ও ইহার গায়ক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু লোক-

সঙ্গীতে এই বিষয়ে কোন প্রকার বিভিন্নতা অনুভূত হয় না—ইহার রচয়িতা ও সুরকার কে, তাহা কেহই জানে না এবং ইহার গায়ক সকলেই হইতে পারে। বিশেষতঃ নূতন লোক-সঙ্গীত সমাজে অল্পই রচিত হয়—প্রাচীন ধারাটিই ইহার মধ্যে রস-প্রাচুর্যে সর্বদা এমন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে যে, নূতন সৃষ্টির প্রেরণা অল্পই অনুভূত হয়। নূতন লোক-সঙ্গীত কেহ রচনা করিলেও সচেতন ভাবে করে না; চতুর্দিকে সামাজিক পরিবেশ হইতে ইহার প্রেরণা আপনা হইতে যখন লোক-সমাজের রস-চৈতন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন ব্যষ্টিমনের প্রচ্ছন্ন রস-তন্ত্রীতে ইহা আঘাত করিতে থাকে, তারপর সহসা একদিন একজনের মধ্য দিয়া ইহার গীতিরূপ প্রকাশ পায়। সমষ্টির মন পূর্ব হইতেই সেই সুরে সাধা ছিল বলিয়া একজনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত সেই গীতিরূপ দশজন সহজেই নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে—তারপর ইহা নিজের মত করিয়া লয়। ইহাকেই পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ communal recreation বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব লোক-সঙ্গীত রচিত হয় না, সমাজ-মন হইতে লোক-সাহিত্য বিকশিত হয়। সমাজ-জীবনের সঙ্গে লোক-সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী জড়িত হইয়া যায় বলিয়াই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিবর্তন সাধিত হয়; ইহা স্বভাবেরই ধর্ম, অতএব ইহার ব্যতিক্রম আশা করা যায় না।

সমাজ-জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই লোক-সঙ্গীত একদিন সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে এই বিষয়ে কেহ কেহ উচ্চতর সঙ্গীতের মূল পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, উচ্চতর সঙ্গীত একান্ত অহেতুক আনন্দের সৃষ্টি, প্রয়োজনীয়তার তাড়নায়ই লোক-সঙ্গীতের উৎপত্তি। এই দাবী অহেতুক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আদিম সমাজ অহেতুক কোন বস্তু সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করিবার কোন অবকাশ পাইত না। ইহার প্রত্যেকটি জীবনোপকরণই বিশিষ্ট এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া পরিকল্পিত হইত। প্রেম-গীতিগুলির মধ্যে যত সাত্ত্বিক ভাবই থাকুক না কেন, আদিম সমাজে ইহাদেরও একটি পরম ব্যবহারিক দিক ছিল—ইহাদের ভিতর দিয়াই নরনারী পরস্পরের প্রতি মিলনের অভিলাষ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত করিত। অতএব সমাজ-জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যটি ইহাদের মধ্য দিয়াই সাধিত হইত। দেখিতে পাওয়া যাইবে, এইভাবে

লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টিজীবনের বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক অবলম্বন করিয়াই গীতি রচিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলার স্ত্রীসমাজে প্রচলিত বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রচলিত গীতিসমূহও বিবাহপ্রমুখ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল—এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যতীত এই সঙ্গীত এখন পর্যন্ত কদাচ গীত হয় না।

লোক-গীতি সম্পর্কে একটি বিষয় এখানে আলোচনা করিতে পারা যায়—লোক-সমাজের বহিরঙ্গগত চিত্র ইহাদের ভিতর দিয়া কতদূর প্রকাশ পায়? কোন একটি লোক-গীতি একজন গায়কের মুখ হইতে শুনিয়া আমি ইহার অতীত ও বর্তমান সমাজ-জীবনের কতদূর পরিচয় পাইতে পারি? এই সম্পর্কে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, 'Man living closer to the natural environment was thought to be a more "natural" man. Being closer to the soil, he was viewed as being closer also to grasping his own life. His songs, lacking the artificial refinements, distortions, and self-consciousness which cultivated art often showed, were thought to speak always directly and immediately of the feelings and problem of singer and listener.'[১] কিন্তু আরও অনুশীলন ব্যতীত এই সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে না, তাহা বর্তমানে প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সাহিত্য মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল মাত্র যে যুগ-চৈতন্যেরই বাহন তাহা নহে, ইহার ভিতর দিয়া সুদূর অতীত যুগেরও উপকরণ অনেক সময় আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। অতএব লোক-সঙ্গীতের মধ্য হইতে বিশেষ কোন সমাজের এককালীন পরিচয় সন্ধান করিতে পারা যায় না।

কোন কোন সময় স্বতন্ত্র কোন সমাজ-চিত্র কিংবা দেশান্তরের কোন প্রাকৃতিক পরিবেশও যে কোন দেশের লোক-গীতির মধ্য দিয়া প্রকাশ না পায়, তাহাও নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্কিন দেশীয় লোক-সাহিত্যের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। মার্কিন কৃষকের সঙ্গীতে স্বভাবতঃই এখনও ইংরেজের সমাজ-

১ ibid, p. 1085.

চিত্র ও ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ মূর্ত হইয়া উঠে; কারণ, ইংলণ্ড হইতে এই সকল গীতি মার্কিন দেশে নীত হইয়াছে, এখন পর্যন্ত তাহা মার্কিন দেশীয় পটভূমির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইতে পারে নাই। মার্কিন দেশের নিগ্রো-দিগের লোক-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এখনও আফ্রিকার অরণ্য-প্রকৃতির হিংস্র-শ্যামল স্পর্শ অনুভব করা যায়। বাংলাদেশে মৈমনসিংহের জারিগানের ভিতর দিয়া কারবালার যুদ্ধের করুণ কাহিনী গীত হয়—ইহার মধ্যেও আরবের তৃষ্ণার্ত মরু-প্রকৃতি আপনার খর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পূর্ববাংলার নিত্য তরঙ্গোদ্ভাসিত নদীসৈকতে দাঁড়াইয়াও জারিগানের গায়কগণ একবিন্দু তৃষ্ণাবারির বেদনা তাহাদের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অতলস্পর্শী করিয়া তুলে। আজ বিশ্বব্যাপী যখন সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়াছে, তখন দেশ হইতে দেশান্তরের সমাজে ইহাদের প্রবেশের অধিকার কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কিন্তু দেশান্তর হইতে আগত সাংস্কৃতিক উপকরণ সমূহ স্বাঙ্গীকৃত হইতে যতই বিলম্ব হয়, প্রকৃত লোক-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতেও তাহার ততই সময়ের প্রয়োজন।

লোক-গীতির ভাবের মধ্যে যেমন বেশি বৈচিত্র্য নাই, ইহার চিত্রের মধ্যেও তেমনই বৈচিত্র্যের অভাব আছে। ইহার ভাব সাধারণতঃ যেমন প্রত্যক্ষ ও সহজ, তেমনই ইহার চিত্রও একঘেয়ে। প্রেম-গীতির নায়ক-নায়িকার রূপ ও আচরণ সর্বত্রই অভিন্ন, কতকগুলি গতানুগতিক চিত্র অবলম্বন করিয়াই ইহাদের মনোভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, যে-স্তরের সামাজিক জীবন হইতে লোক-গীতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। জীবনের কোন জটিল জিজ্ঞাসা লোক-গীতিগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় না। ইহাদের প্রধান ধর্মই ইহাদের প্রত্যক্ষতা (directness) ও স্বাভাবিকতা। অনেক সময় ইহাদের মধ্য দিয়া রূপক (allegory) ব্যবহৃত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু রূপকগুলি বাহিরের শ্রোতার নিকট সর্বদা সহজ-বোধ্য না হইলেও, ইহার সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক শ্রোতার নিকটই নিতান্ত সহজ-বোধ্য। এখানেই লোক-গীতির সঙ্গে তত্ত্ব-গীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। তত্ত্বগীতির সর্বদাই একটি নিগূঢ়ার্থ থাকে—এই নিগূঢ়ার্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলে বিশ্লেষণ করিতে পারে না, ইহা গুরু কর্তৃক বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। সেইজন্য তত্ত্বগীতি লোক-

গীতির মর্যাদা দাবী করিতে পারে না। লোক-গীতির রস সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলেই সহজ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।

লোক-গীতিতে কোন কাহিনী থাকে না, থাকিলেও তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন ও শিথিল ভাবে থাকে। কাহিনী-মূলক গীতিকে গীতিকা বা ballad বলে, ইহার বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। ভাবই গীতির প্রাণ—সুর ইহার অঙ্গ মাত্র। রূপসজ্জায় লোক-গীতি মাত্রই নিতান্ত উদাসীন, সেইজন্য সুর ব্যতীত গীতির প্রকৃত রসোপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। প্রত্যেক লোক-গীতিরই একটি নির্দিষ্ট সুর আছে, এই নির্দিষ্ট সুরের ব্যতিক্রম করিয়া কোন গীতিই গাহিতে পারা যায় না। গীতির সঙ্গে সুর 'বাগর্থবিব সম্পৃক্ত' অর্থাৎ বাক্যের সঙ্গে অর্থের যে সম্পর্ক, ইহারও কথার সঙ্গে সুরের সেই সম্পর্ক। সেইজন্যই সুর ব্যতীত কেবল মাত্র কথা দ্বারা গীতি প্রকাশ করা যায় না। অনেকে মনে করেন, লোক-গীতির কথা হইতে সুর একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন কোন সময় এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই গীতি বিভিন্ন সুরেও একই সমাজের বিভিন্ন অঞ্চলে গীত হইতেছে। অবশ্য ইহার উদাহরণ খুবই বিরল। পাশ্চাত্য লোক-গীতি হইতে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়; বাংলাদেশে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি না, তাহা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়।

কথা অপেক্ষা সুরের সঙ্গেই সমাজ অধিকতর পরিচিত থাকে; সেইজন্য গীতির কথায় কোন ব্যতিক্রম হইলেও তাহা উপেক্ষিত হয়, কিন্তু সুরের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হইবার উপায় থাকে না। প্রত্যেকটি বিষয়ে এক একটি সুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার এক একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলনের ফলে তাহার সংস্কার জাতির মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করে, সেইজন্য ইহার সামান্য ব্যতিক্রমও লোক-সমাজের নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। বিশেষ কোন গীতির মধ্যে বিশেষ সুর অপরিহার্য হইবার যে ঐতিহাসিক কারণ থাকে, তাহা অনেক সময় উপর হইতে বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া এই অপরিহার্যতার কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায় না। কোন্ সুর যে কোথায় সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাও সহজে বলিতে পারা যায় না। বাংলাদেশে যে সকল প্রধান প্রধান লোক-গীতি প্রচলিত আছে, যেমন ঝুমুর, গম্ভীরা, ভাটিয়ালি ইত্যাদি তাহা যে বাংলাদেশেই উদ্ভূত

হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক উল্লেখ করিয়াছেন, 'where neighbouring peoples are in intimate contact, and especially where they intermingle, much more exchange of melodies takes place than otherwise so that it becomes at times exceedingly difficult to trace the original source of the melodies.'[১] ভূমিকা ভাগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাংলা-দেশের চতুর্দ্বার অবারিত—প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহার মধ্যে কত জাতি আসিয়া যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারাই বাংলার বর্তমান লোক-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এক বা একাধিক সুর এক একটি বিস্মৃত জাতির নিজস্ব দান—জাতির পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয়ও নাই, কেবলমাত্র সুরটুকুই অবিনাশী হইয়া যুগ হইতে নূতন যুগের দ্বারদেশে উত্তীর্ণ হইতেছে। অতএব ভাষা হইতেও সুর প্রাচীন। যে দিন ভাষা ছিল না, সে দিন সুর ছিল; যে দিন ভাষা থাকিবে না, সে'দিনও সুর বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার অমরত্ব প্রচার করিবে। কেবলমাত্র বাংলাদেশের পক্ষেই এই সমস্যা নয়; উপরোক্ত সমালোচক উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'It is not too easy today to decide whether a melody which is popular in the British Isles or in the United States is of English, Irish, Scots, or Welsh origin.' এই সুগভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্যই কোন সমাজেই লোক-গীতির সুরে কোন ব্যতিক্রম সম্ভব হইতে পারে না।

ডক্টর ভেরিয়র এল্‌উইন বলিয়াছেন, 'symbolic method is found everywhere in Indian folk-poetry.[২] বাংলা লোক-গীতি সম্পর্কে এই উক্তি কতদূর প্রযোজ্য, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। এ'কথা সত্য যে, বাংলাদেশে তত্ত্বসঙ্গীতে রূপকের ব্যবহার যত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অন্য বিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে তাহা তত প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। 'উইড়া গেল রাজহংস পইড়া রইল ছাওয়া'—ইহা একটি দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত। রাজহংস এখানে আত্মার ও ছায়া এখানে দেহের রূপক। এই প্রকার—

১ ibid, p. 1087.

২ Verrier Elwin *Folk-Song of Chhattisgarh* op., cit. p. li.

'মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতাম পারলাম না'—ইহাও একটি তত্ত্বসঙ্গীত। মাঝি, বৈঠা, নৌকা বাওয়া ইত্যাদি চিত্র কতকগুলি গূঢ় বিষয়ের রূপক হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, তত্ত্বসঙ্গীতের সাহিত্যিক দাবী নিতান্ত গৌণ। অতএব একমাত্র তত্ত্বসঙ্গীতের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাইয়া রূপক বাংলা লোক-সঙ্গীতেরই একটি বিশিষ্ট ধর্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। মৃত্যু এক অবাঞ্ছিত সত্য, এইজন্য শোক-সঙ্গীত সাধারণতঃ রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। তত্ত্ব-সঙ্গীতের পর বাংলা প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে কিছু কিছু রূপকের ব্যবহার পাওয়া যায়; কিন্তু এ'কথা সত্য, রূপকের ব্যবহার উচ্চতর সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই জাত। যেখানে উচ্চতর সাহিত্য ও শিল্পবোধ লোক-সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে, কেবল মাত্র সেখানেই বাংলা প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে রূপকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ, রূপকের ব্যবহার একটি উচ্চতর শিল্পবোধ হইতেই জাত—সহজ ও সরল জীবনের মধ্যে ইহার প্রেরণা আসিতে পারে না। নিরক্ষর সমাজে অনুভূতির প্রত্যক্ষ (direct) অভিব্যক্তিই স্বাভাবিক, অপ্রত্যক্ষ রূপায়ণ একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে না। আদিম জাতির লোক-গীতির যে অংশ যুবক-যুবতীর মিলন-প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া রচিত, তাহার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি আদিম সমাজেও দুর্নীতির পরিচায়ক বিবেচিত হয় বলিয়া তাহা প্রায় সর্বদাই কতকগুলি সাধারণ রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। বাংলায় এই শ্রেণীর লোক-গীতি নাই। ইহাদিগকে যথার্থ প্রেম-সঙ্গীত বলা যায় না, ইংরেজিতে ইহাদিগকে courting song বলে। আদিম জাতির এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে যে রূপকের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচায়ক নহে, বরং স্থূল বস্তুরস-বোধেরই পরিচায়ক। তবে উচ্চতর প্রেম-সঙ্গীত ও তত্ত্ব-সঙ্গীতের বহিরঙ্গ লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইলে বাংলা লোক-গীতিতেও রূপকের অভাব হইবে না।

লোক-গীতি আকারে সাধারণতঃ ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে। ইউরোপীয় লোক-গীতিও সাধারণতঃ চারিটি পদেই সম্পূর্ণ হয়। ভারতীয় আদিবাসী অঞ্চলের লোক-গীতিতেও এই বৈশিষ্ট্যটি রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোক-গীতি ইহা হইতে সামান্য দীর্ঘ মাত্র। বাংলার লোক-

গীতিও সামান্য দীর্ঘ হইয়া থাকে। কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে, এই দৈর্ঘ্য পুনরুক্তি-জনিত মাত্র, বিষয়-জনিত নহে। অতএব মূলতঃ এই সকল গীতি প্রতিবেশী আদিবাসীর গীতির মত হ্রস্বই ছিল। অনেক সময় মূল গীতির বহির্ভূত ধুয়া (refrain) অংশ দ্বারাও লোক-গীতি অনাবশ্যক দীর্ঘীকৃত হইয়া থাকে। ধুয়ার সঙ্গে মূল গীতির অঙ্গ ও ভাবগত কোন যোগ থাকে না, ইহা দ্বারা এক একটি পংক্তির সমাপ্তি নির্দেশ করা হইয়া থাকে মাত্র। অনেক সময় ধুয়া অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি মাত্র। কোন কোন সময় একই ধুয়া একাধিক গীতিতেও ব্যবহৃত হয়। অতএব গীতির অঙ্গ হইতে ইহা পরিত্যাগ করিয়াই গীতির দৈর্ঘ্য বিচার করা সঙ্গত। পূর্বেই বলিয়াছি যে, গীতির অঙ্গ অত্যন্ত শিথিলবন্ধ, সেইজন্য ইহার কোন কোন সম্পূর্ণ পদ কিংবা পদাংশ পুনরুক্তও হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা অনেক সময় গীতি-স্বর (music) বর্ধিত হয়। অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি অপেক্ষা সুরের মাধুর্য সৃষ্টিই গীতির লক্ষ্য, সেইজন্য পদ-গঠনের শৈথিল্যের দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না।

গীত হওয়ার মধ্য দিয়াই গীতির যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায়। সেইজন্য যাঁহারা লোক-গীতির সংগ্রাহক, তাঁহারা একটি প্রধান অসুবিধার সম্মুখীন হ'ন যে, তাঁহার লিখিয়া লইবার জন্য গান কেহ মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে পারে না, ইহা গাহিতে হইবে। গাহিতে হইলেই গায়কের সেই পরিবেশ ও অবসরের প্রয়োজন। যে গীতি-সংগ্রাহক সহস্র সহস্র গীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহার গায়কের সেই পরিবেশ-সৃষ্টির ও অবসর দানের সময়াভাব হয়। এমন কি, সেই অভাব না থাকিলেও গায়কের কণ্ঠ হইতে প্রকৃত গীতকালে গান লিখিয়া লওয়ারও একটি বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। তাহা সকলের থাকে না। একজন গায়ক হইলে গীতির পদগুলি সুরের মধ্য হইতেও উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু একাধিক গায়ক থাকিলে পদগুলি ছাপাইয়া একটি সুরই মাত্র শ্রুত হইতে থাকে। সংগ্রাহকের সুরে প্রয়োজন নাই, কথাই প্রয়োজন ; কিন্তু সমবেত কণ্ঠের মধ্য দিয়া কথা কোথায় হারাইয়া যায়, তাহার আর সন্ধান পাওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্তু গীতি-সংগ্রাহকের নিকট ভাষা অপেক্ষা সুরের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই কম নহে—প্রকৃত পক্ষে উভয়ের মধ্যে এমন একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক গড়িয়া উঠে যে, এক হইতে অপরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কাহারও মর্যাদা রক্ষা করা যায় না। তবে সকল

গীতির পক্ষেই যে এ'কথা সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন গীতি সুর-প্রধান এবং কোন গীতি কথা-প্রধান। তথাপি উভয়েরই যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকগণ শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র দ্বারাও যে সকল শ্রেণীর লোক-গীতিরই সমান মর্যাদা রক্ষা পায়, তাহা নহে ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কৃষি-গীতি, ক্রীড়া-গীতি (game-song) নৃত্য-গীতি (dance-song) ইত্যাদির মধ্যে কথা ও সুরের সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়াও অন্তর্নিবিষ্ট (integrated) হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গির মধ্য দিয়া কথা ও সুর ব্যক্ত হয়। শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র কথা ও সুর ধারণ করিতে পারে, কিন্তু দৈহিক ভঙ্গি ধারণ করিবে কেমন করিয়া ? বাংলার লোক-সমাজে এখনও নৃত্য-সম্বলিত গীতির প্রচলন আছে, ইহাতে নৃত্যের ভঙ্গির মধ্য দিয়া গীতির তাল রক্ষা পায় --এই ভঙ্গিটি দৃশ্য, কেবল মাত্র শ্রব্য নহে। অতএব দৃশ্য এবং শ্রব্য উভয় বিষয় নিখুঁত ভাবে ধারণ করিতে পারে, এমন কোন যন্ত্র ব্যতীত লোক-গীতি সংগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না।

লোক-সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রের স্থান নিতান্ত গৌণ মাত্র। অধিকাংশ লোক-গীতিই কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতই কেবল মাত্র মুখে মুখে গীত হয়। কদাচিৎ যে ক্ষেত্রে প্রচলিত (traditional) বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা কণ্ঠস্বরে একটু মাধুর্য যোগ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়—গায়কের কণ্ঠস্বর ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বাংলার লোক-গীতিতে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সংখ্যা যেমন অধিক নহে, তেমনই ইহাদের মধ্যে বৈচিত্র্যও বেশি নাই।

বাংলার লোক-গীতি যে বর্তমান যুগে লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, ইহার প্রকৃত কারণ কি ? ইহা অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের সম্পর্ক আত্মা ও দেহের সম্পর্ক। সমাজ-দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলেই ইহার লোক-সাহিত্যও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাংলার পল্লীর সংহত সমাজ-জীবন আজ আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। দুই শত বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে কলিকাতা মহানগরী কেন্দ্র করিয়া বাংলার যে নূতন জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার সঙ্গেই বাংলার অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীর এই নূতন জীবন যন্ত্রশিল্পমুখী—কৃষিমুখী নহে। ইহার

আকর্ষণ সুদূর পল্লীর নিভৃত অঞ্চল পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। দূরতম পল্লীতেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষার সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির কোন যোগ রক্ষা পায় নাই। তাহার ফলে লোক-সংস্কৃতির ধারা পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, এ'দেশের নূতন শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্ত্য জীবনকে সকল বিষয়ে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নূতন আদর্শের সম্মুখীন হইয়া পুরাতন সমাজ-জীবন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সংহত সমাজের মধ্যে যে লোক-গীতির নিভৃত আশ্রয় বিরাজ করিত, তাহার ভাঙনের মুখে স্বভাবতঃই তাহা আজ আশ্রয়-চ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার শক্তি আজ আর কাহারও নাই।

কেহ কেহ বাংলার মুসলমান সমাজকেই এ'দেশের লোক-গীতির একমাত্র প্রতিপালক মনে করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান ধর্মসংস্কারক ওয়াহাবী আন্দোলনকেই ইহার ধ্বংসের জন্য দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু বহিরাগত কোন ধর্মান্দোলন সংহত সমাজের উপর কোন সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ওয়াহাবী আন্দোলন বাংলার নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে উচ্চতর মুসলমান সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—কিন্তু বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মুসলমান যে ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারে নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, ওয়াহাবী আন্দোলন সত্ত্বেও বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজ হইতেই সহস্র সহস্র লোক-গীতি সংগৃহীত হইয়াছে। যদি মুসলমান সমাজের উপর লোক-সাহিত্য বিরোধী কোন আন্দোলন ব্যাপক ভাবে কার্যকর হইয়া থাকে, তবে তাহা ওয়াহাবী আন্দোলন নয়, তাহা ইহার অনেক পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু ধর্মসংস্কারমূলকই হউক, কিংবা রাজনৈতিকই হউক, বহিরাগত কোন আন্দোলন দ্বারা কোন সমাজের লোক-গীতিই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না, সাময়িক ভাবে ইহা প্রচার ব্যাহত হইতে পারে মাত্র। কারণ, ইহা সমাজ-দেহের স্নায়ু ও শিরা-উপশিরার মত—মূল সমাজের মধ্যে যদি ভাঙ্গন দেখা না দেয়, তবে ইহা কিছুতেই চির-দিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। অতএব বলিতেছিলাম, বাংলার মূল সমাজ-জীবনেই পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, সেইজন্যই লোক-গীতিও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কেবল মাত্র বাংলা কিংবা ভারতবর্ষের লোক-গীতি সম্পর্কেই যে এই ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা নহে—পৃথিবীর সকল দেশেই

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে ; সেইজন্য প্রত্যেক দেশেই লোক-গীতির অবস্থা প্রায় একরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ সর্বত্রই প্রায় এক। একজন ইংরেজ সমালোচক ইংলণ্ডের লোক-গীতি বিলুপ্ত হইবার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বাংলা দেশের উপরও প্রযোজ্য হইতে পারে, অতএব তাঁহার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে: তিনি লিখিয়াছেন, 'Education has played its part. The instruction given to the children at village schools proved antagonistic to the old minstrelsy. Dialect and homely language were discountenanced ; Teachers were imported from the towns, and they had ittle sympathy with village life and customs. The words and spirit of the songs were misunderstood, and the tunes were counted too simple. The construction of railways, the linking up of villages with other districts, and contact with large towns and cities had an immediate and permanent effect upon the minstrelsy of the countryside. Many of the village labourers migrated to the towns, or to the colonies, and most of them no longer cared for the old ballads, or were too busily occupied to remember them.'[১] ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আধুনিক কালে বিশ্বব্যাপী প্রাচীনতর সমাজ ব্যবস্থার যে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, বাংলা দেশের উপরও তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে ইহা একটি ব্যতিক্রম মাত্র নহে। অতএব বাংলার লোক-গীতি লুপ্ত হইবার জন্য এই দেশীয় কোন ধর্মসংস্কারমূলক কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনকে দায়ী করিতে পারা যায় না।

বাংলার লোক-গীতি এত বিস্তৃত যে, ইহা জীবনের সকল অবস্থাই স্পর্শ করিয়াছে। গর্ভবাস হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি অবস্থাই ইহার ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। 'It does not succeed in making all these things 'poetic' to a westerm or urban ear but it certainly

১ A. Willams. *Folk-Songs of the Upper Thames* (London, 1918), 18f.

transforms them in its own opinion.'[১] গাহিবার প্রণালীর দিক দিয়া বিচার করিলে বাংলার লোক-গীতি প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, যে গীতির তাল আছে ও যে গীতির তাল নাই; যাহার তাল আছে, তাহা কোন না কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, ক্রিয়া দ্বারাই ইহার তাল রক্ষা পায়, সেইজন্য ইহা সক্রিয় সঙ্গীত বলা হয়। যাহার তাল নাই, তাহা অলস অবসরের গীত, তাহাই ভাটিয়ালি নামে পরিচিত। কিন্তু বিষয় ও বিস্তারের দিক হইতে বাংলা লোক-গীতি আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহাই এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

বাংলার লোক-গীতি সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে কোন গীতি এক একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে—ইহার নির্দিষ্ট অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ইহা সমগ্র বাংলা দেশে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম বঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর; উত্তর বঙ্গের গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া; পূর্ববঙ্গের জারি, ঘাটু ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী এই সকল সঙ্গীতের প্রচার হয় নাই। কোন ঐতিহাসিক কারণে প্রথম ইহারা যে অঞ্চলে উদ্ভূত কিংবা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই অঞ্চল কিংবা তাহার সন্নিকট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই ইহারা আজ পর্যন্ত প্রচারিত আছে। এই সকল সঙ্গীতকে আঞ্চলিক সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও প্রচারের দিক দিয়া ইহারা এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, তথাপি বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে বাংলার লোক-সংস্কৃতির সাধারণ উপকরণগুলি রক্ষা পাইয়াছে। যেমন, পটুয়া-সঙ্গীতের বিষয়-বস্তু কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মনসা-মঙ্গল; ভাদুগানের বিষয় প্রকৃতি-বন্দনা; গম্ভীরার বিষয়-বস্তু শিব; ভাওয়াইয়ার বিষয়-বস্তু প্রেম; সারি, ঘাটু প্রভৃতির বিষয়বস্তুও রাধাকৃষ্ণ-প্রেম। বাঙ্গালীর নিজস্ব বিষয়-বস্তুর গুণেই এই সকল সঙ্গীত বিশেষ এক একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়াও বাঙ্গালীরই সামগ্রিক লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্য দিয়াও unity in diversityর নীতিটি রক্ষিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহা আঞ্চলিক হইয়াও সমগ্র বাংলার অখণ্ড লোক-সাহিত্যেরই অবিভাজ্য অঙ্গ।

১ Verrier Elwin, op. cit. p. xlix.

কি কারণে যে বিশেষ প্রকৃতির লোক-গীতি এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে এমন দৃঢ়মূল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আজ অনুমান ব্যতীত নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। এ'কথা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিভিন্ন মানবজাতির বিচিত্র উপাদানে বাংলার লোক-সমাজ গঠিত হইয়াছে। এই সকল পরস্পর স্বতন্ত্র জাতি বাংলার এক একটি অঞ্চলে সংহত ভাবে বসতি স্থাপন করিবার ফলে এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকৃতির লোক-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন জাতির উপর উচ্চতর সংস্কৃতির অখণ্ড প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে উচ্চতর সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ বিভিন্ন অঞ্চলের পরস্পর স্বতন্ত্র জাতির অধিবাসী কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহার ফলে ইহাদের মধ্য দিয়া একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য গড়িয়া উঠে। এইভাবেই বর্তমান বাংলার লোক-সমাজ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এক অখণ্ড উচ্চতর সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য বাংলার সর্বত্রই গড়িয়া উঠা সত্ত্বেও, ইহার অন্তর্নিহিত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই; কারণ, ইহারা মৌলিক, সেইজন্য ইহাদেরই শক্তি অধিক। যাহা বাহির হইতে আসিয়াছে, তাহা কালক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাহা সহজাত তাহা অবিনশ্বর। সেইজন্য বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ে ইহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট পরিচয় রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বাংলার আঞ্চলিক লোক-গীতি সমূহের উদ্ভব ও বিকাশের ইহাই কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অন্তর্নিহিত ভাবের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কোন কোন আঞ্চলিক লোক-গীতির জন্য স্বতন্ত্র বিভাগও নির্দেশ করিতে পারা যায়। যেমন, উপরে আঞ্চলিক সঙ্গীত বলিয়া যাহাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয় প্রেম-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের আঞ্চলিক পরিচয় এত প্রত্যক্ষ যে ইহাদিগকে সাধারণ প্রেম-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় না; সেইজন্য এই শ্রেণীর সকল লোক-গীতিই আঞ্চলিক পরিচয়ে অভিহিত করিতে হইবে।

আঞ্চলিক সঙ্গীতের পরই প্রেম-সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিতে হয়; লোক-সাহিত্যে ইহার মত ব্যাপক আর কোন বিষয়ই নহে। বাংলার বিস্তৃত

প্রেম-সঙ্গীতের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

কোনও শুভলগ্নে বাঙ্গালীর হৃদয়-যমুনার বিবিক্ত পুলিনে রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ-চিহ্ন প্রথম অঙ্কিত হইয়াছিল, তারপর হইতেই বাঙ্গালীর প্রেম-গীতি রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত হইয়া উৎসারিত হইতে লাগিল। বাংলার একটি প্রবচনে শুনিতে পাওয়া যায়, 'কানু ছাড়া গীত নাই।' এই 'গীত' শব্দে প্রেম-গীতই বুঝিতে হইবে—সমগ্র বাংলার প্রেম-সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত। বাঙ্গালীর হৃদয়-যমুনার নির্জন পুলিন-চারিণী এই রাধা শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের রাধা নহেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রাধা নহেন, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিও নহেন—ইনি বাঙ্গালীর একজন প্রতিবেশিনী মাত্র। কৃষ্ণও তাহাই—ইহাদের ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়গত আর কোন পরিচয় নাই। যদি কোনও পরিচয় তাঁহাদের সম্পর্কে দিবার প্রয়োজন হয়, তবে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা মানব-মানবী মাত্র। মানুষ মরণশীল হইলেও যেমন মানব-জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহারাও সাধারণ মানুষের মত জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া মানব-মানবীর চিরন্তন সম্পর্কের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মানব-মানবীর চিরন্তন সম্পর্কই প্রেম, বাংলার লোক-গীতে প্রেমের ধারা রাধাকৃষ্ণের ভিতর দিয়াই অব্যাহত আছে।

একথা সত্য যে, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য অবলম্বন করিয়াই রাধাকৃষ্ণের নাম বাংলার লোক-সাহিত্যের সকল স্তরেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব প্রভাবের পূর্ববর্তী বাংলার সকল প্রেম-সঙ্গীতই প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থতা ব্যতীতই ব্যক্ত হইত; রাধাকৃষ্ণের নাম তাহাতে থাকিত না। এখনও যে অঞ্চলে বৈষ্ণবপ্রভাব অল্প, সেখানে রাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থতা ব্যতীতই কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ ভাবে প্রেম-গীতি রচিত হইয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের নাম বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত হইবার ফলে ইহার মধ্যে কতকগুলি দোষ এবং গুণ দুই-ই দেখা দিয়াছে। দোষের মধ্যে এই যে, ইহা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রেমের একটি সর্বব্যাপকতার গুণ আছে—এমন কোন বিষয়-বস্তু কিংবা চরিত্র নাই, যাহা ইহা স্পর্শ করিতে পারে না। একমাত্র রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর পটভূমিকায় বাংলার প্রেম-সঙ্গীত রচিত হইবার জন্য, ভাব, চিত্র এবং রসের দিক দিয়া ইহার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে নিতান্ত

প্রাণহীন গতানুগতিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। যমুনা-তীরবর্তী পরিচিত কদম্ব কানন হইতে যে একটি মাত্র বাঁশীর স্বর ধ্বনিত হইতেছে, তাহার দিকেই ষোড়শ সহস্র গোপিকা উৎকর্ণ হইয়া আছে—কিন্তু যেদিক হইতে কোন বাঁশীর স্বর শুনা যাইতেছে না, সেই দিকে ফিরিয়া তাকাইলেও যে একটি ভীরু কণ্ঠের মধুর আত্মনিবেদন শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহা ত উপেক্ষা করিতে পারা যায় না! প্রেমিক ত কেবল চন্দন-চর্চিত দেহে বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনেই বিচরণ করেন না, তিনি যে ধূলিমলিন দেহে বাংলার পানা পুকুরের তীরেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাহা ভুলিলে চলিবে কি করিয়া? কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণকে যখন বাঙ্গালী এবং বৃন্দাবনকে যখন বাংলাদেশই করিয়া লইয়াছি, তখন আর এই কথা কেন? তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ভিতরের দিক দিয়া কৃষ্ণকে বাঙ্গালী এবং বৃন্দাবনকে বাংলার পল্লীতে পরিণত করা হইলেও কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের বহিরঙ্গগত রূপে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় নাই। সেইজন্যই বাংলার প্রেম-সঙ্গীতে যমুনা, কদম্ব-কানন, বংশীধ্বনি ইত্যাদির কথাই বার বার শুনিতে পাওয়া যায়—ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কোন চিত্র প্রকাশ পায় না।

বাংলার প্রেম-গীতিতে রাধাকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করিবার ফলে গুণের দিক দিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই যে, ইহা নৈতিক দুর্নীতি হইতে বহুলাংশে রক্ষা পাইয়াছে। আদিবাসীর নরনারীর মিলনসূচক (courting) গীতিগুলি অশ্লীল ভাব ও ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিবার জন্য সাধারণ জন-সমাজ বাংলার প্রেম-গীতি হইতে অশ্লীলতা বর্জন করিয়াছে। কোন কোন স্থলে সামান্য গ্রাম্যতা প্রকাশ পাইলেও বাংলার প্রেম-গীতি সাধারণ ভাবে অশ্লীলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়াই অনুভূত হইবে।

বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলার লৌকিক প্রেম-গীতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় কি না, তাহা এখানে বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন,—

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
> পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান,
> অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন,
> বৃন্দাবন-গাথা; এই প্রণয়-স্বপন

শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—এ কি শুধু দেবতার ?

এ'কথা সত্য যে, লৌকিক প্রেম-গীতির উপর ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব—বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে লৌকিক প্রেম-গীতি রচিত হয় নাই। সেইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে মানবিক প্রেমেরই পূর্ণ আস্বাদ লাভ করা যায়। কালক্রমে বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমাখ্যান একটি নির্দিষ্ট রূপ বা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু লৌকিক প্রেম সম্পূর্ণ স্বাধীন—ইহা নির্দিষ্ট কোন রূপ, পরিচয় বা পরিবেশের অধীন নহে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম-গীতি একটি নির্দিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইবার ফলে, ইহার মধ্য হইতে ভাবগত স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিষয় হইয়া যাইবার ফলে বৈষ্ণব পদাবলীতেও সেই তত্ত্ব-নির্দিষ্ট ধারার কোন ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে নাই। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, মান, বিরহ ইত্যাদির বাঁধা-ধরা পথ ধরিয়াই বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রেম-গীতির প্রকাশ হইয়াছে। এই বিষয়ে বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে একটি রীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, এই রীতি লঙ্ঘন করিবার কোন উপায় ছিল না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-গীতি রচনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব মহাজনদের নির্দিষ্ট অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত বাঁধা-ধরা পথ ধরিয়া সকল পদকর্তাকেই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাহার ফলে বৈষ্ণব মহাজনদিগের অনুমোদিত বিষয়ের বহির্ভাগে প্রেমের যে বিস্তৃত একটি স্বাধীন ক্ষেত্র আছে, তাহা পদকর্তাদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তত্ত্বনির্দিষ্ট একটি রীতির দাসত্ব গ্রহণ করিবার ফলে অল্পকালের মধ্যেই ইহার মধ্যে কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সাহিত্য তত্ত্ব, রীতি কিংবা অলঙ্কারের কোন শাসন স্বীকার করে না, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সহজ। বৈষ্ণব পদাবলী সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা চিহ্নিত—বৈষ্ণব ইহাদের পরিচয়; কিন্তু লৌকিক প্রেম-গীতি সর্বজনীন। সেইজন্য লৌকিক প্রেম-গীতির ভিত্তির উপর রচিত হইয়াও বৈষ্ণব-পদাবলী লোক-গীতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী লৌকিক প্রেম-গীতির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, রাধাকৃষ্ণের নামের সহিত যুক্ত বাংলার বহু গীতিই লৌকিক প্রেম-গীতি;

ইহার কারণ, বৈষ্ণব পদাবলীর বাহিরে রাধাকৃষ্ণের পরিকল্পনায় বাংলার পল্লীকবি কতকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে 'উজ্জ্বল-নীলমণি'র শাসন ছিল না বলিয়াই পল্লীকবি নিজের স্বাধীন অনুভূতিই রাধাকৃষ্ণের অনুভূতি বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এই রাধাকৃষ্ণকেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর প্রতিবেশী—ইহারা নিজেরাও ইহাদের সর্ববিধ দেবত্ব বৃন্দাবনের ধূলি-মাটিতেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর মনোভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর লৌকিক প্রেম-গীতি রচনা ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সকল জাতিরই প্রেম-সঙ্গীত রচনার ভাব ও বিষয়গত যে একটি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আছে, রাধাকৃষ্ণের চিত্র দ্বারা বাঙ্গালীর দৃষ্টি সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার ফলে এই বিষয়ে তাহার সেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। যদি এই চিত্র বাঙ্গালীর সম্মুখে না থাকিত, তবে বাঙ্গালীর লৌকিক প্রেম-গীতিতে আরও বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইত।

বাংলার তত্ত্ব-সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্তর্নিহিত ভাবের দিক দিয়া ইহা সাহিত্যের অন্তভুক্ত হইতে না পারিলেও, বহিরঙ্গ রূপের মধ্যে ইহার সাহিত্যিক রসের অভাব বোধ হয় না। অর্থাৎ বাংলার তত্ত্ব-বিষয়ক রচনা সমূহ দর্শন-শাস্ত্রের নীরস সূত্র মাত্র নহে—উপমায়, রূপকে ও অন্যান্য অলঙ্কারে ইহাদের বহিরঙ্গে সাহিত্যিক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শেখ মদন ফকিরের একটি বাউল গানের কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়—

রে নিঠুর গরজী,
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে ?
দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল,
তাড়াহুড়া নাই।

ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যাহাই থাকুক না কেন, ইহাতে যে বাহ্যিক অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সাহিত্যিক আবেদন যে সার্থক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বাক্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু এখানে গূঢ়ার্থ ব্যতীতও রচনাটির একটি বহিরর্থ আছে, ইহা পাঠ করিলে

ইহার বহিরর্থ আশ্রয় করিয়াই একটি চিত্র চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। ইহাই ইহার সাহিত্যিক আবেদন। কিন্তু গূঢ়ার্থই ইহার লক্ষ্য বলিয়া এই আবেদনটি ক্ষণস্থায়ী ও মুহূর্তেই নিরবলম্বন হইয়া পড়ে। অতএব স্থায়ী সাহিত্যিক গৌরব ইহাকে দিতে পারা যায় না।

রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতগুলিও এই প্রকার। ইহাদের বহিরঙ্গে একটি বস্তুরস আছে, এই বস্তুরসটি সাহিত্য-ধর্মজাত ; যেমন,

মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ॥

ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বভাবটি যতই সূক্ষ্ম ব্যক্তি-অনুভূতির বিষয় হউক না কেন, ইহার বহিরঙ্গ পরিচয়টির মধ্যে একটি লৌকিক আবেদন আছে। এই লৌকিক আবেদনের জন্যই অনেক সময় রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতগুলি লোক-সঙ্গীত বলিয়া ভুল হয়। কিন্তু ভাব কেন্দ্র করিয়াই রূপ, ভাব-নিরপেক্ষ রূপের কোন পরিচয় নাই। সেইজন্য রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতগুলি তত্ত্ব-সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সকল বহিরঙ্গ পরিচয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকগণ বহু তত্ত্বসঙ্গীতকে তাঁহাদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, বাংলার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনের উপাদান হিসাবে এই সকল সংগ্রহের মূল্য অনস্বীকার্য হইলেও, লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহাদের কোন দাবী নাই।

বাংলার লোক-গীতির একটি প্রধান অংশ পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত (functional song) বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ইহারা গীত হয়, ইহাদিগকে মেয়েলী সঙ্গীতও বলা যায় ; কারণ, ইহা প্রধানতঃ নারীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল মেয়েলী সঙ্গীতই ব্যবহারিক সঙ্গীত নহে। নারীজাতির কোন সঙ্গীত পুরুষের বহির্মুখীন কর্ম, যেমন কৃষিকার্য কিংবা পশুশিকার ইত্যাদিরও সহায়ক, তাহা পারিবারিক জীবনের বহির্ভূত ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারিবারিক সঙ্গীত পরিবারস্থ ব্যক্তির সঙ্গেই সম্পর্ক-যুক্ত, পরিবারের বহির্ভাগে যে বৃহত্তর গোষ্ঠী-(communal) জীবন আছে, তাহার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। গর্ভাধান-বিবাহ, পঞ্চামৃত, সপ্তামৃত, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ

ইত্যাদি উপলক্ষে যে সকল নির্দিষ্ট মেয়েলী গীত গাওয়া হয়, তাহাই পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই ইহারা গীত হয়, উদ্দেশ্য ব্যতীত কদাচ গীত হয় না। পরিবারের মধ্যে উপরোক্ত আচারগুলি যখনই অনুষ্ঠিত হয়, তখনই এই সকল গীতের ব্যবহার হইয়া থাকে—কেবল মাত্র স্বাধীন চিত্তবিনোদনের জন্য ইহারা কদাচ গীত হয় না। পুরুষদিগের সমাজেও ইহাদের সাধারণতঃ প্রচলন নাই—অতএব একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই ইহার প্রচার হইয়া থাকে। উপরোক্ত আচারগুলির মধ্যে বিবাহই প্রধান ; অতএব বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যেই সর্বাধিক বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিবাহের মঙ্গলাচরণ, আশীর্বাদ বা পাকাদেখা হইতে আরম্ভ করিয়া এই গীতের সূত্রপাত হয়, তারপর একেবারে গর্ভাধান-বিবাহ পর্যন্ত গিয়া ইহার সমাপ্তি হয়। অতএব দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিবাহের যে বিভিন্ন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠিত হয়, বিবাহ-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া দিনের পর দিন তাহাই ব্যক্ত হইয়া থাকে।

ব্যবহারিক গীতি সর্বাপেক্ষা নিরাভরণ। ইহার প্রায়ই কোন মিলও থাকে না, অবশ্য আদিবাসীর লোক-সঙ্গীতেও পদান্তে কোন মিল থাকে না। ইহার বহিরঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, ভাবের দিক দিয়াও বিশেষ কোন গভীরতা নাই। কিন্তু প্রেম-সঙ্গীতকে যদি ব্যবহারিক সঙ্গীতরূপে ধরা যায়, তবে ইহার সম্বন্ধে এই উক্তি স্বীকার করা যায় না। এই বিষয়ে একটি কথা এই যে, আদিম সমাজে প্রেম-সঙ্গীত দ্বারা একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইলেও, লোক-সমাজে প্রত্যক্ষভাবে ইহার এই ব্যবহারিক মূল্য হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। যে সমাজে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে কেবল মাত্র তরুণ-তরুণীর মিলনের অভিপ্রায় দ্বারাই বিবাহ সম্ভব হইতে পারে না, সেই সমাজে প্রেম-সঙ্গীত ইহার মৌলিক ব্যবহারিক মূল্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত লোক-সমাজের চিত্ত-বিনোদনের সর্বাধিক সহায়ক। অতএব লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহা ব্যবহারিক গীতির অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগই নির্দেশ করা কর্তব্য। বিশেষতঃ ইহার বিস্তার এত ব্যাপক যে, ইহার জন্য একটি স্বাধীন বিভাগ নির্দেশ না করিলে ইহার সম্পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। প্রেম-সঙ্গীত যদি ব্যবহারিক গীতির অন্তর্ভুক্ত মনে করা না হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ব্যবহারিক গীতি প্রকৃতই সর্বাধিক নিরাভরণা। ব্যবহারিক গীতিকে মেয়েলী গীতি বলিয়া নির্দেশ করিলে ইহা বুঝিতে সহজ হইবে। প্রকৃত পক্ষে ইহা

প্রধানতঃ নারীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিবাহ প্রমুখ বিবিধ পারিবারিক অনুষ্ঠানে যে সকল মেয়েলী গীত গাওয়া হয়, তাহাদের অন্তর ও বহিরঙ্গে কোন বৈশিষ্ট্য নাই—ইহাদের বহিরঙ্গ যে রকম শিথিল, অন্তরও তেমনই অগভীর। উত্তর ভারতের উচ্চতর সমাজের প্রায় সর্বত্রই এই সকল সঙ্গীতের সঙ্গে রামায়ণের কাহিনী আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, বাংলাদেশে রামায়ণের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গও বর্তমানে ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, নিতান্ত প্রয়োজনের জগতের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উপকরণের স্থান হইতে পারে না—বহিরলঙ্কার এবং অন্তরগত ভাব-গভীরতা উভয়ই অপ্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র হইতে জন্ম লাভ করে। যেখানে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন, সেখানেই অলঙ্কারের আবির্ভাব হয়; কিন্তু যেখানে কেবল মাত্র প্রয়োজনীয়তার তাগিদ, সেখানে অলঙ্কার ভার-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবহারিক বা মেয়েলী গীতি এই প্রকার ভার-মুক্ত। কিন্তু সে'জন্য ইহাই লোক-গীতির মধ্যে সর্ব-প্রথম উদ্ভূত হইয়াছে কি না, তাহা অনুমান করিয়াও বলিতে পারা যাইবে না।

প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে অনুষ্ঠিত কোন পার্বণ উপলক্ষে যে সকল সঙ্গীত গীত হয়, তাহা আনুষ্ঠানিক বা পার্বণ-সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করিয়া এক স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে পারিবারিক সঙ্গীতের প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ইহা গীত হয়; কিন্তু পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীতের নির্দিষ্ট কোন দিন নাই। বৎসরের মধ্যে ইহার দিন পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া ইংরেজীতে ইহাকে calendric song বলে। ইহা কেবল মাত্র যে নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহা নহে—কোন কোন বিষয়ে পুরুষও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মেয়েলী ব্রতানুষ্ঠানের গীতিগুলি যেমন মেয়েরাই গাহিয়া থাকে, তেমনই গাজন প্রমুখ অনুষ্ঠানের গানগুলি পুরুষই গাহে। বয়স্ক পুরুষ ও নারী ব্যতীতও ইহাদের মধ্যে বালক বালিকাদিগেরও অংশ আছে। কুমারী মেয়েরা যেমন মাঘমণ্ডল প্রমুখ কোন কোন কুমারীব্রতের গীত নিজেরাই গাহিয়া থাকে, কৃষক বালকেরাও ঘেঁটু প্রমুখ নানা লৌকিক দেবদেবীর পূজার মাগন সংগ্রহ করিয়াও নানাপ্রকার গীত গাহিয়া থাকে। বাংলার পল্লীতে 'বারমাসে তের পার্বণ' যে লাগিয়াই ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি উপলক্ষেই এই সকল গীত একদিন গাওয়া

হইত—উৎসবের আনন্দ সঙ্গীতের ধারায় ইহাদের ভিতর দিয়া স্বতঃ উৎসারিত হইত। এই সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য কোন কোন অঞ্চলে যুক্ত রহিয়াছে।

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। সেইজন্য কৃষি অবলম্বন করিয়াও এ দেশের লৌকিক ধর্ম ও সাহিত্য মূলতঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীর দেবতা শিব স্বয়ং কৃষক, ধানের শীষ্ তাঁহার ঘরের লক্ষ্মী। কৃষিকার্যকে বাঙ্গালী দেব-মর্যাদা দান করিয়াছে—ইহা সে কোনদিন অবহেলা করে নাই। সেইজন্য তাহার লোক-সাহিত্যেও কৃষি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। নারী ও পুরুষের সমান সহযোগিতায় কৃষিকার্যে গৃহস্থের সমৃদ্ধি লাভ হয়। সেইজন্য কৃষিকার্য পুরুষের বহির্মুখীন (outdoor) কর্ম হইলেও, নারীও সাধ্যমত ইহাতে তাহার সহযোগিতা দান করিয়াছে। অতএব কৃষি-বিষয়ক গীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমান ভাবে প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্ত্য লোক-সঙ্গীতে work song নামে যে এক বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কৃষিকর্ম ব্যতীতও অন্যান্য বহু বিষয়ক সঙ্গীত স্থান পায়; কারণ, পাশ্চাত্ত্য সমাজে কৃষি একটি অপ্রধান কার্য মাত্র, কিন্তু কৃষি বাংলার সর্বস্ব—পুরুষের সমগ্র বহির্মুখী কর্ম ইহা কেন্দ্র করিয়াই নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইজন্য বাংলায় কর্মবিষয়ক লোক-সঙ্গীত কৃষি-সঙ্গীত বলিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পারে।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বে ব্যবহারিক সঙ্গীত বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে কৃষি-সঙ্গীতের পার্থক্য কোথায়? ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ত কৃষিকার্যও করা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে-সকল গীত ব্যবহারিক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, যেমন বিবাহ-সঙ্গীত ইত্যাদি, তাহা একান্ত পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অবলম্বন করিয়াই গীত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষি-সঙ্গীতের একটি বৃহত্তর ব্যবহারিক মূল্য আছে। যে সময়ই ইহা গীত হউক না কেন, ইহার একটি সর্বজনীন আবেদন প্রকাশ পায়। বহির্মুখীন জীবন হইতে কৃষি-সঙ্গীতের প্রেরণা আসে, কিন্তু ব্যবহারিক গীতি অন্তর্মুখীন প্রেরণা হইতে জাত। তবে উভয় সঙ্গীতই ইহাদের নিজস্ব উপলক্ষ ব্যতীত গীত হইবার রীতি নাই। এখানেই ইহাদের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আঞ্চলিক

লোক-সঙ্গীতের দিক হইতে বাংলাদেশকে প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে, যেমন—পশ্চিম, উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জিলা লইয়া পশ্চিম অঞ্চল; মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর লইয়া উত্তর অঞ্চল; পূর্ব মৈমনসিংহ, পশ্চিম শ্রীহট্ট, উত্তর ত্রিপুরা লইয়া উত্তর-পূর্ব এবং নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম অঞ্চল লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল গঠিত। বাংলার মধ্য অঞ্চল হিন্দু, মুস্লিম ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির দ্বারা ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হইবার ফলে লোক-সাহিত্যগত কোন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চল সমূহেই লোক-সাহিত্যের ধারা অব্যাহত থাকিবার সুযোগ ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কারণে ইহার মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমাজ-সংহতি সর্বদা বিপর্যস্ত হইয়াছে; সেইজন্য ইহার লোক-সংস্কৃতিও কোন বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই। বাংলার অন্যান্য যে সকল অঞ্চলের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল না, তাহা উপরোক্ত চারিটি অঞ্চলের কোন না কোন একটি কিংবা একাধিক অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে; অতএব স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত চারিটি অঞ্চলেই ঐতিহাসিক ও জাতিগত পরিচয় যে পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহা গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে উল্লেখ করিয়াছি—এই স্বাতন্ত্র্যই ইহাদের লোক-সংস্কৃতির খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিবার মূল। কিন্তু এই প্রকার ইতিহাস ও জাতিগত বিভিন্নতার উপরও কালক্রমে কতকগুলি একীকারক (unifying) সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল—ভাষা ও ধর্ম ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদেরই প্রভাবের ফলে এই সকল বিভিন্নতার মধ্য দিয়াও যে ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই গুণেই ইহারা পরস্পর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, বাংলার অখণ্ড সংস্কৃতিরই অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। পরবর্তী আলোচনা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উপরোক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতির যে সকল লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালীর একটি

অখণ্ড জাতীয় অনুভূতি স্পন্দিত হইয়াছে। ইহারা বাংলার জাতীয় গীতি-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র—পরস্পর পরস্পর হইতে বিভিন্ন ও স্বাধীন নহে।

বর্তমানে প্রধানতঃ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী কয়েকটি জিলায় চিত্রকর বা পটুয়া বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর লোক বাস করে। হিন্দু পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন ও তাহাদের বিবরণ গৃহে গৃহে গান করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে। ইহাদের ব্যবহৃত সঙ্গীত ইহাদের নিজেদেরই রচিত—ইহাই পটুয়ার গান বা পটুয়া-সঙ্গীত নামে পরিচিত। পটুয়াগণ হিন্দু দেবদেবীর চিত্রাঙ্কন ও মহিমা কীর্তন করিলেও ইহারা হিন্দুসমাজভুক্ত নহে। কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে ইহাদিগকে হিন্দু বলিয়াই মনে হয়। ইহারা হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাদের মেয়েরা হিন্দু নারীর মতই শাঁখা-সিঁদূর পরিধান করে। একমাত্র নিজেদের মধ্যেই ইহাদের বিবাহ সীমাবদ্ধ। মুসলমান-প্রথা অনুসারে ইহাদের বিবাহ হয়, কিন্তু বৃহত্তর মুসলমান সমাজের মধ্যেও ইহাদের কোন স্থান নাই—নিজেদের সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ইহাদিগকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। হিন্দু সমাজে ইহাদের পাতিত্য ঘটিবার কারণ সম্পর্কে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হইয়া থাকে যে, ইহারা দেবতার চিত্রাঙ্কন ও তাহাদের মহিমা কীর্তন বিষয়ে পৌরাণিক আদর্শ রক্ষা করিবার পরিবর্তে লৌকিক আদর্শেরই অনুসরণ করে—অতএব ব্রহ্মার শাপে ও ব্রাহ্মণের কোপ বশতঃ তাহাদের এই অবস্থা হইয়াছে। ইহাদের সম্পর্কিত এই জনশ্রুতি হইতে কয়েকটি বিষয় অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ ইহাদের চিত্রাঙ্কনে হিন্দু আদর্শের ব্যতিক্রম করিবার সংস্কার এতই প্রবল ছিল যে, তাহার জন্য ইহারা ব্রহ্মার শাপ ও ব্রাহ্মণের ক্রোধ পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাহাদের অঙ্কিত চিত্রের বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে হিন্দুসমাজ-স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন ধারা প্রচলিত ছিল। এই স্বাধীন ধারাটি কি? ইহা যাহাই হউক, অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা একটি অনার্য ধারা বলিয়াই ইহা হিন্দুধর্মানুমোদিত হইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাংলার এই বিশিষ্ট প্রকৃতির আঞ্চলিক লোক-গীতি উদ্ভবের মূলেও একটি অনার্য প্রভাবই কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে হিন্দুসমাজেরই মনোরঞ্জন করিয়া পটুয়াদিগের জীবিকা নির্বাহ

করিতে হইত বলিয়া, হিন্দু উপকরণও তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এই সকল উপকরণের ভিতর দিয়াও তাহাদের নিজস্ব সংস্কার-সুলভ মনোবৃত্তিটি প্রায় সর্বদাই প্রকাশ পাইয়াছে—পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবীগণ প্রায়শঃই পৌরাণিক মর্যাদা রক্ষা করিয়া ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের উক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'পটুয়া-শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে; তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপ-গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী; রাম, লক্ষণ ও সীতা বাঙ্গালী, শিব ও পার্বতীও পুরা বাঙ্গালী। বড়াই বুড়ীর ছবি বাঙ্গালী ঠাকুর মা ও পিসীমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্ত্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশী।'[১] এইভাবে লোক-সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া বাংলার পটুয়া-শিল্পিগণ হিন্দুসমাজের নিকট হইতে পাতিত্য বরণ করিয়া লইল এবং মুসলমান সমাজেও তাহাদের যথার্থ স্থান হইল না।

চিত্রাঙ্কন ব্যতীতও পটুয়াগণ আরও যে দুই একটি বৃত্তি পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহা হইতে ইহাদের অনার্য সংস্রব আরও সুস্পষ্ট অনুভব করা যাইবে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা বিষবেদে বা সাপুড়ের ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়া থাকে। সাপুড়ের ব্যবসায় কুলক্রমাগত ব্যবসায়—ইহা এক পুরুষে দুই পুরুষে কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। অতএব এ'কথা অনুমান করা ভুল হইবে না যে, সাপুড়ের বৃত্তি পটুয়াদিগের কৌলিক বৃত্তি। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মাল নামে পরিচিত যে সাপুড়ের ব্যবসায়ী এক আর্যেতর জাতির বংশধর আজিও বাস করে,[২] তাহা বর্তমান পটুয়াজাতিরই এক শাখা বলিয়া মনে হয়। সাপুড়েরাও এক প্রকার গীতি-ব্যবসায়ী—তাহারা গান গাহিয়াই সাপের খেলা দেখাইয়া থাকে, পটুয়াগণ পটের উপর চিত্র আঁকিয়া গানের ভিতর দিয়াই তাহা বর্ণনা করে। সর্পদেবী মনসার বৃত্তান্ত চিত্রের ভিতর দিয়া প্রদর্শন করানই সম্ভবতঃ ইহাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমে অন্যান্য বিষয় অবলম্বন করিয়াও ইহারা চিত্রপট অঙ্কন ও প্রদর্শন করিতে

১ পটুয়া-সঙ্গীত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯), পৃঃ ১ ॥
২ Risley ii 45-50.

আরম্ভ করে। সেইজন্য এখন পর্যন্তও পটুয়াগণ সহজেই সাপুড়ের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও অষ্টম শতাব্দীতে বিশাখা দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক সংস্কৃত নাটকে যমপট ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে। তাহা হইতে মনে হয়, এক শ্রেণীর গীত-ব্যবসায়ী যমপুরীর বিভীষিকাময় চিত্র পটের উপর অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী পটুয়াদিগের অনুরূপই গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে দেখাইয়া জীবিকা অর্জন করিত। আধুনিক কালেও বাংলার পটুয়াগণ যে সকল পট অঙ্কন করিয়া থাকে, তাহাদের সর্বশেষ দৃশ্যটিতে যমপুরীর একটি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়। অতএব স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে পট ব্যবসায়ের যে ধারাটি প্রচলিত ছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া বর্তমান ধারাটিও অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। বাংলার মাল বেদিয়াগণ কবে কোথা হইতে বাংলা দেশে আসিয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ইহাদেরই পূর্বপুরুষ এই ব্যবসায় দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিত। সাধারণতঃ যে সকল বিষয় লইয়া বর্তমান কালে পটুয়াগণ চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকে, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে—

প্রথমতঃ বেহুলা-লখীন্দর-মনসা-বিষয়ক, দ্বিতীয়তঃ রামায়ণ-বিষয়ক, তৃতীয়তঃ ভাগবত-বিষয়ক। এখানে লক্ষ্য করিবার কয়েকটি বিষয় আছে—পটুয়াগণ মহাভারতের কাহিনী-বিষয়ক কোন পট অঙ্কন করে না এবং মনসা মঙ্গলের বিষয় রামায়ণ এবং কৃষ্ণলীলার তুল্য প্রাধান্য লাভ করে। এই জন্যই বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ পটুয়াগণ পূর্বে কেবলমাত্র সাপুড়ে বা বেদের ব্যবসায়ী ছিল, সুতরাং সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসারই মাহাত্ম্য তাহারা পটের মধ্য দিয়াও প্রচার করিত। অতএব কালক্রমে পটের মধ্যে অন্যান্য বিষয়-বস্তু গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও মৌলিক বিষয়টি ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র যে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা নহে—সমান প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। উপরোক্ত তিনটি সাধারণ বিষয় ব্যতীতও পটচিত্রে আরও কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই সংখ্যা অত্যন্ত অল্প—কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ক মাত্র দুই একটি পটের সন্ধান পাওয়া

গিয়াছে ; যেমন পার্বতীর শঙ্খ পরিধান, কমলে কামিনী, গৌরাঙ্গ-লীলা, গোঁসাই পট, সাহেব পট, ডাকাতের পট ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি বিষয় যথাক্রমে স্থানীয় ও লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া চিত্রিত। ইহাদের মধ্যে গাজীর পট নামে পরিচিত এক শ্রেণীর পট আছে—ইহাদের বিষয় ও ইতিহাস স্বতন্ত্র, ইহাদের কথা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

পট দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে—এক শ্রেণীর নাম চৌকা পট, ইহাতে এক একটি চিত্র বিচ্ছিন্ন ভাবে অঙ্কিত হয়, ইহা গীতি-সহযোগে ব্যাখ্যা করিবার রীতি নাই। অন্য এক শ্রেণীর পটের নাম দীঘল পট বা জড়ানো পট ; ইহাতে কোনও আনুপূর্বিক বিষয় একটি দীর্ঘ পটের উপর হইতে নীচের দিকে অঙ্কিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্রের সহযোগে ব্যক্ত করা হয়। এই চিত্রগুলি পটুয়াগণ গীতি-সহযোগে নিজেরাই ব্যাখ্যা করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক গৃহদ্বারে একই গীতি একই ভঙ্গিতে গাহিয়া গাহিয়া তাহারা গ্রাম-গ্রামান্তর পরিক্রমণ করে। চিত্র এবং গীতি উভয়ে মিলিয়াই একটি অখণ্ড রসের সৃষ্টি হয়—এক হইতে অপরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সেইজন্য পটুয়ার নিজস্ব সঙ্গীত ব্যতীত কেবলমাত্র তাহার চিত্রের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, চিত্র ব্যতীত পটুয়া-সঙ্গীতেরও কোন পরিচয় নাই। ইহাদের এই অখণ্ড যোগা-যোগের ভিতর দিয়া ইহাদের উভয়েরই রস ও সৌন্দর্য বিকাশ পায়।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, গীতিসমূহ চিত্রের হুবহু বা আক্ষরিক বর্ণনা মাত্র। বর্ণনার দিক দিয়া গীতিগুলির মধ্যে কতকটা স্বাধীনতা থাকে এবং এই স্বাধীনতার জন্যই গীতিগুলির মধ্য দিয়া সাহিত্যরস বিকাশ লাভ করিতে পারে। চিত্রের মধ্যে হয়ত দেখা যাইতেছে, একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে, তাহার উপর এক শিশু নৃত্যভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে—দুই পার্শ্বে দুই নাগকন্যা করজোড় করিয়া আছে,—ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নাই। এই চিত্রটি উপলক্ষ করিয়া পটুয়া গাহিবে,

কালীদহের কূলে ছিল কেলি কদম্বের গাছ।
তা'তে চড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাঁপ॥
কালীনাগ আজ আহার ব'লে সকলে ঘেরিল।
নাগবতী দুইটি কন্যা উপস্থিত হইল॥
নাগের মাথায় পদ দিয়ে, দেখুন, ঠাকুর নাচিতে লাগিল॥

অতএব দেখা যাইতেছে, চিত্রে যাহা নাই, এমন অনেক বিষয়ও গীতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—চিত্রে এবং গীতিতে মিলিয়া বিষয়টিকে একটি সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। পটের দিকে চাহিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রাণহীন চিত্রগুলি স্থির হইয়া আছে। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠে—চিত্রার্পিত হইয়া যাহা নিষ্প্রাণ বলিয়া বোধ হয়, সঙ্গীতের সুরে তাহাই চঞ্চল হইয়া উঠে। গীতিগুলি যদি চিত্রের অবিকল বর্ণনা হইত, তাহা হইলে ইহাদের রসসৃষ্টিতে বাধা হইত। অতএব চিত্রগুলি উপলক্ষ করিয়া গীতিরস পরিবেষণ করিবার মধ্যেই ইহাদের সার্থকতা।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, চিত্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দুই চিত্রের মধ্যস্থলে ঘটনার যে ব্যবধানটুকু পড়িয়া যায়, তাহা পটুয়া তাহার নিজস্ব সঙ্গীত দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেয়। অতএব চিত্রগুলি পরস্পর যত বিচ্ছিন্নই হউক না কেন, ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়া কাহিনীর পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইতে কোন বেগ পাইতে হয় না। ইহাদের মধ্যে আখ্যায়িকার দিকটিই যে প্রাধান্য লাভ করে, তাহা নহে—একটি অত্যন্ত ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহার আখ্যায়িকা (narrative) গ্রথিত হইয়া থাকে। ইহার রস কাহিনীগত নহে বরং ভাবগত। বর্তমান কালে ভক্তির ভাবটিই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই ভক্তির মূলে রহিয়াছে ভয়। মনসা-মঙ্গল বিষয়ক পটগুলির মধ্য দিয়া মনসার প্রতি যে ভক্তির বিকাশ হয়, তাহা ভয় হইতে জাত। অন্যান্য পটগুলিরও উপসংহারে যমপুরীর যে বিভীষিকা-চিত্র প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, তাহার উপরই পরোক্ষভাবে দেবতার প্রতি ভক্তিভাবের প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতএব উপরে যে ভক্তিভাবের কথা বলিলাম, তাহা সাত্ত্বিক ভক্তি বলিয়া মনে করা ভুল হইবে ; আধ্যাত্মিক ভাষায় যদি ইহার পরিচয় দিতে হয়, তবে ইহাকে তামসিক ভক্তি বলা যাইতে পারে। সাত্ত্বিক ভক্তি ব্যক্তি-অনুভূতি সাপেক্ষ, কিন্তু তামসিক ভক্তি অর্থাৎ ভয় হইতে যে আত্মসমর্পণ, তাহা মানব মাত্রেরই একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এই দিক দিয়া পটুয়া-সঙ্গীতগুলির সঙ্গে বাংলার লোক-সমাজের যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার জীবন ও সাহিত্যে পটগীতির স্থান সম্পর্কে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাংলার অধ্যাত্মজীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর

স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পটগীতিতে রূপায়ণ লাভ করিয়াছে—সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোন অভিজাত-সমাজের ভাববিলাস-ব্যঞ্জক সাহিত্য নয়—জাতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস-কলুষহীন ভাবধারার ও কল্পনাধারার জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল, তাহার এবং বাঙ্গালী হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্মবিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতা মাখা রূপায়ণ।'[১]

উপরোক্ত ভক্তিরস ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর যে যে রস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রেমরস, বাৎসল্যরস ও দাম্পত্যরস উল্লেখযোগ্য। এক কথায় বলিতে গেলে, ভক্তিরসের পরই গার্হস্থ্য রস ইহাদের অবলম্বন হইয়াছে। গার্হস্থ্য রসের মধ্যে যে একটি সর্বজনীন মানবিক আবেদন আছে, তাহাই ইহাদিগকে সাহিত্যিক গৌরব দান করিয়াছে। পটুয়া-গীতি সমূহ জনশ্রুতিমূলক বিষয়-বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া রচিত হয়। জনশ্রুতিমূলক বিষয় ও রচনার অনায়াস গুণ এই দুইটি দিক দিয়াই ইহা লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। চিত্রগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে যেমন বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন চিত্রকরের বিশিষ্ট কোন প্রতিভার স্পর্শ ইহাদের মধ্যে নাই, তেমনই ইহাদের গীতিগুলি শ্রবণ করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিশেষ কোন কবি কিংবা গীতিকারের স্বকীয় কোন প্রতিভা ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকট হইয়া উঠে নাই—ইহারা সমষ্টির হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত। সেইজন্য ব্যষ্টির প্রভাব ইহাদের মধ্যে অনুভূত হয় না। এই গুণে ইহারা লোক-সাহিত্যের ধর্ম হইতে চ্যুত নহে।

গাহিবার উদ্দেশ্যেই রচিত বলিয়া পটুয়া-গীতির বহিরঙ্গ অত্যন্ত শিথিল। ইহার রচনায় মাত্রার কোন স্থিরতা নাই ; তবে গাহিবার সময় যেখানে মাত্রার অভাব থাকে, সেখানে টানিয়া টানিয়া তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া হয় এবং যেখানে আধিক্য থাকে, সেখানে দ্রুত গাহিয়া প্রত্যেক পদ নির্দিষ্ট সুরের সীমার মধ্যে আনিয়া লওয়া হয়। যেমন,

কেও ধরে চুলের মুষ্টি কেও ধরে গায় ॥
পাপী লোক হলে লোহার ডাঙ্গে বেড়ে গো তার মস্তক ফাটায় ॥

১ ঐ, পৃ ১।৵

কিন্তু সর্বত্রই যে এমন হয়, তাহা নহে; তবে একথা সত্য যে, লোক-সঙ্গীতের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইহার বহিরঙ্গ রচনাতেই সর্বাধিক শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। চিত্রের উপর এখানে সঙ্গীতকে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া গীতিকার অনেক সময়ই রচনার সংযম রক্ষা করিতে পারেন না।

প্রত্যেক পটুয়া-গীতিরই একটি সাধারণ ভূমিকা থাকে, ইহাতে নমস্কার কিংবা ভগবানের নাম স্মরণ করা হইয়া থাকে; যেমন,

হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি ব্রজের শোভা আছে।
জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে॥

কিংবা

নম মহেশ্বর দিগম্বর ঈশান শঙ্কর।
শিব শম্ভু শূলপাণি হর দিগম্বর॥

বন্দনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, কোন্‌টি কি বিষয়ক পট। প্রথমটি যে কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি যে শিব-বিষয়ক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পটগুলিতে ভাগবতের যে সকল্ অংশ বাঙ্গালী দর্শকের পরিচিত ও রুচিকর তাহাই নির্বাচিত করিয়া চিত্রার্পিত করা হইয়া থাকে—জটিল তত্ত্ববিষয়ক অংশ সর্বদাই পরিত্যক্ত হয়। কৃষ্ণের নৃত্য, গোষ্ঠ-সজ্জা, বস্ত্রহরণ, দধির ভার বহন ইত্যাদি বিষয়ই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পটে চিত্রিত হইয়া থাকে। ভাগবতের ঘটনার পারম্পর্য যে সর্বদা রক্ষা পায়, তাহা নহে—শাস্ত্রের শাসন, পুঁথির নির্দেশ ইহাতে স্বীকার করা হয় না, শিল্পী ইচ্ছানন্দে চিত্রগুলিকে পর পর রূপায়িত করে। এমন কি, বিষয়ের প্রতিও যে আনুপূর্বিক একটি নিষ্ঠা প্রকাশ পায়, তাহাও নহে; পটুয়া-গীতির কোন কোন অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আনুপূর্বিক এক বিষয়ক কোনও পটের মধ্যস্থলে স্বতন্ত্র বিষয়ের চিত্রও স্থান পায়। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় প্রকাশিত 'পটুয়া-সঙ্গীতে'র একটি আনুপূর্বিক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পটের মধ্যস্থলে একটি মাত্র চিত্রে বিষহরী দেবী স্থান লাভ করিয়াছেন।[১] অতএব ইহাকে পঞ্চকল্যাণী (পরে দ্রষ্টব্য) পটও বলা যাইতে পারে না, অথচ আনুপূর্বিক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পট বলিয়া নির্দেশ করাও ভুল্ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আনুপূর্বিক একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা পটুয়া-সঙ্গীতের

১ প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য

ধর্ম নহে, ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় পরিবেষণের প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পটেরই উপসংহারে যমপুরী ও সংসার-জীবনের অসারতা বর্ণনা করা হয়—এই বৈশিষ্ট্য প্রায় সকল পটের মধ্য দিয়াই রক্ষা করা হয়।

সেইজন্য মিশ্র-বিষয়ক এক শ্রেণীর পটের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—তাহাকে 'পঞ্চকল্যাণী' পট বলে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন দেবতার লীলা কীর্তনের পরিবর্তে বিভিন্ন দেবতার লীলা বর্ণিত হইয়া থাকে—শিব, কৃষ্ণ, রাম, মনসা, চণ্ডী ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে ইহাদের মধ্য দিয়া পরিবেষণ করা হয়। এই সকল দেবদেবী প্রত্যেকের গুণ একমুখী নহে—কেহ ভোলানাথ, কেহ গোপীনাথ, কেহ সীতানাথ, কেহ হিংস্র এবং কেহ ঈর্ষাভাবাপন্ন। অতএব এই সকল বিভিন্নমুখী ভাব এক পাত্রে পরিবেষণের ফলে ইহাদের মধ্য দিয়া একটি অখণ্ড রস গড়িয়া উঠিতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের যে সীমার মধ্যে পটুয়া-সঙ্গীত অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে পঞ্চকল্যাণী পটের সংখ্যা অধিক নহে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে যে পট দেখাইবার রীতি প্রচলিত আছে, সেখানে পঞ্চকল্যাণী পটই ব্যবহৃত হয়—অন্য কোন পট ব্যবহৃত হয় না। পূর্ববঙ্গে এই সকল পট আচার্য ব্রাহ্মণ কিংবা কুম্ভকারগণ চিত্রিত করিয়া থাকে—পটুয়া নামক কোন সম্প্রদায় সেখানে নাই। পূর্ব-মৈমনসিংহ অঞ্চলের একটি পঞ্চকল্যাণী পটের প্রারম্ভাংশ এই প্রকার—

নম মহেশ্বর দিগম্বর ঈশান শঙ্কর।
শিব শম্ভু শূলপাণি হর দিগম্বর ॥
গিয়ে কুচ্‌নীপাড়া—
গিয়ে কুচ্‌নীপাড়া ভাঙ্‌ ধুতুরা শিবশম্ভু খায়।
তানপুরা বাজাইয়া শিবে কুচুনী ভুলায় ॥
এই যে নন্দী বেটা—
এই যে নন্দী বেটা শিরে জটা উল্টে আঁখি চায়।
ভয় পাইয়া যম রাজা দৌড়িয়া পলায় ॥
দেখ ভঙ্গি বাঁকা—
দেখ ভঙ্গি বাঁকা রাখাল সখা কদম্ব তলায়।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী গোপীর মন ভুলায় ॥

দেখ কুট্‌না বুড়ী—
দেখ কুট্‌না বুড়ী জটলা করি কুমন্ত্রণা দিয়া।
শ্যামের সঙ্গে গোপন পীরিত দিয়াছে ঘটাইয়া॥
দেখ কাল ননদী—
দেখ কাল ননদী সদায় বাদী কুলের কুলবালা।
বলে, দাদা, তোমার রাধা গিয়াছে জঙ্গলা॥
দেখ ঘোর কলিকাল—
দেখ ঘোর কলিকাল মাতাল বৈতাল হইয়াছে প্রবল।
ধরম করম লজ্জা সরম হইয়াছে বিকল॥ ইত্যাদি

পূর্ববঙ্গে এই পট নমঃশূদ্র প্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণই দেখাইয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। যে পট অঙ্কন করে, সে কদাচ ইহার গীত রচনা করে না, কিংবা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াও বেড়ায় না। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—পশ্চিম বঙ্গের উপরোক্ত অঞ্চলের মত ইহা একটি সাম্প্রদায়িক বৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই।

তবে পূর্ববঙ্গে এক শ্রেণীর পট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা গাজীর পট নামে পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গের উপরোক্ত অঞ্চলে ইহার সঙ্গে কচিৎ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহাতে গাজী বা মুসলমান ধর্ম প্রচারকদিগের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত সমূহ চিত্রে রূপায়িত হইয়া থাকে। অলৌকিকতার আতিশয্যে ইহাদের ঘটনাসমূহ এতই ভারাক্রান্ত যে, ইহাদের মধ্য হইতে সাহিত্য-রস উদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব। ইহারা ধর্মপ্রচারের বাহন—সাহিত্য-রস পরিবেষক নহে; অতএব ইহারা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

পটুয়া-সঙ্গীতের কোন স্থায়ী মূল্য নাই। যতদিন পট অঙ্কন করিবার রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল, ততদিন ইহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীতগুলিও প্রচারিত হইত। পট-চিত্রের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ভাবে ইহারা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য পটুয়ার শিল্প ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া-সঙ্গীতও লুপ্ত হইয়াছে। একান্ত ভাবে একটি বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করিবার ফলে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও পরিমিত আয়ু লইয়াই ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ স্বাধীন লোক-সঙ্গীত যেমন সমাজের

মধ্য দিয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, ইহা স্বভাবতঃই তাহা পারে নাই। সেইজন্য যদিও ইহা ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য প্রমুখ সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথাপি ইহার বাহ্য অবলম্বনটির অভাবেই ইহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পটুয়ার গানগুলি ছিল বর্ণনাত্মক—ভাবাত্মক নহে; অতএব বর্ণিতব্য বিষয়-বস্তুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের বর্ণনাও লুপ্ত হইয়াছে।

পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি যখন আদিবাসীর বর্ষা-উৎসবের 'করম' সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে, তখন পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিনী কুমারীদিগের কণ্ঠনিঃসৃত ভাদুগানের ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হিন্দুপ্রভাব বশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছে—তাহা ভাদুপূজা নামে পরিচিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর 'করম'-উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র। নৃত্য এবং গীতই করম-উৎসবের প্রধান অঙ্গ, ভাদু পূজারও তাহাই; তবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে ইহার নৃত্যাংশ স্বভাবতঃই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আদিবাসীর করম-উৎসব বর্ষা-উৎসব, ভাদু-উৎসবও বর্ষা-উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদু-উৎসব, ইহার গান ভাদুগান। কিন্তু আধুনিক কালে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে; তাহা এই—অনুমানিক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মানভূম জিলার পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণিসিংহ দেবশর্মা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার ভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। ভদ্রেশ্বরী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রাজান্তঃপুরের মধ্যে অধিকাংশ অনূঢ়া রাজকন্যার জীবন যে ভাবে কাটিয়া যায়, তাঁহার জীবনও সেই ভাবেই কাটিতেছিল। এই ভাবেই একদিন ভদ্রেশ্বরী পরলোক গমন করিলেন। প্রাণাধিকা কন্যার অকাল পরলোক-গমনে রাজা নিদারুণ ব্যথিত হইলেন—তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, রাজকন্যার স্মৃতিরক্ষার জন্য ভাদ্রমাসে পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার নামে উৎসব পালন করিতে হইবে। প্রজাগণ সানন্দে আদেশ পালন করিল।

তারপর মানভূম হইতে তাহা বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল। আধুনিক কালে রচিত বহু ভাদুগানের ভিতর দিয়াই এই বিষয়টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বহু পূর্ব হইতেই এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহার সঙ্গে কাশীপুররাজ ও তাঁহার কন্যার নাম আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। কাশীপুর রাজপরিবারের এই বিবরণটি ঐতিহাসিক সত্য।

ভাদ্র মাসের প্রথম দিন কুমারীগণ গৃহে একটি মৃন্ময় নারী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার এই প্রকার আগমনী গীতি গাহিয়া থাকে—'আদরিণী ভাদুরাণী এল আজি ঘরকে।' কিংবা

ভাদুর আগমনে।
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে ॥
ভাদু আজকে এ'লো ঘরে গো এলো গো শুভদিনে।
মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো যত সব সঙ্গিগণে ॥
মোরা সারারাতি কর্‌ব পূজা গো ফুল দিব গো চরণে।
আন্‌ব সন্দেশ থালা থালা খাওয়াব ভাদুধনে ॥
ভাদুপূজা নাই যেথায় যে গো, কি কাজ তাদের জীবনে।
কাশীপুরের রাজার পূজা গো, সে পূজা করে প্রথমে ॥
সে মনের মত বর পেয়েছে যা ছিল গো তার মনে।
ভাদু, বলি তোমায়, চরণ তোমার দিবে আমায় মরণে ॥[১]

প্রথম দিন এই প্রকার আগমনী সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাদু-বন্দনার পর প্রতি রাত্র জাগিয়া কুমারীগণ নানা লৌকিক বিষয়ে উপস্থিত মত (extempore) সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিয়া থাকে। বিবিধ গার্হস্থ্য বিষয় অবলম্বন করিয়াই এই সকল সঙ্গীত রচিত হয়, ইহাদের মধ্যে ধর্মভাবের স্পর্শ মাত্রও থাকে না। যেমন,

বলি, ওলো মকর।
আস্‌ছে জামাই নূতন নূতন ফ্যাসান্ কর ॥
সাবান মেখে ফর্‌সা হয়ে লো রেডি হ'লো তুই সত্বর।
আস্‌ছে ঘোড়ায় চেপে নিয়ে যাবেক শ্বশুর ঘর ॥

১ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত সকল ভাদুগানই গ্রন্থকার কর্তৃক বাঁকুড়া জিলা হইতে সংগৃহীত।

আজকাল আবার নূতন নূতন ফ্যাসান্ লো পুরুষ চেয়ে স্ত্রী ডাগর।
যখন পুরুষ হয় নাই, (তখন) স্ত্রীয়ের বয়স এক বছর॥

প্রত্যেক গৃহেই কুমারীগণ এই উৎসব পালন করিয়া থকে—গৃহে গৃহেই ভাদু প্রতিমা স্থাপন করিয়া পরিবারের কুমারী ও সদ্যোবিবাহিতা নারীগণ সাধারণতঃ উপস্থিত মত রচিত সঙ্গীতই গাহিয়া থাকে; ক্রমে প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে এই বিষয়ক একটি প্রতিযোগিতার ভাব প্রকাশ পায়। এক পরিবারের মেয়েরা তখন তাহাদের প্রতিবেশী পরিবারের মেয়েদিগকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই আক্রমণ করে—কোন কোন সময় এই আক্রমণ পরস্পর পারিবারিক কুৎসা প্রচারের স্তরেও নামিয়া আসে, কিন্তু অনেক সময় নির্দোষ আমোদই ইহার উপজীব্য হয়। নির্দোষ আমোদের মধ্যে পরস্পরের ভাদু-প্রতিমার নিন্দা একটি প্রধান ও অপরিহার্য বিষয়। এক পরিবারের মেয়েরা তাহাদের প্রতিবেশী পরিবারের ভাদু-প্রতিমার এইভাবে নিন্দা করিয়া থাকে—

দেখে যা লো তোরা।
ভাদু দেখে হইছি লো দিশেহারা॥
রূপের ছটা ঘনঘটা লো, আলো, ঘর আঁধার করা।
আন্‌মনেতে ব'সে আছে, ঠিক যেন ক্ষেপীর পারা॥
মুখের ছিরি, আহা মরি লো, শ্রাবণ মাসের মেঘ করা।
চোখ দুটো তার বেলের মতন ঠিক যেন আগুন পারা॥
নাক্‌টায় যেন বেং বসেছে লো, ঠোঁট দুটো উঁচু করা।
দেখে শুনে এমন ভাদু আন্‌লি কেন সইয়েরা॥
হাত পা সরু পেটটা মোটা লো, তাতে আবার গাল পোড়া।
বুঝি রোগ ভোগ ক'রে ভাদুর তোদের, হইছে লো এমন ধারা॥

নিজেদের প্রতিমার এই নিন্দা শুনিয়া প্রতিবেশী পরিবারের মেয়েরাও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, তাহারাও স্বরচিত সঙ্গীতে প্রতিবেশিনীর প্রতিমার অনুরূপ নিন্দা করিয়া এই প্রকার সঙ্গীত রচনা করে—

ভাই রে, মনে মনে।
আমার ভাদুর রূপ দেখে জ্বলিস্ কেনে॥

আমার ভাদুর রূপটি তোদের লো, চোখে বল সইবে কেনে।
সূর্যের আলো দেখ্‌লে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে ॥
তেম্‌নি তোরা ভাদুধনে লো, দেখ্‌তে নাল্লি নয়নে।
তোদের ভাদু, আমার ভাদু, তফাৎ লো রাত্রিদিনে ॥
আমার ভাদু স্বর্গশোভা লো, তোদের পাতাল-ভুবনে।
সত্য মিথ্যা দেখ্‌না চেয়ে, চোখ থাকতে অন্ধ কেনে ॥
তোদের ভাদু অনামুখী লো, ভেবে দেখ মনে মনে।
তপ্‌ড়াগালী চেপ্টাবুকী পান্তাখাকী তার সনে ॥
আস্তাকুড়ের সক্‌ড়ি খাকী লো—বসা গা তায় সেইখানে।
আমার ভাদুর সনে তোরা সমান করিস কেমনে ॥

ভাদু-সম্পর্কিত যে জনশ্রুতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অবিবাহিত অবস্থায়ই রাজকুমারী ভাদু পরলোক-গমন করিয়াছিলেন, সেইজন্য ভাদুর বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন প্রসঙ্গ ভাদুগানের একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে। যেমন,

ভাদুর বিয়া দিব আজ নিশীথে।
ভাদুর বর আস্‌ছে এ'বার উড়া জাহাজেতে ॥
হলুদ মেখে অঙ্গখানি, ব'সে আছে চাঁদ-বদনী,
শুভ লগনে শুভ মিলন আশাতে ॥
চল সবে জল সইতে, বাজনা বাজিবে সঙ্গেতে।
ভরিব ভর্তি ক'রে নূতন কলসীতে ॥
আমার ভাদুর বয়স যত, জামাই করবো মনের মত,
সরল প্রেম রসের প্রেমিক জনেতে ॥
নবীনা প্রেমিকা ভাদু, কত শত জানে যাদু,
কত জনে মজায় চোখের চাওনিতে ॥

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাদু কুমারী—অতিক্রান্ত যৌবনেও তাহার বিবাহ হয় নাই, ইহাই প্রচলিত জনশ্রুতি। অতএব পল্লীবালিকাগণ মনে করে যে, ভাদু বিবাহ করিবে না বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—

ভাদু, আপন ভুলে, কেন বিয়ে করবে না তাই বল খুলে ॥
নবীনা প্রেমিকা ভাদু লো, কেমনে আছ ভুলে ॥
নবীন প্রাণে বঁধুর সনে শুভ বরণ করে লে।
বর এ'সেছে কত শত লো, তোরে দেখিবার ছলে।
যদি রসিক দেখে করবি বিয়া, মনের মতন চিনে লে ॥
আজ বড় শুভ নিশি লো, শুভ মালা বদলে।
মনের আশা পূর্ণ হ'বে, বাসর ঘরে ঢুকিলে ॥
আইবুড়তে বন্ধ্যা থাকা লো, অধর্ম কলিকালে।
বৃথা বয়স কেটে গেলে কে ডাকিবে মা ব'লে ॥

কুমারী হৃদয়ের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাই যে এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাদুর নামে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভাদুগান কুমারী-হৃদয়ের মানস-মুকুর—ভবিষ্যৎ জীবনের যে আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙিন স্বপ্ন কুমারীর অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, ভাদুগান অবলম্বন করিয়া তাহার বাণীরূপ প্রকাশ পায়—ইহা মানবিকতার স্নিগ্ধস্পর্শে সুশীতল।

পূর্বেই বলিয়াছি, একমাস ব্যাপিয়া ভাদুসঙ্গীত গীত হয়, অতএব কেবল মাত্র ভাদু-বিষয়ক সঙ্গীতেই এই সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করা যায় না—বিবিধ সমসাময়িক বিষয় অবলম্বন করিয়াও ইহাতে গীত রচিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরে কাপড়ের কলের ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষ্য করিয়া এই ভাদুগানটি রচিত হইয়াছিল,

মনের এই বাসনা।
দেখ্‌ব কবে কটন মিলের কারখানা ॥
উকিল মোক্তার হাকিম আদি গো সমবেত সর্বজনা।
দেখি, সহযোগী দেশবাসিগণ উৎসাহে সব আট্‌খানা ॥
মান্যবর শ্রীরামানন্দ[১] গো, করি কল্যাণ কামনা।
শুভক্ষণে রথের দিনে কর্‌লেন ভিত্তি স্থাপনা ॥

১ 'প্রবাসী' সম্পাদক জননায়ক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে; তিনি বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীতও ইহাতে ব্যাপক ভাবে গীত হয়; যেমন,

প্রভাত হোল নিশি।
আর কেন, রাই, আশাতে কুঞ্জে বসি॥
সারা নিশি কেটে গেল গো এ'ল না কালশশী।
শুকা'ল ফুল-বাসর, মালাটি হোল বাসি॥
পরশি উষার আলো লো হাসি হাসি দশদিশি।
কিবা, মধুর মন্দ মলয়ে বিকাশে কুসুমরাশি॥

পূর্বেই বলিয়াছি, গানের সঙ্গে সঙ্গে কুমারীরা কোন কোন অঞ্চলে সমবেত ভাবে নৃত্যও করিয়া থাকে, নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্য বাজিয়া থাকে। বাদ্য ও নৃত্যসম্বলিত একটি ভাদুগান এই প্রকার—

ছড়া

সাবাস, সাবাস, বায়েন দাদা, এমনি বাজ্‌না বাজালি।
যেতে বল্‌লাম কাশীপুরে, কোতুলপুরে উঠালি॥

নাচ বাজনা

ডেংটিনাক্, ডেংটিনাক্, ডেডেং ক'সেত ঢাক বাজালে।
বল্ দেখি ভাই ঢাকের জনম, কোথা হতে ঢাক পেলে॥

নাচ বাজনা

তা' যদি না বল্‌তে পার, ঢাক রাখ মানে মানে।
পাওনা পাবে ঘুটার মেডেল, দিবে তোমায় দশজনে॥

নাচ বাজনা

নারীর প্রেমে যে মজেছে তার দফা পটোল তোলা।
নারীর প্রেমে পড়্‌লে পুরুষ হ'তে হয় বুড়া হেলা॥

এখানে গানের দুইটি করিয়া পদ কুমারীগণ সুর করিয়া গাহিয়া যায়, এক একবার দুইটি করিয়া পদ গাওয়া শেষ হইলে ঢাকের তালে তালে কতক্ষণ নৃত্য করে, তারপর পুনরায় আর দুইটি পদ গাহে; এইভাবে সারারাত্র কাটিয়া যায়।

ভাদুগানের সর্বশেষ বিষয় ভাদুর বিদায়—ইহা বাংলার বিজয়া-সঙ্গীতের মতই করুণ। ভাদ্রমাসের শেষদিন কুমারীগণ তাহাদের একমাস ব্যাপী পূজিত

প্রতিমাগুলি মাথায় বহিয়া এই মত বিদায়-গান গাহিতে গাহিতে কোন পুষ্করিণী কিংবা নদীর তীরে আসিয়া সমবেত হয়—

প্রাণে ধৈর্য ধ'রে।
প্রাণের ভাদু বিদায় দিই কেমন করে ॥
সারা বছর কেঁদে কেঁদে গো, পেয়েছি বছর পরে।
সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিষম বিপদ সাগরে ॥
পোড়া বিধি নিদারুণ গো, পোড়াই তাঁহার বিচারে
(মোদের) সুখের বাদী হয়ে সদা দুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে ॥
জুড়াইব দুঃখ জ্বালা গো, কাহার চাঁদ বদন হেরে ॥

যে মৃৎপ্রতিমা কেন্দ্র করিয়া কুমারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাস ব্যাপিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহার জড়রূপ যে কবে ঘুচিয়া গিয়া তাহা অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কেহ অনুভবও করিতে পারে নাই ; সেইজন্য তাহার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কুমারী হৃদয়ে আজ রিক্ততার হাহাকার দেখা দিয়াছে—

ভাদু, বিধুমুখী।
এস এস হৃদয়ে ধরে রাখি ॥
বিদায় কথা শুনে তোমার গো, অবিরল ঝরে আঁখি।
(তুমি) যেও না লো, বিনয় করি আমাদের দিয়ে ফাঁকি ॥
(তুমি) মোদের প্রাণের আধার গো, তোমায় অধিক বলব কি।
(এলে) বছর পরে থাক দু'দিন, আমাদের করে সুখী ॥

এই বেদনাই বাংলার বিজয়া গানের ভিতর দিয়াও অনুভূত হইয়াছে।

ভাদু গানের একটি বিশিষ্ট সুর আছে। তাহা ভাদুর সুর নামে পরিচিত। ছোটনাগপুরের আদিবাসীর করম সঙ্গীতও একই সুরে সর্বত্র গীত হয়। পশ্চিম বাংলার ভাদুগানেও একই সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভাদুগানের সুরে এই অঞ্চলে আর এক প্রকার লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহার নাম টুসু বা তুষু গান, তাহার কথাই এখন বলিব।

পশ্চিম বাংলায় তুষ-তুষলী নামে একটি মেয়েলী ব্রত আছে। এই ব্রত কুমারী-সধবা-বিধবা নির্বিশেষে সকলেই করিতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষমাসের সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি

দিন পর্যন্ত এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। ইহাতে গোবরের সঙ্গে তুষ মিশাইয়া কতকগুলি নাড়ু পাকাইতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়ু দূর্বা দিয়া পূজা করিবার পর তাহা একটি মাটির মাল্‌সায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তারপর মকর-সংক্রান্তির দিন নাড়ু শুদ্ধ মাল্‌সাগুলি মেয়েরা হাতে বা মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া কোন পুকুর কিংবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। বাঁকুড়া জিলায় কতকগুলি মেয়েলী ছড়া বলিয়া নাড়ুগুলি পূজা করিতে হয়; যেমন,

তুঁষ-তুষলী কাঁধে ছাতি।
বাপ মা'র ধন যাচাযাচি।
স্বামীর ধন নিজ পতি।
বাপের ধন কান্নাহাটি।
পুত্রের ধন পরিপাটি।
তুষলী গো রাই।
তুষলী গো মাই॥
তোমায় পূজিয়া আমি কি বর পাই॥

কিন্তু মানভূম জিলার সদর মহকুমায় এই প্রকার ছড়া আবৃত্তির পরিবর্তে মেয়েলী সঙ্গীত দ্বারা টুসুর পূজা করা হইয়া থাকে। তাহাই মানভূমে টুসুগান নামে পরিচিত। মানভূমে ইহার প্রচলনের ব্যাপকতা দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, মানভূম হইতেই ইহা বাঁকুড়া জিলায় আসিয়া একটি স্থানীয় রূপ লাভ করিয়াছে।

বিভিন্ন অঞ্চলে তুষু বা টুসুর বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মানভূম জিলায় সংলগ্ন বাঁকুড়া জিলায় তাহার নাম তুষু এবং সেখানে তাহার এই রূপ দেখা যায়—'দগ্ধ মৃত্তিকার শরাবের উপর চতুর্দিকে মৃৎপ্রদীপ সজ্জিত থাকে। শরাবের গর্ভে ধান্যের তুষ দেওয়া হয়; তদুপরি নানাবিধ পুষ্পের মাল্য, কড়ি ও গুঞ্জার হার দিয়া শরাব সজ্জিত হয়। পূজার সময় প্রদীপগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। শরাবের গর্ভে তুষ দেওয়া হয় বলিয়াই বোধ হয় তুষু নাম হইয়াছে।'[১] মানভূম জিলার অভ্যন্তরে সর্বত্রই দেবতার নাম টুসু। তাঁহার পূজা সেখানে অত্যন্ত ব্যাপক এবং একটি জাতীয় উৎসবের আকার লাভ করিয়া থাকে। মানভূম জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর এই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া

১ প্রবাসী ১৩৬১, ফাল্গুন, পৃঃ ৫৫১

যায়, যেমন, (১) ছোট কুণ্ডাকার একটি গর্ত, (২) একটি মাত্র সরা (উপরে ইহাকেই শরাব বলা হইয়াছে), (৩) প্রদীপ বসানো একটি সরা—প্রদীপের সংখ্যা সর্বত্রই বিজোড়, (৪) একটি টোপা (বাঁশের ছোট ডালা), (৫) মাটির প্রতিমা, (৬) চৌলে। প্রথম চারিটির ভিতরে সর্বদা বিজোড় সংখ্যক গোবরের ও পিটুলির গুটি রাখা হয়। কোন কোন অঞ্চলে টুসুর মাটির প্রতিমা নির্মাণের প্রথা প্রচলিত আছে। মূর্তিটি বাহনহীনা, সাভরণা, গভীর হলুদ রং, একটি কিশোরীর রূপ, উচ্চতা অনধিক এক হাত। ইহার উপর ভাদু প্রতিমার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। রঙিন কাগজ ও সোলা কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত দুই ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটি মন্দিরাকৃতি বস্তুর নাম চৌলে। চতুর্দল হইতে কথাটি আসিয়া থাকিবে।

মানভূম জিলা হইতে সংগৃহীত নিম্নলিখিত টুসুগানগুলির মধ্যে টুসুর চরিত্র বিষয়ে কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদের পরিকল্পনায় টুসু গৃহস্থের পরিবারভুক্ত মানবী মাত্র, কোনও দেবী চরিত্র নহেন। তিনি তেলের বাটি লইয়া স্নান করেন, মাথার চুল ঝাড়েন এবং গলায় সোনার হার পরিয়া থাকেন—

টুসু সিন্যাছেন গা হিল্যাছেন
হাতে তেলের বাটি।
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাটি॥

টুসু মুড়িও ভাজেন,

আমার টুসু মুড়্হি ভাজে
কি বা খইড়কা লড়ে গ।

টুসু চৌদলে চড়িয়া বেড়াইতে যান,

আমার টুসু বেড়াতে যায়
চন্দন কাঠের চৌদলে।

তবে একটু অলৌকিকতার মধ্যে এই যে টুসুর শ্বশুর বাড়ী অন্য দশজনের মত নহে—জলের ভিতর তাহার শ্বশুর-বাড়ী—

জলে হেল জলে খেল,
জলে তুমার কে আছে।

আপন মনে ভাবে দেখ
জলে শ্বশুর ঘর আছে ॥

জলে টুসুর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়, সেইজন্য জলের মধ্যেই তাঁহার শ্বশুর বাড়ী বলিয়া কল্পনা করা হয়। টুসু পূজার গীত উপলক্ষ্য করিয়া নারী-মনের ব্যক্তিগত বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা নানা ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে—

ছুটু ছুটু গাছগুলি
কতই যতন করব।
তুই ধনী চিন্তামণি
তকেই বিহা করব ॥
থপা থপা সরষা ফুলটি
হলুদ বলে বাঁটেছি।
হেই শাশুড়ী, গাল দিও না
পাশা খেল্‌তে বসেছি ॥

উদ্ধৃত দুইটি গানের সঙ্গে টুসুর কোনও সম্পর্ক নাই; ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। টুসুগানের ভিতর দিয়া নারীমনের অনুরূপ অনুভূতি সর্বদাই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই গুণেই লোক-সমাজে ইহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

মানভূম জিলার টুসুগানের সুর ভাদুগানেরই অনুরূপ—পূজার প্রক্রিয়ার মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও ভাদুগান ও টুসুগানে বাহিরের দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। তবে ভাদুগানের প্রধান অবলম্বন কুমারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু টুসুগানে সমসাময়িক সমগ্র সমাজেরই চিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহা কেবল মাত্র কুমারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার পরিবর্তে পরিণত বয়স্ক নারীসমাজের মধ্যে প্রচলিত বলিয়া সমাজ-জীবনের সমসাময়িক সমস্যার কথা ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে। ডাকঘরের কর্মচারিগণ কবে যে একবার ধর্মঘট করিয়াছিলেন, তাহার কথা টুসুগানে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল—অবশ্য ভাদুগানেও অনুরূপ বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়,

মরি মন গুমানে।
ও ঠাকুর পো, পোষ্টাপিশ বন্ধ শুনে ॥
ডাকে চিঠি আর যাবে না হে, বিলাবে না পিয়নে।
(এবার) বল দেখি তোমার দাদার খবর পাব কেমনে ॥
বহুদিন তার পাই না সংবাদ হে, কেমন আছে কে জানে।
(আমার) খেতে শু'তে মন সরে না, কত কি ছাই হয় মনে
নিশিভোরে ঘুমের ঘোরে হে, যা দেখেছি স্বপনে।
(আমি) মুখ ফুটে তা বলতে নারি, প্রাণ কাঁদে তার কারণে ॥

আধুনিক যুগে নানাদিক দিয়া যে সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, তাহা ব্যঙ্গ করিয়াও টুসুগান রচিত হইয়াছে—

তাধিন্ ধিন্ তা ধি না।
কলিকালের রঙ্গ দেখে বাঁচি না ॥
গয়লায় পৈতা পর্‌ল আগে হে, শেষ কালেতে টিক্‌ল না।
এখন পোদ্দারে পরেছে পৈতা কলিকালের নিশানা ॥
পোদ্দার বামুন যায় না চিনা গো, পৈতাধারী দুইজনা।
এখন চেনা বামুন নইলে পরে, প্রণাম করা চলে না ॥
ছোক্‌রাদের আর নাই উৎসাহ রে, কারণ মাত্র একজনা।
তারা চরসে ভরপূর হয়েছে, চরস নৈলে চলে না ॥
বাবুরা সব হৈছে কাবু রে, টেঁকে নাইক দু'আনা।
কেবল মেয়েরা সব মার্‌ছে মজা, বাড়্‌ছে গো বিবিয়ানা ॥
পায়ে জুতা হাতে ঘড়ি যে, চক্ষে চশমা একখানা।
দেখে দেখে তাক্ লেগেছে, হরিনাম কেউ বলে না ॥

বাংলা ভাষার মহিমা কীর্তন করিয়া অতি-আধুনিক মনোভাব সম্পন্ন এই টুসুগানটি রচিত হইয়াছে—

আমার মনের মাধুরী।
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি ॥
আকাশ জুড়ে বিষ্টি নামে মেঠো সুরের কোণ চুয়া।
বাংলাগানের ছড়া কেটে আষাঢ় মাসে ধান রুয়া ॥ (মনের মাধুরী)

মনসা-গীতি বাংলা গানে শ্রাবণে জাত-মঙ্গলে।
চাঁদ-বেহুলার কাহিনী গাই চোখের জলে গান ব'লে॥
বাংলা গানে করিলো, সই, ভাদু পরব ভাদরে।
গরবিনীর দোলা সাজাই ফুলে পাতায় আদরে॥
বাংলা গানে টুসু আমার মকর দিনে স াকরাতে।
টুসু ভাসান পড়ব ট াড়ে টুসুর গানে মন মাতে॥ (মনের মাধুরী)

বর্ধমান জিলার কোন কোন অঞ্চলে ভাদু পূজার প্রভাব বশতঃ তুষু পূজা একটু বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। তাহাতে মেয়েরা মাটি দিয়া তুষু-ঠাকরুণ নির্মাণ করে, ইহার রং ভাদু প্রতিমার মতই হলুদ, কিন্তু আকৃতি ভাদু হইতে অনেক ছোট—সাধারণ পুতুলের মত। কেহ কেহ বা যমপুকুর ব্রতের মত মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া একটি ছোট পুকুরের মত কাটিয়া তাহাতেই তুষু ঠাকুরাণীর পূজা করে। ইহা পশ্চিম বাংলার যমপুকুর ব্রতের প্রভাবেরও ফল হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

যে অঞ্চলে ভাদুর মত প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তুষু বা টুসুর পূজা হইয়া থাকে, সেখানে এই প্রকার তুষুগান শুনিতে পাওয়া যায়,—

চল, তুষু, চল খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বটতলা।
খেল্‌তে খেল্‌তে দেখে আস্‌ব কয়লা-খাদের জলতোলা॥
হলুদ বনের তুষু তুমি হলুদ কেন মাখ না?
শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না॥
ও তুষুর মা, ও তুষুর মা, তোদের কি কি তরকারী?
ঐ শালারি ক্ষেতের বেগুন ঐ কানাচির গুগ্‌লী॥
বাড়ীময় নীল বুনেছি নীলের শুঁটি ধরে না।
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর নীল কাপড় বই পরে না॥
চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না।
জামাই আদর বড় আদর তিন বেলা বই থাকে না॥
আর দু'দিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পান।
বস্‌তে দিব শীতল পাটী নীলমণিকে করব দান॥
চল তুষু, চল সারদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব।
কুলির জলে সিনান ক'রে রোদেতে চুল শুকা'ব॥

এক কিল সইলুম, দু'কিল সইলুম, তিন কিল বই আর সইব না।
যা লো ননদ, বলে দিবি, তোর ভাইয়ের ঘর আর করব না॥
নদীর ধারে গাই বিয়াল, বাছুরের নাম হাসি গো।
রাখালটাকে কিনে দিব পিতল বাঁধা বাঁশী গো।[১]

ভাদুর বিদায়-সঙ্গীতের মত টুসুর বিদায়-সঙ্গীতও বিজয়া-গানের বেদনায় ভরা—

এতদিন রাখিলাম মাকে
গুঁজি কপাট দিয়ে গ।
আর রাখিতে নাল্লম মাকে
মকর আল্য লিতে গ॥
এতদিন রাখিলাম মাকে
মা বলে আর ডাক্‌লে না।
যাবার সময় রগড় ধরলে
মা ছাড়া বই যাব না॥

উত্তর-ভারত বিশেষতঃ উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, পেপ্‌সু এবং পাঞ্জাবের কোন কোন জিলায় টেসু নামক এক প্রকার লোক-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। টেসু গান প্রকৃতপক্ষে মাগনের গান। পল্লীর বালকেরা 'টেসু' হাতে লইয়া বাড়ী বাড়ী মিঠাই কিংবা পয়সা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়, তারপর সংগৃহীত দ্রব্য ও অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া তাহারা এই প্রকার গীত গাহিয়া থাকে—

মেরে টেসুনে খাইথী নারংগী।
উস্‌মে সে নিক্‌লে গোরে ফিরংগী॥
গোরে ফিরংগী নে কাতা সূত।
উস্‌মে সে নিক্‌লে টেসু ফুল॥
টেসু ফুল নে করী ন কমাই।
সব লড়কোং সে ভীম মগাই॥[২]

অতএব দেখা যাইতেছে, ইহার সঙ্গে মানভূম জিলায় প্রচলিত টুসুগানের কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয়ের নামের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা লক্ষণীয়।

---

১ প্রবাসী ২৬ ভাগ (১৩৩৩), ২য় খণ্ড, ৩৮৬-৮৭

২ Sriramratna, 'Samjhi Aur Tesu,' *Vanyajati, Vol.* III (1955), p. 28.

মানভূম জিলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ সিংহভূম জিলার বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত। এই পথেই মানভূম জিলার ভাদু ও টুসুগান সিংহভূম জিলার সেরাইকেলা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। সেরাইকেলা মহকুমার ওড়িয়া মেয়েরা গানগুলি ওড়িয়া ভাষায় সামান্য মাত্র পরিবর্তিত করিয়া লইয়া এইরূপে গাহিয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই বিনা পরিবর্তনেও গায়—

আম্ব গছ ধাড়ি ধাড়ি নিম্ব গছ ছাই গো।
আসুখিবে ভাদুমণি নেপুর বজাই গো ॥
দেখে যা লো ভাদুর শশী কেমন বদন ভুলা যায়।
একটি মায়ের চারটি বিটি চারটি সোনার চাপকৌড়ি।
মা বাপের দুলালি আমরা শাশুড়ীর চোখের বালি ॥[১]

রামায়ণের কাহিনীও এই অঞ্চলের ভাদুগানের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া বাল্মীকির তপবনে।
লব কুশ ধরেন ঘোড়া, সীতা বলেন দাও ছাড়ে ॥
ছাড়ব না ছাড়ব না ঘোড়া ছাড়ব না বিনা রণে।
আসুন দেখি শ্রীরামচন্দ্র রণ করুন আমার সনে ॥
গো এই ছিল মনে, জনক-নন্দিনী সীতা।
পাঠাইলেন বনে গো, এই ছিল মনে ॥

এই উচ্চভাব পুনরায় নিতান্ত লৌকিক স্তরে নামিয়া আসে—

বেড়া যাব পদ্ম আন্‌ব বেনাই দিব সিংহাসন।
তার ভিতরে খেলা করে রাজকুমারী ভাদুধন ॥
রাজকুমারী ভাদু তুমি দুধের গালা জান না।
দুধের গালা শুকাই গেলে হায় মরি কাঁচা সোনা ॥
আমার ভাদু মুড়ি ভাজে শাঁখা ঝলমল করে গো।
তোদের ভাদু অভাগিনী আঁচল পেতে মাগে গো ॥
আলি সতীন ভাল করলি বস্‌লো সতীন এইখানে।
আমরা দুটো গান গাহিব শুন্‌লো সতীন দুই কানে ॥
কদম গাছকে উঠলে ভাদু কাঁচা কদম খেয়ো না।
পাকলে কদম সবাই খাব কাউকে বারণ করব না ॥

১ গানগুলি সেরাইকেলা হইতে শ্রীমতী কৃষ্ণা গাঙ্গুলী কর্তৃক ১৯৫০-৫৩ সনের মধ্যে সংগৃহীত।

ছোটনাগপুর বিভাগ ও সাঁওতাল পরগণা জিলার বিভিন্ন আদিবাসী জাতি যদিও বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং অনেকেই স্বতন্ত্র মানব-জাতি হইতে উদ্ভূত, তথাপি বর্তমান কালে ইহাদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। ইহাদের মধ্যে যে লোক-সঙ্গীত প্রচলিত, তাহা সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর গানের নাম ঝুমুর। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সমগ্র ছোটনাগপুর ও পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত আদিবাসী সমাজে এই ঝুমুর গান প্রচলিত আছে। তবে সাঁওতাল পরগণা জিলার মুণ্ডাভাষী সাঁওতাল জাতির মধ্যেই ইহা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পশ্চিম বাংলার পশ্চিম-সীমান্ত লগ্ন সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাঁওতাল জাতি প্রকৃতপক্ষে এক দো-ভাষী (bilingual) জাতি—ইহারা বহুকাল যাবৎ ইহাদের মাতৃভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও গ্রহণ করিয়াছে এবং কেবল মাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনেই যে তাহারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা নহে। এমন কি, নিজেদের উৎসবে অনুষ্ঠানেও বাংলা ভাষায় সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জিলার সর্বত্র সাঁওতালদিগের মধ্যে বাংলা ঝুমুর গান প্রচলিত আছে। সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রচলিত বাংলা ঝুমুর গান যে কালক্রমে কি ভাবে পশ্চিম বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা এখানে নির্দেশ করিব।

প্রত্যেক আদিবাসী পল্লীতেই নৃত্যগীতের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে, তাহাকে উপরোক্ত অঞ্চলের প্রায় সকল আদিবাসীই আখ্‌ড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। শব্দটি স্বতন্ত্র অর্থে বাংলাতেও প্রচলিত আছে। পল্লীর যুবক-যুবতীগণ আখ্‌ড়ায় সমবেত হইয়া যখন নৃত্যগীতের উদ্যোগ করে, তখন সর্বপ্রথম এই প্রকার বন্দনা-গান গাহিয়া থাকে—

আখাড়া বন্দিয়া, গুরু, ভালা গীতা গাই।
গুরু রামলক্ষ্মণ সাদরে বাজাই।
সীতামণি ঝুমুরে খেলাই ॥[১]

১ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর গানগুলি মানভূম জিলার তোপচাচি থানার অন্তর্গত কানাড়ি গ্রাম-নিবাসী লক্ষু মাঝির নিকট হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক সংগৃহীত।

সাঁওতালি ঝুমুর গানগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। চারিটি পদের অধিক ইহাতে প্রায় থাকে না, কোন কোন সময় তিনটি পদও থাকে ; তাহা হইলে দ্বিতীয় পদটি একবার পুনরাবৃত্তি (repeat) করিয়া চারিটি পদ পূরণ করিতে হয়। কিন্তু রাঁচী জিলার ওরাওঁ জাতির ঝুমুর ইহা অপেক্ষা সামান্য দীর্ঘ, অনেক সময় আট কিংবা দশটি পর্যন্ত পদ থাকিতে পারে, তবে পদগুলি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সাদ্রি ভাষায় রচিত একটি ওরাওঁ ঝুমুর এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

এসো কা বরখা বড়ী জোর।
ভীংজয় সোরে সোর ॥
এসো কা বরখা বড়ী জোর।
রোপলি হম্ রোপা ধান।
বদ্‌রী গরজে অসমান্ ॥
বনমে নাচত হৈঁ মোর।
এসো কা বরখা বড়ী জোর ॥
খেত চাষ্টিঢ় কিসান ঠাঢ়।
ভরল নদীকে দেখে বাঢ় ॥
অন্নধন না হোবৈং থোর।
এসো কা বরখা বড়ী জোর ॥

সাঁওতালি ঝুমুর গানগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও কুন্দ পুষ্পের মত সৌরভাকুল ; কারণ, ইহাদের অধিকাংশেরই বিষয়-বস্তু প্রেম,

বাড়ী হেঁটে পুখরী,
পুখরীতে ফুলের বাগান।
কার বেটি এত রসিকা গো,
আধরাতি ফুল তুলি যায়।

এই ঝুমুর গানটি সম্পর্কে দুইটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ ভারতীয় আদিবাসীর সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন রূপক ; এখানে 'পুখরী' ও 'ফুলের বাগান' কথা দুইটি রূপক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আদিবাসীর সঙ্গীত রচনায় পদান্তে মিল থাকে না। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, মিলের ব্যবহার লোক-সঙ্গীতের অবনতি (degeneration)র নিদর্শন—ভাবের দৈন্য গোপন করিবার জন্যই মিলের অবতারণা হইয়াছে। ভারতীয়

লোক-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ আলোচনায় এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। উদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্যে যেমন রূপকের ব্যবহার হইয়াছে, তেমনই মিলও পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার সহজ ও সরল ভাবটি দুর্বোধ্য কিংবা নীরস হইয়া উঠে নাই। সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর গানের ইহাই প্রধান গুণ। এই প্রকার ঝুমুর গান আরও একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে—

ছোট মোট বাঙন বেটী
ডাঁড়ায় পড়ে চুল।
মোচড়ে বান্ধিবে কেশ
কদম ফুলের পারা॥

লৌকিক বিষয় মাত্রই ঝুমুর গানের অবলম্বন হইতে পারে; কিন্তু প্রেম-বিষয়ই ইহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সাঁওতালি ঝুমুরের লৌকিক প্রেম বিষয়ই যে কি ভাবে বাংলাদেশের সীমায় প্রবেশ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে, তাহা কয়েকটি সাঁওতালি ঝুমুরের সঙ্গে বাংলা ঝুমুর গানের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। একটি সাঁওতালি ঝুমুর গানে শুনিতে পাওয়া যায়—

ছোট নদী ছোট জল
বড় নদী বড় জল।
হাতের শাঁখা মাজাইতে
কানের সোনা পড়ি গেল।
তাতে আমি খুঁজিতে বিলম্ (বিলম্ব)॥

নদী হইতে জল লইয়া আসিবার পথে প্রণয়াস্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার জন্য গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে; সেইজন্য বধূ তাহার বিলম্বে গৃহে ফিরিবার কারণ মিথ্যা করিয়া বলিতেছে—বড় নদীতে জল বেশি, তাহাতে কিছু পড়িয়া গেলে তাহা খুঁজিয়া পাইতেও বিলম্ব হয়; হাতের শাঁখা যখন মাজিতেছিলাম, তখন কানের সোনা খসিয়া জলে পড়িয়া গেল, তাহা খুঁজিতে বিলম্ব হইয়াছে। বাংলাদেশের পটভূমিকায় এই গানটি স্থাপিত হইলে, এখানে এই বধূটি সহজেই শ্রীরাধিকা ও অভিযোগকারিণী জটিলা-কুটিলা বলিয়াই গৃহীত হইবে, ইহাদের লৌকিক রূপের কেহই সন্ধান করিবে না। আর একটি অনুরূপ সঙ্গীতের উল্লেখ করা যাইতেছে—

যখন আমি জলকে বা যাইতেছিলাম,
তখন তুমি কদমতলে বঁশীও বলায়।
ন বঁশী বলায় হে, জলে কলসী ডুবে নাই ॥

যখন আমি জলের ঘাটে যাইতেছিলাম, তখন তুমি কদমতলায় বাঁশী বাজাইতেছিলে। তুমি বাঁশী আর বাজাইও না, এখনও আমি কলসী জলে ডুবাইতে পারি নাই। এই সঙ্গীতটি হইতে এ'কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, বুঝি বা বাংলাদেশ হইতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী গিয়া সাঁওতাল জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু এ'কথা সত্য নহে, বরং যাহা হইয়াছে, তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বংশীবাদন-প্রীতি সাঁওতাল জাতির যেমন একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, কদম্ব (করম্) বৃক্ষও তাহাদের নিকট তেমনই সুপরিচিত। এই বৃক্ষ তাহাদের নিকট করম নামে পরিচিত এবং ভাদ্রমাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বৃক্ষের একটি শাখা তাহারা প্রাঙ্গণে রোপণ করিয়া তাহা কেন্দ্র করিয়াই নৃত্যগীতাদি দ্বারা সমবেত ভাবে বর্ষা-উৎসব পালন করিয়া থাকে। অতএব বাংলায় প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে যে কদম্ব বৃক্ষ ও শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের বৃত্তান্ত এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহাদের মূলে বাংলার প্রতিবেশী এই আদিম জাতিসমূহের বংশী-প্রীতি ও করম্ (কদম্ব) উৎসব উদ্‌যাপনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকা কিছুই বিচিত্র নহে।[১]

আর একটি অনুরূপ সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর উল্লেখ করা যাইতেছে—

ঘরেত শাসিনী (শাশুড়ী) বাদী,
বাহিরেত ননদিনী বাদী।
অন্তরে বা দেখা হয়—
আমার পুরুষও বাদী।

গৃহে শাশুড়ী ও বাহিরে ননদিনী উভয়েই আমার বাদী বা বিরুদ্ধাচরণ-কারিণী। কিন্তু কখনই বা (আমার প্রণয়াস্পদের সঙ্গে) আমার দেখা হয়! অর্থাৎ কখনও বিশেষ একটা দেখাশোনা হয় না। (আমার এমন দুর্ভাগ্য যে) আমার প্রণয়াস্পদ (পুরুষ)ও আমার বাদী বা বিরুদ্ধাচরণকারী। সুদীর্ঘ সংস্কার বশতঃ বাঙ্গালী পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইহা শ্রীরাধিকার উক্তি।

[১] বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের করম উৎসবের ইতিহাস সম্পর্কে Elwin & Hivale, *Folk-Songs of the Maikal Hills*, op. cit., 311 দ্রষ্টব্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—ইহা সাঁওতাল সমাজের একটি সাধারণ লৌকিক প্রেম-গীতি মাত্র, ইহা যে-কোন পরিবারেরই নারীর উক্তি হইতে পারে।

সাঁওতাল প্রেমিক-যুবকের গায়ের রং পাথরের মত কালো। অথচ কোন লোক-সঙ্গীতের নায়ককে কালো বলিয়া সম্বোধন করিলেই আমাদের বৃন্দাবন-চারী কৃষ্ণের কথা মনে না হইয়া যায় না। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত সাঁওতালী বাংলা ঝুমুর গানটিতে যে শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতেই মনে করা হইতেছে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না—

'হেট কুলি উপর কুলি
কিসের লাগি এত আনাগোনা।'
'বার টাকার শিকড়ি
তের টাকার মাকড়ি
কাল-ছোঁড়া নিয়ে গেল
তা'তে আমি কুলি আনাগোনা।'

'নীচের পথে উপরের পথে এত আনাগোনা কেন আরম্ভ হইয়াছে?' 'কালো ছোঁড়া আমার তের টাকার মাকড়ি ও বার টাকার হার লইয়া গিয়াছে, তাহারই সন্ধানে আমি পথে আনাগোনা করিতেছি।'

সাঁওতাল প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক এই কাল ছোঁড়াই বাংলার লোক-সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ লাভ করিয়াছে।

গোকুল এবং মথুরার মধ্যখানে যমুনার ব্যবধান যেমন শ্রীরাধিকার নিকট দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সাঁওতালী বাংলা ঝুমুরেও তেমনই প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মিলনের মধ্যখানে এক দুরতিক্রম্য নদীর ব্যবধানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

মায়ে বাপে আমায় জনম দিল।
দশে পাঁচে আমার বিহা দিল॥
নদীপারে আমার শ্বশুর বাড়ী।
স্বরগের[১] জল পড়ে নদীতে বান॥
আসা যাওয়ার আমার বারণ হইল।
আগু ত মন দৌড়ে পিছে ত বেঙ[২]
আঁখির লোর পড়ে মনে মনে॥

১ আকাশের; ২ দেহ।

নিম্নোদ্ধৃত সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর গানটির ভিতর দিয়া যেন বিরহিণী শ্রীরাধিকার আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাওয়া যায়—

আমার মন তোমার মন
একই মন ছিল।
আরও তুমি পালি (পাইলে)
দোসরের মন।
দেশ হৈতে বিদেশ গেলি ল
কই পালি (পাইলে) দুলালির[১] ঘর ॥

এইভাবে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন ভাষায় রচিত আদিবাসীর ঝুমুর গানগুলি বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতের রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর পটভূমিকা রচনায় ইহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর গানগুলির একটি গুণ এই যে, ইহারা বাংলাদেশের লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের মত একটি নির্দিষ্ট ধারা ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই; কারণ, বাংলা দেশের রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর মত কোন কাহিনী তাহারা কোনদিনই একান্তভাবে অনুসরণ করে নাই—সেইজন্য স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতের স্বাধীন বিকাশ সেখানে সম্ভব হইয়াছে। কত সাধারণ বিষয়ও বাংলা সাঁওতালী ঝুমুর গানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত দুইটি সঙ্গীত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

সারাদিন সারারাত,
বাজালি রে রসিক[২]।
এখন বলে যাব যাব
কোন পথে পালাবি রে রসিক'
মাঝ কুলি[৩] আছে জিঙ্গিরি ॥
হেট কুলি আখাড়া[৪]
উপর কুলি আখাড়া

---

১ দুলালি—প্রিয়া।
২ সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্যসম্বলিত ঝুমুর গানে যে পুরুষ মাদল বাজায় তাহাকে রসিক বলে।
৩ কুলি—পথ।
৪ নৃত্য করিবার স্থান।

আখাড়া বড় রে জমক।
তুমি হো না আইলি দাদা
আমি হো না গেলি রে
আখড়া বড় রে জমক ॥

আদিবাসীর সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় রচিত বাংলা এই ঝুমুর গানগুলি বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি নূতন দিক নির্দেশ করে।

মানভূম জিলার বাঙ্গালী নর্তকীদিকের মধ্যস্থতায় বাংলা ঝুমুর গান ছোটনাগপুরের রাঁচী ও পালামৌ জিলায়, উড়িষ্যার গাংপুর, মধ্যপ্রদেশের যাশপুর প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত প্রচার লাভ করিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের গঞ্জুগণ (স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী) মানভূম জিলার প্রধানতঃ পশ্চিম অঞ্চল হইতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নর্তকী সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই বাঙ্গালী নর্তকী-দিগের জীবনেতিহাস বড়ই বিচিত্র। মানভূম জিলার নিম্নশ্রেণীর কোন ব্যক্তির গৃহে যদি কোনও বালিকা দেখিতে একটু সুশ্রী ও সুকণ্ঠ হয়, তবে তাহার মাতাপিতা বাল্যকাল হইতে তাহাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেয়। গীতের মধ্যে তাহারা মানভূম জিলার প্রচলিত বাংলা ঝুমুর গানই শিখিয়া থাকে, সাধারণতঃ অন্য কোনও গীত শিখে না। নৃত্যগীতে শিক্ষা শেষ করিবার পর এই সকল বালিকা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগকে উক্ত অঞ্চলের গঞ্জুদিগের নিকট আজীবন ভরণ পোষণ করিবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি ও অর্থের বিনিময়ে জীবনের জন্য সমর্পণ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের বিবাহ হয় না, কিংবা তাহারা সন্তানও ধারণ করে না। যতদিন রূপ এবং যৌবন থাকে, ততদিন তাহাদের আশ্রয়দাতা গঞ্জুদিগকে তাহাদের নৃত্যগীতে পরিতুষ্ট করিতে হয়। শেষ জীবনে সেই গৃহেই তাহারা ভরণ পোষণ পায়। যদিও অবাঙ্গালীদিগের মধ্যেই তাহাদের সকল জীবন ব্যয়িত হয়, তথাপি প্রথম জীবনে তাহারা যে বাংলা ঝুমুর গান শিখিয়া থাকে, তাহাই তাহারা সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া গাহিয়া থাকে। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে আসিবার ফলে ক্রমে তাহাদের উচ্চারণ-রীতি পরিবর্তিত হয়, কেহ কেহ কালক্রমে বাংলা ভাষা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় ভাষা গ্রহণ করে—তথাপি তাহারা যে বাংলা গানগুলি শিখিয়া আসে, তাহা কদাচ ভুলে না—অবাঙ্গালী উচ্চারণে তাহারা বাংলা ঝুমুর গান গাহিয়া যায়, ইহাদের অর্থও অনেক সময় তাহারা

বুঝিতে পারে না। নূতন পরিবেশের মধ্যে আসিয়া কিছু কিছু ওরাওঁ এবং ভোজপুরী হিন্দী গানও তাহারা শিখে। ক্রমে তাহাদের ব্যবহৃত গানগুলি বাংলা, হিন্দী, ওঁরাও প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা হইতে আগত শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া এক বিচিত্র রূপ ধারণ করে; কিন্তু ইহাদের সুরের মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম শুনিতে পাওয়া যায় না। মধ্যভারতের যাশপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালী নর্তকীদিগের কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল; বাংলার লোক-সঙ্গীত অবাঙ্গালী অঞ্চলে গিয়া কি রূপ লাভ করিতেছে, ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

ঠাকুরজী যায় গঙ্গা নাহায় রে।
ভাই মোরা ভরিয়া যায় লা॥

ঠাকুরজী গঙ্গাস্নানে গেল, আমার ভাইকে বেগারীরূপে ধরিয়া লইয়া গেল।

চকোরা ফুলি গেলা হরিয়র মাই।
চকোরা ফুলা বড়া শোভয়॥

চকোর গাছ (লজ্জাবতীর মত একপ্রকার লতা) ফুলিয়া গেল, এখন ইহাকে দেখিতে বড় শোভা।

করম করম করলেহ রাজা।
করম ডোলইতে আওয়॥

সবাই মিলিয়া করম করম বলিত, কিন্তু আজ নিজে হইতেই করম রাজা ঘরে আসিতেছে, দেখ।

নহিয়ারা নহিয়ারা মতি করু সঙরো।
নহিয়ারা দেখলি তোহার॥
কাঠিকের ঘর না হ মাটিকের ছাব না।
উপরে ত খেড়ক ডব না॥

নাইয়র নাইয়র কর, কিন্তু তোমার বাপের বাড়ী গিয়া দেখিলাম, কিছুই ত নাই—কাঠের বেড়া, তাহাতে মাটির দেয়াল, উপরে খড়ের ছাউনী।

দুইও সাইতিন চালা মাছের মারে,
কাশা নাদী বানা ভিতরে।
ছোটকী যে লেল ফাটন নাচুয়া
বড়কী যে ভোট মকরী॥

দুই সতীন বনের মধ্যে কাশ নদীতে মাছ ধরিবার জন্য যায়। ছোট সতীন জল সিঁচিবার সরঞ্জাম লইল, বড় সতীন লইল কোদাল (কারণ, তাহাদিগকে কাদা চাঁচিতে হইবে)।

উদ্ধৃত সঙ্গীতগুলির মধ্যে ওরাওঁ, ভোজপুরী (সাদ্‌রী) ও বাংলা তিন ভাষারই মিশ্রণ হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র ঝুমুরের সুরের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নাই বলিয়া সকলেই ইহার ভিতর হইতে রসোপলব্ধি করিতে পারিতেছে।

উপরে যে সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর গান কয়টি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা সাঁওতাল জাতির মৌলিক প্রেরণা-জাত বলিয়া মনে করাই সঙ্গত—ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক কোন প্রভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালী অল্পদিনের মধ্যেই সাঁওতালি ঝুমুরগুলিকে নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ করিয়া লইল। বাংলা লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ইহাদের সংক্ষিপ্ততা দূর করিয়া, পদান্তে মিত্রাক্ষর যোজনা করিয়া, ইহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম যোগ করিয়া, অথচ ইহাদের মৌলিক সুরটুকু যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখিয়া পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী পল্লী-অঞ্চলে বাঙ্গালী নূতন ঝুমুর সঙ্গীত রচনা করিল, তাহা স্বভাবতঃই বাংলার আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইল। আদিবাসীর সাংস্কৃতিক উপাদান বাঙ্গালী এইভাবে নিজের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইল। পূর্বে যে কয়টি ঝুমুর সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হয় নাই; অতএব তাহা আদিবাসীরই সাংস্কৃতিক অঙ্গ; কিন্তু বাঙ্গালী যখন তাহা তাহার রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইল, তখনই তাহা বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক উপকরণ বলিয়া গণ্য হইল। এই প্রকার একটি বাংলা ঝুমুর গানের উল্লেখ করা যাইতেছে—

সই, সাধে বাদে আগুন জ্বেলেছি।
আদর ক'রে কালনাগিনী
বুকে নিয়ে খেলেছি॥
নাহি জানি সুধার আশা,
পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি শ্যাম-প্রেমের আশা।
বিরহে যতন করে আশা জলে ফেলেছি॥

পূর্বে যে ভাদুগানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কোনও কোনও সময় ঝুমুরের সুরে গীত হয়; কারণ বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে ঝুমুরের সুর অত্যন্ত জনপ্রিয়। এমন কি, এই অঞ্চলে বহুকাল হইতেই ব্যবসায়ী ঝুমুর গানের সম্প্রদায় আছে। ঝুমুরের সুরে রচিত একটি ভাদুগান এখানে উল্লেখ করিতেছি—

তিং দাং দাং তিনাং নিদাং—
পিন্দাড়ে হাত লাগালি,
ভাদু লো, তুই নাগরে ভুলালি।
ধন্য ধন্য রূপ তোর,
(বঁধুর) করে দিলি নিশি ভোর,
সাবাস মাইরি মধু তোর
ঐ মুখে কি মধু চাটালি॥

বহু আধ্যাত্মিক বিষয়ও ক্রমে বাঙ্গালীর ঝুমুর গানের অঙ্গীভূত হইয়াছে, যেমন,—

হে করুণাময় হরি!
আর কবে করিবে কৃপা বুঝিতে না পারি।
তুমি হে ভব-কাণ্ডারি, আছি তোমার ভরসা করি,
এ ভব-তুফান হতে কেমনে হে তরি॥
অধম পাতকিগণে উদ্ধারিলে কত জনে,
ভজন সাধনহীনে, দীনের প্রতি হেরি॥

সাঁওতালি বাংলা ঝুমুরেও অনুরূপ বৈরাগ্যমূলক বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যাইবে; যেমন,—

ঘরেতে অন্ধন বাহিরেত গরুবাছুর
সব কিছু মিছা।
বনের কাঠ গাঁয়ের আগুন
সঙ্গে নিয়ে যায়॥

গৃহে তোমার যে ধনদৌলত (অন্ধন) কিংবা বাহিরে যে তোমার গরুবাছুর আছে, তাহা সকলই মিথ্যা; (তোমার মৃত্যু হইলে) বনের কাঠ ও গাঁয়ের আগুন মাত্র তোমার সঙ্গে যাইবে।

কীর্তনের মত জনপ্রিয় সঙ্গীত বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নাই। বর্তমানে ইহা লোক-সঙ্গীতের স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সঙ্গীতের স্তরে উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কোন আদিবাসীর লোক-সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করিয়াই যে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সংশয়ের কারণ নাই। তথাপি বিষয়টি এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

বাংলা ভাষায় যে অর্থে কীর্তন কথাটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে শব্দটি যে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় আসিয়াছে, এমন মনে করা যাইতে পারে না। Monier-Williams তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *A Sanskrit-English Dictionary*-তে সংস্কৃত মহাভারত ও পঞ্চতন্ত্রে ইহার যে-সকল প্রয়োগ পাইয়াছেন, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, যথা, 'mentioning, repeating, saying, telling'—অর্থাৎ উল্লেখ করা, পুনরাবৃত্তি করা, বলা বা কহা, কিন্তু কীর্তন কথাটি দ্বারা বাংলায় প্রধানতঃ যাহা বুঝায়, অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকৃতির সঙ্গীত, তাহার কথা সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায় না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধানে' কীর্তন শব্দের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণপ্রসঙ্গ বাংলাদেশে প্রবেশ লাভ করিবার পূর্বে ইহা দ্বারা যে কেবল মাত্র বিশেষ এক রীতির সঙ্গীতই বুঝাইত, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বাংলা ভাষায় শব্দটি কোনও স্বতন্ত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। সেই সূত্রটিই আমাদের সন্ধান করিতে হইবে।

পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁ জাতির নৃত্যসম্বলিত লোক-সঙ্গীতের একাংশের নাম কীর্তন। অন্যান্য আদিবাসী সঙ্গীতের মত ওরাওঁ জাতির নৃত্যসম্বলিত লোক-সঙ্গীতও নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র চারিটি পদ পাওয়া যায়। বৃত্তাকারে সমবেত নৃত্যকালীন ইহার প্রথম যে দুইটি পদ গাহিয়া সম্মুখের দিকে পা ফেলিতে হয়, তাহাকে 'ওর' ও শেষ যে দুইটি পদ গাহিয়া পিছাইয়া আসিতে হয়, তাহাকে 'কীর্তন' বলে। বিষয়টি যাঁহারা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই একজনের অভিমত এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি—

'The *or* takes the lines of dancers anti-clockwise on the circle. After it has been repeated three or four times there is a stop or hitch in the dance and the movement is reversed—the line moving back clockwise, while the *kirtana* is sung and repeated. Where there are more than four lines in the dance poem, the fifth and sixth lines and the seventh and eighth are treated as additional *kirtanas*, and after each *kirtana* has been sung and repeated, the dance moves back into the *or* action and repeats the first two lines before it goes on to the next. A few dances do not have any obvious reverse action, and in these cases the *kirtana* is sung as an addition or variation to the *or*—the poem being sung over and again for as long as the dance lasts'.[১]

ওরাওঁ জাতির এই সঙ্গীতাংশ হইতে ক্রমে এ'দেশে বিশেষ কোন অঞ্চলের সমগ্র সঙ্গীতের উপরই কীর্তন কথাটি প্রযোজ্য হইতে থাকে বলিয়া মনে হয়। ওরাওঁগণ দ্রাবিড়-ভাষী, অতএব কীর্তন কথাটি সঙ্গীত অর্থে ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিয়া ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উত্তর ভারতের কোন স্থানে কীর্তন কথাটি সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত না থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষী অঞ্চলে ইহা এই অর্থে বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে।

আদিবাসীর যে লোক-সঙ্গীত মূলতঃ ভিত্তি করিয়া বাংলা কীর্তন গানের সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আজ উদ্ধার করা সহজসাধ্য নহে। তথাপি মনে হয়, বাংলার কীর্তন গানও মূলতঃ নৃত্যসম্বলিত লোক-সঙ্গীতই ছিল, বর্তমানে বাংলার উচ্চতর সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্র হইতে সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান দূর হইয়া গেলেও, একমাত্র কীর্তন গানে এখনও ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়।

এ'কথা বুঝিতে পারা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের বিশেষ কোন অঞ্চলে উক্ত ওরাওঁ কিংবা অন্য কোন অনুরূপ সংস্কৃতির অধিকারী উপজাতির প্রভাব বশতঃ

১ W. F. Archer, *The Blue Grove*, op cit., p. 26.

কীর্তন গান সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তখন ইহা স্বভাবতঃই রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী কিংবা ধর্মসম্পর্কিত বিষয়-বস্তু নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু কালক্রমে সেই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে তাহাতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তারপর বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে তাহা বাংলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহে বিস্তৃত হয়। বৈষ্ণব ধর্মের সহায়তায়ই কীর্তন গান আঞ্চলিক পরিচয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সমগ্র বাংলা দেশেরই জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ্‌রূপে গণ্য হইয়াছে। কীর্তন গানের উপর বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলেই ইহার লোক-বৈশিষ্ট্য (folk-characteristic)ও কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ, একদিক দিয়া বৈষ্ণব মহাজন-পদরচয়িতৃগণ যেমন ইহার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনীর ধারা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই ইহার গায়েনগণও ইহার সুনির্দিষ্ট সঙ্গীতাঙ্গ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ; তাহার ফলে বাংলার চারিটি বিভিন্ন অঞ্চলে কীর্তন গানের চারিটি ধারার প্রতিষ্ঠা হয় ; যেমন, গড়াণহাটি, মনোহরসাহী, রেণেটি অথবা রাণীহাটি এবং মান্দারিণী। ক্রমে কীর্তন-সঙ্গীত এই কয়টি সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। এইভাবে ইহার স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তির ভাবটি বিনষ্ট হইয়া গিয়া ইহা প্রকৃত লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িল। বীরভূম জিলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও কীর্তন গানের ব্যাপক চর্চা দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই সকল অঞ্চলেই ইতিহাসের কোন বিস্মৃত যুগে কোন আদিবাসী সমাজের সঙ্গে সংস্রবের ফলে বাংলার কীর্তন গান সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; তারপর বৈষ্ণব প্রভাবের যুগে ইহা নূতন রস ও রূপ লাভ করিয়া বাংলার সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রাগ্‌-বৈষ্ণব যুগের কীর্তন গানের ধারাটি বৈষ্ণব যুগের মধ্যে আসিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার ফলে, ইহার লোক-সাহিত্যগত পরিচয়টি আজ আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। তথাপি ইহাতে প্রেম-বিষয়ের যে প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেই মনে হইতে পারে যে, মূলতঃ লৌকিক প্রেমই ইহার ভিত্তি ছিল। সে'কথা অন্যত্র বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

উপরের কীর্তনের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম, তাহা এ'দেশের এই বিষয়ক প্রচলিত সংস্কারের এতই বিরোধী যে, ইহা সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন বলিয়া বোধ

হইতে পারে। সেইজন্য বিষয়টির এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, কীর্তন শব্দটি সংস্কৃত কীর্তি কিংবা কীর্তিগান হইতে আসিয়াছে। কিন্তু গান সম্পর্কিত কীর্তন কথাটি কীর্তি শব্দ হইতে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ, কীর্তন গান মূলতঃ প্রেম-বিষয়ক খণ্ড-গীতি (love lyric) ছিল এবং এখনও তাহাই আছে—ইহা কোনদিনই ব্যক্তিবিশেষের কীর্তি-প্রচারক আখ্যায়িকা গীতি (narrative song) ছিল না, কিংবা এখনও নাই। চৈতন্যধর্ম প্রচারিত হইবার সময় হইতেই বাংলার এই শ্রেণীর লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। কীর্তন গানের প্রাচীনতম লৌকিক রূপের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নামের কোনও সম্পর্ক ছিল না ; সুতরাং তাহাদের ভিতর দিয়া কাহারও কোনও কীর্তি প্রচারের কোনও অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বৃত্তান্তকে 'লীলা' বলা হয় ; এই সম্পর্কে 'কীর্তি' কথাটি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুমোদিত নহে। কীর্তি কথাটির মধ্যে ঐশ্বর্যের স্পর্শ আছে ; কিন্তু বাংলার বৈষ্ণবধর্ম মাধুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনেকে সংস্কৃত হইতে কীর্তন কথাটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন অভিধানে যে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, শব্দটির উৎপত্তি অত্যন্ত অনিশ্চিত। কোনও অভিধানে আছে কৃৎ+অন্=কীর্তন, কিন্তু কৃৎ+অন্ 'কীর্তন' হয় না, তাহাতে হয় 'কর্তন'। কোনও অভিধানে আছে কীর্তি+অন্। কিন্তু তাহাতেও 'কীর্তন' না হইয়া 'কীর্তয়ন' হয়। কোনও কোনও অভিধানে কীৎ´ ধাতু কিংবা কৄৎ ধাতুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহা হইতে ইহার একটি কষ্টকল্পিত ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এ'কথা সকলেই জানেন যে, যে-সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত, তাহাদের অধিকাংশই অনার্যভাষা হইতে আগত। বাংলার লোক-সঙ্গীতের যতগুলি নাম পাওয়া যায়, যেমন টুসু, ঝুমুর, ভাঁজো, ভাদু, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, কুষাণে, জারি, সারি, ঘাটু, ঘেঁটু—ইহাদের কোনটিই সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই ; ইহারা দেশজ শব্দ। সেইজন্য বাংলা দেশের বাহিরেও এই নামগুলি অপরিচিত। কীর্তন গানও যদি এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত হইতে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, তবে কীর্তন

কথাটির ব্যুৎপত্তি সন্ধান করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ দ্রাবিড়ভাষী অঞ্চলে অনুরূপ অর্থে শব্দটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

এখানে একটি কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, বাঙ্গালীর নিকট হইতেই যে ওরাওঁ জাতি কীর্তন কথাটি গ্রহণ করে নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে এই ভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে, বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ মনে করেন, বাঙ্গালী তাহার জাতীয় সংস্কৃতির বহু উপকরণের জন্য তাহার অনার্য প্রতিবেশীদিগের নিকটই ঋণী; বাংলার অনার্য প্রতিবেশীদের মধ্যে এখনও যাহাদের সামাজিক সংহতি সুদৃঢ়, তাহারা কোনও দিক দিয়াই বাঙ্গালীর কাছে ঋণী নহে। প্রসিদ্ধ জাতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত H. H. Risley অনুমান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মেয়েরা যে সিঁথিতে সিঁদূর পরে, সেইজন্য তাহারা তাহাদের ছোটনাগপুরের দ্রাবিড়-ভাষী অনার্য প্রতিবেশীর নিকট ঋণী, তাহারা এ'জন্য বাঙ্গালীর নিকট ঋণী নহে।[১] পরবর্তী কালে অনুসন্ধানের ফলেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। স্বর্গত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'বাংলার ব্রত' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, বাংলার মেয়েরা যে কুক্কুটী-ব্রত করে, তাহা 'ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির ব্রত, কুক্কুটী হলেন তাহাদের দেবী (পৃঃ ১৭)।' অতএব দেখা যাইতেছে, সাংস্কৃতিক উপকরণের জন্য আদিবাসীর নিকট বাঙ্গালীর আরও ঋণ আছে, ইহাই একমাত্র ঋণ নহে।

বীরভূম জেলায় হাপুগান নামক একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ দুইজন লোক একসঙ্গে এই গান গাহিয়া থাকে। একজনের হাতে মন্দিরা বা গোপীযন্ত্র থাকে, আর একজনের হাতে ছোট একখানি লাঠি থাকে। লাঠিধারী লোকটি গান গায় এবং তাহার সঙ্গী লোকটি ধুয়া ধরে। গাহিবার পদ্ধতিটি একটু অদ্ভুত। এক পদ করিয়া গান গায়, আর মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া নিজের পিঠেই লাঠি দিয়া তাল ভাঁজে। অবিশ্রাম লাঠি চালনার ফলে অনেকের পিঠেই কালশিরা দাগ পড়িয়া যায়। কতকটা নমস্কারের ভঙ্গিতে লাঠিটা দুই হাত দিয়া ধরিয়া থাকে।[২] গানগুলি এই প্রকার,—

১ *Castes and Tribes of Bengal*, (Calcutta, 1891) Vol. II., p 280.
২ শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রদত্ত বিবরণী হইতে। উদ্ধৃত সঙ্গীত তাঁহা কর্তৃকই সংগৃহীত।

একই বিলে চরে পাখী অন্য বিলে ধায়।
চল্যা যাবার কালে পাখীর ফাঁদ বাধিল পায়।
ও হায় হায়॥
পাখী না পিখিমি চেনে আসমানে তার বাসা।
কার খোঁজে না বিলের জলে করে যাওয়া আসা।
ধর্‌তে পার্‌লে ছাঁদন বেড়ী দিতাম গো তার পায়॥
ও হায় হায়॥
আল্লা আল্লা বুলো রে বান্দা ভাত নাইক ঘরে।
টুপি দিয়া ইমান ঢাক্যা বাগুন চুরি করে॥
তারে ধর্‌ব কেমন ক'রে॥
নিমক হারাম প্যাটের ক্ষুধা নাইরে সরম তার।
দু'দিন বাদে নিভ্‌লে বাতি তামাম অন্ধকার॥
সন্দ কিবা তার॥

এই গানের নাম যে কেন হাপুগান হইল, কিংবা হাপু শব্দের তাৎপর্যই যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই গান বীরভূমে যে খুব ব্যাপক তাহাও বলিবার উপায় নাই।

মালদহ জিলার বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীতের নাম গম্ভীরা গান। ইহা বাংলার আর কোনও অঞ্চলে প্রচলিত নাই। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জিলায় গমীরা নামক একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তবে তাহার প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। গম্ভীরা শব্দটির তাৎপর্য এখানে স্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না; কারণ, ইহার অর্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, এই অর্থেই শব্দটি মধ্যযুগের বাংলায় ব্যাপক ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মালদহে গম্ভীরা গানের যে অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কোন স্থান নাই। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টানাইয়া গানের আসর বসে। ইহার বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ বর্ষ-বিবরণী পর্যালোচনা। বৎসরের শেষ তিন দিন এই গানের অনুষ্ঠান হয়, কোন কোন সময় নূতন বৎসরের বৈশাখ মাস ব্যাপিয়াও সঙ্গীত পরিবেষণ চলিতে থাকে এবং এই উপলক্ষে সেই বৎসরের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী ইহাতে সঙ্গীতাকারে পর্যালোচনা করা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, আসামের অধিবাসী ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বাৎসরিক উপজাতীয় অধিবেশন (Tribal Council)

উপলক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্যসহযোগে অনুরূপ বর্ষ-বিবরণী পর্যালোচনার রীতি প্রচলিত আছে—গম্ভীরা গানের ভিত্তিও তাহাই বলিয়া মনে হয়; এই সূত্রে শব্দটিও তিব্বতো-চৈনিক কোন শব্দের সংস্কৃত রূপ হওয়াই সম্ভব। মধ্য যুগের বাংলায় প্রচলিত গম্ভীরা শব্দের সঙ্গে সঙ্গীত অর্থবাচক গম্ভীরা শব্দের কোন মৌলিক সম্পর্ক নাই। ইহা জলপাইগুড়ির লোক-সঙ্গীত 'গমীরা' শব্দটির সংস্কৃত রূপ।

বৎসরের শেষ তিন দিন বাংলার প্রায় সর্বত্রই একটি লৌকিক সূর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়—তাহার নাম গাজন; বর্তমানে ইহা শিবের গাজন নামে পরিচিত। শিব লৌকিক সূর্যদেবতা, ধর্মঠাকুরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়া কোন কোন অঞ্চলে আদ্য নামেও পরিচিত। মালদহের গম্ভীরা নামক গীতোৎসব শিব বা আদ্যের গাজনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য মালদহ অঞ্চলে সাধারণ শ্রেণীর লোক যে শিবের গাজনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা আদ্যের গম্ভীরা নামেও পরিচয় লাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ গম্ভীরা গানের সঙ্গে গাজনের কোন সম্পর্ক নাই। যদিও বর্তমানে হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ গম্ভীরা গানের আসরের এক কোণে শিবেরও একটি আসন স্থাপন করা হইয়া থাকে, তথাপি শিবের সঙ্গে গম্ভীরা গানের কোন সম্পর্ক নাই। কোন কোন গম্ভীরা গানে শিবের নামোল্লেখ থাকিলেও ইহা শৈবধর্ম-বিষয়ক সঙ্গীত নহে, বরং লোক-সঙ্গীত মাত্র। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত গম্ভীরা গানটি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

> বলব কি গান, ওহে শিব, বাগানে নাই আম।
> গাছে গাছে বেড়িয়া দেখ্‌ছি নূতন পাতা সব সমান॥
> মনে মনে ভাব্‌ছি বসে, কাজের কোন পায় না দিশা।
> তেল ধান চাউলের দর খুব কশা ভুষার বেশি দাম॥
> আর এক শুন নূতন কাহিনী, ঠিক দুপ্রহরের শিল আর পানী।
> মাঠে হয় কৃষাণ পেরসানি মারিলে গহম॥[১]

এই গানে মালদহের প্রসিদ্ধ আমের উল্লেখ করা হইয়াছে—সে'বৎসর (১৯০৮) যে বেশি আম হয় নাই, সেইজন্য গায়ক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; তারপর একদিন দ্বিপ্রহরের সময় শিলাবৃষ্টি হইবার ফলে মাঠের গম যে নষ্ট

১ *Bengal District Gazetteers, Malda* (Calcutta, 1918) p. 81

হইয়া গিয়াছিল, তাহার জন্যও আক্ষেপ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে সমাজ যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে (Community) বিভক্ত হইয়া বাস করিত, তখন এই সকল এক একটি দল প্রতিবেশী দলের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইত। তাহাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এই প্রকার সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করা হইত; কিন্তু বর্ত্তমান নিরুপদ্রব সমাজ জীবনে এই সঙ্গীতগুলি নূতন বিষয়-বস্তুর সন্ধান করিয়া লইয়াছে। আধুনিকতম সঙ্গীতগুলির মধ্যে আধুনিকতম রাজনৈতিক বিষয়-বস্তুও স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু সকল গীতই নামে মাত্র শিবকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত হয়।

যেমন,

শিব তোমার লীলাখেলা কর অবসান।
বুঝি বাঁচে না আর জান॥
তারপর ম্যালেরিয়ায় হইলাম সারা,
বুঝি বাঁচে না আর জান॥
অন্নদা মা ভিক্ষা কইর‍্যা করবে কি আর গতি হে,
মুসুরি কলাই তোল ছ্যাশাইয়া, ক্ষেতের ফসল গেল ডুব্যা
বুঝি বাঁচে না আর জান॥

সরল কৃষক সমাজ মনে করে, শিব নিজে যেমন দরিদ্র ও সম্বলহীন, তেমনই তিনি সমগ্র কৃষক সমাজের দারিদ্র্যের কারণ; তিনি ইচ্ছা করিলেই সমাজের এই দুঃসহ দারিদ্র্যের অবসান করিতে পারেন—

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব, গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব, ও শিব, ছেল্যাপিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব, দয়া কর॥
পরণে নেতা নাই ও শিব, বরজে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব, ও শিব, মাইয়া লোকের মান।
ও বোকা শিব, দয়া কর॥

নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য কৃষক-কবির নিকট শিব কৃপার পাত্র হইয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবতার সঙ্গে মানুষের যে একটি সহজ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, গম্ভীরা গানেও তাহার সন্ধান মিলে।

গম্ভীরা গানে বিষয়-গত বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহাতে প্রধানতঃ শিব দেবতাটি লক্ষ্য থাকে বলিয়া এ'দেশে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেবল মাত্র হিন্দু কৃষক-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। মুসলমান সমাজে ইহা কালক্রমে একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিল, তাহা আলকাপ গান বলিয়া পরিচিত। ইহা শিব-বিষয়ক গম্ভীরা গানেরই ইসলামি সংস্করণ মাত্র ; তবে গম্ভীরা গানে একটু ধর্মীয় লক্ষ্য থাকিবার জন্য ইহা নীতি ও রুচির দিক দিয়া নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু আলকাপ গানে কোনও ধর্মীয় লক্ষ্য নাই বলিয়া ইহার বিষয় নিতান্ত লঘু এবং রুচি ও নীতিবোধ সময় সময় অত্যন্ত নিম্নস্তরে গিয়া পৌছিয়া থাকে। অনেক সময় আলকাপ গানে একটি কিশোর কিংবা বালক মেয়ের মত সাজিয়া নৃত্য করে ও গান গাহিয়া থাকে ইহাকে লইয়াই এক একটি দল গড়িয়া উঠে। দলের একজন পুরুষ কিশোরী বেশী বালকটির সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নানা লঘু হাস্যপরিহাস ও কৌতুক করিয়া থাকে। দলের মধ্যে এই দুইজন ব্যতীত অবশিষ্ট আর প্রায় সকলই দোহার। পুরুষ ও নারীবেশী বালকটির দ্বৈত সঙ্গীত সংলাপের মধ্যে মধ্যে তাহারা ধুয়া ধরিয়া থাকে, কখনও কখনও ছড়া কাটে। জীবনের কোন গভীর বিষয়ই আলকাপ গানের ভিতর দিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ গান ও ছড়াই সমসাময়িক নিতান্ত লঘুস্তরের বিষয়-বস্তু লইয়া রচিত হয়। মালদহ জিলার মুসলমান কৃষক সমাজ ব্যতীতও মুর্শিদাবাদ জিলার উত্তরাংশেও আলকাপ গানের বহুল প্রচলন আছে। মুর্শিদাবাদ জিলা হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত আলকাপ গানটিতে সামান্য একটু কবিত্বের স্পর্শ অনুভব করা যাইবে—

পারী॥ 'মাঝি, পার করে দে দেরী সহে না।
শ্বশুর বাড়ি হতে বাপের বাড়ি যেতে
মন ত মানে না॥'

মাঝি॥ আমি ঝড় তুফানে পার ত দিব না।
নদীর গাংভরা জল করে টলমল
হলকাতে জল তরী ত মানে না॥

পারী॥ পার করে দেরে মাঝি পয়সা নে হাতে।
আমার মাঝি কাজের কাজি আছে এক ঘাটে॥

আমি নারী তুমি আনাড়ী, ওরে মাঝি ভাই।
এ'বার তরী ছাড়্লে পরে বুঝিব তোমায় ॥
মাঝির বেটা মাঝিরে, তোর নৌকায় নাইরে জুত।
ভাঙা নায় পার করিতে কিবা পেয়েছিস্ জুত ॥
মাঝি বসে বসে বুঝ ॥

মাঝি ॥ উৎপাত করিস্নে, ধনি, বেলা যেতে দে।
তোর লেগে রেখেছি তরী জুড়ে আড়ে ॥
আমি যখন নৌকা ছাড়ি উজান আর ভাইটাল।
ভাইটাল যখন নৌকা ছাড়ি তুলে দেই হে পাল ॥
উজান যখন নৌকা ছাড়ি ধরি তখন গুণ।
ধনি, আমার কথা শুন ॥

মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিষয় হইলেও বাংলার লোক-সঙ্গীতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া আলকাপ গানেও রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

'শুন ওহে চিকন কালা,
তোমার প্রেমের এত জ্বালা,
ব্রজবালা রইতে নারি ঘরে।
ও, নাম ধরিয়া বাজাও বাঁশী
বিজন বিপিনে বসি
মন উদাসী তোমার বাঁশীর স্বরে ॥'
'কে বলে রাই, তোমার নামে
বাজে বাঁশী ব্রজধামে
শুন ওহে রাজার দুলালী।
আমি হই গোষ্ঠের রাখাল
মাঠে চরাই গো ধেনুর পাল
থাকি বসি কদম্বের তলে ॥'

রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব কবিতার ভাব উক্ত আলকাপ গানটির অবলম্বন হইবার জন্য ইহাতে যেমন একটু ভাব-গভীরতার স্পর্শ অনুভব করা যায়, নিতান্ত

লৌকিক বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত নিম্নোদ্ধৃত আলকাপ গানটিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব অনুভব করা যাইবে না—

ধন্য তুমি কলির ছেলে—জানাই গো প্রণাম।
জানাই গো প্রণাম সভাতে করি গো সেলাম॥
দাদা! গরীব ভাইদের দুঃখ দেখে বাঁচে না পরাণ।
ইহার চেয়েও দুঃখ পায় শিক্ষিত যে জন গো॥
চাকরী করবে বলে ছেলে,
পিতা তাদের দেয় ইস্কুলে,
ছেলের চাক্‌রী কর্‌বে ব'লে
তারা ডিগ্রী ধ'রে নিলে গো।
সরকার একটা চাকরী দিল
মনে ভাবে ভাগ্য ভাল।
উপরে 'ব্যাকিং' যাদের ছিল,
তারা চাক্‌রী কেড়ে নিল গো॥'

আলকাপ গানের যে সকল বিষয় নিতান্ত লঘুস্তরের তাহা গান না হইয়া প্রধানতঃ ছড়া হইয়া থাকে, তাহাকে আলকাপের ছড়া বলে। কবিগানের মতই আলকাপ গান গাহিতে গাহিতে কোন কোন স্থলে আসিয়া ছড়া কাটিবার রীতি গৃহীত হইয়া থাকে। আলকাপের ছড়া কাব্যগুণ বিবর্জিত নিতান্ত সাধারণ স্তরের রচনা। উপরি উদ্ধৃত অংশের মধ্যেও ছড়ার রূপটিই অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হইবে।

মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রচলিত আলকাপ গানেরই একটি অধঃপতিত রূপের নাম রং পাঁচালী। ইহা কেবলমাত্র রঙ্গ তামাসার বিষয়, উচ্চাঙ্গের কাব্যগুণ ইহাদের রচনায় প্রকাশ পায় না। গম্ভীরা গানই ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া অবনমিত হইতে হইতে কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া রং পাঁচালীতে পরিণত হইয়াছে। সাময়িক বিষয়ের পর্যালোচনা ইহারও উদ্দেশ্য। তবে সাময়িক বিষয়েরও দুইটি দিক আছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ, আর একটি নিতান্ত লঘুস্তরের। বলাই বাহুল্য যে, রং পাঁচালীতে নিতান্ত লঘুস্তরটিকেই অবলম্বন করা হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহা আলকাপ এবং বোলান গান (পরে দ্রষ্টব্য)-এর অঙ্গ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে

সামাজিক আচার-ব্যবহারের ত্রুটি-বিচ্যুতি, এবং অসঙ্গতির কৌতুককর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈত গীতিসংলাপ ইহারও বৈশিষ্ট্য। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

স্ত্রী ॥ পূজার সময় জামাই আন্‌তে হবে।
শুন ওহে খুকীর বাপ ভাত র*াধিব তবে॥
পুরুষ ॥ পূজার সময় জামাই আন্‌তে বল্‌ছ আমায়, সুন্দরী।
এ বছরের ব্যাপার দেখে আমি যে ভেবে মরি॥
নূতন জামাই আন্‌লে কিবা খেতে দিবে।
স্ত্রী ॥ এলো মেলো ত্যাজ্য ক'রে জামাই হাজির কর।
নইলে তুমি পূজার দিনে বাড়ী হ'তে সর॥ ইত্যাদি

এই অঞ্চলের এক জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীতের নাম বোলান গান। ইহাতে পৌরাণিক কোন কোন কাহিনী পালার আকারে বাঁধা থাকে, লৌকিক সুর ও রাগ-রাগিণী দ্বারা তাহাই আসরে পরিবেষণ করা হয়। কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ইহার প্রধান বিষয়। উচ্চ ভাব প্রকাশ করা ইহার লক্ষ্য হইলেও রচনার ত্রুটিতে ইহার মধ্যে অনেক স্থলেই ভাবগত শৈথিল্য প্রকাশ পায়। যেমন,

নীলমণি খায় ননী নন্দের ঘরে,
অন্নপ্রাশন নন্দ দিল সেরে।
খেয়েছিল সবে পাতা পেড়ে
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে ক'রে॥

কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ব্যতীতও বোলান গানে নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা দীর্ঘ গীতি-কাহিনী বলিয়া ইহাতে প্রারম্ভেই একটি বন্দনা গীত হয়, তাহা গণেশ কিংবা সরস্বতী উভয়েরই হইতে পারে। 'হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানে মিলন' পালার বন্দনা গীতটি এই প্রকার—

সমাদরে লম্বোদরে করি চরণ বন্দনা।
শিবসুত সিদ্ধিদাতা কর মোরে করুণা॥
কোথায়, মাগো, শ্বেত-বসনা।
পূরাও মনের বাসনা॥
কোথায় তারা দুঃখহরা দুর্দিনে রাখ জননী।
ভজন পূজন মোরা নাহি জানি॥

'হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানে মিলন' পালায় এই বন্দনার পর, বিশ্বামিত্রের পুষ্পবনের এই বর্ণনা পাওয়া যায়—

হেমন্ত হইল অন্ত সুখের বসন্ত এলো।
ফুল বাগানে ফুটল কলি যত অলি জুটিল॥
বিশ্বামিত্রের ফুলবাগানে
গুণ গুণ করে মধুকর গণে।
স্বর্গের অপ্সরী যারা আসিলো ফুলের বাগানে
দলে দলে তারা সকলে
ভাঙ্গে ফুলের কুঁড়ি যত অপ্সরী চলিল ইন্দ্রালয়ে।

এই ভাবে সমস্ত কাহিনীটি কেবলমাত্র সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্বে নানা লৌকিক বিষয় লইয়াই বোলান গান রচিত হইত, কিন্তু পরবর্তী হিন্দুধর্মের প্রভাব বশত হিন্দু পুরাণের নানা বিষয় ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

এই অঞ্চলেরই আর এক শ্রেণীর সঙ্গীত সাধারণতঃ ছেঁচর গান নামে পরিচিত। ছেঁচর নাম হইতেই এই কথা মনে হইতে পারে যে, ইহারা নিতান্ত লঘুবিষয়ক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত, ইহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এবং উচ্চভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত। দৃষ্টান্ত যথা—

(১)

আমায় কে ডাক্‌লো গো বিজন বনের ধারে গো,
বাঁশির সুরে ও নাম ধরিয়া।
বঁধু, আশার আশে রইলাম বসে
পথ পানে শুধু চাহিয়া॥

(২)

বিরহে প্রাণ বাঁচে না, প্রাণবন্ধু কুঞ্জে এ'ল না।
আমি জেগে থাকি সারা নিশি গো, পাতিয়ে ফুলের বিছানা॥
আমি খুঁজে বেড়াই বনে বনে গো,
শ্যামের দেখা পেলাম না॥

(৩)

বন্ধু, জানিয়ে জান না, বল্‌লে শোন না।
জ্বালিয়ে গেলে মনের আগুন নিভিয়ে গেলে না॥
ও যার কাঁচিকাটা চুল
বন্ধু বেল-কদমের ফুল
বন্ধু নয়নের কাজল,
তিলেক দণ্ড না দেখিলে মন হয় রে পাগল॥

রংপুর জিলা ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে জাগগান বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। রাত্রি জাগিয়া এই গান গাহিতে হয় বলিয়া ইহার নাম জাগগান। জাগ শব্দটি জাগা শব্দ হইতেই আসিয়াছে। এই অর্থে জাগরণ কথাটি বাংলায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়; যেমন, ভাদু গান ভাদুর জাগরণ, মনসার গান মনসার জাগরণ ইত্যাদি। রংপুর জিলাই জাগগানের কেন্দ্রস্থল, এখান হইতে ইহা রাজসাহী ও পাবনা অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে সকল অঞ্চলে ইহা রংপুরের মত এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। জাগগান এই অঞ্চলের অন্যান্য গানের মত খণ্ড গীতি নহে, কিংবা ইহার বিষয়-বস্তুও প্রেম নহে—ইহা সাধারণভাবে আখ্যায়িকা-গীতি (narrative) বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া লৌকিক আখ্যায়িকা কীর্তন করাই জাগগানের উদ্দেশ্য। আদিম সমাজের মধ্যে পূর্বে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজে বহু বীরত্বমূলক কাহিনী প্রচার লাভ করিত—আদিম সমাজে এই সকল উপজাতীয় গৌরব-প্রচারমূলক কাহিনী কীর্তন করিবার বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সময় থাকিত। এখনও আসামের উপজাতীয় অঞ্চলে এই রীতি প্রচলিত আছে। মনে হয়, এই প্রকার কোন ঐতিহ্যের ভিত্তি হইতেই জাগগানগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। আদিম সমাজ-সুলভ যুদ্ধবিগ্রহ এই অঞ্চল হইতে এখন লুপ্ত হইয়াছে; সেইজন্য বীরত্বমূলক কাহিনীর পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে এখন স্থানীয় লৌকিক চরিত্রেরই মহিমা কীর্তন করা হয়। পীর ও সাধুদিগের চরিত্র সম্বন্ধে সমাজের স্বাভাবিক কৌতূহল হইতেই জাগগানের মধ্যে পীরমাহাত্ম্য-সূচক বিষয় প্রবেশ লাভ করিয়াছে—ক্রমে বৈষ্ণবপ্রভাব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের আখ্যায়িকা জাগগানের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

সমস্ত পৌষমাস ব্যাপিয়া উত্তর বঙ্গের কৃষক বালকগণ দল বাঁধিয়া রাত্রি জাগিয়া জাগগান গাহিয়া থাকে। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বিপুল আড়ম্বর সহকারে মাঠের মধ্যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়—গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় ভোজ্যোপকরণ সংগ্রহ করে।

এ'যাবৎ উত্তরবঙ্গ হইতে যে সকল জাগগান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই সোনারায় বা সোনাপীর নামক একজন মুসলমান পীরের মহিমা কীর্তন শুনিতে পাওয়া যায়। জাগগানে সোনারায়ের জন্মবৃত্তান্তটি এই,

পীরের বরে জন্ম নৈল পুন্নমাসীর চান।
বাপে মায়ে রাখ্‌ল তার সোনারায় নাম॥
সোনারায় নাম রাখ্‌ল সোনার বরণ।
জোড়া মাণিক্য দিয়া গড়িয়াছে নয়ন॥
বেড়ার বান্ধ্‌ কাট্যা দাই ঘরেতে পশিল।
হেনকালে সোনারায় ভূমস্তে পড়িল॥
ছাওয়াল তুলিয়া দাই কোলে তুল্যা নিল।
নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তারে আস্থত করিল॥
সোনার চিচ্‌রা দিয়া নাড়ী ছেদ করিল।
তোমার ছাওয়াল তুলি লও, মা, আমারে কিবা দিবা।
গুণ্যা বাছ্যা পাঁচ টঙ্কা দাইয়ের হাতে দিলা॥[১]

জাগগানে সোনাপীর এই ভাবে নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন—

সোনাপীর উঠে বলে, মাণিক পীর রে ভাই।
এসেছি গোয়ালপাড়া জাহির রেখে যাই॥
আগনড়ি পাছ করে বাতানে দিল বাড়ি।
নব লক্ষ ধেনু ম'ল বিশ লক্ষ বাছুরি॥
বাতানে পড়িয়া মল বাতানে ভাসুর।
দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর॥
কান্দেরে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও।
গোধেনুর বদলে কেন না মরিল মাও॥

১ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ৪।২, পৃঃ ৪৬৮-৬৯

কান্দেরে গোয়ালের নারী হস্তে করে কাঁচি।
গোধেনুর বদলে না মরিল চাচী॥
কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে ক'রে ঝারি।
গোধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি॥
সোনাপীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
মেরেছি গরীবের ধন জীয়াইয়া যাই॥
আখড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাড়ি।
নবলক্ষ ধেনু তারা পারে দোড়াদোড়ি॥
বাতাসেতে চেতন পেল বাতাসে ভাসুর।
দরবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর॥
আগে যদি জান্‌তেম তুমি সোনাপীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর॥
জিন্দা চার যুগের সার।
মারিয়া জীয়াতে পার, অপার মহিমা তোমার॥[১]

নিম্নোদ্ধৃত জাগগানটির উপজীব্য চৈতন্য বা নিমাইর জীবনী, সেইজন্য ইহা নিমাইর জাগ নামে পরিচিত,—

নিমাই দুখিনীর ধন।
দুঃখ পাশরার বেটা রে নিমাই ওরে নীলরতন॥
একমাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজল।
দুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল॥
তিন মাসের কালে নিমাই লোহরক্তের গোলা।
চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া॥
পঞ্চ মাসের কালে নিমাই পঙ্কফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথায় চুল উঠে॥
সাত মাসের কালে নিমাই সাত সুরে গায়।
অষ্ট মাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায়॥
নয় মাসের কালে নিমাই নব ডঙ্কা মারিল।
দশ মাসের কালে নিমাই ভূমিষ্ঠ পড়িল॥

১ সা-প-প, ৪৩

দশ মাস দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল।
নিমাই চাঁদ ভূমিস্থ পড়ে মা বোল বলিল ॥
কোথা হ'তে এল যোগী কেশব ভারতী।
কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইরে বানাইল সন্ন্যাসী ॥
দেখ দেখ নগুর্‌্যার লোক দেখ রে চাহিয়া।
নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসী চল্‌লো জননী ছাড়িয়া ॥
সন্ন্যাসী না হইও, রে নিমাই, বৈরাগী না হইও।
ঘরে বসে কৃষ্ণ নামটি মাকে শুনাইও ॥[১]

জাগগান গীতিকা বা ballad-এর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না; কারণ, কোন সুবিন্যস্ত ও সংহত কাহিনী ইহাতে থাকে না। বিশেষতঃ যে মানবিক আবেদন গীতিকা মাত্রেরই একটি অপরিহার্য ধর্ম, তাহাও জাগগানে নাই, ইহা অলৌকিক ঘটনাবলীতেই পরিপূর্ণ। এই ঘটনাগুলি কোন সুনিবিড় কাহিনীর ধারা অনুসরণ না করিয়া নিতান্ত শিথিল ও অসংলগ্ন ভাবে প্রকাশ পায়। গীতিকা হইতে ইহার গীতিসুর অধিকতর প্রত্যক্ষ; অতএব ইহা বাংলার পল্লী-গীতিরই একটি বিশিষ্ট রূপ।

উত্তর বঙ্গের লোক-সঙ্গীতের মধ্যে কোচবিহার-জলপাইগুড়ির দোতারার গান সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। উচ্চতর সমাজের সর্ববিধ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, ইহা সমাজের সাধারণ স্তরে ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছে। দোতারা দুই তন্ত্রিযুক্ত একটি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র; ইহার সংযোগে যে গান গাওয়া হয়, তাহাই দোতারার গান নামে পরিচিত। যে গান দোতারার সংযোগে গাওয়া হয়, তাহা চট্‌কা এবং ভাওয়াইয়া নামেও পরিচিত। এই অঞ্চলে প্রচলিত মনসার গীত এবং কুষাণে বা রামায়ণ গানও দোতারার সাহায্যে গীত হয়। বলা বাহুল্য যে, ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গান গাহিবার রীতি হইতেই ইহা মনসার গীত ও কুষাণে গানেও প্রসার লাভ করিয়াছে। মনসার গীত এবং কুষাণে গানের পটভূমিকায় বেহুলা ও রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হইলেও, তাহা অবলম্বন করিয়া যেমন নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তব জীবনের সুখদুঃখের কথা কীর্তিত হয়, দোতারার গানেও অনেক সময় কোন প্রচলিত রূপকথা অবলম্বন করিয়া প্রাত্যহিক

---

১ সা-প-প, ঐ

জীবনের সুখদুঃখের কথাই বর্ণিত হয়। একটি ক্ষীণতম কাহিনীর সূত্র ইহাদের অবলম্বন হইলেও, ইহাদের ভিতর হইতে এক একটি খণ্ডগীতি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া আপনার রস ও সুর-মাধুর্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে।

ভাওয়াইয়া গান কেবলমাত্র যে দোতারার সাহায্যেই গীত হয়, তাহা নহে—ইহা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রংপুর অঞ্চলের সর্বাধিক জনপ্রিয় একক কণ্ঠ-সঙ্গীতও বটে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার বিষয়-বস্তু প্রেম, কিন্তু ইহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে; সেইজন্যই ইহা প্রেম-সঙ্গীতের অন্তর্গত হইলেও আঞ্চলিক সঙ্গীতেরই অন্তর্গত করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া প্রধানতঃ প্রেমস্পর্শ-কাতর নারীমনের প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাবই অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহার প্রধান সুর বিরহ কিংবা অতৃপ্তির সুর। পূর্বেই বলিয়াছি, বিরহই প্রেমের সর্বোত্তম অংশ; সেইজন্য ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে বিরহ ও অতৃপ্তির যে মর্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ইহাকে এক অনবদ্য বেদনা-মধুর রসরূপ দিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে জলপাইগুড়ি জিলায় এক পল্লীর কৃষকের মুখে নিম্নোদ্ধৃত ভাওয়াইয়া গানটি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল; ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ইহার ভাব পুরাতন হইয়া যায় নাই। এই গানটি উত্তর বঙ্গের কেবল ভাওয়াইয়া গানের নহে, লোক-সঙ্গীত মাত্রেরই একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। কারণ, ইহার পূর্ববর্তী আর কোন লোক-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় না; সেইজন্য গানটি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার যোগ্য—

পর্থম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া,
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হয়া,
রে বিধি নিদয়া।
হাইলা পৈল্ মোর সোনার যৌবন্ মলেয়ার ঝড়ে,
মাও বাপে মোর হৈল বাদী না দিল্ পরের ঘরে,
রে বিধি নিদয়া।
বাপক্ না কও সরমে মুই মাওক্ না কও লাজে,
ধিকি ধিকি তুষির অঘুন জ্বলছে দেহির মাঝে,
রে বিধি নিদয়া।

পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাজ সরমের ডরে,
খুলিয়া কোলে মনের কথা নিন্দা করে পরে,
রে বিধি নিদয়া।
এমন মন মোর করে, রে বিধি, এমন মন মোর করে,
মনের মতন চেঙ্গ্‌ড়া দেখি ধরিয়া পালাও দূরে,
রে বিধি নিদয়া।
কহে কবে কলঙ্কিনী হানি নাইক মোর তাতে,
মনের সাধে করিম্‌ কেলি পতি নিয়া সাথে,
রে বিধি নিদয়া।[১]

ইহার অনতিকাল ব্যবধানে রংপুর জিলার এক পল্লী হইতে এই ভাওয়াইয়া গানটি সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহার মধ্যেও উপরি-উদ্ধৃত সঙ্গীতটির মত নারী-মনের এক প্রচ্ছন্ন বেদনার স্বর ধ্বনিত হইয়াছে,

না খাই তোর গুয়া রে
না খাই তোর পান রে
না করোঁ তোর বৈদেশী পিরীতি রে॥
বৈদেশী পিরীতি রে—
মাটির কলসী রে,
ভাঙ্গি গেইলে না লাগিবে জোড়া রে॥
উত্তর হইতে আইল্‌ ভারী,
কথা পুছোঁ মুঞ্‌ঞ সরাসরি,
কত ভাবি মোর কালা কেমন আছে॥
মোর কালা মানুষ ভাল্‌
না বুঝে কালা সঞ্‌ঝা কাল্‌
না বুঝে একলা নারীর কাম রে।
ঢেঁকিকো কাটিম্‌ রে,
ছাইলকো পুতিমরে,
কেম্‌নি শুনিম্‌ মুঞ্‌ঞ চ্যাংড়া বন্ধু গান রে॥

[১] G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India* (Calcutta 1903) V. part 1., p 185.

মোর কালা খাইবে ভাত,
কোট্‌ঠে পাইম্ মুঞ্‌ঞ কলার পাত,
কোট্‌ঠে পাইম্ মুঞ্‌ঞ জীয়া মাগুর মাছ রে ॥[১]

উদ্ধৃত দুইটি সঙ্গীতের মধ্যেই নারীমনের নিরাশার (frustration) সুর ধ্বনিত হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়ার মধ্য দিয়াই নরনারীর মনের সূক্ষ্মতম ভাবগুলি বিকাশ লাভ করে—পাওয়ার মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বারা হৃদয়ের সূক্ষ্মতম ভাবগুলি আচ্ছন্ন হইয়া যায়; সেইজন্য প্রাণে যেখানে রিক্ততার বেদনা জাগে, সেখানেই মধুরতম সঙ্গীত জন্মলাভ করে। ভাওয়াইয়া গানও এই রিক্ততার বেদনায় মধুর হইয়া উঠে।

প্রেমিকের নিকট প্রণয়িনীর কোন বিশ্বগ্রাসী দাবী নাই; কারণ, প্রেমই তাহার অন্তরের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখে। কিন্তু দাবী যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহা উপেক্ষিত হইলে প্রণয়িনীর মনে ব্যথার অন্ত থাকে না; এই তুচ্ছ অভাব-অভিযোগের ব্যথাও ভাওয়াইয়া গানের প্রেরণা জোগাইয়াছে—

বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে।
যে জন বঁধুয়া হবে,
ঘাম মুছিয়া কোলে ল'বে,
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে ॥
শাক তোলোঁ মুঞ্‌ঞ নাতারি রে,
শাক তোলোঁ মুঞ্‌ঞ পাতারি রে,
আজি শাক তোলোঁ মুঞ্‌ঞ বাড়ীর চতুর্দিগে রে ॥
এক লোটা তুলিতে,
ফির লোটা ভরিতে,
ওরে, ছিঁড়ি পইল্ মোর গলার চন্দ্রহার রে ॥
মাও নাই যে বলিম,
ভাই নাই যে কহিম,
আজি কে তুলিয়া দিবে গলায় চন্দ্রহার রে ॥

১ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (র-সা-প-প) ১৩১৫, ১ম সংখ্যা

ঘরের মধ্যে কাঁচা সোনা ফেলিয়া রাখিয়া যে সদাগর পোড়া সোনার সন্ধানে দূর দেশে যায়, তাহার যত মূর্খ আর কে আছে ? তাহার প্রেমেরই বা কি মূল্য ? ঘরের কাঁচা সোনা যে চিনিল না, সে বিদেশের পোড়া সোনা চিনিবে কি করিয়া ? নিরক্ষর কৃষক-কবির রচনায় এই অপূর্ব ভাবটি কি মধুর রস ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে --

কুকিলার কুহু কুহুরে—
(আরে মোর) মইওরের ফ্যাকম্—
কোন দেশে থাকিয়া, ও মোর বন্ধু, দেখালু স্বপন।
বালাই দেঁঙ্ তোর পিরীতের মাথাত রে ॥
ধন-কাঙ্গালী সাউধের ছাইলা রে—
(আরে মোর) ধনক্ নাইগো মন,
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা (ও মোর বন্ধু) বৈদেশে গমন।
বালাই দেঁঙ্ পিরীতের মাথাত রে ॥
গছ মধ্যে শিমিলার গছ রে,
(আর মোর) স্বরগে ম্যালেরে ডাল,
নারী হয়্যা এ যৌবন (ও মোর বন্ধু) রাখিম্ কতকাল।
বালাই দেঁঙ্ তোর পিরীতির মাথাত রে ॥

অতএব দেখা যাইতেছে, নারীমনের নৈরাশ্যের ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়। ইহার সুরের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। দ্বিপ্রহরের নির্জনতা কিংবা নিশীথের স্তব্ধতার ভিতর হইতে একটি মর্মভেদী বেদনার সুর ইহাতে উত্থিত হইয়া যেন আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তাহাতে শ্রোতার মন সহজেই অভিভূত হইয়া যায়। ভাওয়াইয়া গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রেম-সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আজিও প্রবেশ লাভ করে নাই ; ব্যক্তি-হৃদয়ের একান্ত অনুভূতি ইহার আশ্রয় বলিয়া বহির্জগতের ধূলাবালি ইহার মধ্যে উড়িয়া আসিয়া পড়িতে পারে নাই।

ভাওয়াইয়া গানেরই একটি অংশের নাম চট্কা গান—ভাওয়াইয়া গানে গুরুগম্ভীর বিষয় ও দীর্ঘ টানের সুর ব্যবহৃত হয়, লঘুস্তরের বা চটক্দার বিষয় ও

ক্ষিপ্র তালের সুর অবলম্বন করিয়া চট্‌কা গান রচিত হয়। চট্‌কা গানের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্ত নগণ্য ; একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

ও দিদি, শোনেক একটা কথা কং
তোক ছাড়া আর কাক শাইকাং
তুই ছাড়া আর কবার জাগায় নাই।
(দিদি) বাপ মায়ের কপাল পোড়া
মোরও নারীর অল্প পড়া
সেইজন্য ভাল পাত্তর আইসে না॥ ইত্যাদি

অতএব দেখা যাইবে, ভাওয়াইয়া গানের তুলনায় এই অঞ্চলের চট্‌কাগান লঘু রঙ্গরস ব্যতীত আর কিছুই নহে ; কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের মতই এই গানেরও নায়িকা নারী।

পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। জারিগান পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই প্রচলিত আছে—কিন্তু পূর্ব মৈমনসিংহ ব্যতীত অন্যত্র ইহা বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। যে কাঁরণেই হউক, এই অঞ্চলে ইহার একটি বিশিষ্ট পরিচয় গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বীর ও করুণ রস মিশ্র রচনা—কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত ইহার বিষয়। বীর-রসাত্মক এই কাহিনীর উপর ইহাতে একটি অতি করুণ কাহিনী আছে—তাহা হজরত ইমাম হোসেন ও হাসানের হত্যা। দুস্তর মরুপ্রান্তরে শত্রুসৈন্যের অবরোধের মধ্যে অসহায় শিশুর এক বিন্দু তৃষ্ণাবারির জন্য যে আর্তি এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একদিক দিয়া যেমন ইহার মানবিক আবেদন সার্থক করিয়াছে, আবার অন্য দিক দিয়া ইহার বীররসাত্মক পটভূমিকার উপর সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই গুণেই পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে একমাত্র জারিগানেই একটু পৌরুষের স্পর্শ আছে। জারিগান নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত। একজন মূল গায়েনের পরিচালনায় অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জন গায়ক পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাতে একটি করিয়া গামছা লইয়া বৃত্তাকারে পা ফেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে থাকে ; পা ফেলিবার তালে তালে নূপুর বাজিতে থাকে, আঁচলের মত করিয়া গায়কেরা হাতের গামছাটি দুলাইতে থাকে, মূল গায়েন সঙ্গীতের ভিতর দিয়া কাহিনী বর্ণনা করিয়া যায়—মধ্যে

মধ্যে অন্যান্য গায়কগণ ধুয়া ধরে। করুণ রসাত্মক কাহিনীর মধ্যে এই প্রকার বীর-রসাত্মক ধুয়াগুলি অপূর্ব রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে—

চল চল চল সবে সমরখন্দে যাব।
এজিদে মারিয়া সবে দরিয়ায় ভাসাব॥
সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ ভাই।
জীও জীও জীও ভাই॥

মূল গায়েন ইহার কাহিনীর ধারা সঙ্গীতের ভিতর দিয়া বর্ণনা করিয়া যায়, কিন্তু ইহার কাহিনী অদ্যোপান্ত দৃঢ়সংবদ্ধ নহে—করুণ-রসাত্মক অংশ সমূহ ইহার মধ্যে যে অপূর্ব গীতিসুর সৃষ্টি করে, তাহার ফলেই ইহার কাহিনী কোন কোন স্থানে শিথিলগতি হইয়া পড়ে; যেমন,

'হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন,
ওহে যেনা পথে দিছিরে দুই ভাই জোড়ের ভাই এমাম হোছেন।
সেই না পথে যাবো রে আমি, করো আমার গোর কাফন;
রামলক্ষ্মণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে,
ঐ রকম গেছেরে দুই ভাই মদিনা শূন্য ক'রে।
ভাই ভাই বলে ডাক্‌ছে হানেফ, আর কি প্রাণের ভাই আছে?
যে বলের বল কর্লে মরে জয়নাল সে বল ভেঙ্গেছে,
যার বলের বল করছ তুমি, সে বল কি আর আমার আছে?
জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।'[১]

গীতি-সংলাপের ভিতর দিয়াও জারিগানের কাহিনী অনেক সময় অগ্রসর হইয়া থাকে। কাসেম ধর্মরক্ষার জন্য কারবালার যুদ্ধে যাত্রা করিতেছে, তাহার নব-পরিণীতা পত্নী সাকিনা তাহাকে বাধা দিতেছে, এই বিষয়টির মধ্যে যে একটু নাটকীয় সংলাপের অবকাশ ছিল, পল্লীকবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন—

সাকিনা—বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে কেন আকিঞ্চন।
হে, অনাথিনী কইরে মোরে বিয়ার বাসরে,
কোন প্রাণে প্রাণনাথ চইলেছ সমরে হে॥

১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি (১৯৪২), পৃঃ ২৮৶

কাসেম—হো, মহাকর্তব্যের তরে, ওরে সাকিনা।
চলেছি এ ঘোর সমরে কেঁদ না, কেঁদ না রে॥
সাকিনা—যেও না যেও না, নাথ, আমারে ছাড়িয়া।
(যদি) যুদ্ধে যেতে ছিল সাধ, কেন করিলে বিয়া হে॥
হে, উদয় অস্তে একই সাথে কে দেখ্যাছে কুথায়।
বিয়ার ঘরে স্ত্রী রেখ্যে স্বামী যুদ্ধে যায় হে॥

একদিকে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, অপর দিকে মহান্ কর্তব্যের ক্ষেত্র হইতে আহ্বান এই উভয়ের মধ্যবর্তী কাসেমের অন্তর্দ্বন্দ্বটি এই সংলাপের ভিতর দিয়া সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে—

কাসেম—রণে যদি না যাই পিয়া হাসরের দিনে।
ক্যামনে দেখা'ব মুখ বাবাজীর সামনে হে॥
হয়তো আবার দেখা হ'বে হাসরের দিনে।
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা নাই গো সেখানে হে॥

সাকিনা তখন কাসেমকে নিজ হস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিল। তারপর সেই ধর্মযুদ্ধে কাসেম যখন প্রাণ দিল, তখন স্বামীর রক্তাক্ত দেহ ক্রোড়ে লইয়া সাকিনা মর্মভেদী বিলাপে আকাশ-বাতাস বেদনার্ত করিয়া তুলিল। পল্লীকবির রচনায় ইহার এই করুণ রস সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—

হা রে, ও আমার প্রাণনাথ, এস এস এস প্রাণ হৃদি-বাসরে।
কে রঙ্গিল সোনার তনু গো খোনখারাবি আবিরে (হা রে)॥
ধর ধর গো পিয়া, এসেছি প্রাণ প্রিয়া
বুকে বিনৃছে বিষের চিতা দেখ নজরে।
অঘোর ঘুমে ঘুম দিল লো, হা হা, সাকিনা লো তোর ঘরে হা রে॥

কিন্তু ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে সপরিবারে শত্রু সৈন্য বেষ্টিত হইয়া ইমাম হোসেন যে তাঁহার তৃষ্ণার্ত শিশুর মুখে এক বিন্দু জল পান করিতে দিতে পারিলেন না, বরং তাহার পরিবর্তে নিজের চোখের সম্মুখে সেই অসহায় শিশুকে শত্রুর তীরে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিলেন, তাহার বেদনাই জারিগানগুলিকে সর্বাধিক করুণ করিয়া তুলিয়াছে—

আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানী হাতে লইয়া,
কলেজা অঙ্গার হইল পানীর লাগিয়া রে-এ-এ।
হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানী হাতে লইয়া॥
এই পানী বিনে মোর ফরজন্দ ইয়ার।
তামাম শহীদ হইল কারবালা মাঝার॥
দুধের বাচ্চার বুকে তীর পানীর লাগিয়া।
একেলা খাইব পানী সকলে হারাইয়া রে-এ-এ,
হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানী হাতে লইয়া॥

ফোরাত নদীর তীর আজ শত্রুকবল মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণার সময় শিশুপুত্রের কণ্ঠে একবিন্দু জল দিতে পারেন নাই, শিশুর তৃষ্ণার্ত বক্ষে শত্রুর তীর বিদ্ধ হইয়া রক্তের উৎস সৃষ্টি করিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি কি করিয়া নিজে আর জলপান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন? জীবনের জন্য তাঁহার শান্তি তাঁহার অন্তর হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার জন্য আনীত পানীয় জল ফোরাত নদীতে বিসর্জন করিয়া দিলেন—

এই বলিয়া পানী দিল ফোরাতে ঢালিয়া—
সোনার হোসেন পড়্যা গেল তীরেতে ঢলিয়া॥
তারপর উঠিয়া মর্দ দুলদুলে চড়িল।
বেঈমান এজিদ ফৌজ কতই মারিল॥
মারিতে মারিতে সৈন্য ঢলিয়া পড়িল।
দিন দুই পরে সারা দুন্যাই আন্ধাইরে ঘিরিল রে—
হোসেন কান্দে, হোসেন কান্দে পানী হাতে লইয়া॥

জারিগানের বিষয়-বস্তু যতই করুণ হউক না কেন, একটি যুদ্ধের পটভূমিকায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বীররসের সার্থক স্পর্শও আছে।

এই জারিগান সম্পর্কেই বলা হইয়াছে, 'জারীগান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় করুণাত্মক গান।' জারীগানের মত ব্যথার সুর অন্য কোন গানে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্রভাবে অন্য কোন পল্লীগানে যুদ্ধ করা হয় নাই। মানুষ অবস্থার দাস। চারিদিকে মরু ধূ ধূ করিতেছে। এক বিন্দু বারি পাইবার উপায় নাই। পিপাসার্ত নরনারী বিশেষতঃ শিশুদের অসহ্য এবং অকথ্য যন্ত্রণা দেখিয়া সত্যই

আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে, "জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।"[১]

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে জারি বলিয়া পরিচিত যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে উক্ত কারবালা যুদ্ধের কাহিনীর কোন উল্লেখ থাকে না, কিংবা পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান যে প্রণালীতে গীত হয়, তাহার সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না; অতএব তাহা জারিগান নহে। পূর্ব মৈমনসিংহের বহির্ভাগে সাধারণতঃ সারিগানই জারিগান বলিয়া ভুল করা হয়। সারিগান বা নৌকা বাইচের গান আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত নহে—ইহা পূর্ববঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত আছে। সে'কথা পরে বলিব।

পূর্ব মৈমনসিংহ অর্থাৎ মৈমনসিংহ জিলার নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও সদর মহকুমায় ঘাটুগান নামক এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে; পূর্ব মৈমনসিংহের একান্ত সংলগ্ন অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম শ্রীহট্ট ও উত্তর ত্রিপুরা ব্যতীত ইহা বাংলাদেশের আর কোথাও প্রচলিত নাই। ইহা কেবল মাত্র উপরোক্ত অঞ্চলেই যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, এই অঞ্চলের মধ্যেও ইহা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়েই গীত হয়—এই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, বৎসরের মধ্যে ইহা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার বিবরণ বড়ই বিচিত্র, এ'পর্যন্ত প্রামাণ্য ভাবে কোথাও আজ পর্যন্ত তাহা প্রকাশিত হয় নাই, সেইজন্য তাহা এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

নিম্নশ্রেণীর কোন ব্যক্তির গৃহে যদি কোন বালক একটু সৌম্যদর্শন ও সুকণ্ঠ হয়, তবে তাহার মাতাপিতা কিংবা তদভাবে কোন অভিভাবক তাহাকে সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শী করিয়া তুলিবে। এই বিষয়ে অনেক সময় অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই বালক বালিকার মত মাথায় দীর্ঘ কেশ রক্ষা করে। যখন সে আনুমানিক বার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে নৃত্যগীতের ব্যবসায় আরম্ভ করে। এই প্রকার নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী বালককেই ঘাটু বলে। সে তখন যে স্বাধীন ভাবে নৃত্যগীত দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহা নহে। উপরোক্ত অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক বা একাধিক সৌখীন ঘাটুগানের সম্প্রদায় থাকে।

---

১ ঐ

সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়গুলি পরস্পর প্রতিযোগিতার মনোভাব লইয়াই গড়িয়া উঠে। এই সকল সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে উক্ত নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী বালকের অভিভাবকের নিকট হইতে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট কালের জন্য এই কার্যে নিয়োগ করে। কিন্তু এই নিয়োগের মধ্যেও একটু বৈচিত্র্য আছে। বালকের অভিভাবক নির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাকে উক্ত সম্প্রদায়ের হাতে তুলিয়া দেয়। এই সময়ের জন্য তাহার ভরণ-পোষণের সকল দায়িত্বও উক্ত সৌখীন সম্প্রদায়-গুলিই গ্রহণ করে। তারপর এক একজন ঘাটু বালক লইয়া এক একটি সৌখীন ঘাটুগানের সম্প্রদায় গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া বেড়ায়। ঘাটুগানের সময় বর্ষা ও শরৎকাল। পূর্ব মৈমনসিংহের বিস্তৃত জলাভূমির মধ্যে যখন বর্ষার জল সঞ্চিত হইয়া 'হাওর' বা সাগর বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করে, সেই সময়ই ঘাটুগানের সময়। হাওরের বুকে বিস্তৃত নৌকার পাটাতনের উপর ঘাটুর আসর বসে, তারপর হাওরের প্রান্তবর্তী গ্রামগুলির ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া দিবারাত্র অব্যাহত এই গান চলিতে থাকে। গ্রামের ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া গান গাওয়া হইতেই বালকের নাম ঘাটু হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে যদি পল্লীর কোন উৎসব দেখা দেয়, তবে সেই উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের আর বিরাম হয় না। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন মনসার ভাসান উপলক্ষ্যে বড় হাওরের পূর্ব-প্রান্তবর্তী নিকলি নামক স্থানে এখনও শত শত ঘাটুর নৌকা আসিয়া সমবেত হয়। বিজয়া-উৎসবের দিনও পূর্বে কোন কোন অঞ্চলে ঘাটুগানের বিশেষ সমারোহ হইত, কিন্তু পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে বিজয়া-উৎসব অপেক্ষা মনসার ভাসান উৎসবই অধিকতর জনপ্রিয় বলিয়া এই উপলক্ষ্যে এখনও জনসাধারণ তুমুল সাড়া অনুভব করিয়া থাকে।

ঘাটুর দলে যে গান গাওয়া হয়, তাহার দুইটি ধারা। একটি ঘাটুসম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্গীত, অপরটি ঘাটুর একক বৈঠকী সঙ্গীত। উভয়ই লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত; কারণ, উভয়ের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র আছে। যখন ঘাটু-সম্প্রদায়ের লোক সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত গাহিতে থাকে, তখন ঘাটু বালক নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে না—তাহাকে নৃত্যের ভিতর দিয়া নীরবে সেই সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত সঙ্গীতের ভাবটি রূপায়িত করিয়া তুলিতে হয়। ইহাই ঘাটুগানের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় আবেদন। পূর্বেই বলিয়াছি, ঘাটু বালক বালিকাদের মত দীর্ঘ কেশ রক্ষা করে, তারপর আসরে নৃত্যকালীন তাহার

পরিধেয় ধুতিটি মেয়েদের শাড়ীর মত করিয়া পরিয়া লয়, অঙ্গে সে আর কোন আভরণ ধারণ করে না, এমন কি নূপুরও তাহার পায়ে থাকে না। সমস্ত রাত্রি কিংবা সমস্ত দিন ব্যাপিয়াই যদি তাহার সম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্গীত চলিতে থাকে, তবে সমস্ত রাত্রি কিংবা দিন ব্যাপিয়াই সে মৌন নৃত্যের ভিতর দিয়া সেই সঙ্গীতের ভাবটি প্রকাশ করিতে থাকে। যখন সমবেত কণ্ঠে সকলে গাহিতে থাকে,

> কি বংশী বাজাইল গো সই, আমার দুষমন্ কালাচান্দে,
> আমার চউখের পানী ঝুইরা পড়ে, পরাণ কেবল কান্দে,
> ওলো আমার সই,—

তখন ঘাটু বালক কেবল মাত্র দুইখানি নিরাভরণ হাত ও নীরব নৃত্যভঙ্গির সহায়তায় দূরাগত বংশীধ্বনি ও তাহার সমস্ত দেহমনের উপর তাহার করুণ প্রতিক্রিয়ার ভাব অপূর্ব কৌশলে ব্যক্ত করিতে থাকে। অঙ্গে আভরণ কিংবা আবরণের কোন বাহুল্য নাই, অথচ একমাত্র শিক্ষার গুণে সে যে নৃত্যভঙ্গি প্রকাশ করিবে, তাহা দ্বারাই যেন দূরাগত বংশীধ্বনি ও প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়া তাহার প্রতিক্রিয়াটি পর্যন্ত দর্শকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে। অথচ কোন জটিল মুদ্রা বা অঙ্গন্যাস যে ইহাতে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। ঘাটুনৃত্য বাংলার লোক-নৃত্যের এক পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি। সহানুভূতির দৃষ্টি লইয়া কোন লোক-শিল্পী ইহা উদ্ধার করিয়া আনিয়া শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করেন নাই বলিয়া, ইহা ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে। বর্তমানে চারিদিকে সমাজ-সংস্কারের যে সদিচ্ছা দেখা দিয়াছে, তাহার সম্মুখীন হইয়া ইহা অচিরকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঘাটুসঙ্গীতের দুইটি ধারা—একটি ঘাটুসম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্গীত, অপরটি ঘাটু বালকের একক গীত। সমবেত সঙ্গীতের কথাই উপরে বলিলাম, এখন ঘাটু বালকের একক (Solo) সঙ্গীতের কথা বলিব। গান গাহিতে বসিয়া ঘাটুসম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে বিরাম গ্রহণ করে, তখন ঘাটু বালককেই নৃত্যসম্বলিত একক সঙ্গীত পরিবেষণ করিতে হয়। এই সঙ্গীতও প্রেম-সঙ্গীত। সুকণ্ঠ বালক নৃত্যের ভিতর দিয়া নিজের সঙ্গীতের ভাবটি যখন ব্যক্ত করিতে থাকে, তখন তাহার শক্তির আর এক দিক প্রকাশ পায়। এই নৃত্যগীতের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তথাপি ইহার

সৌন্দর্যের কোন অভাব অনুভূত হয় না। ঘাটুদিগের একক সঙ্গীতগুলি একান্ত গীতিধর্মী (lyric), তাহা ব্যক্তিহৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতির সহজ বিকাশ মাত্র ; ক্বচিৎ রাধাকৃষ্ণের নাম ইহাদের মধ্যে থাকিলেও এই রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন-চারী নহেন, বাংলার পল্লীর ধূলি-মলিন সন্তান। একটি সঙ্গীতের প্রথম পদটি এই—

জান্‌তাম যদি অবোধ গো ছাইলা,
পরাণ ত দিতাম না।

আর একটি সঙ্গীতের প্রথম পদ,

আমি উড়িয়া বেড়াই ‍দুনিয়ার মাঝে
মনের মানুষ পাইলাম না।

ঘাটু বালকের বয়স পনর ষোল বৎসর অতিক্রম করিয়া গেলেই সাধারণতঃ তাহাকে তাহার এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয় ; কারণ, তখন তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও দেহ কিশোর-সুলভ কমনীয়তাহীন হইয়া যায়। যে সঙ্গীতের ভাণ্ডার সে সঞ্চয় করে, তাহা দ্বারা তখন কোন নূতন ঘাটু বালককে সে অনুরূপ শিক্ষিত করিয়া তুলে। এই ভাবে শ্রুতি-পরম্পরায় ঘাটুগানগুলি সমাজের মধ্যে নিজেদের প্রাণ-ধারা রক্ষা করিয়া চলে।

কোন সমসাময়িক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া ঘাটুগান রচিত হয় না, কিংবা ইহাদের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক ভাবের বিন্দুমাত্রও স্পর্শ অনুভব করা যায় না। ইহাই ঘাটুগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই ইহা বাংলার লোক-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিবার অধিকারী। কিন্তু বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহকারীদিগের মধ্যে ঘাটুগানের উপর কাহারও উৎসুক দৃষ্টি পতিত হয় নাই। ইহার একটি কারণ আছে। বর্তমানে নৈতিক বিচারে ঘাটুসম্প্রদায়গুলির স্থান অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চতর হিন্দু ও মুসলমানের সমাজ নৃত্য বিষয়টি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না ; অতএব যে অনুষ্ঠানের নৃত্যই প্রধান উপজীব্য, তাহা ইহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। উচ্চতর হিন্দু-মুসলমানের সমাজই কালক্রমে সাধারণ স্তরের সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে—এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। ব্যবসায়ী ঘাটু বালকের সঙ্গে সৌখীন ঘাটুসম্প্রদায়ের যে সম্পর্কটি

গড়িয়া উঠে, তাহা সামাজিক বিচারে খুব সুস্থ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল কারণে ঘাটুর নৃত্য ও ঘাটুগানের মধ্যে যত উচ্চাঙ্গ শিল্পগুণ ও রস-বোধই প্রকাশ পা'ক না কেন, সামাজিক দৃষ্টিতে সমগ্র ঘাটুর প্রতিষ্ঠানটিই হেয় হইয়া রহিয়াছে। অতএব এই অঞ্চলের উচ্চতর সমাজ ঘাটুগান বলিতে দুর্নীতিপূর্ণ পল্লী-সঙ্গীতই বুঝিয়া থাকে; কিন্তু ঘাটুগানের মধ্যে দুর্নীতির পরিচায়ক কোন উপকরণ নাই। তবে প্রেম বিষয়ও কেহ কেহ দুর্নীতির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ঘাটুগান বলিতে ঘাটুসম্প্রদায় সমবেত কণ্ঠে যে সঙ্গীত গাহিয়া থাকে তাহাই বুঝায়, ঘাটু বালকের একক সঙ্গীত বুঝায় না। নিম্নোদ্ধৃত ঘাটুগানগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে দুর্নীতির পরিচায়ক কিংবা অশ্লীলতা কিছু মাত্র নাই, ইহারা উচ্চাঙ্গের প্রেম-সঙ্গীত; কারণ, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, উচ্চাঙ্গের প্রেম-সঙ্গীত মাত্রই অশ্লীলতা-বর্জিত। অশ্লীলতা স্থূল দেহাশ্রয়ী, কিন্তু প্রেম সূক্ষ্ম ভাবের দ্যোতক; অতএব প্রকৃত প্রেম-গীতিতে অশ্লীলতা নাই। নিম্নে কয়েকটি ঘাটুগান উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে ইহাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকটা ধারণা করিতে পারা যাইবে।

ঘাটুগানগুলি গাহিবার একটি বিশেষ সুর আছে। সুরের অন্তরালে ইহার কথাগুলি প্রায়ই প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; কারণ, সুরই ইহাতে প্রধান, কথা প্রধান নহে। সেইজন্য অধিকাংশ ঘাটুগানেই পদান্তে মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মিলের ইহাতে প্রয়োজনও বোধ হয় না, কথাগুলি সুর করিয়া এমন ভাবে টানিয়া টানিয়া গাওয়া হয় যে, তাহাতে মিলের স্থানটিও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহা যে আদিম জাতির লোক-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রেমের সর্বোত্তম অংশই বিরহ; ঘাটুগান উচ্চাঙ্গের প্রেম-সঙ্গীত বলিয়াই ইহারও বিষয় প্রধানতঃ বিরহ। দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির বুকে ভাসমান সুবৃহৎ তরণীর অলস গতিতে যে একটি বিষাদের পটভূমিকা রচিত হয়, তাহার উপর পল্লীগায়কের কণ্ঠনিঃসৃত বিরহ-সঙ্গীতগুলি এক সহজ কারুণ্যের সৃষ্টি করে; নিম্নোদ্ধৃত ঘাটুগানগুলিই তাহার প্রমাণ।

১

কোথায় বাজে সই গো মধুর বাঁশরী।
আর সখী, গৃহে রইতে না পারি ॥
কোথায় বাজে, সই গো, না পাই দিশা।
উড়ে যাওয়ার সাধ ছিল বিধি না দিল পাখা।
আমার এই দুর্দশা হইল দিনে দিনে ॥
নাগিনী দংশিল যেন জীবনের নাই ভরসা ॥

২

ললিতা বিশাখা সখী ত্বরা করি আয় গো।
আমার প্রাণবন্ধু হয় বিদায় গো ॥
শুকশারী গান গায়,
রজনী পোহায়ে যায়।
যায় বন্ধু নন্দের আলয় গো।
আমার প্রাণবন্ধু হয় বিদায় গো ॥
বন্ধুর পায় নূপুর ছিল, আমার রাধার সাধ ছিল গো,
হৃদয়ে ধরিয়া আমার তাপিত প্রাণ জুড়ায় গো ॥
আমার প্রাণবন্ধু হয় বিদায় গো ॥
নারীর প্রেমে পাষাণ গলে গো।
আমার প্রাণবন্ধু হয় বিদায় গো ॥

আমার দুঃখের কথা কারে জানাই, লো সই,
যাইতে যমুনার ঘাটে,—আলো সই, আমি তোরে
আমার পরাণের দুঃখের কথা শুনাই (ওলো সই),—
চউখের জল ভইরাছে আমার কাঙ্খের কলসী, লো সই !
কোনখানে যে বাজে বাঁশী, শুইনা হয় মন উদাসী—
ঘরে যাইতে বারে বারে পথ ভুইলা রই,—(ওলো সই)
আমার দুঃখের কথা কারে জানাই, লো সই !

৪

সই লো, আর না যাইবাম যমুনার জলে, (ওলো সই)
তোরা যা লো সই, যা লো তোরা, পরাণ আমার যায় ! (লো সই)
জলের ঘাটে চিকন কালা, লো সই, জ্বালাইয়া দিল দ্বিগুণ জ্বালা--
কি যে জ্বালায় আমার পরাণ যায়, ওলো সই !
আর না যাইবাম যমুনার জলে।

পূর্ব মৈমনসিংহের সংলগ্ন শ্রীহট্ট জিলা হইতে সংগৃহীত এই কয়টি ঘাটু-গানের[১] মধ্যেও অনুরূপ ভাবের বিকাশ অনুভব করা যায়—

ও রূপ আমারই অন্তরে গো রইল,
আচানক রূপ সই গো যমুনার কিনারে।
জল ভরিতে গেলাম, সই গো, যমুনার কিনারে,
ঘাগুরী ভাসাইয়া গো জলে চাইয়া রইলাম রূপ পানে।

২

কত বারে বারে করি গো মানা, ডুবাইও না কলসী,
ও গো জলে ঢেউ দিও না গো সখী।
একে ঘাটে চিকন গো কালা, গলে শোভে বনমালা
হাতে মোহন বাঁশী।
শ্যামের বাঁশীর সুরে মন উদাসী গৃহে রইতে পারি না,
শ্যাম কালারূপ নিরখি, ওগো জলে ঢেউ দিও না।

কালো যমুনার বুকে চিকন কালা শ্রীকৃষ্ণের ছায়াটি পড়িয়াছে, স্থির জলের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া সেই রূপ দেখিতেছি। জলে ঢেউ উঠিলে সেই ছায়ারূপটি অস্পষ্ট হইয়া যায়। সখীকে বার বার অনুরোধ করিতেছি—জলে ঢেউ দিও না, সেই রূপটি আমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে দাও।

বাজে বাঁশী গহীন কাননে গো কি শুনাইলা হায় !
মোহন মুরলী রবে প্রাণই যায়।

---

১ মুন্সী আশরাফ উদ্দীন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত, হারামণি, পৃঃ ২৮/০—২৮৶০

যখন বন্ধে বাজায় গো বাঁশী, শুনিয়া মন হয় উদাসী
পিঞ্জিরার পাখী গো হয়ে ঝুমিয়ে মরি।
আকুল করিল চিত্ত শ্যাম চিকন কালায়
গো মোহন মুরলী রবে প্রাণই যায়॥

আমি পিঞ্জরের পাখীর মত গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া আছি, বাহিরের কোন সংবাদ জানি না, এমন সময় কাহার বাঁশীর শব্দ বাহির হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমার জীবন আকুল করিয়া তুলিল! বুঝি এই জ্বালায় আমার প্রাণ যাইবে, জ্বালা জুড়াইবার আর কোন উপায় হইবে না।

উদ্ধৃত ঘাটুগানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই চোখে পড়ে—ইহাদের মধ্যে পূর্ব মৈমনসিংহের নৈসর্গিক পরিবেশ যেন অতি সহজ নিবিড়তা লাভ করিয়াছে। হাওরের বিস্তার ও জলাভূমির স্নিগ্ধতায় এই গীতিগুলি উদার ও কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাটুগান প্রেম-সঙ্গীত হইলেও ইহার প্রেমে মিলন নাই—কেবলমাত্র বিচ্ছেদই ইহার পরিচয়। সেইজন্যই ইহা একান্ত করুণ-রসাত্মক, না পাওয়ার বেদনাই ইহার মধ্য দিয়া শত ধারায় ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রেমের অপরিপূর্ণতায় জীবনে যে নৈরাশ্য দেখা দেয়, তাহার সুগভীর অনুভূতিতে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত দুইটি করুণ হইয়া উঠিয়াছে—

১

কি বৈলেছ মধুর সুতানে,
আরে আমার সোনার বরণ কোয়িলা
কুহুরব কেন শুনাইলে॥
প্রিয়ার জ্বালায় কোয়িলারে
জিউ মেরা দগছে
কি আনল জ্বালাইলে॥
শূন্য দেখিরে কোয়িলা না হেরি কালিয়া বরণে।
সেই না জ্বালায় কোয়িলারে জিউ মেরা দগছে॥
আরে কোন না দেশে ডাক্‌রে কোয়িল তমালে তোর বাসা,
কোন না দোষে প্রাণনাথে কৈরাছে নৈরাশা।

মরণ কালে ডাইক্যারে কোয়িল পিয়া নাম ধরে।
জিউ জ্বলেরে কৈয়িলা পিউ মেরা কাঁহারে ॥[১]

হে আমার সোনার বরণ কোকিল, মধুর শব্দে তুমি আমাকে কি বলিতেছ? তুমি তোমার কুহুরব কেন আমাকে শুনাইলে? একেই আমি প্রিয়ের (বিরহ) জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, তুমি আবার তাহার উপর আমার বুকে কি অনল জ্বালাইয়া দিলে? কালোবরণকে না দেখিয়া আমি চারিদিক শূন্য দেখিতেছি। হে কোকিল, অন্য কোনও দেশে গিয়া তুমি ডাক, আমি জানি না, কি কারণে প্রাণনাথ আমাকে নিরাশ করিয়াছেন; আমার মৃত্যুকালে তুমি আমার প্রিয়ের নাম ধরিয়া ডাকিও, আমার প্রিয় কোথায়? আমার প্রিয় কোথায়? হে কোকিল, আমার অন্তর যে জ্বলিয়া যাইতেছে।

২

বংশী বাজে ও রামা, বাঁশী বাজে কোন না গইন বনে,
জিউরায় সমুজ না মানে।
বংশী হইল কাল-ভুজঙ্গিনী,
ডংশিল রাধার পরাণি
বিষে অঙ্গ জর জর বাঁচি কেমনে,
জিউরায় সমুজ না মানে ॥

কোন গভীর বনে বাঁশী বাজিতেছে,—প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহে না। বংশী কাল ভুজঙ্গিনী হইয়া রাধার প্রাণ দংশন করিল, বিষে দেহ জর্জরিত হইল, বাঁচিবার কোনও উপায় নাই—প্রাণ প্রবোধ মানে না।

ঘাটুগানের একটি অংশ হিন্দী-বাংলা মিশ্র রচনা—ইহাকে তেলেনা গান বলে। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি ইহার নিদর্শন। গানগুলি মৌলভি আশরাফ সিদ্দিকি ও চৌধুরী গোলাম আকবর কর্তৃক শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

১

পিয়ারী তুম্‌কো
পিত লাগাওয়ে ॥

১ গান দুইটি মৌলভি সিরাজুদ্দিন কাশীমপুরী কর্তৃক সংগৃহীত

রুম ঝুমি তেলেনা গাওয়ে ॥
রুম্ ঝুম্ ঝুম্-তা-না-না-না-না
একেত আন্ধেরী রাতি।
বিজুলী চটক ভাতি।
পেয়ারী রুম্ ঝুম্ ঝুম্
তা-না-না-না-না ॥

২

জিউয়া না মানে সখী,
আরে পিয়া পরদেশী রে ;
কোন দেশে রৈলায় রে পীয়া
আনিয়া মিলাওয়ে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সে দিকে আঁধার দেখি,
মেরে কপালমে ঐ লিখিল
হা রে দারুণ বিধি।
দুঃখিনী অভাগী
রাধার দুঃখ গেল না,
কোন দেশে রৈলান রে পিয়া
নিলয় পাইলাম না ॥

মৈথিল এবং বাংলা মিশ্র ব্রজবুলি নামক কৃত্রিম ভাষায় যেমন মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, উদ্ধৃত লোক-সঙ্গীতগুলির রচনায়ও তেমনই হিন্দী এবং বাংলা মিশ্র এবং কৃত্রিম ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বাংলার আর কোনও লোক-সঙ্গীতে ইহার অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহা লোক-সাহিত্য রচনার একটি ব্যতিক্রম মাত্র। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লোক-সাহিত্য কোনও কৃত্রিম ভাষায় রচিত হইতে পারে না—জাতির নিজস্ব ভাষার অকৃত্রিম রূপই ইহার বাহন। সুতরাং এই নিদর্শন গুলি সমাজের উপর বহিঃপ্রভাবের ফল এবং মৌলিক ঘাটু-সঙ্গীত রচনার প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়া যাইবার যুগেই রচিত। সাধারণ ভাবে মনে হইতে

পারে যে, ইহারা ব্রজবুলির অনুকরণে রচিত, কিন্তু এ'কথা সত্য নহে—স্বতন্ত্র দিক হইতে ইহাদের উপর হিন্দীভাষার প্রভাব পড়িয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার সঙ্গে ইহার ভাষার কোনও যোগ নাই।

এখানে একটি বিষয় সহজেই মনে হইতে পারে যে, পূর্ব মৈমনসিংহের ঘাটুগানের গায়ক অধিকাংশই জাতিতে মুসলমান; সুতরাং বাংলা ভাষার সহিত অন্য কোনও ভাষা মিশ্রিত করিয়া যদি তাহাদের সঙ্গীত রচনা করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহারা তাহাদের মধ্যে আরবি-পারসী কিংবা উর্দু শব্দ মিশ্রিত করিবার পরিবর্তে হিন্দী শব্দ মিশ্রিত করিবার কারণ কি? ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে যে কথা ব্যবহৃত হয়, তাহা হিন্দী। যদিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মাত্রেরই বিশিষ্ট গায়কগণ জাতিতে মুসলমান, তথাপি আরবি-পারসী-উর্দু শব্দ তাঁহারাও সঙ্গীতে কদাচ ব্যবহার করেন না। অতএব পল্লীর মুসলমান গায়ক কর্তৃক গীত হওয়া সত্ত্বেও ঘাটুগানগুলিতেও আরবি-পারসী শব্দের পরিবর্তে হিন্দী শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা বাংলার লোক-সঙ্গীতের উপর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

ব্যবহারিক

সামাজিক কিংবা পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক আচারানুষ্ঠান সম্পর্কে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহারিক গীতি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইংরেজিতে ইহাকে functional song বলা হয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার নির্দিষ্ট ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা অন্যত্র কদাচ গীত হয় না। বিবাহের গীতই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। পল্লীর বিভিন্ন পরিবারের বিবাহানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষ্যে ইহাদের ব্যবহার নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের তুলনায় ইহাদের সীমা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে রচনার কোন উৎকর্ষ অনুভব করা যায় না। উচ্চতর সমাজে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিজীবনের প্রায় প্রত্যেকটি সংস্কার অবলম্বন করিয়া এই প্রকার সঙ্গীত প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গেই ইহাদের প্রচলন সর্বাধিক।

জীবনের ধারাবাহিক সূত্র অবলম্বন করিয়া এই ব্যবহারিক গীতির পরিচয় দিতে হইলে প্রথমেই গর্ভাধান বিবাহ-সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিতে হয়। গর্ভাধান বিবাহোপলক্ষে পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীগণ এই গীত গাহিয়া থাকেন। এই সকল সঙ্গীতের নায়ক-নায়িকা সর্বত্রই রাম-সীতা, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। অবশ্য এই রাম-সীতার চরিত্রের মধ্যে রামায়ণোক্ত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না, কেবল নায়ক-নায়িকার নাম দুইটিই রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে মাত্র। গর্ভাধান-বিবাহ ব্যতীতও পঞ্চামৃত, সীমন্তোন্নয়ন, সপ্তামৃত, সাধভক্ষণ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে বিষয়ানুগ বিভিন্ন গীত প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ সীতাদেবীর গর্ভকালীন বিভিন্ন অবস্থাই বর্ণিত হইয়া থাকে। ইংরেজি লোক-সঙ্গীতে ইহাকেই pregnancy song বলে। মধ্যভারতের সকল আদিবাসী সমাজেই অনুরূপ সঙ্গীতের প্রচলন আছে। পূর্ব মৈমনসিংহে প্রচলিত এই প্রকার একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

অযোধ্যা নগরে উঠে গো জয়াদি জোকার।
শুনি নাগরিয়া লোকে গো লাগে চমৎকার॥

ঢাকঢোল বাজে রঙ্গে গো নাচে প্রজাগণ।
ভাণ্ডার খুলিয়া সবে গো করে ধন বিতরণ॥
ব্রাহ্মণেরে দিলা রাজা গো ধনরত্ন দান।
দুগ্ধবতী গাভী দিলা গো সহিত রাউখ্‌খাল॥
এক দুই দিন করি গো পঞ্চমাস গেল।
গর্ভের লক্ষণ গো ক্রমে প্রকাশ হইল॥
জ্যেঠি খুড়ি মিলি সব সাধ খাওয়াইল।
জয়রবে অযোধ্যাপুরী গো ভরিয়া উঠিল॥
অলস হইল গো তনু মুখে হাই উঠে।
সোনার পালঙ্ক ছাড়ি গো ভূমে পড়ি লুটে॥
পোড়া মাটি খায় গো ঘুমে ঢুলে দু'নয়ন।
চন্দ্রাবতী কয় গো এই গর্ভের লক্ষণ॥

ইহাতে চন্দ্রাবতী নামক একজন কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই চন্দ্রাবতী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি মনসা-মঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। ইহা যে মহিলা-কবির রচিত, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নাই, তবে এই প্রকার সকল গীতই যে একমাত্র চন্দ্রাবতীরই রচনা, তাহা নহে; পল্লীগায়িকাগণ নিজেদের রচনাও যে অনেক সময় তাঁহার নামে আরোপ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শিশুর গর্ভবাসকালীন বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনামূলক সঙ্গীতের পর শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার প্রথম জাতকর্মকালীন সে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, ইহাও পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত এবং উক্ত চন্দ্রাবতীর নামেই প্রচলিত।

দশমাস দশদিন গো পূর্ণিত হইল।
সর্ব সুলক্ষণ শিশু গো ভূমিষ্ঠ হইল॥
সুবর্ণ কাটারিতে গো ধাই নাড়ী ছেদ করে।
জয়াদি জোকার পড়ে গো কৌশল্যার মন্দিরে॥
দূতে গিয়া বার্তা কইল গো দশরথের আগে।
হিরামণ মাণিক্য দিয়া গো রাজা পুত্র দেখে॥

সুগন্ধি চন্দন যত ছিটায় গো রাজপথে।
শিশু দেখ্‌তে রাজগণ গো আইল শূন্য রথে ॥
নেতের পতাকা উড়ে গো প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিদান বাদ্যভাণ্ড গো দেবের মন্দিরে ॥
আম্রশাখে পূর্ণ কুম্ভ গো তীর্থজলে ভরি।
হুলাহুলি কুলাকুলি গো দেয় কুলনারী ॥
যতেক নাটুয়াগণ করে গো নাচগান।
আনন্দেতে তোলপাড় গো করে পুরীখান ॥

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পুত্র-সন্তানের পরিবর্তে কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জনক-গৃহে সীতার জন্মবৃত্তান্তই গীত হইবে, কিংবা এই সঙ্গীতটির মধ্যেও দশরথের নামের পরিবর্তে জনকের ও কৌশল্যার নামের পরিবর্তে জনক-মহিষীর নাম যোগ করিয়া লওয়া হইবে। বলাই বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই ভাবে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন উপলক্ষ্যে ও বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও শ্রীরামের অন্নপ্রাশন ও উপনয়নের বিষয়ই অবলম্বন করা হয়। এই সকল সঙ্গীতেও কোন উচ্চাঙ্গ কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ পায় না।

ব্যবহারিক সঙ্গীতের মধ্যে বিবাহ-সঙ্গীতই সর্বোৎকৃষ্ট। বিবাহের আচার বিস্তৃত ও জটিল। ইহাই সামাজিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ইহা কেবল একটি ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র নহে, বিশেষ কোন পরিবারে ইহার অনুষ্ঠান হইলেও ইহার সম্বন্ধে লোক-সমাজ সমগ্র ভাবে সচেতন হইয়া থাকে, ইহার বিভিন্ন আচারে লোক-সমাজভুক্ত ব্যষ্টি মাত্রই অংশ গ্রহণ করে। নাগরিক জীবনে বিবাহ ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু পল্লীজীবনে ইহা বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান। সেইজন্য লোক-সমাজের মধ্যবর্তী বিশিষ্ট কোন পরিবারের বিবাহোৎসবে সমগ্র সমাজই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বাংলার প্রতিবেশী উপজাতিসমূহের পল্লীতে এই বিবাহানুষ্ঠানের দলগত (communal) পরিচয় অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়।

বাংলার হিন্দুর বিবাহাচারের দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ—একটি বৈদিক ও আর একটি লৌকিক। এ'দেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে একটি আর একটিকে

সম্পূর্ণ গ্রাস না করিয়া উভয়েই সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বৈদিক আঁচারের মধ্যে যেমন পুরোহিতের স্থান, লৌকিক আচারের মধ্যেও তেমনই নারীর স্থান। সেইজন্য লৌকিক আচার স্ত্রী-আচার নামে পরিচিত। বৈদিক মন্ত্র দ্বারা যেমন বৈদিক আচার পালন করা হয়, তেমনই বাংলা গীত গাহিয়া লৌকিক আচারগুলি নিষ্পন্ন করা হয়। মেয়েলী গীতই স্ত্রী-আচারের মন্ত্রস্বরূপ। বিবাহের প্রস্তাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যেক স্ত্রী-আচারেই বিষয়ানুরূপ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। আদিম জাতির বিবাহ কেবল মাত্র স্ত্রী-আচার দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, পুরুষের তাহাতে বিশেষ কোন স্থান নাই। বাংলার সমাজেও ব্রাহ্মণ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে স্ত্রী-আচারই বিবাহের একমাত্র আচার ছিল, সেইজন্য আজ পর্যন্তও ইহা এত শক্তিশালী।

আনুষ্ঠানিক ভাবে নদী কিংবা পুকুরঘাট হইতে জল ভরিয়া আনিয়া বর কিংবা কনেকে স্নান করাইবার জন্য যে মেয়েলী সঙ্গীত গীত হয়, তাহা জলভরা কিংবা জল সইবার গীত নামে পরিচিত। এই উপলক্ষ্যে এই গীতটি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই সুপরিচিত—

চল, সখি, যমুনায়,
বাঁশী ডাকে—আয় আয়,
দিনমণি অস্ত চলে যায়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পূর্বে বলিয়াছি যে, রাম-সীতার প্রসঙ্গই বাংলার মেয়েলী বিবাহ-সঙ্গীতের উপজীব্য। কেবল বাংলা দেশের নহে, উত্তর ভারতের সর্বত্র উচ্চতর হিন্দুসমাজে বিবাহোপলক্ষ্যে যে মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদেরও উপজীব্য রাম-সীতারই বিবাহ-প্রসঙ্গ। কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত অংশে যমুনার উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এখানে রাম-সীতার বিবাহ-প্রসঙ্গের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-প্রসঙ্গই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ'কথা সত্য নহে—রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ বাংলার বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যে স্থান পায় নাই। তবে বাংলার লোক-সঙ্গীতে যত নদীর উল্লেখ করা হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকেরই নাম যমুনা—বাংলার লোক-মানসে (folk mind) যমুনা ছাড়া নদী নাই, এমন কি, গঙ্গা-ভাগীরথীও সেখানে অজ্ঞাত। এই যমুনার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্য দিয়া যত উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শই স্থাপিত হউক না কেন, ইহা গার্হস্থ্য কিংবা পারিবারিক জীবনের আদর্শের বিরোধী। বিবাহ পারিবারিক জীবনের একটি বাস্তব সংস্কার, সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের আধ্যাত্মিক আদর্শ ইহার উপর আপন সমুচ্চ মহিমা বিস্তার করিতে ব্যর্থকাম হইয়াছে। অতএব রামায়ণ-বন্দিত চরিত্র রাম-সীতাই ইহার উপজীব্য হইয়াছে। যেমন, বরের বিবাহ-সজ্জা উপলক্ষ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

জোগা রে মঙ্গল ধ্বনি,
আইস, আইস, ওরে বাছা নীলমণি।
ঘরের থনে জিজ্ঞাসেন মায়ে—
'কি কি শোভে আমার রামের গায়ে?'
'হস্তে শোভে হস্তজ্যোতি,
গলায় শোভে রামের গজমোতি।'
'রৌদ্রে ঘাইমাছে বাছা,
ক্ষুধায় ঘাইমাছে বাছা,
কি চন্দ্রবদন ওগো রামের মা।'
'কই গেলা রামের দাসী।
গাম্‌ছা আন রামের বদন মুছি।'
অঞ্চলে বান্ধিয়া কড়ি।
যান ওগো রামের মা বাইণ্যা বাড়ী।
'হাদেরে বাইণ্যা ছেইলা,
কত লইবা রে তোমার সিন্দুর তোলা?'
'আমার সিন্দূরের মূল্য, সোনার পাঁচ কড়া;
ওগো রামের মা।'

অতএব এই রাম যেমন অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র নহেন, তাঁহার জননীও কোশল-রাজকন্যা কৌশল্যা নহেন। এখানে রামের জননী গামছা দিয়া পুত্রের গায়ের ঘাম মুছিয়া দিতেছেন, আঁচলে কড়ি বাঁধিয়া লইয়া বেণের বাড়ী হইতে তাহার বর-সজ্জার জন্য নিজেই সিন্দুর কিনিয়া আনিতে যাইতেছেন। এই বাঙ্গালী রামই বাংলার বিবাহ-সঙ্গীতের নায়ক।

বিবাহের আর একটি স্ত্রী-আচার বর-কন্যার পাশাখেলা। এই উপলক্ষ্যে পূর্ব মৈমনসিংহে এই মেয়েলী গীতটি শুনিতে পাওয়া যায়—

সুখ-বসন্তের কথা গো শুন সখীগণ।
রতন-মন্দিরে বসি গো কৌশল্যা-নন্দন॥
উপরে চান্দোয়া টাঙ্গায় গো নীচে শীতল পাটি।
রামসীতা বসিলেন গো হাতে পাশার কাটি॥
আবের পাখায় বাতাস গো করে সখীগণ।
কৌতুকে করেন রাম গো প্রেম-আলাপন॥
গুয়া পান খায় কেহ গো হাসে খলখলি।
চান্দে রে ঘেরিয়া যেন গো তাহার মণ্ডলী॥
সুবর্ণের গুটিতে গো ঘর সাজাইয়া।
রামচন্দ্র খেলে পাশা গো সীতারে লইয়া॥
লক্ষ্মীর সহিত পাশা গো খেলে নারায়ণে।
ইন্দ্র যেন খেলে পাশা গো শচীরাণী সনে॥
মদনের সহিত পাশা গো খেলে যেন রতি।
হরের সহিত কিংবা গো খেলায় পার্বতী॥

বিবাহের স্ত্রী-আচার সম্পর্কিত এই পাশাখেলায় সীতা সর্বদা জয় লাভ করিয়া থাকেন, রাম সর্বদাই পরাজিত হ'ন। এই উপলক্ষ্যে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়,—

ছি, ছি, ছি,
লাজে মরি,
শ্রীরাম হারিল খেলায়,
জিত্‌ল জানকী।

কন্যা-বিদায় বাঙ্গালী গৃহস্থ-পরিবারের বিজয়া, বিবাহোৎসবের ইহাই করুণতম অংশ। ইহা অবলম্বন করিয়াই সর্বোৎকৃষ্ট বিবাহ-সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে। উৎসব শেষ হইতে না হইতেই কন্যার গৃহে বিদায়ের শানাই করুণ স্বরে বাজিতে আরম্ভ করে—মাতাপিতা ও ভাই-ভগিনীদের হৃদয়-বেদনা তাহার ভিতর দিয়া যেমন ব্যক্ত হয়, পল্লীরমণীদের সুধাকণ্ঠ নিঃসৃত করুণ

সঙ্গীতের ভিতর দিয়াও তাহা তেমনই ব্যক্ত হইতে থাকে। তাহারা গায়,

আগে যদি জানতাম রে ময়না,
তোরে নিবে পরে, রে সুন্দর ময়নামতি রে।
পাটার চন্দন পাটায় না থুইয়া,
তোরে লইতাম কোলে, লো সুন্দর ময়নামতি রে॥

সহস্র গৃহকর্মের মধ্যে মাতা যে তাঁহার কন্যাকে এতদিন যত্ন-সমাদর করিতে পারেন নাই, তাহাকে বিদায় দিবার মুহূর্তে সে কথাই আজ তাঁহার বার বার মনে হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে। কিন্তু তখন কে জানিত যে, যে-সন্তান তাঁহার নাড়ী ছিঁড়িয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অন্যে এমন ভাবে একদিন আসিয়া লইয়া যাইবে—

আধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি,
আধেক গাঙ্গে বিয়া, রে সুন্দর ময়নামতি রে।
ময়নারে যে নিয়া গেল
চিলের ছোঁও দিয়া, রে সুন্দর ময়নামতি রে॥

একটি পরিবার আজ নববধূকে বরণ করিয়া লইবার আনন্দে পরিপূর্ণ, আর একটি পরিবার কন্যাকে বিদায় দিবার ব্যথায় কাতর। সুখে দুঃখে যে ছোট মেয়েটি এতকাল মা'র চারিপাশ ঘিরিয়া থাকিত, তাহাকে কে কোথা হইতে আসিয়া যেন ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মাতাপিতার মনে এই বেদনার অনুভূতি কি তীব্র হইয়া বাজিয়াছে—

ময়নার বাপে কান্দন কান্দে চালের বাতা ছোটে,
ময়নার মায়ে কান্দন কান্দে গাছের পাতা ঝরে লো,
সুন্দর ময়নামতি লো।

ঘরের খড়ো চাল খসিয়া পড়িতেছে, পিতার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কন্যার ব্যথায় তাঁহার হৃদয় অভিভূত; জননীর ক্রন্দন শুনিয়া যেন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে। কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি বাংলার গৃহ-প্রাঙ্গণে এই ভাবে অভিনীত হয়।

পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের মুসলমান সমাজেও বিবাহোপলক্ষ্যে অনুরূপ মেয়েলী সঙ্গীত প্রচলিত আছে। তবে ইহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই রামসীতা কিংবা রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না; অতএব ইহাদের মানবিকতার

আবেদন আরও প্রত্যক্ষ। উত্তর বঙ্গের মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ-সঙ্গীতের এখানে কিছু নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে।

পাত্র এবং পাত্রীর বিবাহ স্থির হওয়া হইতে শেষ পর্যন্ত উত্তর বাংলার মুসলমান সমাজে নানা প্রকার গীত প্রচলিত আছে। স্থান ও পরিবার ভেদে তাহার তারতম্যও যথেষ্ট। বরের স্নানের পূর্বে গীত শুনিতে পাওয়া যায়,

ছাওয়াল দামান্ হারে গো ধুইবে রঙে!
আল্লারে, কেউ নাই তার সংগে।
দামানের মাও উইঠ্যা বলে
বাপ. ধন্‌রে আমি আছি তোমার সংগে॥

স্নান হইলে জলের দরকার—যিনি এয়ো তিনিই জল আনিতে পারেন—

এসো রাই, আমরা জল ভরিতে যাই,
ভরণ ভরা হইলে আমরা বাড়ীতে লয়্যা যাই।
এসো রাই, আমরা দোলা সাজাতে যাই।
দোলা সাজান হ'লে আমরা ন'শার ঘরে যাই॥

এখানে 'নওশা' অর্থাৎ বর—'তুলহিন' অথবা কন্যাও অবস্থাভেদে বলা হয়। 'নওশা'র বিবাহ সম্পন্ন হইবে। এইবার ক্ষীর খাইবার পালা। কিছুক্ষণ পরেই পাত্র রওনা হইবে—

তুধে ফলে রেন্ধেছি ক্ষীর
খাও খাওরে বাছা,
মায়ের হাতের ক্ষীর খাও বাছা।

শেষের পদটি সমস্বরে সকল মেয়েরা মিলিয়া গাহিবে। এইবার যাত্রার আয়োজন হইতেছে—

ভার সাজে বৈরাতী সাজে, সাজে মিঠাইর ভার
রে দামান যায়, সোনার চান্ যায়।
আধেক পথে যাইতেরে দামান
মিঠাই না বিলায়।
আত্‌রাই গাঁয়ের মিঞারা সব
হাত পাতিয়া লেয়॥

ইহাতে বরপক্ষের ধনদৌলতের পরিচয় প্রকাশ পাইল।

বর আসিয়া পৌছিল—

দামান আইল সোনার পিরহান পরিয়া রে।
দামান আইল সোনার সড়ক ধরিয়ারে ॥
যাইতে যাইতে নজর পইল বাণিয়ার দোকানেরে।
দে রে ভাইরে ভালো দেইখে স্বরমা রে।
আমি যাবো সাজাদীর মহলে রে ॥
বাজে বাজে ঢোল নহবৎ বাদ্য রে।
বাজে নূপুর উমুর ঝুমুর রে ॥

এয়োরা একটু ঠাট্টা করিয়া লয়—

নয়া দামান বাজায় হারমন লিচুফল গাছে।
বাবারা আন্যাছে দৈয়ের ভারমণ
গলিতে রাখ্যাছে!
উছট্ লাগিয়া দৈয়ের ভারমণ
পড়িয়া গিয়াছে ॥

কোন কোন স্থানে বিবাহের রাত্রে এয়োগণ বাসর জাগিয়া গায়—

আজ আমরা বাসর বঞ্চিব।
যদি বাসর বঞ্চ হে বিবি—নাকের মানান নোলক রে
আজ আমরা…॥
যদি বাসর বঞ্চ হে বিবি—কানের মানান ঝুম্কারে
আজ আমরা…॥

ইত্যাদি প্রতিটি অলঙ্কারের নাম করিতে হইবে।

বিবাহ হইলে পুত্রকন্যা হইবেই। কাজেই সব এয়ো মিলিয়া কন্যাকে একটু ঠাট্টা করিয়া লয়, কাপড় দিয়া একটি পুতুলও তৈরী করা হয়—

ছাওয়াল কান্দে রে।
চাচীর কোলে যাইতে ছাওয়াল
চল্ বল্ চল্ বল্ করে রে
খল্ বল্ খল্ বল্ করে রে ॥

বাড়ীর বৃদ্ধা পিতামহী অথবা মাতামহী এ'সব ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন—বলেন নাচ হউক—

খৈ খৈ করিয়া মরি খৈ কেন মিলে না,
নাচো ওহে নাচনাওয়ালী মাঙ্গা কেন হেলে না ?
মাঙ্গা কেন হেলে না ওলো পাও কেন পড়ে না ?

এই গানগুলির মধ্যে অনেক গানে বহু পুরাতন যুগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেদিন ঘরে ঘরে চরকার ব্যবহার ছিল। স্বামী দূরদেশে বাণিজ্যে গিয়া স্ত্রীর জন্য একটি চরকা আনিয়াছে—

স্বামী— কেমন চরকা আন্যাছি দেখো রাণী ;
কেমন চরকা দেখোসে আন্যাছি।
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর—
আমার বাপের সাত মহলা ঘর—
উওতো চরকায় আমি সুতা কাট্যাছি ॥
স্বামী— যদি সুতা কাট্যাছ রাণী,
আন সুতা দেখিরে আমি।
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর,
আমার চাচার পাঁচ মহলা ঘর—
উওতো সুতায় আমি কাপড় বুন্যাছি।
স্বামী— যদি কাপড় বুন্যাছ রাণী,
আনো কাপড় দেখি রে আমি।
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর,
আমার ভা'য়ের তিন মহলা ঘর,
উওতো কাপড় আমি ছিড়্যা ফেল্যাছি।
স্বামী— যদি কাপড় ছিড়্যাছ রাণী,
আনো তেনা দেখি রে আমি।
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর,
আমার ভা'য়ের চার মহলা ঘর,
উওতো তেনায় আমি কাঁথা সিঁয়্যাছি ॥

স্বামী— যদি কঁ্যাথা সিঁয়্যাছ রাণী,
আনো কঁ্যাথা দেখি রে আমি।
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর,
উওতো কঁ্যাথা আমি বেচ্যা ফেল্যাছি।
স্বামী— যদি কঁ্যাথা বেচ্যাছ রাণী,
আনো পওসা দেখি রে আমি।
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর,
উওতো পয়সায় আমি পান কিন্যাছি।
স্বামী— যদি পান কিন্যাছ রাণী,
আনো পান দেখি রে আমি।
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর,
উওতো পান আমি খায়্যাছি।
স্বামী— যদি পান খায়্যাছ রাণী,
হাসো দেখি সোনার বরণী ॥
স্ত্রী— ও ভিন্ দেশী সওদাগর,
ওই না হাসি দিয়ারে আমার ঠোঁট না রাঙাইছি ॥

গীতটি আরও নানা রকমে পাওয়া যায়।

উভয়ের সুখের সংসার জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বসিয়া খাইলে রাজার দৌলতও ফুরাইয়া যায়। কাজেই স্বামীকে বাণিজ্যে যাইতে হইতেছে—

কাঁচা ডালিম কুচুর মচুর, নাগর, পাকা ডালিমে রস--
নাগর কি দোষে ছাড়িয়া যাও।
তুমি যাইছো দূরের বাণিজ্যে নাগর—
নাগর, রুমাল রাখ্যা যাও।
তোমার কথা মনে হইলে নাগর
নাগর, রুমাল তুল্যা লিব হাতে ॥

বিদায়ের রাত্রি প্রভাত হইল—

রাজার বেটা সোয়ামীরে তুমি
বাণিজ্যেতে যাও।

একটু খানিক দাঁড়াওরে প্রাণ একটুখানি দাঁড়াও
নাগর—পান খায়্যা যাও।
কিবা ফরমাস করবোরে প্রাণ
শ্বশুর আছে ঘরে।
শ্বশুরের জন্য দস্তার বাঁধা হুকা আন্য রে।
বুড়া শাশুড়ীর জন্য আন্য রে চরকা আর চরকী।
ছয় জায়ের জন্য আন্য রে সোয়ামী, ছয় জোড়া বোলাকী।
আরে ছয় জোড়া চুলের জড়ি—
আমার জন্য আন্যরে সোয়ামী
জড়ি পাড়ের শাড়ী॥

উত্তর বঙ্গের অজস্র বিবাহের গীতে হিন্দু বিবাহ-সঙ্গীতের প্রভাব বিদ্যমান।[১] নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি চট্টগ্রাম জিলার মুসলমান সমাজ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; আনুষ্ঠানিক ভাবে বরের ক্ষৌরকর্মের সময় ইহা গীত হয়—

সোনার নাপিতা রে,
আঁয়ার অ বাড়ী যাইবা,
সোনার নরইং রূপার বাটি
সাঙ্গি করি নিবা;
ও সোনার নাপিতা রে,
ভালা করি কামা নাপিত,
বাপের দুর্লভ পুত রে।
চিকণ করি কামা নাপিত
সুন্দর তুলি কামা নাপিত,
মায়ের দুর্লভ পুত রে।[২]

মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজের মতই প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-আচারই পালন করা হয় এবং প্রত্যেক আচার সম্পর্কেই মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

---

১ গানগুলি মৌলভি আসরাফ সিদ্দিকি কর্তৃক উত্তর বাংলার রাজসাহী হইতে সংগৃহীত।

২ মাসিক মোহম্মদী, আষাঢ়, ১৩৪২, পৃঃ ৬৪৭

কোনও কোনও অঞ্চলে বর কণের পাশা খেলাও প্রচলিত আছে; ফরিদপুর জিলা হইতে সংগৃহীত পাশাখেলার একটি গান এই প্রকার—

গাঙ্গের কোলে ভাঙ্গের গাছটি,
ও ভানু লো, চিরল চিরল পাতা না রে।
তারির না তলে তারির না তলে
ও ভানু লো, খেলায় রঙ্গের পাশা না রে।
পাশা না খেলিতে পাশার বুঝান বুঝাইতে
ও ভানু লো ঘুমে কাতর হৈল না রে।

উদ্ধৃত গীতিগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যে যেখানে রাম-সীতার উল্লেখ আছে, সেখানেই রচনা কতকটা কৃত্রিম ও নিস্প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের মেয়েলী সঙ্গীতগুলির সম্মুখে এই বিষয়ে কোন আদর্শ নাই বলিয়া ইহাদের মধ্যে মানবিকতাবোধের স্বাধীন বিকাশ অনুভূত হয়; অতএব লোক-সঙ্গীত হিসাবে ইহারা অধিকতর সার্থক। মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরও একটি মেয়েলী বাসর-সঙ্গীত এই—

দেশাল সিন্দুর চায় না রে ময়না,
আবেরি ময়না ঢাকাই সিন্দূর চায়।
ঢাকাই সিন্দূর পরিয়া ময়নার গরমি ছোটে গায়।

বাসরের বধূ—সে নবনীর মত কোমল, দেশী সিঁদূর সে পরিতে পারে না; ঢাকাই সিঁদূর তাহার পরিবার সাধ; কিন্তু ঢাকাই সিঁদূর পরিয়াও তাহার গায়ের গরম কাটে না।

দেশাল শাড়ী চায় না রে ময়না,
আবেরি ময়না ঢাকাই শাড়ী চায়।
ঢাকাই শাড়ী পরিয়া ময়নার গরমি লাগে গায়।

ঢাকাই শাড়ী পরিয়াও বধূটির গরম কাটিতে চাহে না; নিরুপায় হইয়া স্বামী নিজেই তখন,

ডান হাতে আবের পাঙ্খা,
বাম হস্তে শ্যামলা গামছা
আরে দামান ঢুলায় বালীর গায়।

বর-বধূর প্রথম আলাপনের লজ্জা-মধুর চিত্রটিও বাসর-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই ভাবে প্রকাশ পায়—

'তোমার সিন্তার উপর কিবা সাপ দোলে আ লো বিবি ?'
'ওতো সাপ নহে, বেশরে ঝিলিক মারে আ রে সাধু।'
'তোমার নাকের উপর কিসির সাপ দোলে ?'
'ওতো সাপ নহে, আমার বেশরে ঝিলিক মারে আ রে সাধু।'
'তোমার গায়ের উপর কিসির সাপ দোলে আ লো বিবি ?'
'ওতো সাপ নহে, আমার শাড়ীতে ঝলক মারে আ রে সাধু।'

কন্যা-বিদায়ের গানগুলিও করুণ রসের আকর। বর পালকি করিয়া বধূকে লইয়া দেশে চলিয়াছে, পাল্‌কির ভিতর বধূর কান্নার আর বিরাম নাই। তাহার প্রতি সহানুভূতিতে বরের হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে স্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

'বাও নাইকা বাতাস নাইকা আমার পাল্‌কির পরদা উড়ে রে।
আমার পাল্‌কির পরদা ঘুচাইয়া আমার বিবি কেন কান্দে রে।
তুমি কিরে দুক্ষে কান্দ, আ লো বিবি, তাই বল আমি শুনি।'
'বাবাজানের বাঙ্গেলায় খেল্‌তাম হা রে সাধু, ছোট ভাইবোন লয়া।
মিঞা ভাইর বাঙ্গেলায় খেল্‌ছি, হা রে, পাশা ভাইবৌরে লইয়া।
মামুজানের বাঙ্গেলায় রইছে; হা রে সাধু, আমার দুপুইরা ফুলের সাজি,
আমি তারির লাগ্যা কান্দি, হা রে সাধু, আমার ঝরে চউখের পানী।'

পূর্ব ইউরোপের কোন কোন দেশে পতিগৃহ-যাত্রাকালে কন্যা নিজেই একক বিদায়-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, এই রীতি ভারতবর্ষের উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চল এবং ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। বাংলা দেশের কোনও অঞ্চল হইতে এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের আজও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সঙ্গীতগুলি নানাদিক হইতে বিশেষত্বপূর্ণ, ইহাদের করুণ আবেদনটি সুগভীর মানবিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। উড়িষ্যার কটক জিলা হইতে সংগৃহীত একটি মাত্র সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা হইল, সঙ্গীতগুলি বাংলা না হইলেও যে কেবল এক সর্বজনীন অনুভূতির অভিব্যক্তিতে সার্থক, তাহাই নহে—ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী বধূর বিশিষ্ট হৃদয়-বেদনাটিই যেন সুস্পষ্ট

হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহ যাত্রা কালে কন্যা নিজে একাকিনী সুর করিয়া গায়—

বাপা, মুঁত গোড়কু ফাসি হাতর শাঙ্কুলি।
বেকর মালি ত মু হোইথিলি হো বাপা॥
এবে গোড়র ফাসি হাতর শাঙ্কুলি।
বেকর মালি খোলি নিশ্চিন্ত হব হো॥

পথরর বোঝ মুঁ হোইথিলি।
এবে ত পথরর বোঝ ওহলাই হব হো অচিন্তা॥
মোর যোগে ত রাতিরে নিদ
দিনরে ভোক শোষ কমু ন থিলা হো বাপা।
খাইবা ভাত ত অমৃত পরি লাগিব হো বাপা।
অচিন্তা নিদ ত মাড়ি আসিব হো বাপা॥

বাবা, আমি তোমার পায়ের বেড়ি, হাতের শিকল হইয়াছিলাম; এখন পায়ের বেড়ি, হাতের শিকল খুলিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। আমি তোমার পাথরের বোঝা হইয়াছিলাম, পাথরের বোঝা নামিয়াছে, এখন নিশ্চিন্ত হইও। আমার জন্য ত তোমাব রাত্রির নিদ্রা, দিনের ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছিল। এখন ভাত অমৃতের স্বাদ লাগিবে, নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইবে।

অভিমানাহত বালিকার বেদনা এক দিক দিয়া সমাজ ও অপর দিক দিয়া পিতৃহৃদয়ের পরিচয়টি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

বিবাহ-সঙ্গীতের পরই শোক-সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইংরেজিতে ইহাকেই funeral song বলে। আদিবাসী অঞ্চলে শোক-সঙ্গীতও মেয়েলী সঙ্গীত, কিন্তু বাংলাদেশে শোক-সঙ্গীত পুরুষ কর্তৃকই গীত হয়। শবযাত্রায় এই গানটি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়—

হারাইলাম দুকূল, এ'কূল আর ও'কূল,
কবে ফুটিবে আমার বিয়ার ফুল।
যাব চলন করি বাঁশের দোলায় চড়ি,
জাত-বেহারীর স্কন্ধে চড়ি, সকল হ'বে ভুল॥

আগে পাছে কাষ্ঠের বোঝা,
ছাইড়া দিয়া ভবের মজা,
শ্বশুর বাড়ী হবে রে তোর নদীর কূল ॥
গেলে শ্বশুর বাড়ী, সবে ত্বরা করি
স্নান করাবে মোরে করি গণ্ডগোল।
বরণ কুলাতে দিবে বর-শয্যায় শোয়াইবে
আট কড়া কড়ি দিবে তুলসীর মূল ॥

জননীর গর্ভে আশ্রয় লইবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানে চিতা-শয্যায় শয়ন করা পর্যন্ত মানব-জীবনের যে বিভিন্ন সংস্কার পালন করা হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটি অবলম্বন করিয়াই এই প্রকার লোক-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে আশা, আনন্দ ও দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি ইহাদের ভিতর দিয়া এই ভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

কতকগুলি লোক-সঙ্গীত পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মিটাইয়া থাকে, তাহা ব্যবসায়ীর সঙ্গীত; ইংরেজিতে ইহাকেই Professional Song বলে। ইহাদিগকে বাংলায় ব্যবসায়ী সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু ব্যবহারিক সঙ্গীত বলিয়া আমি বাংলা লোক-সঙ্গীতের যে বিভাগ নির্দেশ করিয়াছি, তাহাতে ইহারও কোন কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, আমি ইহা ব্যবহারিক সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহি। অন্যান্য ব্যবহারিক সঙ্গীতের মত ইহাও গাহিবার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই, প্রয়োজনানুসারে যখন ইচ্ছা তখনই গীত হইতে পারে। তবে ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশেষ কোন কোন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ইহা যুক্ত থাকে; জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ইহা প্রচার লাভ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদের গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ী বেদেরা সাপের খেলা দেখাইবার সময় টানিয়া টানিয়া সুর করিয়া এই গান গাহে। পশ্চিম বঙ্গে বেদেনীরা কোন কোন স্থানে গানের সঙ্গে নৃত্যও যোগ করিয়া থাকে। ইহাতে ধারাবাহিক কোন কাহিনী বর্ণিত হয় না, কেবল মাত্র বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর করুণতম

অংশটুকু বিচ্ছিন্ন শোক-গীতির মত সুর করিয়া গীত হয়। পূর্ববঙ্গের বেদেনীর গানের একটি অংশ এই প্রকার—

আরে—একে যে মরি গো বিষের জ্বালায়
আরও যে অপমান রে।
বিয়ার রাইতে যে হইলা গো রাঁড়ী
বেহুলা সুন্দরী রে॥

পশ্চিম বঙ্গের বিষ বেদেনীর কণ্ঠেও শুনিতে পাওয়া যায়—

উর্‌র্‌—হায় হায় লাজে মরি!
আমার মরণ কেনে হয় না হরি!
আমার পতির মরণ সাপের বিষে,
আমার মরণ কিসে গ!
মদন পোড়া চিতের ছাইয়ের
কে দেবে হায় দিশে গ!
রঙ্গ মেখ্যা সেই পোড়া ছাই,
ধৈরয মুই ধরি গ, ধৈরয মুই ধরি গ।[১]

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে বীরভূমের কয়েকটি বেদের গান সংগৃহীত আছে।

আনুষ্ঠানিক

বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক উৎসব ও পার্বণাদি উপলক্ষে যে লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহাই আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। ইহা বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বিস্তৃত—তবে কোন কোন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হইলেও ইহাদের সম্পর্কিত অনুষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রচলিত আছে। ইংরেজিতে ইহাদিগকেই calendric song অথবা ritual song বলা হয়।

এই সম্পর্কে প্রথমেই গাজনের গানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গাজন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত; যেমন নীলপূজা, শিবের গাজন, আতের গম্ভীরা, ধর্মের গাজন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যে সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ হইলেও, ইহাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাধারণতঃ চৈত্র সংক্রান্তির শেষ তিন দিন শিবের গাজন ও বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে ইহার এই নির্দিষ্ট তারিখের কিছু ব্যতিক্রমও হয়। যেমন, বৈশাখ সংক্রান্তির দিন বাঁকুড়া জিলার ছাতনা গ্রামের কামারকুলির শিবের গাজন ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে উক্ত জিলারই বেলেতোড় গ্রামের ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

পূর্ববঙ্গের নীলপূজা উপলক্ষে শিবের বিবাহ, পার্বতীর শাঁখা-পরিধান, হরপার্বতীর বিবাদ, গঙ্গা-পার্বতীর বিবাদ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গ হর-পার্বতী প্রসঙ্গের পূর্ববর্তী; কিন্তু অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিগণ সতী ও পার্বতীর চরিত্র একাকার করিয়া লইয়াছে। এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে কোন উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশ পায় না; ইহারা আখ্যানমূলক রচনা, কোন মতে বৈচিত্র্যহীন কাহিনীটি একটানা স্রোতে বর্ণনা করা হয় মাত্র। অনেক সময় রচনার ভিতর

দিয়া স্থূল গ্রাম্যতাও প্রকাশ পায়। নীলপূজা উপলক্ষ্যে রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ স্থান লাভ করিতে পারে নাই—তবে কোন কোন অঞ্চলে বিষ্ণুর দশাবতারের বর্ণনাটি শুনিতে পাওয়া যায়।

উত্তর বঙ্গ, বিশেষতঃ মালদহ জিলায়, নীলপূজা আদ্যের গম্ভীরা নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন লৌকিক প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়, প্রকৃত শিব-প্রসঙ্গ ইহার সামান্য অংশই অধিকার করে মাত্র। ইহাতে যে পৃথিবীর জন্মকথাটি গীত হয়, তাহা এই প্রকার—

না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল।
কোনরূপে ছিল ধর্ম হয়ে শূন্যাকার॥
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে।
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ॥
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ॥
কূর্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহন ত গুরু গোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্মকথা কহি সভার ভিতরে॥

ইহাতে শিব-পূজার বিভিন্ন উপকরণের উৎপত্তি বর্ণনা ও তাহাদের বন্দনা-গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলের গাজন শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন উভয় নামেই পরিচিত। ইহার সঙ্গীতের ভিতর দিয়া শিব ও ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। শিবের যোগনিদ্রাভঙ্গের প্রসঙ্গটি এই প্রকার—

প্রভু, যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে।
কার্তিক গণেশ কোলে শয়নে আছে নিদ্রাভোলে
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে॥
নিদ্রা ত্যজ দেবরাজ বসহ খট্টার মাঝ
নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে।
প্রভু, তুমি দেব অধিপতি হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি
অন্য দেব কোনখানে লাগে॥

বীরভূম জিলার ভাঁজো সঙ্গীত আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অন্তর্গত। ইহা বয়স্ক মেয়েদের নৃত্যসম্বলিত গীত। ইহা বাংলার অন্যত্র প্রচলিত নাই, তবে ইহা মেয়েলী কৃষি-ব্রতেরই অঙ্গ-স্বরূপ। ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমীর পর যে দ্বাদশী হয়, তাহা ইন্দ্রদ্বাদশী নামে পরিচিত। সেইদিনই ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কুমারী মেয়েরা গ্রামের সন্নিহিত কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে দল বাঁধিয়া ভাঁজো-ব্রতের জন্য বালি আনিতে যায়। গ্রামান্তরের মেয়েরাও সেই স্থানে বালি লইবার জন্য সমবেত হয়। উভয় দলের মধ্যে তখন নৃত্যসম্বলিত গীতির লড়াই হয়,

কাক কাল কোকিল কাল আর কাল ফিঙে।
তার চেয়ে অধিক কাল বলরামের শিঙে॥
শুষুণীর শাক তুল্‌তে গেলাম শাকে ধরেছে পোকা।
খেঁকশেয়ালীর খেঁক শুনে, বোন, ফেলে এলাম টোকা॥
এই পথে যেও, ভাঁজো, এই পথে যেও।
বেনা বনে কড়ি আছে ভাগ ক'রে নিও॥
ভাঁজোর শোলোক বলব কি, ভাই, জোয়ায় নাক কথা।
কাল গিয়েছে জ্বরের পালা আজ ধরেছে মাথা॥

মধ্যভারতের উপজাতীয় বালিকাদিগের মধ্যে ভাজলি নামক এক উৎসব প্রচলিত আছে, তাহাও ভাদ্রমাসেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভাঁজো উৎসবেরই অনেকটা অনুরূপ। ইহাতে যে মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও ভাঁজো গীতির মতই ভাব ও চিত্রগত অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ; যেমন,

In the river my tangana fish is quivering
It will not let me draw water,
Let go, let go, O tangana fish, my cloth
For in my house my father-in-law is sick,[১]

ভাঁজো ও ভাজলি উৎসবের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, বাংলার উমা-সঙ্গীত লোক-সঙ্গীতেরই অন্তর্গত; কারণ, ইহার আধ্যাত্মিক আবেদন অপেক্ষা মানবিক আবেদনই অধিকতর সার্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। উমা-সঙ্গীতগুলি গাহিবার নির্দিষ্ট

---

১ Elwin & Hivale, *Folk-Songs af Maikal Hills*, op, cit., p 331.

সময় আছে—শারদীয় উৎসব সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই ইহারা গীত হয়, সেইজন্য ইহাদিগকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মধ্যেই আলোচনা করিতে হয়।

গার্হস্থ্য জীবনই উমা-সঙ্গীতের উপজীব্য। ইহাদের মধ্যে উমা, মেনকা, শিব, হিমালয় প্রভৃতির নাম আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের পৌরাণিক কোন পরিচয় নাই। বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বাস্তব আনন্দ ও বেদনাবোধ ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারিঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামিগৃহে ফিরিয়া যায়, তখন সমস্ত বাংলা দেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।'[১]

একদিন অশ্রুমুখী গিরিরাণী স্বামীর নিকট গিয়া বলিলেন,

আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ-বচনে
উমা মা মা বলে কেঁদেছে।

শুনিয়া জননীর হৃদয় কি করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এই অশান্ত হৃদয় লইয়া তোমার পাষাণ-প্রাসাদে আমার চক্ষে মুহূর্তের জন্যও নিদ্রা নাই, আজ শরৎ-প্রত্যূষে তাহাকে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি,—

ওহে গিরি রাজন্।
শীঘ্র গিয়ে আন প্রাণের উমাধন॥
শুনিয়ে নারদের মুখে হে উমা মায়ের বিবরণ।
(আমি) ধৈরয ধরিতে নারি মন হ'য়েছে উচাটন॥
অন্নাভাবে শীর্ণ তনু হে, পরণে জীর্ণ বসন।
তৈল বিনে ছাই মাখে গায়, করে না বেণী বন্ধন॥
ভিক্ষা ক'রে বেড়ায় সদা হে, জামাতা সে ত্রিলোচন।
কত দুঃখে কৈলাসেতে করছে উমা কালযাপন॥
আছে দু'জন ভুখা ছেলে হে, গজানন আর ষড়ানন।
(তারা) চাইলে খেতে পায় না দিতে, রয় না কোন আয়োজন॥
তাহে আবার ভূতের বেগার হে, খেটে খেটে যায় জীবন।
গৌরী যে রাজার কুমারী, তার প্রাণে কি সয় এমন॥

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ (১৩৪৭), পৃঃ ৬৪৮

বালিকা কন্যা দীর্ঘকাল ব্যবধানে পিতাকে সম্মুখে পাইয়াও মা'র কুশল বার্তা জানিবার জন্য অধিকতর ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে—

কহ বাবা নিশ্চয়, আর কবে পাছে।
সত্য করি বল আমার মা কেমন আছে॥

জননীর মনেও সর্বদা আশঙ্কা, দরিদ্র স্বামীর গৃহে কন্যার দিনগুলি কি দুঃখেই না কাটিয়াছে। সেইজন্য প্রথম দর্শনেই জননী তাহাকে এই প্রশ্নই করিতেছেন,

গিরিরাণী কন বাণী চুমো দিয়ে মুখে।
কও, তারিণী, জামাই-ঘরে ছিলে কেমন সুখে॥

কিন্তু মিলনের এই আনন্দ কয় দিন? দেখিতে দেখিতে তাহা ফুরাইয়া গেল। বিজয়ার দিন শিব উমাকে লইয়া যাইবার জন্য মেনকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাতৃস্নেহ বিদ্রোহ করিয়া উঠিল; কিন্তু সমাজ-শাসনের নিকট মাতৃস্নেহ পরাজয় স্বীকার করিল—নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া কন্যাকে পুনরায় দরিদ্র জামাতার করে তুলিয়া দিতে হইল। জননীর হৃদয় ইহাতে কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না—

তনয়া পরের ধন বুঝিয়া না বুঝে মন
হায়, হায়, একি বিড়ম্বন বিধাতার।

বিজয়া-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া রিক্তা জননীর এই চিরন্তন হাহাকার ধ্বনিত হইয়াছে। এই গুণেই ইহাদের সাহিত্যিক আবেদন সার্থক।

উমা-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া যেমন বাংলার জননী ও কন্যার স্নেহসম্পর্কের একটি বাস্তব রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, পূর্ববাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ভাই-ফোঁটা উপলক্ষ্যে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্য দিয়াও ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহমধুর সম্পর্কের একটি বাস্তব পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তবে উমা-সঙ্গীতের মত ভাই-ফোঁটার গীতিগুলি এত মার্জিত নহে—ইহাদের মধ্যে স্থূল গ্রাম্যতার ভাব অনুভব করা যায়। তথাপি সঙ্গীতগুলি আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ।

আশ্বিন যায় কার্তিক আইয়ে গো।
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা॥
ভাই-দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা।
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সহরে যাইতে।

ভাই-ফোঁটার কথা শুন্‌তাম গোবর আন্যা দিতে ॥
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সহরে যাইতে।
ভাই-ফোঁটার কথা শুন্‌তাম মেথী আন্যা দিতে ॥
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সহরে যাইতে।
ভাই-ফোঁটার কথা শুন্‌তাম আগ্রী আন্যা দিতে ॥

মেয়েলী সঙ্গীত মাত্রই সুর-প্রধান—কথা প্রধান নহে। উৎসবানন্দের একটি সুর মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে, কতকগুলি অসংলগ্ন ও অর্ধসংলগ্ন কথা তাহার অবলম্বন হয় মাত্র। উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে। এই প্রকার আরও শুনিতে পাওয়া যায়—

আশ্বিন যায় কার্তিক আইতে গো।
ভাইধনেরে দুতিয়া দিব রঙ্গে ॥
পাড়ারি ডাকাইয়া ভইনে রঙ্গী গুয়া পাড়িল গো।
ভাইধনের দুতিয়া দিব রঙ্গে।
বারুইয়া ডাকিয়া ভইনে ঝারি পান কিনিল গো,
ভাইধনের দুতিয়া দিব রঙ্গে ॥
কেমন গৌরব যোগী ভইনের—ভাইধন বসিল গো,
ভইনের ধোয়া চন্দন হইয়া গেল বাসি গো ॥
কাপইড়া ডাকাইয়া ভইনে ক্ষীরুয়া জোড়া কিনিল গো,
ভাইধনেরে দুতিয়া দিব রঙ্গে ॥

মেয়েলী ব্রতের গীতও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুমারী মেয়েরা সাধারণতঃ ব্রতোপলক্ষ্যে ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহিতা নারীদিগের ব্রতে গীতই অধিকতর ব্যবহৃত হয়। কার্তিক ব্রত উপলক্ষ্যে পূর্ববঙ্গের নারীদিগের মধ্যে এখনও যে গীত প্রচলিত আছে, তাহাই ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নারীগণ গীত গাহিয়া অতিবাহিত করে। এক রাত্রিতে যে পরিমাণ গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই একটি সুবৃহৎ সংগ্রহ সংকলিত হইতে পারে। ইহার বন্দনা গীতটি এই প্রকার—

উত্তরে বন্দিয়া আইলাম কৈলাস পর্বত রে।
তার শেষে বন্দিয়া আইলাম শিব আর পার্বতীরে ॥

দক্ষিণে বন্দিয়া আইলাম ক্ষীর নদী সাগর রে ॥
পূর্বেতে বন্দিয়া আইলাম পূবের ভানুধর রে ॥
পশ্চিমে বন্দিয়া আইলাম গয়া বারাণসী রে।
স্ত্রীর মধ্যে বন্দিয়া আইলাম সীতা বড় সতী রে ॥
পুরুষের মধ্যে বন্দিয়া আইলাম রামচন্দ্র গোঁসাইরে।
গাইয়ের মধ্যে বন্দিয়া আইলাম কবলী ধবলী রে ॥
মায়ের দুটি স্তন বন্দি অক্ষয় ভাণ্ডার রে।
গয়াকাশী গেলে ধার শুধিতে না পারি রে ॥

কার্তিক ব্রত প্রকৃত পক্ষে কৃষি-ব্রত; অতএব ইহার সঙ্গীতগুলিও কৃষি-সঙ্গীতের অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত ছিল, কিন্তু এই সকল সঙ্গীত কৃষিকর্মোপলক্ষ্যে গীত হয় না; বরং বৎসরের নির্দিষ্ট দিবসে ব্রতোপলক্ষ্যেই গীত হয়; সেইজন্য ইহাদিগকে calendric বা আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কার্তিক ব্রতের নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা ব্রত-সঙ্গীত হইলেও ধর্মভাব ইহার মুখ্য নহে, বরং প্রত্যক্ষ কৃষি-সম্পদই ইহার লক্ষ্য—

পক্ষী রে, আরে রে, বাবুই রে, ক্ষেতের পাক্না ধান খাইলে।
উইড়া উইড়া ধান খায়, পইড়া পইড়া রং চায়
সরাইনালের আগে বাসারে ॥
এক বাবুই ধলিয়া, আর এক বাবুই কালিয়া,
আরেক বাবুইর কপালে তিলক রে।
কাল না ছেলেটায়, ডাক দিয়া কইয়া যায়,
বাদুড় পড়্যাছে রাধার ক্ষেতে রে ॥
একেলা না পুতের বউ, সাত ক্ষেত রাখে গো,
আরও জোগায় পান তেলের কড়ি।
আরে রে বাবুই রে, ক্ষেতের পাক্না ধান খাইলে ॥

পৌষ-পার্বণ বাঙ্গালীর বাৎসরিক শস্যোৎসব (harvest festival)। বলাই বাহুল্য, কৃষিজীবী সমাজে ইহার একদিন যে মূল্য ছিল, আজ তাহার আর সে মূল্য নাই। তথাপি বাংলার পল্লীতে ইহার মত আনন্দোৎসব খুব বেশি নাই। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বালক ও অন্তঃপুরে নারীদের মধ্যে এখনও ছড়া ও সঙ্গীত প্রচলিত আছে। অনেক

সময় ইহার ছড়াও সুর করিয়া গাওয়া হয়, সেইজন্য ইহাদিগকে গীতির মধ্যেও আলোচনা করা যাইতে পারে।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন পৌষ মাস বা বাংলার লক্ষ্মীমাস বিদায় লইয়া যায়, সে'দিন ছড়ায় ও সঙ্গীতে এই বিদায়ের সুরটি বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত করিতে থাকে—

এস পৌষ যেও না।
জন্ম জন্ম ছেড়ো না॥
ভাতের হাঁড়িতে থেকো।
পৌষ যেও না॥

কিন্তু ঋতুচক্রের গতি যখন রোধ করিবার কোন উপায়ই থাকে না, তখন অবশেষে এই সান্ত্বনার মধ্যে বাংলার লক্ষ্মীমাসকে বিদায় দিতে হয়—

এ' বছর যাও পুষালো কাঠের মালা প'রে।
আর বছর আন্‌ব গো দুব্‌-তুলসী দিয়ে।

ছড়া ও সঙ্গীতের তালে তালে মনের ময়ূর যেন পেখম ধরিয়া নাচিতে থাকে—

পুষালো গো রাই।
আমরা ছোপ্‌ড়ি পিঠ্যা খাই॥
ছোপ্‌ড়ি লোপ্‌ড়ি গাঙ্‌ সিনাতে যাই।
গাঙের জলে রাঁধি বাড়ি ঝারির জল খাই॥
চার মাস বর্ষা আমরা পোখর না যাই॥

পূর্বেই বলিয়াছি, গীত অপেক্ষা ছড়ার লক্ষণ ইহাদের মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট। বীরভূম জিলা হইতে সংগৃহীত এই গীতিটি হইতেও তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে—

এস পৌষ যেও না।
জনম জনম পোয়ো না॥
আঁদাড়ে পাদাড়ে পৌষ।
বড় ঘরের মেঝেয় বোস॥
এমনি করে এসো পৌষ জনম জনম।
আমরা যেন উপোস না যাই কোন বছর॥
এস পৌস বড় ঘরের মেঝেয় চেপে বোস।
এম্‌নি ক'রে এস পৌষ এম্‌নি করে এস॥

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ বীরভূম, বর্ধমান জিলা এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণা জিলার কোন কোন অঞ্চলে ঘেঁটু নামে এক লৌকিক দেবতা আছেন। তাঁহাকে পূজা করিলে খোস পাঁচড়া রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়; এই পূজা সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের রাখাল বালকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়। পূজার পূর্বে বালকেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঘেঁটুর নামে মাগন সংগ্রহ করে। সেই উপলক্ষ্যে তাহারা নানা ছড়া বলে এবং গানও গায়। এই গানগুলিকেও মাগনের গানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একটি নিদর্শন এই,

আজ আনন্দে ঘেঁটু ল'য়ে সঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চল সবে যাই।
মনের আনন্দে দাও গো পূজা
এমন দিন ত আর হ'বে নাই॥
খোস্ চুলকানো ঘেঁটু দেছিস গায়
সতী নারীর বীর পতির গায়।
বামে দাঁড়ায়ে সতী নারী
পতি বিনা সতীর গতি নাই॥

সহজ আনন্দরসের পরিবর্তে গানগুলির ভিতর দিয়া এই যে বিজ্ঞভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বহুলাংশে ইহাদিগকে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে।

ঘেঁটু খোস পাঁচড়ার দেবতা বলিয়া তাহার রূপটি কুৎসিৎ বলিয়া মনে করা হয়। তাহার রূপ বর্ণনা করিয়া ছেলেরা গায়—

সাধের মালা রইল গাঁথা বরণ ডালাতে।
ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হ'লাম আমরা সবেতে॥
আ মরি কি রূপের গঠন, (দেখে) গা'টা করৃছে কেমন।
গলা সরু মাজা মোটা টাক ধ'রেছে মাথাতে॥
কম হ'য়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হ'য়েছে বুকের ছাতি।
দাঁতগুলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভুরুতে॥

অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মত ইহাও কাব্যগুণ বিবর্জিত।

যে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া নরনারী পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের অনুভূতি ব্যক্ত করিয়া থাকে, তাহাই প্রেম-সঙ্গীত। লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহার আবেদনই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ; দেশকাল-নিরপেক্ষ এক শাশ্বত মানবিক বৃত্তি ইহার ভিত্তি বলিয়া ইহার ভাবগত আবেদন সর্বজনীন—একমাত্র ভাষাগত প্রাদেশিকতা ইহার এই সর্বজনীন রসোপলব্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে। ভাষাগত ব্যবধান দূর করিতে পারিলে ভাবের দিক দিয়া অরণ্যচারী 'অসভ্য' জাতির প্রেম-সঙ্গীত এবং মহানগরীর অধিবাসী 'সুসভ্য' জাতির প্রেম-সঙ্গীতে কোনও পার্থক্য থাকে না। মধ্য প্রদেশের অরণ্যচারী গঁড় জাতির এই ভাষান্তরিত প্রেম-সঙ্গীতটি ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর যে-কোন প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে--

> Come by this road : go by that road.
> As you journey, hold in your mind the image of your darling.
> And let that love be seen in your eyes.[১]

ইহার কারণ, প্রেমের অনুভূতির মত আন্তরিক অনুভূতি আর কিছুরই নাই—মানব-মনের সুগভীর তলদেশে যেখানে অন্তরের রাজত্ব, সেখানে মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য নাই। সেইজন্য প্রেম-সঙ্গীতগুলি সমগ্র জগদ্ব্যাপী এক অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, আদিম সমাজের মধ্যে জৈব প্রয়োজনেই প্রেম-সঙ্গীতগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। নরনারী যখন পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিত, তখনই সঙ্গীতের ভাষায় তাহাদের সেই ভাব ব্যক্ত করিত। আদিম সমাজে নৃত্যও এই সঙ্গীতের সহচর। সভ্যতার পথে সমাজ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার স্থূল জৈব প্রয়োজনীয়তার দিকটি সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি দ্বারা প্রচ্ছন্ন করিয়া লইতেছে। সেইজন্য প্রেম-সঙ্গীতগুলি ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবের বাহন হইতেছে।

১ Hivale and Elwin, *Songs of the Forest* (London, 1935) p, 111.

আদিবাসী সমাজে প্রেম-সঙ্গীত গাহিবার উপযোগী বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান থাকিলেও লোক-সমাজে ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন অনুষ্ঠান নাই। বিবাহের বাসর-গৃহে কোন কোন সময় প্রেম-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু হিন্দুসমাজে ইহা আধুনিকতার প্রভাবের ফল—কোন পূর্ববর্তী ধারা অনুসরণ করিয়া ইহা বিকাশ লাভ করে নাই। তবে মুসলমান সমাজে বিবাহের বাসর-গৃহে এখনও কদাচিৎ দুই একটি লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আঞ্চলিক সঙ্গীতের আলোচনা সম্পর্কে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল সঙ্গীতও গাহিবার সুনির্দিষ্ট কোন অনুষ্ঠান নাই, যখন ইচ্ছা তখনই গীত হইতে পারে, তবে অবসরের মুহূর্তই ইহার প্রকৃত সময়। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে কৃষক উদাস মাঠের বুকে যখন একাকী কাজ করিতে থাকে, নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মাঝি যখন তাহার অলস বৈঠাটি সোজা করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে, সমস্ত দিনের কর্ম হইতে অবসর লইয়া সন্ধ্যায় যখন কেহ তাহার অলস দেহ ঘাসের উপর এলাইয়া দেয়, তখনই পল্লীজীবনে প্রেম-সঙ্গীতের যথার্থ অবসর। তবে ইহা গায়কের ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থার উপরই সর্বদা নির্ভর করে।

বাংলার প্রেম-সঙ্গীত সাধারণতঃ একক (Solo) গীতি ; আদিবাসী সমাজের মধ্যে নৃত্যসম্বলিত সমবেত গীতির সহায়তায় ইহা প্রকাশ পাইলেও, বাংলাদেশে সাধারণতঃ ইহা এককই গীত হয়। তবে আঞ্চলিক প্রেম-সঙ্গীতগুলি কোন কোন সময় ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। বাংলাদেশের প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে আদিবাসী অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতের আর একটি স্থূল পার্থক্য আছে—বাংলার অধিকাংশ প্রেম-সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই নারীমনের অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু এ'দেশে সাধারণতঃ নারী ইহার গায়িকা নহে—পুরুষই ইহার গায়ক, নারীমনের নিগূঢ় অনুভূতি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া পুরুষই এখানে ব্যক্ত করিতেছে। একমাত্র বিবাহ-সঙ্গীত ও কোন কোন ভাদু-সঙ্গীত ব্যতীত নারীসমাজে প্রেম-সঙ্গীত এ'দেশে প্রচলিত নাই। কিন্তু আদিবাসীর প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষই পুরুষের এবং নারীই নারীর মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। বাংলাদেশে এই বৈসাদৃশ্য দূর করিবার জন্য কোথাও পুরুষ নারীর বেশ গ্রহণ করিয়া থাকে—ঘাটু তাহার নিদর্শন।

যথার্থ প্রেম-গীতিতে অশ্লীলতা কিংবা গ্রাম্যতা থাকিতে পারে না। কারণ, অশ্লীলতা কিংবা গ্রাম্যতা উপরি-স্তরের বিষয়,—প্রেম-সঙ্গীতের অনুভূতি হৃদয়ের গভীরতম স্তর হইতে উৎসারিত হয়—জীবনের উপরি-স্তরের ধূলিবালি সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারে না। অতএব যথার্থ প্রেম-সঙ্গীতে কোন স্থূলতা প্রকাশ পায় না, সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিই প্রকাশ পায়। সেইজন্য বাংলার লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতগুলি অনায়াসেই রাধাকৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল; কিংবা রাধাকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিয়াও ইহারা পার্থিব ধূলিবালির স্পর্শে কোথাও মলিন হইয়া যায় নাই।

বাংলার প্রেম-সঙ্গীত প্রধানতঃ ভাটিয়ালি সঙ্গীত; পূর্বেই বলিয়াছি, যে-সঙ্গীতের কোন তাল নাই, তাহাই ভাটিয়ালি সঙ্গীত বলিয়া পরিচিত। অলস বা নিষ্ক্রিয় অবসরের সময়ই প্রধানতঃ বাংলা প্রেম-সঙ্গীত গীত হয়, ইহা প্রায়ই কোন কর্মের সহচর নহে বলিয়া ইহাতে কোনও তাল সৃষ্টি হইতে পারে না; তবে সারি কিংবা অন্যান্য কোন কর্মসঙ্গীতে যে প্রেম-বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বাংলা প্রেম-সঙ্গীতের সাধারণ ব্যতিক্রম মাত্র। আদিবাসী সমাজে প্রেম-সঙ্গীতে সমবেত নৃত্যের মধ্য দিয়া অনেক সময় তাল রক্ষা পায়, সেইজন্য আদিবাসীর প্রেম-সঙ্গীত ভাটিয়ালি সঙ্গীত নহে।

গীতিকা বা ballad-এর যে সকল অংশে গীতি-(lyric) সুর প্রাধান্য লাভ করে, তাহা কোন কোন সময় খণ্ড ও স্বাধীন প্রেম-গীতির রূপ লাভ করে। কারণ, গীতিকারও প্রধান উপজীব্য প্রেম—এই বিষয়ে গীতির সঙ্গে গীতিকার ভাবগত কোনও পার্থক্য নাই—তবে গীতিকার অবলম্বন কাহিনী এবং গীতির অবলম্বন অনুভূতি মাত্র! 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র বহু বিচ্ছিন্ন অংশ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে স্বাধীন প্রেম-গীতিরূপেই ব্যবহৃত হয়।

অনেক সময় বিচ্ছিন্ন কোন প্রেম-গীতিও গীতিকার মধ্যে সংলগ্ন হইয়া যায়। ইহাদের প্রাসঙ্গিকতা সর্বদাই যে রক্ষা পায়, তাহা নহে—তবে ইহা দ্বারা গীতিকার একঘেয়ে কাহিনীর অনেক সময় গীতিমূল্য (lyric value) বর্ধিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত প্রেম-গীতিটি পূর্ববাংলার কোন কোন গীতিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—

আমার বাড়ীত যাইও রে, বন্ধু, বসতে দিবাম পীঁড়ে।
জল পান করিতে দিবাম শালিধানের চিঁড়ে॥

শালিধানের চিঁড়ে না রে বিন্নি ধানের খই।
বাড়ীর গাছের কবরী কলা গাম্‌ছা বান্ধা দই॥

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, প্রেম-গীতি প্রশ্নোত্তর-বাচকও হইতে পারে—কিন্তু উচ্চাঙ্গের প্রেমগীতি প্রশ্নোত্তর-বাচক হইবার পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নোত্তর দ্বারা ভাবের নিবিড়তা বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই বলিয়াছি, প্রেম-গীতির শ্রেষ্ঠ অংশই বিরহ। বিরহ-সঙ্গীত স্বভাবতঃই প্রশ্নোত্তর-বাচক হইতে পারে না—ইহা ব্যক্তি-হৃদয়ের ঐকান্তিক অনুভূতি। তবে প্রেম-সঙ্গীতে যে প্রশ্নোত্তর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন গীতিকার বা ballad-এর বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর-বাচক সঙ্গীতটি 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র একটি সুপরিচিত অংশ—স্বাধীন প্রেম-গীতি নহে—

'কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যৌবন কালে না করাইছে বিয়া॥'
'কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মতন নারী পাইলে আমি করি বিয়া॥'
'লাজ নাই রে নির্লজ্জ ছেলে লজ্জা নাই রে তোর।
গলায় বান্ধিয়া কলস জলে ডুব্যা মর॥'
'কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্, আমি ডুব্যা মরি॥'

কিন্তু ইহাও কেহ কেহ স্বাধীন প্রেম-সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার কারণ, এই গীতিকার অন্যান্য অংশ কোন কোন অঞ্চলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাবগৌরবে এই পদ কয়টি অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

প্রেমের মধ্যে যখন নৈরাশ্যের কোন আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন সেই ভাব সঙ্গীতের শত ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে। সেইজন্যই প্রেম-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অংশই বিরহ। বেদনাই সুগভীর ভাবমূলক সঙ্গীতের জননী। সেইজন্য বেদনার সঙ্গীতই মধুরতম সঙ্গীত। 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts'; প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যেও বেদনা যেখানে সুগভীর হইয়া বাজিয়াছে, সেখানেই সুর মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার লৌকিক বিরহ-সঙ্গীতই তাহার প্রমাণ।

প্রিয়তমা তাহার প্রিয়তমের কৃষ্ণরূপ জগৎ ভরিয়া প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু বিরহের মধ্য দিয়া তাহাই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না—

কাউয়া কালা কুঁইলা কালা,
আঁখির পুতলি কালা।
আরও কালা অঙ্গের নিশানা,
ওরে কালরূপে জগৎ জোড়ারে, অ বঁধুয়া॥
মনর শান্তি অইল না,
তর জ্বালায় আর পরাণ ত বাঁচে না॥
ওরে বারে বারে তুই আঁরে, ওরে ও কুইলা
মনর শান্তি ন দিলি।
তর জ্বালায় আর পরাণ ত ন বাঁচে॥
কুইলা তর কুটিল স্বভাব ত ন গেল্।

—(চট্টগ্রাম)

প্রিয়তমের সঙ্গে নিভৃত আলাপনে একদিন কি এই বঞ্চিতা প্রিয়তমা তাহার অন্তরের গোপন কথা ব্যক্ত করিবার অবকাশ পাইবে না?

আইস প্রাণের বন্ধু তুমি, আইস প্রাণের বন্ধু তুমি,
আইস মোর হিয়ার কূলে।
দুঃখের কথা কইব নিরলে॥
আমার যত দুঃখের কথা
সইতে নারে তরুলতা গো;
ফুল ঝরে তার পাতা ঝরে,
সাগরে আগুন জ্বলে॥
দুঃখের কথা কইব নিরলে॥

আমার দুঃখের দাগা পাইয়া,
আসমান গেছে কাল হইয়া গো;
চাঁদ হইয়াছে কলঙ্ক সার,
নিত ভাসে নয়ান জলে॥
দুঃখের কথা কইব নিরলে॥

বিদেশে না তোমায় পাইয়া
তুষের আগুন বুকে লইয়া গো ;
কত যে পোহাইছি নিশি,
দিন গেল মোর বিফলে ॥
দুঃখের কথা কইব বিরলে ॥

—(মৈমনসিংহ)

এই প্রকার নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতই বাংলার মৌলিক প্রেম-সঙ্গীত, ইহার উপরি স্তরে কালক্রমে রাধাকৃষ্ণের নাম আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারাও বাংলার প্রেম সঙ্গীতের লৌকিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক সঙ্গীত অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের মানবিক ভাবমূলক সঙ্গীতই কালক্রমে সাধারণের রুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল ; কারণ, ইহাতে নৈর্ব্যক্তিক ভাবটি রাধাকৃষ্ণের পরিচয়ের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্গীতের চিত্রটি পূর্বোদ্ধৃত প্রেম-সঙ্গীত কয়টির চিত্র অপেক্ষা অধিকতর সজীব—

মা গো, বউ আমাদের ক্ষেপেছে।
চেয়ে দেখ নয়নে চাঁদ বদনে কি ছিল কি হ'য়েছে ॥
ও বউ যমুনায় জল আন্‌তে গিয়ে,
হাসে আর দেখে চেয়ে,
কালা বুঝি পাগ্‌লা-ঘুড়ি দিয়েছে।
বাঁশীর স্বর অনুপাম, তাই বুঝি রাই খেয়েছে ॥
ও বউ রান্নাশালায় র্\u200dাধ্‌তে গিয়ে
কাঁদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে :
শুধাইলে কয় না কথা, বলে ধুঁয়া লেগেছে।
লজ্জায় তাড়াতাড়ি নামা'য়ে হাঁড়ি
নীল বসনে চোখ মুছেছে ॥

জলপাইগুড়ি হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্যে একটি আশাহতা প্রণয়িনীর অন্তর্বেদনা যেন প্রত্যক্ষ ও বাস্তব রসরূপ লাভ করিয়াছে—

একবার আসিয়া কালাচাঁদ মোরে যাও দেখিয়া রে।
কোঁড়া কান্দে কুঁড়ী কান্দে কান্দে বালি হাঁস,

আর ডাউকীর কান্দনে মুই সই ছাড়নু ভাইয়ার দেশ রে।
আর আইল ত কান্দে আইল কাশিয়া দোলাও কান্দে হোলা।
বাপ মায় বেচেয়া খাইলে সোয়ামী পাগ্‌লা ॥
লোকে যেমন ময়না পোষে পিঞ্জরে ভরিয়া।
ঐ মত নারীর যৌবন রাখি চউখ বান্ধিয়া ॥
একবার আসিয়া কালাচাঁদ মোরে যাও দেখিয়া ॥

গার্হস্থ্য জীবনের ভিতর দিয়া দাম্পত্য-জীবনে যে মিলন-বিরহের নিত্য অভিনয় হইতেছে, লোক-সঙ্গীতের ভিতর তাহারও সার্থক অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম-সঙ্গীতগুলির মধ্যে ইহাদের আবেদনই সর্বাপেক্ষা বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। একটি দৃষ্টান্ত দিই। রাম সাধু তাহার নববিবাহিতা যুবতী পত্নীকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে। গৃহে নিঃসঙ্গ জীবন যখন বধূর দুঃসহ হইয়া উঠিল, তখন একদিন সকল লজ্জার মাথা খাইয়া বধূ শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—

শাশুড়ী ত বলি রে,
গুণের শাশুড়ী বলি রে,
হারে তোমার পুত রহিল কোন্ দ্যাশে রে।

শাশুড়ী বধূর মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ইহার উত্তরে বলিতেছে—

আমার যে পুত রে,
ও বউ রে,
পঞ্চফুলের ভোমর রে,
হারে, এক ফুলে রহিল মন মজিয়া রে।

জননী নিজের সন্তানকে চিনিতেন। বধূর সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে কোন কপটতা না করিয়া সরল ভাবেই তাহার পুত্রের চরিত্রের কথা তাহাকে জানাইয়া দিলেন—আমার পুত্র পঞ্চফুলের ভ্রমর, কোথায় কোন্ ফুলে মজিয়া রহিয়াছে, সে কথা কে বলিবে? গৃহে যে বিলাসোপকরণ আছে, তাহা লইয়াই তুমি তাহার কথা ভুলিয়া থাক—

ঘরে তে আছে রে,
ও বউ রে, কোটরা ভরা সিন্দুর রে,
তুমি উয়াই দেইখা পাশর রাম সাধুরে।

ঘয়েতে আছে রে
ও বউ রে, বাক্স ভরা জেওর রে,
তুমি উয়াই দেইখা পাশর রাম সাধুরে ॥

কিন্তু কৌটা ভরা সিন্দূর ও বাক্স ভরা গয়না লইয়া বধূ কি করিবে? সে বলিল,

ও কৌটার সিন্দূর রে,
ও শাউড়ী, আমি বাতাসে উড়াব রে,
ও বাক্সের গয়না রে,
ও শাউড়ী, আমি লুটারে বিলাব রে।
আমি তবু যাব রাম সাধুর তলাসে রে ॥

নারীহৃদয়ের একটি প্রচ্ছন্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস সঙ্গীতের স্বর অবলম্বন করিয়া কি অপূর্ব কৌশলে এখানে প্রকাশ পাইল! কয়টি পদের ভিতর দিয়া যেন একটি উপন্যাসের ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল। ইহার সৌন্দর্য্য ও সংযম উভয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুনিবিড় দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও কোন অলক্ষিত দিক হইতে যে বিপর্যয়ের বজ্রাঘাত আসিয়া পড়ে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এই সঙ্গীতটির মধ্যে একটি ঐতিহাসিক তথ্যেরও নির্দেশ পাওয়া যায়। এক কালে যে মগ জলদস্যুরা জলের ঘাট হইতে কি ভাবে বাংলার নারীদের হরণ করিয়া লইয়া যাইত, ইহাতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইবে—

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
কোথাকার এক মঘম রাজা পান্সী বান্ধলো ঘাটে।
আমি কি করি!
এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
চুলের মুইঠা ধইরা রাজা উঠায়া নৌকার পরে রে।
আমি কি করি!
আগা নৌকায় ঝামুর ঝুমুর পাছা নৌকায় ছায়া।
ধীরে সুস্থে বাইও নৌকা আমি পতির ক্রন্দন শুনি রে।
আমি কি করি!

কাইন্দ না কাইন্দ না পতি রে, না কান্দিও আর !
ঘরে আছে অষ্ট অলঙ্কার তুমি আরেক বিয়া কইর রে,
আমি কি করি !

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কালক্রমে বিরহিণী নারীর যেমন কতকগুলি সাধারণ অবস্থার বর্ণনা বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বাংলা প্রেম-সঙ্গীতেও কালক্রমে বিরহিণী নারী সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ চিত্র কল্পনা করা হইত। বিরহিণী নারী পক্ষিণী হইয়া গিয়া প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সর্বদাই অভিলাষ জ্ঞাপন করিত—

বিধি যদি দিত রে পাখা,
উইড়া যাইয়া দিতাম দেখা ;
আমি উইড়া পড়্তাম সোনা বন্ধুর খ্যাশে রে।

কিংবা,

ফুল যদি হইতা রে, বন্ধু, ফুল হইতা তুমি।
কেশেতে ছাপাইয়া রাখ্তাম আমি ঝাইড়া বান্ধ্তাম বেণী ॥

বারমাসী সঙ্গীত বিরহ-সঙ্গীতেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপর বিরহিণী নারীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন পল্লীকবি, ইহার মনোবিশ্লেষণের উপর জোর দিয়া থাকেন, কেহ বা প্রকৃতি-বর্ণনার উপরই জোর দেন—উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া খুব কম কবিই ইহা রচনা করিতে পারিয়াছেন। কালক্রমে ইহা বিরহ-সঙ্গীত রচনার একটি গতানুগতিক রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার বাহিরে আদিবাসীর লোক-সাহিত্যেও অনুরূপ রচনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু বাংলার লোক-সাহিত্যের মত ইহার এত বহুল প্রচলন আর কোথাও নাই। শুধু তাহাই নহে, রচনার দিক দিয়া ইহা বাংলাদেশেই সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বাংলার সকল অঞ্চলেই ইহা প্রচলিত আছে। রংপুর জিলার কৃষকের মুখ হইতে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি সংগৃহীত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ হইতে

মাসগণনার যে রীতির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, সঙ্গীতটি প্রাচীন—

প্রথম অগ্রাণ মাসে নয়া হেউতি ধান।
কেও কাটে কেও মাড়ে কেহ করে নবান॥
যার ঘরে আছে অন্ন আঁধে বাড়ে খায়।
যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখ চায়॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল পৌষ মাস॥
পৌষ না মাসেতে কন্যা লোক খায় আলোয়া।
ভাল ফুল ফুটিয়াছে কেকিটী (?) কমলা॥
কেকিটী কমলা ফুটে আরো ফুটে মালী।
তরুণ বয়সের বেলা ছাড়িল সোয়ামী॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল মাঘ মাস॥
মাঘ না মাসেতে কন্যা করুয়া পড়ে শীত।
তলে পাটী পাড়ে কন্যা শিওরে বালিশ॥
সাধু সাধু বলিয়া বালিশে দিলাম কোল।
হতভাগা ভূলার বালিশ না বোলে এক বোল॥
পোড়া দেঙ্ তোর তুলার বালিশ গগনে উঠুক ধুঁয়া।
কতদিনে ফিরিবে অভাগিনীর চন্দ্রমুয়া॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল ফাল্গুন মাস॥
ফাল্গুন মাসে হে কন্যা ফাগুয়া খেলায় রাজা।
ডালমূল ভাঙ্গিয়া যখন কুহুলী তোলায় ভাষা॥
তোলাও রে তোলাও রে কুহুলী পাড়িয়া মারিম ছাও।
আমার দেশে নাই সাধু সাধুর দেশে যাও॥
গাছে পড়ি পঞ্চ কথা সাধুরে বুঝাও॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল চৈত্রমাস॥

চৈত্র না মাসেতে কন্যা পচিয়া বয় বাও।
হেটে তালু শুকায় কন্যার মুখে না আসে রাও ॥
মুখে না আসে রাও হে কন্যা চক্ষে না ধরে নিন্দ।
হাতে হাতে চন্দ্র দিয়া হারাইলাম গোবিন্দ ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল বৈশাখ মাস ॥
বৈশাখ মাসেতে হে কন্যা সুশাগ ললিতা।
সব সখী খায় শাগ অভাগীর মুখে তিতা ॥
আঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন শোঙ্গ্রাইলাম পাতে।
আমার ঘরে নাই সাধু পশিয়া দিব কাকে ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি আসিল জ্যৈষ্ঠ মাস ॥
আম খাইলাম কাঁটাল হে খাইলাম আরও গাভীর দুধ।
কতদিনে খণ্ডিবে অভাগীর মনের দুখ ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল আষাঢ় মাস ॥
আষাঢ় মাসেতে হে কন্যা কিস্‌সানে কাটে ধান।
কোড়া পাখীর কান্দনেতে শরীর কম্পমান ॥
হেঁওয়া পাখীর কান্দনেতে পাঁজর কৈল শেষ।
ডউকির কান্দনেতে মুঞ্‌ঞ ছাড়িনু বাপের দেশ ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল শ্রাবণ মাস ॥
শ্রাবণ মাসেতে কন্যা কিস্‌সানে ওয়[১] ওয়া[২]।
হাড়ি কোণে করিছে মেঘ গগনে বর্ষে দেওয়া ॥
বর্ষেক রে বর্ষেক রে দেওয়া বর্ষেক পঞ্চধারে।
আমার ঘরে নাই সাধু ফিরিয়া আসুক ঘরে ॥

১ ওয়—রোয়, রোপণ করে
২ ওয়া—রোয়া, রোপা ধান্য

এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল ভাদ্র মাস॥
ভাদ্র না মাসেতে হে কন্যা পাকিয়া পড়ে তাল।
যুগীর যুগিনী হইয়া হস্তে লব থাল॥
হস্তে লব থাল হে প্রিয়, মাগিয়া খাব দেশে।
দুই কানে দুই কুণ্ডল পিন্ধিয়া যাব সাধুর দেশে॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল আশ্বিন মান॥
আশ্বিন মাসে হে কন্যা দুর্গা অষ্টমী।
ধানে দূর্বায় করে পূজা বিধবা ব্রাহ্মণী॥
পূজুক পূজুক পূজা মাগিয়া লব বর।
আমার সাধু ফির্‌লে দিব লক্ষ ছাগল॥
এই মাস গেল কন্যা, না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল কার্তিক মাস॥
কার্তিক মাসে হে কন্যা তুলসীর গোড়ে বাতি।
ঘুরি আসে তোমার সাধু কান্ধে লইয়া ছাতি॥[১]

একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ভাব অবলম্বন করিয়া এই দীর্ঘ রচনাটি প্রকাশ পাইয়াছে—ইহার বিভিন্ন অংশ একই অংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র; অতএব রচনার দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও ইহা লোক-গীতি বলিয়া গণ্য হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

লোক-সাহিত্যের এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই মধ্যযুগের বিস্তৃত উচ্চতর সাহিত্যেও এই বারমাসীর বর্ণনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই সূত্রেই সীতার বারমাসী, রাধার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল। বারমাসের বর্ণনার পরিবর্তে যদি ছয় মাসের বর্ণনা হইত, তবে তাহাকে ছয়মাসী বলিত। মনসা-মঙ্গলে বেহুলার অষ্টমাসীর বা আট মাসের দুঃখের বর্ণনাও পাওয়া যায়। ক্রমে এই বারমাসীর বর্ণনা কবিত্বের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল মাত্র গতানুগতিক বর্ণনামূলক রচনায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার, সেই সূত্রে

১ ব-সা-প-প. ১৩১৫ সাল, ২য় সংখ্যা

বাংলার কিছু কিছু প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে নায়করূপে শ্রীগৌরাঙ্গেরও নাম প্রবেশ করিয়াছে। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গের আনুপূর্বিক জীবন অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, তাহার কোন দিক দিয়া প্রেম-সঙ্গীতের নায়কোচিত কোন গুণ প্রবেশ করিতে পারে নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন পরিকল্পনার জন্যই তাঁহার মধ্যেও এই গুণ আরোপ করা হইয়াছে ; যেমন,

গৌর-রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল
ঔষধে আর মানে না,
চল, সজনি, যাই গো নদীয়ায়।
সাপের বিষ যেমন তেমন
প্রেমের বিষ উজান ধায়,
গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশিয়াছে আমার পায়,
চল, সজনি, যাই গো নদীয়ায়।

আরও একটি গানে শুনিতে পাওয়া যায়—

আমারে ছুঁইস না তোরা, ও সজনি !
আমারে ছুঁইলে পরে তোর জাইত কুল হইবে যে হানি ॥
আমারে ছুঁইস না তোরা, ও সজনি ॥
জাইত মোর রাখ্যাছে ধইরে গৌরাঙ্গ গুণমণি ॥
আমারে ছুঁইস না তোরা, ও সজনী ॥

কোন কোন স্থলে এই সকল প্রেম-সঙ্গীত সাত্ত্বিক গৌরাঙ্গ-ভক্তির রূপক হিসাবেও গ্রহণ করা যায়।

কর্ম

পূর্বেই বলিয়াছি, সঙ্গীত কর্মের সহচর। কৃষিকর্মে যেমন কৃষক, কোন কোন গৃহকর্মের সময় নারীও গান গাহিয়া তাহার শ্রম লাঘব করিয়া থাকে। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত work song নামে পরিচিত—বাংলায় তাহা কর্মসঙ্গীত বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে। কৃষিজীবী সমাজে কৃষি সর্বজনীন কর্ম; অতএব কৃষিকার্যকালীন যে সকল সঙ্গীত গীত হয়, তাহাও কর্মসঙ্গীতের মধ্যেই গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে কলকারখানায় শ্রমরত মজুরদের যে সমবেত সঙ্গীত প্রচলিত আছে, বাংলাদেশে তাহা নাই। এ'দেশে নাগরিক জীবন কেন্দ্র করিয়া যে যন্ত্রসভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার প্রভাব বাংলার পল্লীসমাজের মধ্যে আজিও বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; অতএব তাহা বাংলা লোক-সাহিত্যের উপজীব্য হইতে পারে নাই। নৌকা বাহিবার কালে পূর্ববঙ্গে মাঝিগণ কোন কোন সময় যে সমবেত সঙ্গীত গাহিয়া থাকে, তাহাও আমি কর্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি—কারণ, কর্ম-সঙ্গীত কর্মের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট—কর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণা হইতেই ইহাতে সঙ্গীতের জন্ম হয়—যেখানে কর্ম নাই, সেখানে এই সঙ্গীতও নাই। নৌকা বাহিবার তালে তালে সেই সঙ্গীতের আপনা হইতেই জন্ম হইয়া থাকে, বৈঠা ছাড়িয়া দিলে সঙ্গীতও নীরব হয়; অতএব ইহাও যথার্থই কর্মসঙ্গীত। ইহা সারিগান বা নৌকা বাইচের গান বলিয়াও পরিচিত। কৃষিকর্ম ও নৌকা বাওয়া ব্যতীত বাংলা দেশে সমবেত (communal) কর্ম আর বিশেষ নাই; অতএব ইহাদের সম্পর্কিত সঙ্গীতই বাংলার কর্মসঙ্গীত। এতদ্ব্যতীত আর কোন বিষয় বাংলার কর্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। ঢাকা সহরে ছাত পিটানোর সময় যে সমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও নৌকা বাইচের গান বা সারি গান, স্বাধীন কোন সঙ্গীত নহে। নৌকা বাইচের সময় বৈঠা দ্বারা যে তাল রক্ষা করা হয়, এখানে ছাত পিটাইবার সরঞ্জামটি দ্বারা সেই তাল রক্ষা করা হইয়া থাকে। কর্মসঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার তাল আছে; সেইজন্য ইহা ভাটিয়ালি হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে কর্মের মধ্য দিয়া যে তাল প্রকাশ পায়, তাহাই সঙ্গীতের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

সারিগানে বৈঠা ফেলিবার তালে তালে, কৃষিকার্যে অঙ্গ-সঞ্চালনের তালে তালে, যুদ্ধগামী সৈনিকের পা ফেলিরার তালে তালে যথাক্রমে সারি, কৃষি ও যুদ্ধগীতির তাল রক্ষা পায়।

কৃষকেরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করিতে করিতে গায়—

আয় রে তরা ভুঁই নিরাইতে যাই।
ভুঁই মোগো মাতাপিতা, ভুঁই মোর গো পুত।
ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশীকোঠা সুখ॥
(এই) পৌষ মাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়।
মাঘমাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়॥
ফাল্গুন মাসে দেলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ।
বৈশাখেতে চিকচিহিনী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ॥
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে।
ছেরাবনে আউস ধান গেরুহস্তেতে তুলে॥
ভাদ্র গেল, আশ্বিন আইল, কাতিকে দেয় সাড়া।
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখ্‌রে আমন ছড়া॥
আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই আর।
আইস এ'বার যাবার বেলা চরণ বন্দি তার॥
(ওগো) সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে।
এধার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে॥[১]

পাট বাংলার প্রধানতম কৃষি-সম্পদ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে লাঙ্গল দিয়া পাটের জমি চাষ করা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ-ভাদ্রে বর্ষার জলে তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত করা পর্যন্ত ইহা লইয়া কৃষকের ব্যস্ততার আর অবধি থাকে না। চাষ দেওয়ার পর বীজ বোনা, বার বার আগাছা বাছাই করা, পাট কাটা, 'লওয়া' (পাটকাঠি হইতে বাকল ছাড়ান) ও সর্বশেষে ধোওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির কর্মের ভিতর দিয়া কৃষকগণ সমবেত ভাবে গান গাহিয়া থাকে। এই সকল গান তাল-প্রধান, ভাব-প্রধান নহে। পাটকাটার গানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

১ চিত্তরঞ্জন দেব, পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ (১৩৬০), ৪১-৪২

পূবের থনে আইল বাতাস নদী অইল তল।
ভ্যাশ পিরথিমী সাগর ভইরা চরায় নাম্‌ল জল॥

(জোনা ভাইরে।)

কাঁচি বাগী সঙ্গে লইয়ারে পাট কাটিতে চল।

(জোনা ভাইরে।)

পূবের থনে বইছে বাতাস নামছে ম্যাগের ঢল।
এক নিমিষে তুই না জাহান কর্‌ব বুঝি তল॥

(জোনা ভাইরে।)

ঝড় বাদলে দিন মজুরি দিব ট্যাহা ট্যাহা।
শীগ্রি কইরা বাইরাওরে ভাই চালাও বিষম ঠ্যাহা॥

(জোনা ভাইরে।)

বিহান বিকাল দিব খাওন পাব্‌দা বোয়াল কই।
তাহায় সঙ্গে পাইবা আরও হাটের সরস দৈ॥

(জোনা ভাইরে।)

কাঁচি বাগী সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল॥[১]

সারি বাঁধিয়া কৃষকের দল যখন পাট ক্ষেতে নামিয়া একসঙ্গে কাঁচি চালাইতে থাকে, তখন তাহাদের কর্মের তালে তালে মনের ভিতর গানের সুর গুণগুণ করিয়া উঠে। এক এক দলে এক একজন মাতব্বর থাকে, সেই প্রথমে কাঁচি চালাইয়া যাইতে থাকে, সেই প্রথমে গান গাহিয়া উঠে, তারপর তাহার সঙ্গিগণ তাহার অনুসরণ করিয়া গাহিতে থাকে—

সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত।
আগল দীঘল সামাল কইরা শক্তে বাইন্দো পাত॥
হাকিমপুরের মকিম সেখের হাঁইকে কাঁপে হাতি।
তাহার খাতায় কাম করিতে ডুবাও কেনে জাতি॥
সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত।
শক্ত কইরা ধইরো কাঁচি মকিম সেখের গাঁতা॥

---

১ আশরাফ সিদ্দিকি, 'পাট-কাটার গান'; কৃষি-কথা, ১৯৫৩, পৃঃ ৫৮৭-৮৮

এক নিমিষে কাটবো জমিন পৌণে চৈদ্দ খাঁদা।
মকিমপুরের হাকিম সেখের লোহার ডাংকা হাত॥
চৈদ্দ খাঁদা কাইট্যা জমিন তবে সে খায় ভাত।
সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত॥[১]

গানের সুরে কর্মের শ্রম লাঘব হইয়া আসে।

বাংলার প্রতিবেশী কৃষিজীবী উপজাতীয় সমাজে কৃষিকার্যের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপযোগী সঙ্গীতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়—বীজ বপন হইতে আরম্ভ করিয়া রোপা, বাছাই, কাটা প্রত্যেক কার্য উপলক্ষ্যেই বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হয়। বাংলাদেশেও যে তাহার ব্যতিক্রম আছে, তাহা নহে; কিন্তু সংগ্রহের অভাবে এই শ্রেণীর সকল সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলার মেয়েরাও ধান ভানিবার সময় সমবেত গীত গাহিত, তাহা হইতেই 'ধান ভান্‌তে শিবের বা মহীপালের গীত' কথাটির উদ্ভব হইয়াছে।

বরেন্দ্রভূমি হইতে সংগৃহীত একটি ঢেঁকিতে ধান ভানার গীত এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

ধান বাহানো ধান বাহানো ওরে নারদ-মণি!
বিন্দ্যাবনে ধান বাহানে রাধে গোয়ালিনী—
এ ধান বাহানো রে, সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে॥ ধুয়া॥
ঢেঁকিতে উঠিয়া বলে,—'আমি সাড়ে চাইর হাতের কাঠ,
সোনার কামিনী ধান বাহানে, ঝাইড়া মারে লাত।
এ ধান বাহানো রে সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে।
পুয়াতে[২] উঠিয়া বলে, 'আমরা দোনো ভাই',
সোনার কামিনী ধান বাহানে, আমরা গান গাই॥

১ ঐ, পৃঃ ৫৮৮

২ যে খুঁটি দুইটির উপর ঢেঁকির পিছন দিকটা ভর করিয়া থাকে, তাহাকে 'পুয়া' বলে।

আগশালাইতে[1] উঠিয়া বলে,—আমি থাকি মধ্যস্থলে।
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমার বাহুর বলে॥
এ ধান বাহানো রে······॥
মোহোনাতে[2] উঠিয়া বলে, ও ভাই আমি সোয়া হাতের চূড়া,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমি করি গুঁড়া।
এ ধান বাহানো রে······॥
গড়েতে[3] উঠিয়া বলে, 'আমি থাকি মাটির তলে,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমার বুকের বলে',
এ ধান বাহানো রে······॥
কুলাতে উঠিয়া বলে, 'আমি করি ফাস ফুস।
সোনার কামিনী ধান বাহানে, আমি বাহির করি তুষ।'
এ ধান বাহানো রে······॥
বাঢ়ুনে[4] উঠিয়া বলে, 'আমি তিন বান্ধনে দঢ়,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমি করি জড়।'
এ ধান বাহানো রে সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে॥

গ্রামে গ্রামে এখন ধান ভানার কল স্থাপিত হইতেছে, তাহার ফলে গ্রাম্য স্ত্রীসমাজও আজ শ্রম-বিমুখী হইয়া পড়িতেছে, বালিকারা বিদ্যালয়ে গিয়া ইংরেজি পড়িতেছে, ধান ভানার গীত গাহিবার আজ আর কেহ নাই, ভবিষ্যতে আরও থাকিবে না।

সারিগান বা নৌকা বাইচের গান পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই প্রচলিত আছে। কৃষি-সঙ্গীত অপেক্ষা এই সঙ্গীতের সংগ্রহও ব্যাপকতর হইয়াছে, সেইজন্য ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনাও সম্ভব।

পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে নৌকা বাইচের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, কোন কোন স্থানে বাইচের প্রতিযোগিতাও হয়। এই উপলক্ষ্যে

১ যে কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে ঢেঁকি পুয়ার উপর ভর করিয়া থাকে, তাহা আগ্‌শালাই।
২ ঢেঁকির সম্মুখস্থ লোহার বলয়-পরানো গোল মোটা কাঠ।
৩ গর্ত, যাহার মধ্যে ধান কুটা হয়।
৪ ঝাঁটা।

সারিগান শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নদী, নৌকা ও জল সারিগানের বিষয়। প্রেমভাব ইহার প্রধান ভাব, তবে প্রেম ব্যতীতও অন্যান্য করুণ-রসাত্মক ভাবও ইহার অবলম্বন হইয়া থাকে। সহজ আনন্দের অর্থহীন অভিব্যক্তিও অনেক সময় ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়—

আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না।
জামাই গৌরব সভা করো না।
ওহে, নাও কিনিবার গেলাম আমি তারাপুরের বাঁয়ে,
চল্লিশ টাকা নায়ের দাম
তার পঞ্চাশ টাকা খোসা।
জামাই, আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না।
ওহে দায়ের মিঠা বালু রে
কুড়ালের মিঠা শিল,
ভাল মানুষের জবান মিঠা
কামিনীর মিঠা কিল।
জামাই, আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না॥[১]

চারিদিকে উচ্ছ্বসিত বর্ষার জলরাশি, তাহার উপর দিয়া ক্ষিপ্রগামী একটি দীর্ঘ ছিপের দুই ধারে দুই সারি গায়ক বসিয়া বৈঠার তালে তালে এই গীতি গাহিতেছে। ইহার সুরের মধ্যে যেমন গতির ক্ষিপ্রতা অনুভব করা যায়, তেমনই ইহার ভাবও পরিবেশ অনুযায়ী তরলিত হইয়া উঠে—

(১)

ও রায়কিশোরী, তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?
ঐ কাল জলে চান করাব সই,
ও সই রে, ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?
বেড়াই আমি তোমার লাগে,
অন্নধারী হলাম সাথী, তোমার লাগে,
ঘুরছি আমি রাত্রি দিনে করিছ কেন চাতুরী ?
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?[২]

১ হারামণি, পৃঃ ১০৭
২ ঐ, ১০৯

(২)

সুন্দরী লো, বাহির হইয়া দেখ
শ্যামের বাঁশী বাজাইয়া যায় কে ॥
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা ॥
মরাল বাঁশের বাঁশী নারে তরই বাঁশের আগা।
অবলা নারীর প্রাণে দিল কত দাগা ॥
বাঁশীটি বাজাইয়া কৃষ্ণে বইল কদম ডালে।
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে ॥
সেই পারে কদম্ব গাছ বৈসা কান্দে কাগা।
শিশুকালে কৈরা রে পীরিত যৈবন কালে দাগা।[১]

(৩)

সোনা বন্ধু রে পিরীত কর‍্যা ছাড়্যা যাইও না।
পিরীত কর‍্যা ছাইড়া গেলে দেহে পরাণ থাক্‌বে না ॥
পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত গলার হার।
পিরীত কর‍্যা যে জন মর্‌ছে সাফল জীবত তার ॥
পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত বড় লেঠা।
ছাড়াইলে ছাড়ানি যায় না টেংরা মাছের কাঁটা ॥
পিরীত বিষমরে জ্বালা যার অন্তরায় লাগে।
এক চইক্ষে নিদ্রা গেলে আরেক চইক্ষে জাগে ॥
এই পিরীত কর‍্যাছিল রাধার সনে কানু।
রাধে বাজায় করতাল কানাইয়া বাজায় বেণু ॥
এই পিরিতি কর্‌ছে রে ভাই ডাগ্‌ওয়ার সনে পাত।
পোরদা পোরদা অইয়া গেলে তেও না ছাড়ে সাথ ॥

সারিগানে অনেক সময় রূপক ব্যবহৃত হইয়া থাকে—

নাও দৌড়াই রে, হিলচিয়ার খালে।
পাগলা কুত্তা কামড় দিল বুইড়া বেটির গালে ॥

১ এই গান দুইটি মৌলভি সিরাজুদ্দীন কাশীমপুরী কর্তৃক সংগৃহীত।

সমসাময়িক স্থানীয় ব্যক্তি বিশেষের নামও ইহাতে কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যায়—

তুং তুঙ্গা তুং নাতুং তুঙ্গা দ্বারকে বৈঠা বাই।
মুরারি মুকুন্দ বাজাইয়া যাই ॥

সমসাময়িক কোন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াও সারিগান রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না—এক বৎসরের গানই পরবর্তী বৎসর শুনিতে পাওয়া যায় না।

রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা কিংবা হরগৌরীর বিষয় অবলম্বন করিয়াও সারিগান রচিত হয়। সারিগান নৌকা বাইচের গান বলিয়া রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের মধ্যেও যেখানে নৌকার উল্লেখ আছে, সেই সকল অংশই ইহার উপজীব্য করা হয়। কৃষ্ণলীলায় নৌকাখণ্ড, পারখণ্ড ইত্যাদি নৌকা-সম্পর্কিত প্রসঙ্গ। ইহাদের মধ্য হইতে সারিগানের চিত্র ও ভাব এইভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে ; যেমন,

আরে, ও কানাই, পার ক'রে দে আমারে।
আজিকার মথুরার বিকিদান করিব তোমারে ॥
তুমি ত সুন্দর, কানাই, তোমার ভাঙ্গা না'।
কোথায় রাখ্‌ব দইয়ের পশরা কোথায় রাখ্‌ব পা ॥
শুনে কানাই বলে তখন, শোন রসবতি।
ভরাকালে ভরা গাঙ্গে কেন এ'লে যুবতি ॥
আগা নায়ে রেখে দই মাঝখানাতে বস।
ফুটিক্ ফুটিক্ ফেল জল লজ্জায় কেন ভাস ॥
সর্ব সখী পার করিতে নেব আনা আনা।
রাধিকারে পার করিতে নেব কানের সোনা ॥

প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া যখন কোন বাইচের নৌকা স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিত, তখন ইহার গায়কগণ বৈঠার তালে তালে গাহিত—

জয় দে লো, রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে।
ধান্য দূর্বা বরণ-কুলা দে লো ঐ গলুয়ার কপালে ॥
নড়িয়া বরিয়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে ॥
জয় দে লো, রামের মা, তোর গোপাল আইছে ঘরে।

সাত সাগরের পার থিকা সে আন্‌ছে বরণমালা।
দুধের বাটী ক্ষীরের নাড়ু আনো থালা থালা॥
যেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে।
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম যাই তারে॥

যশোহর জিলায় কিছুদিন পূর্বেও বিজয়া-দশমী উপলক্ষ্যে বিশেষ নৌকা বাইচের অনুষ্ঠান হইত। সেইজন্য এই অঞ্চলের সারিগানে বিজয়ার বেদনার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে,

সোনার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিল।
হাস ম'ষ দিয়ে, মাগো, কল্লেম তোর পূজা,
কোথায় ফেলে গেলি এ'সব, ও মা দশভুজা। (সোনার কমল)
মাগো কার বাড়ী গিয়াছিলে, কে ক'রেছে পূজা,
কার জনম ক'ল্লে সফল হ'য়ে দশভুজা। (সোনার কমল)

কখনও কখনও নিমাই-সন্ন্যাসের বেদনার্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়াও বিজয়ার করুণ অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—

কেমনে বাঁচিবে তোর মা—
আরে, ও নিমাই, সন্ন্যাসেতে যেও না।
যখনে জন্মিলে নিমাই নিম তরুতলে,
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম নিমাই চাঁদ তোমারে।
সন্ন্যাসী না হইও, নিমাই, বৈরাগী না হইও,
ওরে, ঘরে বসে কৃষ্ণনাম আমারে শুনাইও।

বিজয়ার বেদনায় বাংলার হৃদয় যখন ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে, তখন একটি রিক্তা জননীর করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস এই ভাবে আসিয়া তাহাতে যুক্ত হইয়া ইহাকে সহজেই অশ্রুমুখী করিয়া তুলে।

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে মনসার ভাসানের দিনই নৌকা বাইচের মূল বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও, সেখানে বেহুলার কাহিনী সারিগানে শুনিতে পাওয়া যায় না। কোনদিন হয়ত তাহা শুনা যাইত, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিবে।

নৌকা বাইচ প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্পর্কিত সঙ্গীতগুলিও বিস্মৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তবে ঢাকা সহরের তালে

তালে ছাত পিটানোর গানের মধ্যে সেই সুর এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে তাঁত চালাইবার সময় তাঁতীরা শ্রম লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের নিত্যকর্মের সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের তাঁতীদিগের একটি বৃহৎ অংশ এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, অমুসলমান শ্রেণিভুক্ত তাঁত-ব্যবসায়িগণ সাধারণতঃ যুগী বা নাথসম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহাদের উভয়ের কর্মই অনুরূপ। সেইজন্য বিভিন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের এই বিষয়ক সঙ্গীতের ভিতর কিংবা বাহিরের দিক দিয়া বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করা যায় না। তবে কখনও কখনও ইহারা নিজেদের ধর্মানুমোদিত কোন কোন তত্ত্বকথা এই সম্পর্কে লঘু ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকে। তবে আধ্যাত্মিক ভাব অপেক্ষা লৌকিক ভাবই ইহাদের মধ্য দিয়া অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ব বাংলার মুসলমান তাঁতীদিগের মধ্য হইতে এই গীতটি সংগৃহীত হইয়াছে—

মরি হায় রে, আল্লা হায়,
আমি কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায়।
কলিকাতা আইসা আমি ঠেক্‌লাম বিষম দায়॥
আমি পরথমে বন্দনা করি শিক্ষাগুরুর পায়।
ঐ, যে-গুরুতে হাতে ধ'রে শিখায় ডাইনে বাঁয়॥
দেখেন, অন্য দফায় যেমন তেমন এই দফায় জোম।
ঠেইলা নিব এইভাবে শনি, রবি, সোম॥
তালিমে বলে মুন্সী চল হাটে যাই।
সোলার নৌকায় পাখায় উইঠা পরীক্ষা চালাই॥[১] ইত্যাদি

শ্রমিকগণ একযোগে কোন গুরুভার কর্ম সম্পাদন করিবার কালে কার্যের তালে তালে অনেক সময় একসঙ্গে কতকগুলি উক্তি সুর করিয়া বলিয়া থাকে, যেমন—

আরও জোরে—হেইও!
সাবাস্ জোয়ান—হেইও!
একটু আরও—হেইও!

১ চিত্তরঞ্জন দেব, ঐ পৃঃ ৩১৯

কোন পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবৎ এই প্রকার উক্তিকে শ্রম-সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা সঙ্গীত নহে, এমন কি ইহাদিগকে ছড়া বলিয়াও নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, ইহাদের মধ্যে ভাব ও রসগত কোন নিবিড়তা নাই। অতএব ইহাদিগকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত হয় না।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, শ্রম-সঙ্গীতের কোনও উচ্চাঙ্গ সাহিত্যিক দাবী নাই। ইহাদের মধ্যে যেমন ভাব কোথাও নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই রসও জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রত্যক্ষ কর্মের ভিতর দিয়া যেখানে অঙ্গ-সঞ্চালনই মুখ্য স্থান অধিকার করে, সেখানে ভাবের নিবিড়তা আশাও করা যায় না। তাল যেখানে মুখ্য হইয়া উঠে, সেখানে ভাব গৌণ হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। সেইজন্য কর্মসঙ্গীতগুলি প্রায় সর্বত্রই অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসের অর্থহীন অভিব্যক্তি মাত্র।

C. E. Gover, *Folk-Songs of Southern India* (London, 1872), p. 195-99.

তৃতীয় অধ্যায়

১ গীতিকা

ইংরেজি ballad কথাটিকে বাংলায় গীতিকা বলিয়া অনুবাদ করা হয়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যাপক প্রচলিত এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোক-গীতি (narrative folk-song)-কেই ইংরেজিতে ballad বলিত। ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় ইহার বিভিন্ন নাম ছিল, যেমন, ডেনমার্কের ভাষায় *vise*, স্পেনীয় ভাষায় *romance*, রুশ *bylina*, ইউক্রেনীয় *dumi*, সার্বিরীয় *junacka pesme* ইত্যাদি। সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া সকল দিক দিয়াই যে ইহাদের ভাব ও অঙ্গগত ঐক্য আছে, তাহা নহে—কেবল মাত্র এই সকল বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মোটামুটি মিল দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, ইহা আখ্যানমূলক হয়, ইহা আবৃত্তি করার পরিবর্তে গীত হয় ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়া ইহার লৌকিক বৈশিষ্ট্য (folk character) অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাৎ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে যে একটি বিশিষ্ট লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া গীতিকা রচিত হয় না এবং জনশ্রুতিমূলক (traditional) বিষয়ই ইহার ভিত্তি। ইহার মধ্যে রচয়িতার একটি আত্মনির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পায়। একটি মাত্র ঘটনাই ইহার লক্ষ্য, গীতি-সংলাপ ও ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী শেষ পর্যন্তদ্রুত সঞ্চারিত হইয়া যায়। একজন ইংরেজ সমালোচক গীতিকার এই প্রকার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, 'A ballad is a folk-song that tells a story with stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectively with little comment or intrusion of personal bias.' এই সংজ্ঞা হইতে গীতিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন, গীতিকায় বিশেষ একটি সঙ্কটপূর্ণ ঘটনামুখী কাহিনী থাকিবে, ঘটনা এবং সংলাপের ভিতর দিয়াই এই কাহিনী অগ্রসর হইবে, সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া লেখক একটি একান্ত বস্তুধর্মী কাহিনী ইহাতে বর্ণনা করিবেন। বিষয়গুলি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

গীতিকা সম্পর্কে প্রথম কথাই হইতেছে যে, একটি বিশিষ্ট কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইবে—এই কাহিনী শিথিলবদ্ধ হইলে চলিবে না বরং দৃঢ়বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কাহিনী মাত্রেরই কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ক্রিয়া (action), চরিত্র, পরিবেশ ও বিষয়-বস্তু। গীতিকার মধ্যেও ইহাদের প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া বা actionই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে—অন্যান্য বিষয় গৌণ হইয়া যায়। ইহা কাহিনী-প্রধান রচনা, চিত্র-প্রধান রচনা নহে। কিন্তু বিশেষ একটি কাহিনীর ধারা যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, তাহাও নহে। একটি আনুপূর্বিক কাহিনীর সঙ্কটময় কয়েকটি মুহূর্তের উপর জোর দিয়া ইহা বর্ণনা করা হয়—ইহাতে কাহিনীর বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির দোষ দূর হইয়া গিয়া ইহা নাটকীয় গৌরব লাভ করিতে পারে। একজন ইংরেজ সমালোচক এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'They present the narrative not as a continuous sequence of events but as a series of rapid off flashes and their art lies in the selection and juxtaposition of these flashes.' অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন কোনও কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া গীতিকা রচিত হয় না, বরং তাহার পরিবর্তে কাহিনীর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কতকগুলি ঘটনার উপর তীব্রতম আলোক-সম্পাত করিয়া ইহা রচিত হইয়া থাকে—বিভিন্ন আলোকোজ্জ্বল ঘটনা-মুহূর্তগুলির ভিতর দিয়া কাহিনী একটি সমগ্রতা লাভ করে। নিম্নে যে দুইটি পাশ্চাত্ত্য গীতিকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গীতিকার এই বৈশিষ্ট্য যে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পরিবেশের উপর গীতিকার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, দ্রুত সঞ্চারিত ক্রিয়া বা action-এর পটভূমিকায় ইহার পরিবেশটি অস্পষ্ট হইয়া যায়। কাহিনীর ক্রিয়া যেখানে গতিশীল, সেখানে ইহার পরিবেশ সর্বত্রই অস্পষ্ট হইয়া থাকে। চলন্ত গাড়িতে আরোহণ করিলে যাত্রীর চোখে পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্যসমূহ যেমন অস্পষ্ট হইয়া যায়, গীতিকার ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহার পারিপার্শ্বিক চিত্র সমূহও তেমনই অস্পষ্ট দেখায়। ইহার বিষয়-বস্তু অনেক সময় প্রত্যক্ষগোচর নহে, বরং অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দ্বারাই প্রকাশ করা হয়। ইহার চরিত্র সাধারণতঃ নাটকের মত এত সুস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ (individualistic)

নহে বরং এক একটি আদর্শ বা ছাঁদ (type) স্বরূপ। তবে কোন কোন সময় ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ'কথা সত্য যে, কোন চরিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের ভাব ফুটিয়া উঠিলেও, তাহা আনুপূর্বিক নাটকীয় চরিত্রের মত পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিতে পারে না—অধিকাংশ চরিত্রই অপরিণত ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ক্রিয়া বা actionই গীতিকার মূল আকর্ষণ। অনেক সময় এই ক্রিয়া উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণের অধিকারী হয়, ঘটনার উত্থান-পতন চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, ইহার ঘন-সন্নিবিষ্ট ঘটনাজালের মধ্য দিয়া কোন ফাঁক দেখা যায় না, অনাবশ্যক ঘটনা ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা ইহার মধ্যে পরিত্যক্ত হয় এবং কেবলমাত্র মূল ঘটনার প্রবাহই পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের ভাষায়, 'It sought to impress by the vivid representation of a single event, to bring home to the hearer, its wonder, its pathcs, its fatefulness, or its horror' অর্থাৎ ইহার কাহিনী এক-ঘটনামুখী হইয়া থাকে—এই ঘটনা নিতান্ত গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন না হইয়া বরং শ্রোতার মনে পরম বিস্ময়, সুগভীর কারুণ্য, চরম সঙ্কট ও লোমহর্ষক ভীতিভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি, কাহিনীর মধ্য দিয়াই ইহার প্রকৃত রস প্রকাশ পায়, শ্রোতৃবর্গের সমগ্র ঔৎসুক্য কাহিনীর ধারার উপরই ন্যস্ত থাকে, অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয় সেইজন্য তাহাদিগকে সহজেই ধৈর্যচ্যুত করে। অনেক সময় সহজবোধ্য আভাস ও ইঙ্গিতের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কাহিনীর দৈর্ঘ্য খর্ব করা হয়, প্রত্যক্ষ বর্ণনা অপেক্ষা এই সকল আভাস ও ইঙ্গিত হইতে কাহিনীর রসাস্বাদন করিতে শ্রোতৃবর্গের অধিকতর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়।

গীতিকা সর্বত্রই গীত হয়, কোথাও কেবল মাত্র আবৃত্তি করা হয় না; গীতের সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রও প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহার সুর গতানুগতিক। বাংলা পাঁচালী ও লাচাড়ীর মত বর্ণনাত্মক বিষয় প্রকাশ করিবার উপযোগী ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোক-সাহিত্যেও অনুরূপ সুর প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারাই প্রত্যেক দেশের গীতিকা সমূহ গীত হইয়া থাকে। ইহার সুর গতানুগতিক বলিয়াই বৈচিত্র্যহীন, বাহির হইতে বিবেচনা করিলে একঘেয়ে বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সুর গীতিকার

লক্ষ্য নহে ; কাহিনীই ইহার লক্ষ্য, সুর তাহার আশ্রয় মাত্র। সেইজন্য আনুপূর্বিক গতানুগতিক সুরে গীত হওয়া সত্বেও ইহা শ্রোতৃবর্গের অপ্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। এইখানে সাধারণ লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে গীতিকার পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ লোক-সঙ্গীত (folk-song) বিভিন্ন সুরে গীত হয়—তাহাতে সুরই মুখ্য, কথা গৌণ মাত্র, বরং কথা সুরের অধীন, কথার অধীন সুর নহে ; কিন্তু গীতিকায় ইহার বিপরীত—ইহাতে কথাই মুখ্য, সুর গৌণ মাত্র ; সেইজন্য সুরের বৈচিত্র্যহীনতা ইহাতে বিরক্তির উৎপাদন করে না।

লোক-সমাজেই গীতিকার উদ্ভব হইয়া থাকে—আদিম সমাজে ইহার উদ্ভব হইতে পারে না। ভূমিকায় লোক-সমাজ ও আদিম সমাজের পার্থক্য সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গীতিকা 'is the product of accomplished and often literary-conscious poets. The folk of the ballad have behind them a long tradition, a tradition partly conditioned and shaped by conscious and lettered culture. The folk are unlettered, rather than illiterate. They are homogeneous, interested in one another, in the dramatic aspects of life. They have a great store of traditional story stuff.'...অর্থাৎ গীতিকা শিক্ষিত ও প্রায়শঃ সচেতন কবিমনের সৃষ্টি। যে সমাজে ইহার উদ্ভব হয়, তাহার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য থাকে—এই ঐতিহ্য অংশতঃ একটি সচেতন শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহার অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টি নিরক্ষর হইলেও মূর্খ নহে, ইহার মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব ও জীবনের নাটকীয় রূপ সম্পর্কে সূক্ষ্ম কৌতূহল বর্তমান থাকে।

ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গীতিকা নিতান্ত সাধারণ কিংবা আদিবাসীর সমাজে উদ্ভূত হইতে পারে না। যে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রুতিমূলক সংস্কৃতির অধিকারী হইয়াছে, ইহা কেবল মাত্র তাহা দ্বারাই সৃষ্ট হইতে পারে—যে জাতির সাংস্কৃতিক জীবন দৃঢ়সংবদ্ধ নহে, তাহা দ্বারা ইহা কদাচ সৃষ্ট হয় না।

গীতিকা ছোট গল্পের মত একটি মাত্র কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। এখানেই ইংরেজি 'এপিক' কিংবা বাংলা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে

ইহার মূল ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজি 'এপিক' কিংবা বাংলা মঙ্গলকাব্যে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর ধারা থাকিলেও, তাহা সর্বদাই বিভিন্ন শাখা বা উপকাহিনীর ভারে মন্থরগামী হইয়া পড়ে, কিন্তু গীতিকায় তাহা হইবার উপায় নাই। ইহার মধ্য হইতে সকল বাহুল্য সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করা হয়। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'This stripping the story of all excrescenes of description, motivation, incidental material, and especially of editorializing, results not only in utter impersonality but in a "gapped" narrative in which the reader gets only the moments of most dramatic action.'[১]

উপরে ইউরোপীয় গীতিকার যে সকল লক্ষণের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া প্রচলিত সকল গীতিকার মধ্যেই যে সহজলভ্য তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে লোক-সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ ইহাই আদর্শ গীতিকার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। এই আদর্শ লক্ষণযুক্ত কোন গীতিকার সন্ধান যে কোথা হইতেও না পাওয়া যায়, তাহা নহে। এই সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক ডেন্‌মার্কের '*Sir Peter's Leman*' নামক গীতিকাটির উল্লেখ করিয়া অনুরূপ রচনাই ইউরোপীয় গীতিকার আদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা মাত্র বিয়াল্লিশটি পদে সম্পূর্ণ; এই একান্ত সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যেই ইহা এক জটিল নাটকীয় পরিবেশ রচনা করিয়া সুস্পষ্ট পরিণতি নির্দেশ করিয়াছে। কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

স্যার পিটরের এক প্রণয়িনী ছিল, নাম কার্স্‌টিন। তাহাদের মধ্যে বিবাহের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কার্স্‌টিন একদিন পিটরকে বলিল, 'তুমি যে দিন বিবাহ করিবে, সে'দিন আমি যতদূরেই থাকি না কেন, তোমার বাসরে উপস্থিত হইব।' ইহার পরই পিটরের বিবাহের ভোজ-সভার দৃশ্য—দেখা যাইতেছে—কার্স্‌টিন ইহাতে উপস্থিত আছে, সে পান-পাত্র পূর্ণ করিয়া মদ্য পরিবেষণ করিতেছে। পিটরের নবপরিণীতা বধূর দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। সে কার্স্‌টিনের পরিচয় জানিতে চাহিল। একজন পরিচারিকা বলিল, সে তাহার স্বামী পিটরের প্রণয়িনী। ইহার পরই দৃশ্য পরিবর্তিত

১ *SDFML*, p. 107.

হইয়া গেল—বর-বধূ বাসরে আসিয়া প্রবেশ করিল, কার্স্টিন জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া তাহাদের অগ্রবর্তিনী হইল। দম্পতির রাত্রি-যাপনের জন্য কার্স্টিন স্বহস্তে শয্যা-রচনা করিয়া দিল—

> The sheets of silk o'er the bed she drew,
> 'There lies the swain I loved so true.'

বর-বধূকে গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া জ্বলন্ত মশালটি হাতে লইয়া কার্স্টিন বাহির হইয়া আসিল; বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল। তারপর হাতের জ্বলন্ত মশালটি দিয়া সেই গৃহে আগুন ধরাইয়া দিল। মনে মনে এই ভাবিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে, 'bride must burn on the bride-groom's arm'. এইখানেই কাহিনীটির যবনিকা-পাত হইয়াছে। রচনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কেবল মাত্র কথোপকথনের ভিতর দিয়াই ইহার বর্ণনা শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত রচনাটির মধ্যে ঘটনার প্রবাহ যেন প্রলয়ের শক্তি অর্জন করিয়াছে।

উত্তর অতলান্তিক প্রদেশ হইতে সংগৃহীত আর একটি গীতিকার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুইটি গীতিকা হইতেই পাশ্চাত্ত্য গীতিকা সমূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকটা ধারণা হইবে। এই গীতিকার নাম *Fair Sally*; ইহার কাহিনীটি এই—

সেলী সুন্দরী ও অভিজাত-বংশীয়া ধনি-কন্যা। একটি দরিদ্র যুবক তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইল। সে সেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

> 'O Sally! O Sally! O Sally!' said he,
> 'I fear that your love and mine cannot agree,
> Unless all your hatred should turn into love,
> For your beauty's my ruin, I'm sure it will prove'.

সেলী তাহাকে ঘৃণা করে না; কিন্তু বুঝিতে পারে যে, তাহাকে ভালবাসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। দারুণ আঘাত পাইয়া যুবকটি ফিরিয়া গেল। কিন্তু সহসা একদিন সেলীর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে তাহার প্রত্যাখ্যাত যুবকটিকেই ভালবাসিয়া ফেলিল। তাহাকে পুনরায় নিজের কাছে ডাকিল। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু যুবক ক্ষমা করিল না, বরং প্রতিহিংসায়

জলিয়া উঠিয়া বলিল, 'I'll dance on your grave when you're laid in the earth.' সেলী মরিল, শুনিয়া যুবকের মন বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল ;

Said he, 'I'll retire, and lay by her side,
I'll wed her in death, and I'll make her my bride!'

এইখানেই গীতিকাটির সমাপ্তি। দৈর্ঘ্যে ইহা পূর্বোক্ত গীতিকাটিরই সমান ; ইহার মধ্যেও ঘটনা-প্রবাহ প্রায় পূর্বোক্ত গীতিকাটির মতই ক্ষিপ্রগামী, উভয়ই বিয়োগান্তক, উভয়ের কাহিনীই ব্যর্থ প্রেম-মূলক। বিষয় ও ভাবের দিক দিয়া পাশ্চাত্ত্য গীতিকাগুলি অধিকাংশই এই প্রকার; তবে ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও আছে।

গীতিকা নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত, সেইজন্য ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবার কতকগুলি সহজ প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধানই কোন কোন অংশের পুনরুক্তি ; ইংরেজিতে ইহাকে refrain বলে। বাংলায় (ধুয়া বা ধ্রুবপদ) নামক একটি শব্দ আছে, ইহা দ্বারা ইংরেজি refrain কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয় না। ধুয়ার পদ সাধারণতঃ একটি মাত্র হইয়া থাকে, ইহার অধিক হয় না, ইহা অনেক সময় গীত-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রও হইয়া থাকে। কিন্তু refrain-এ অনেক সময় অধিক সংখ্যক পদও থাকে এবং পদগুলি গীত-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য refrain কথাটিকে ধুয়া বলিয়াই এখানে অনুবাদ করা যাইবে, ইহার অন্য কোন প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হইবে না। ইংরেজি ও জার্মেন গীতিকায় ধুয়া ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন থাকিলেও, ইহা গীতিকার একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলিয়া পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ স্বীকার করেন না। ধুয়া ব্যতীতও গীতিকায় কতকগুলি বাঁধা-ধরা শব্দ ও শব্দসমষ্টি প্রায়ই বার বার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা পরে দেখিতে পাইব, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য-গুলি বাংলা গীতিকায়ও প্রচলিত আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্যের জন্যই এক দেশের গীতিকা অপর দেশের গীতিকা হইতে বাহ্যতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়।

গীতিকার উৎপত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যে প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীনতর সমালোচকগণ গীতিকা ও লোক-সঙ্গীতের

মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত গীতিকাও কোন সংহত সমাজের ঐক্যবদ্ধ সৃষ্টি। কালক্রমে এই মত সামান্য পরিবর্তিত হইল। তখন মনে করা হইত যে, ব্যক্তি-বিশেষের অধিনায়কত্বে সমাজের জনসাধারণ ইহা রচনা করিত—যিনি ইহার রচনা-কার্যে অধিনায়কত্ব করিতেন, তিনি ইহার সম্পাদন-কার্য করিতেন মাত্র—ইহার অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিয়া সামগ্রিক ভাবে ইহার ভিতর হইতে একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটাইয়া তুলিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ এই উভয় মতই পরিত্যাগ করিয়া ইহা ব্যক্তি-প্রতিভার একক সৃষ্টি বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, গীতিকা ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্ত্য মধ্যযুগের সৃষ্টি, তাহার পূর্ববর্তী সৃষ্টি নহে; ইহার একটি উন্নত শিল্পগুণ আছে, ইহার গঠন-কৌশলও জটিল, সঙ্গীত ইহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—ব্যক্তি-বিশেষের সচেতন শিল্পমন ব্যতীত ইহার রূপায়ণ সম্ভব হইতে পারে না; অতএব ব্যবসায়ী গায়ক-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের ইহা রচনা। নূতন নূতন গায়কের মুখে পড়িয়া ইহা কখনও উন্নত, কখনও অবনত হইয়াছে। তারপর সমাজের মধ্যে যখন তাহা প্রচার লাভ করিয়াছে, তখন জনসাধারণ নিজেদের রুচি অনুযায়ী তাহা পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছে, তাহার ফলেও ইহা কখনও উন্নত, কখনও বা আবার অবনত হইয়াছে। ক্রমে ব্যক্তি-বিশেষের পরিচয় ইহার রচনার মধ্য হইতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়া সমাজের পরিচয় ইহাতে মুদ্রিত হইয়া যায়—তখনই ইহা সমগ্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ রচনা বলিয়া ভুল হয়।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদিগের মধ্যে গীতিকার উদ্ভব সম্পর্কে মতভেদ যাহাই থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, ইহা আদিম বা অসভ্য সমাজের সৃষ্টি নহে—ইহা উন্নততর বা সভ্য সমাজেরই সৃষ্টি। আদিম সমাজে সঙ্গীতের অস্তিত্ব থাকিলেও গীতিকার অস্তিত্ব নাই; লোক-সঙ্গীত আদিম জাতির সঙ্গীত (tribal song) অপেক্ষা জটিলতর সৃষ্টি, এই জটিলতা শিল্পানুগ যথেচ্ছ সৃষ্ট নহে। অতএব ইহা আদিম সমাজ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। 'এপিক' রচনার পরবর্তী যুগে গীতিকা বা ballad-এর উদ্ভব হইয়াছে। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'culturally the ballad everywhere is post-epic.' এই মতটির উপর কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক অত্যন্ত

জোর দিয়া থাকেন। কারণ, অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, 'এপিক' হইতে বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়াও গীতিকা রচিত হইয়া থাকে।

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক মনে করিয়া থাকেন যে, গীতিকা মধ্য-যুগীয় ইউরোপীয় রোমান্সেরই এক একটি সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। '…the ballad "was usually a precis of a romance" by a selection of "the salient points" and…it developed "certain poetical features of its own" by reason of this relationship'. ইহাদের মতে গীতিকা মধ্য-যুগীয় ইউরোপের সাহিত্য-অবশেষ লইয়াই রচিত, বিষয়-বস্তু কিংবা প্রেরণার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে অভিনবত্ব কিছু মাত্র নাই। আধুনিক কোন কোন সমালোচক এই উক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা মান করেন, গীতিকা মধ্যযুগীয় রোমান্টিক সাহিত্যের অঙ্গ নহে; ইহা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, লোক-সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করিয়া ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে।

গীতিকার উদ্ভব যে সময়ই হউক না কেন, ইহার সম্বন্ধে একটি কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, ইহার মধ্যে কেবল মাত্র সমসাময়িক ভাব ও বস্তুরই যে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় তাহাই নহে, 'but also the fossil remains of the lore of the folk reaching back to remote antiquity.' এই সকল 'প্রস্তরীভূত' আদিম উপকরণ সমূহের মৌলিক তাৎপর্য লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভিতর হইতে জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ এখনও সংগৃহীত হইতে পারে। গীতিকার প্রধান আবেদনই রসের আবেদন। 'It is often magnificent poetry with beauty and definitiveness. The felicity of its lines, its moving stories, its suggestiveness and evocations are all of the high order of poetry. It often gives a deep reading of life, concerned as it is so frequently with central matters, such as love and death, and presenting these matters with the simplicity and directness of Greek drama.'[১]

ভারতীয় লোক-সাহিত্যে এ'পর্যন্ত যত গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য গীতিকা-সুলভ বৈশিষ্ট্যের সর্বত্রই যে সাক্ষাৎকার

১ ibid, p. 111.

লাভ করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যেরই অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ইহার প্রধান কারণ, দেশে এবং কালে মানুষ যতই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়ুক, তথাপি তাহার কতকগুলি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন বৃত্তি আছে; লোক-সাহিত্য সেই অন্তর্নিহিত সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হয়; অতএব পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোক-সাহিত্যের বহিরঙ্গগত যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, ইহাদের অন্তরগত পরিচয়ের মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গুণেই ভারতীয় লোক-কথা (folk-tale) একদিন ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চল আয়র্ল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইউরোপের কোন গীতিকা যে ভারতবর্ষে প্রচার লাভ করিয়াছে, কিংবা ভারতবর্ষের কোন গীতিকার বিষয়-বস্তু যে ইউরোপে নীত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, শাশ্বত মানবিকতার চিরন্তন বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া গীতিকাগুলি প্রত্যেক দেশেই স্বতন্ত্র ভাবে রচিত হইয়াছে বলিয়াও স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে ইউরোপীয় গীতিকাসমূহের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে—ভারতীয় গীতিকাসমূহ বর্ণনা-প্রধান, ইউরোপীয় গীতিকা-সমূহ ঘটনা-প্রধান। ইহা ভারতীয় চরিত্রেরই একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘটনার প্রবাহ অপেক্ষা ইহার পারিপার্শ্বিক বর্ণনার উপরই এই দেশের দৃষ্টি অধিকতর নিবদ্ধ থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'কাদম্বরী' নামক সংস্কৃত গদ্যকাব্যের সমালোচনায় ভারতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতীয় লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গীতিকাও ভারতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। সেইজন্য উপরে ডেনমার্ক দেশের গীতিকা *Sir Peter's Leman*-এর যে সংক্ষিপ্ততা-গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ভারতীয় গীতিকার মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ভারতীয় গীতিকা অনেকটা 'এপিক'-ধর্মী—কাহিনী অনেক সময় ইহাতে গৌণ হইয়া পড়িয়া পারিপার্শ্বিক বর্ণনাই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়া যায়। ভারতীয় গীতিকা সমূহের কেবল মাত্র এই বৈশিষ্ট্যটি বাদ দিলে, ইহাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য গীতিকাসমূহের আর

যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে, তাহা নহে। এই সম্পর্কেও একটি কথা মনে হইতে পারে যে, যখন ভারতীয় গীতিকাগুলি সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তখন ইহারা বর্ণনা-প্রধান না হইয়া ঘটনা-প্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়—লোক-পরম্পরায় প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনাগুলি কালক্রমে ইহাদের মূল কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী গীতিকা-গায়ক আছে; তাহারাই পুরুষানুক্রমিক গীতিকার ভাণ্ডার নিজেদের মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ নিরক্ষর, সেইজন্য স্মৃতিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীরের মুসলমান গীতিকা-ব্যবসায়ী, রাজপুতানার চারণ, মধ্য প্রদেশের পর্‌ধান, বাংলার ভাট—ইহারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে গীতিকা-পরিবেষণ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত; আজ তাহাদের ব্যবসায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোক-সাহিত্যের এক অমূল্য ভাণ্ডার বিস্মৃতির ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে চলিয়াছে।

উত্তর ভারতের লোক-গীতিকার মধ্যে একটি বহিঃপ্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভব করা যায়—তাহা পারসী ও আরবী কথা-সাহিত্যের প্রভাব। পারসী ও আরবী কথা-সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ কথা-সাহিত্য। দীর্ঘকাল যাবৎ উত্তর ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, তাহার ফলে এই দেশের গীতিকা-সাহিত্যেও তাহার প্রভাব অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কথা-সাহিত্যের সঙ্গে গীতিকা-সাহিত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; কারণ, গীতিকাও কথা বা কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। অতএব একদিক দিয়া এই বিষয়ক ভারতীয় নিজস্ব সমৃদ্ধি, অপর দিক দিয়া ইহার উপর দুই অনুরূপ সমৃদ্ধ সাহিত্যের প্রভাবের ফলে ইহাতে যে রস-বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পৃথিবীর যে-কোন সমৃদ্ধ দেশের গীতিকা-সাহিত্যের সঙ্গেই তুলনা করা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভারতীয় গীতিকা-সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে তাহার বিশেষ সঙ্গতি রক্ষা পায় নাই। ইহার কারণ, বহিরাগত মুস্‌লিম কথা-সাহিত্যের প্রভাব। প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যের প্রভাব কেবল মাত্র উচ্চতর শ্রেণীর পাঠকের

মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু মুস্‌লিম কথা-সাহিত্যের প্রভাব সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতীয় গীতিকার মধ্যে তাহার প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সকল অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের প্রভাব ব্যাপকতর হইয়াছিল, ভারতের সেই সকল অঞ্চলেই গীতিকা-সাহিত্যও অধিকতর পুষ্টিলাভ করিয়াছে—কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলাই ইহার প্রমাণ।

বাংলাদেশ হইতে এ'পর্যন্ত যে সকল গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ নাথ-গীতিকা, দ্বিতীয়তঃ মৈমনসিংহ-গীতিকা ও তৃতীয়তঃ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে যে তিনখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাই মৈমনসিংহ জিলা হইতে সংগৃহীত, অতএব ইহাদের এই দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাও মৈমনসিংহ-গীতিকারই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের স্থূল বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক এখন আলোচনা করা যাইবে।

বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে পূর্বোল্লিখিত গীতিকাগুলির মধ্যে নাথ-গীতিকাগুলি একটু স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইবে। একটি মাত্র ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া সমস্ত নাথ-গীতিকা রচিত হইয়াছে, রচনার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও বিষয়-গত পার্থক্য ইহাদের মধ্যে কিছু মাত্র নাই। অবশ্য গীতিকায় জনশ্রুতিমূলক বিষয়-বস্তু সর্বদাই অবলম্বন করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গীতিকার বিষয়-বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া কোনদিনই ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। ইহার কারণ, ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে গীতিকার সীমায় উত্তীর্ণ হইবা মাত্র ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ এক নূতন লৌকিক রূপ ধারণ করে, ইহার ঐতিহাসিকত্ব আর রক্ষা পাইতে পারে না। ইহা তখন লোকশ্রুতির সমধর্মী হইয়া দাঁড়ায়। নাথ-গীতিকাও এই শ্রেণীরই ঐতিহাসিক রচনা। ইতিহাসের কোন বিস্মৃত যুগে এক রাজপুত্র মাতার নির্দেশে তরুণ যৌবনেই দুই নব-পরিণীতা বধূ প্রাসাদে রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্তটিই নানাদিক হইতে নাথ-গীতিকাগুলির মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে; ইহাই কেন্দ্র করিয়া সমগ্র নাথ-গীতিকার উদ্ভব। ইহার মধ্যে রাজা, রাণী, রাজপুত্র ও রাজবধূ প্রভৃতির

ঐতিহাসিকত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাদের নামগুলির মধ্যে কেবল মাত্র তাঁহাদের ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিয়া ইহারা জনশ্রুতির রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছেন।

যে-কোন ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুই যে লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা নহে। যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে যথার্থ মানবিকতার স্পর্শ আছে, কেবল মাত্র তাহাই লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইতে পারে। যে মূল ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুটি অবলম্বন করিয়া নাথ-গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহার একটি সর্বজনীন মানবিক আবেদন ছিল, তাহা না হইলে কেবল মাত্র রাজা ও রাজপুত্রের ঘটনা বলিয়াই তাহা লোক-সাহিত্য কিংবা উচ্চতর সাহিত্য কোথাও স্থান লাভ করিতে পারিত না। এই নাথ-গীতিকাগুলি ব্যতীত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কিংবা 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় প্রকাশিত অন্য কোন গীতিকায় যে ঐতিহাসিক উপাদান নাই, তাহা নহে; কিন্তু নাথ-গীতিকার সঙ্গে ইহাদের একটি পার্থক্য এই যে, নাথ-গীতিকায় ইহাদের ঐতিহাসিক রূপ কখনও অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই—উপরোক্ত অন্যান্য গীতিকায় সেই রূপটি প্রায় সর্বত্রই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাথ-গীতিকার চরিত্রগুলি এখনও অতীতের ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য গীতিকার চরিত্রগুলি বর্তমান সাধারণ জনসমাজের মধ্যে একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে—ইহাদের ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই।

নাথ-গীতিকাগুলি বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন হইলেও, ইহারা বিষয়ের সর্বজনীনত্বের গুণে বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বাংলার অন্য কোন গীতিকার এই সৌভাগ্য হয় নাই। অবশ্য ইহার কারণ ছিল। একটি সর্বজনীন আবেদন থাকা সত্ত্বেও নাথ-গীতিকাসমূহ একটি সর্বভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়কে অবলম্বন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজপুত্রের অপূর্ব আত্মত্যাগের পরও নাথগুরুদিগের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথাও কীর্তন করা হইয়াছে। বাংলার আর কোন গীতিকায় বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িকতা-বোধ জনিত এই প্রকার অলৌকিকত্বের প্রচার করা হয় নাই। প্রধানতঃ এই জন্যই নাথ-গীতিকা অপেক্ষা অন্যান্য গীতিকার প্রচার অনেক সীমাবদ্ধ। নাথসম্প্রদায়ভুক্ত গুরুবাদী যোগিগণ তাঁহাদের গুরুর অলৌকিক মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গেই প্রধানতঃ এই

গীতিকা দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন—তাহার ফলে কেবল মাত্র বাংলার প্রতিবেশী প্রদেশসমূহেই নহে—সুদূর পাঞ্জাব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানেও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বাংলার নাথ-গীতিকার কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য গীতিকা ইহাদের নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

নাথ-সম্প্রদায় বিষয়ক রচনার মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ আছে—একটি নাথগুরুদিগের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনী—আর একটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনী। প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে এ যাবৎ যে সকল গীতিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 'গোরক্ষ-বিজয়', 'মীনচেতন' নামে পরিচিত ; দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে যে সকল গীতিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'গোবিন্দ চন্দ্রের গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি নামে পরিচিত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গীতিকার মধ্যে একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার নায়ক-চরিত্র গোরক্ষনাথ একটি সমুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার গুরু মীননাথকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে নাথধর্মের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কীর্তন থাকিলেও মানব-জীবনের একটি চিরন্তন দুর্বলতার কথাও প্রচার করা হইয়াছে। এই গুণেই ইহা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী। সাধন-ভজনের কৃত্রিম অভ্যাস দ্বারা আচ্ছন্ন মানবের রক্তমাংসের বেদনা যে কত তীব্র হইয়া উঠিতে পারে, মীননাথের জীবনে তাহাই দেখা গিয়াছে। সিদ্ধগুরু মীননাথ রমণীর মোহ-পাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সমগ্র সাধন-ভজনে জলাঞ্জলি দিলেন, পুত্রতুল্য শিষ্যের নিকট এই নির্লজ্জ উক্তি করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না,

> ষোল শয় কদলী মোরে সেবিতে আছে নিত।
> তাহার অধিক আর কি আছে পৃথিবীত॥

রমণীর মোহ তাঁহার নিকট আজ জীবনের চরম সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে ; আধ্যাত্মিক সাধনার পথে ইন্দ্রিয়-লালসার এই দুর্জয় বাধার কাহিনী পৃথিবীর বহু দেশেই, কেবল মাত্র লোক-সাহিত্য নহে, উচ্চতর সাহিত্যেরও বিষয়ীভূত হইয়াছে। অতএব সম্প্রদায়গত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রচিত

হইলেও একটি চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা ইহার অবলম্বন বলিয়া 'গোরক্ষ-বিজয়', 'মীন-চেতন' গীতিকাও লোক-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত—কোন সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অন্তর্গত নহে। ইহার আরও একটি প্রমাণ এই যে, নাথধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবের যুগে এই গীতিকাগুলি রচিত হইলেও, আজ যে যুগে এ'দেশের সমাজ হইতে নাথধর্মের সকল প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখনও এই গীতিকা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের যদি কেবল মাত্র ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যই থাকিত, তবে নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহারা সীমাবদ্ধ থাকিত এবং নাথধর্মের প্রভাব লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারাও লুপ্ত হইয়া যাইত।

'গোরক্ষ-বিজয়' ও 'মীন-চেতন' এই দুইটি স্বতন্ত্র নামে ইহার বিভিন্ন পুঁথি সংগৃহীত হইলেও, ইহারা মূলতঃ একই। লোক-সাহিত্যের ইহা একটি স্বাভাবিক ধর্ম মাত্র। ইহার যতগুলি পাঠ যত বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হয়, ততই ইহাদের মধ্যে পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই গীতিকাগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবসায়ী গায়েনদিগের মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে; মুখে মুখে প্রচলিত হইবার জন্যই ইহাদের মধ্যে পাঠ-বৈচিত্র্যও দেখা দিয়াছে—তথাপি ইহার কেন্দ্রীয় কাহিনীটির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই গীতিকাগুলি সম্পর্কে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমাজের চিত্র খুব স্পষ্ট নহে। ইহার চরিত্র গোরক্ষনাথ, মীননাথ, শিব, চণ্ডী, যোগিনী, মঙ্গল-কমলা ও অন্যান্য কদলী নারী বাস্তব জগতের অধিবাসী নহে। যদিও পল্লীকবিগণ ইহাদের মধ্য দিয়া শাশ্বত মানবিক বৃত্তিগুলিই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তথাপি একটি পরিচিত পরিবেশের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পায় নাই বরং একটি রোমাণ্টিক পরিবেশের ভিতর দিয়াই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য গীতিকাগুলির মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য কতকটা প্রকাশ পাইলেও, নাথ-গীতিকার মধ্যেই এই ভাবটি অধিকতর পরিমাণে অনুভব করা যায়। সেইজন্যই ইহা-দিগকে একটু স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা স্বতন্ত্র নহে, বাংলা সাহিত্যের লৌকিক ধারার সঙ্গে ইহাদের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ আছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গোরক্ষনাথ মীননাথের সন্ধান

করিতে করিতে কদলীপত্তনে গিয়া উপস্থিত হইলে এক যোগিনী তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল—

নয়ানে নয়ানে চাহ হাত লাড়ি কথা কহ
চল যোগী আহ্মার যে বাড়ী

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও অনুরূপ চরিত্র নয়ানী বিদেশী যুবক লাউসেনকে দেখিয়া বলিল,

এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে॥

ভারতচন্দ্র রচিত 'বিদ্যাসুন্দরে'র মালিনীও অনুরূপ অবস্থায় বিদেশী যুবক সুন্দরকে গিয়া বলিল,

কাঙ্গালী দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা এস আমার আলয়॥

অতএব দেখা যাইতেছে, 'গোরক্ষ-বিজয়' বাংলা লোক-সাহিত্যের ধারার সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ। অতএব ইহাদের ধর্মীয় আবেদন যাহাই থাকুক না কেন, ইহা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

এইবার নাথ-সাহিত্যের অন্যতম বিভাগ মাণিকচন্দ্র রাজার গান ও গোপী-চাঁদের সন্ন্যাসের লোক-সাহিত্যগত দাবি সম্পর্কে আলোচনা করিব।

সমুচ্চ আদর্শের প্রভাবে 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র বাস্তব মূল্য যদি কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াও থাকে, তথাপি মাণিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের গানে তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট ভাবেই অনুভব করা যায়। ইহাতে তরুণ রাজপুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের যে বৃত্তান্তটি আছে, তাহার একটি সহজ মানবিক আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ রাজপুত্র কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই—তিনি সংসার-ভোগে আসক্ত হইয়াই জীবন যাপন করিতে-ছিলেন। মাতার নিকট হইতে একদিন আকস্মিকভাবে তাঁহার সন্ন্যাসের নির্দেশ আসিল। তাঁহার পত্নীর প্রতি অপরিসীম প্রেম, ভোগের প্রতি আকণ্ঠ আসক্তি ইত্যাদির উপরই আকস্মিক বজ্রপাত হইল। তিনি মাতার নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। রামচন্দ্রের মত গুরুজনের আদেশ সর্বান্তঃকরণে মাথায় তুলিয়া না লইয়া তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ভোগের স্পৃহা তাঁহার সন্ন্যাসের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। এই গীতিকাগুলির

মধ্যে ঐহিক ভোগ-তৃষ্ণারই জয়গান শুনিতে পাওয়া যায়। মাতার নির্দেশ শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইল; কিন্তু এই স্বীকৃতি প্রবলতর শক্তির নিকট দুর্বলের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নহে। সেইজন্য সন্ন্যাসের পথে পা বাড়াইয়াও ভোগের প্রাসাদের দিকে তাঁহাকে বার বার চোখ ফিরাইয়া তাকাইতে হইয়াছে। এই শাশ্বত মানবিক ধর্মের জন্যই মাণিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের গান সহজেই মানব-মন অধিকার করিয়াছে, নাথধর্মের মাহাত্ম্যের জন্য নহে। বিগত শতাব্দী হইতে ইহার যে সকল পাঠ বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কোথাও কোন নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত হয় নাই বরং হিন্দু-মুসলমান সাধারণ কৃষক-সমাজের মধ্য হইতেই তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক পরিচয় কালক্রমে ইহাদের মধ্য হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নাথ-গীতিকাগুলি একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উচ্চ নৈতিক আদর্শ অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে মানব-মনের স্বাধীন অনুভূতি সমূহ সহজভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, সমাজ এবং নীতি-নির্দিষ্ট পথে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য অসামাজিক কোন অনুভূতি ইহাতে স্থান দেওয়া হয় নাই। দাম্পত্য জীবন কেন্দ্র করিয়াই ইহার প্রেম এবং সমাজ-সম্মত জীবনই ইহার জীবন। এই বিষয়ে মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার গীতিকাগুলি একটু স্বতন্ত্র। ইহারা সমাজ-ধর্মনিরপেক্ষ। যদি কোন ধর্ম ইহাদের মধ্যে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা মানবিকতার ধর্ম। যেখানে সকল মানুষই এক, সেই স্থানটিই ইহাতে সন্ধান করিয়া তাহারই বিচিত্র রূপ ইহাদের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে, মানুষের বাহিরের পরিচয় বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে। নাথ-গীতিকার সামাজিক শুচি ও সংযম অন্যান্য পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় নাই।

নাথ-গীতিকাগুলি প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গেই প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেখানে ইহা যুগীযাত্রা নামে পরিচিত। রংপুর জিলার মুসলমান কৃষকদিগের মুখে এই গান শুনিতে পাইয়া স্যার জন্ গ্রীয়ারসন্ তাহা লিখাইয়া লন এবং 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' এই নাম দিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। সেই সময় হইতেই এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ফলে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ইহারই বিভিন্ন পাঠ সংগৃহীত হইয়া

প্রকাশিত হয়। এই গীতিকার নায়ক গোপীচাঁদ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। ত্রিপুরা জিলা তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া মনে করা হয়। নাথ-গীতিকার কোন কোন পুঁথি পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু উত্তর বঙ্গেই ইহার সর্বাধিক প্রচার হইয়াছিল।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' মৈমনসিংহ জিলার পূর্বভাগ বিশেষতঃ নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই প্রচলিত, সদর মহকুমার পূর্বাংশও এই সীমার সহিত সংযুক্ত। যে ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহ জিলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, তাহার পূর্বভাগই মৈমনসিংহ-গীতিকার উৎপত্তি ও প্রচার স্থল, পশ্চিমভাগ নহে। সেইজন্য 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র যথার্থ নাম 'পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকা'ই হইতে পারে। তারপর পূর্বেই বলিয়াছি, 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে তিন খণ্ড গীতিকা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাই মৈমনসিংহ জিলার উপরোক্ত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, অবশিষ্ট গীতিকাগুলির মধ্যে একটি মাত্র ব্যতীত সকলগুলিই উত্তর বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বীরভূম জিলা হইতে একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির রচনাও ইহাদের একটি খণ্ডের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, ইহার নাম 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া'। ইহা গীতিকা নহে; কারণ, ইহাতে কোন বিশিষ্ট কাহিনী নাই, কেবল একটি ঘটনারই বর্ণনা আছে মাত্র, গীতিকাগুলির সম্পাদক স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাকে 'ছড়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র সংগ্রহে ইহা মুদ্রিত হইবার অবশ্য কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না।

(আঙ্গিকের দিক দিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই গীতিকা-গুলির মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। কাহিনী বর্ণনার যে গতানুগতিক রীতি এ'দেশে প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারা এইগুলি রচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবও অনুভব করা যায়। গীতিকা মাত্রই প্রচলিত রচনা-রীতির অনুগামী; ছড়ার বিষয়-বস্তুর মধ্যে যেমন আকস্মিকতা ও অভিনবত্ব অনেক সময় চোখে পড়ে, তেমনই ছন্দের দিক দিয়াও অনেক সময় নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতিকার রচনা-রীতিতে কোন

বৈচিত্র্য নাই। এই ছন্দে ইহা আনুপূর্বিক রচিত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র একটি গীতিকাই যে আনুপূর্বিক অভিন্ন ছন্দে রচিত হয়, তাহা নহে—ইহা রচনার দ্বিতীয় আর কোন ছন্দই নাই ; একই পরিচিত ছন্দ ইহার সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন,

| | | | | | | | | | | | | | ॥
পূবেতে বন্ দনা করলাম্ পূবের্ ভানু শ্বর্। =১৪
| | | | | | | | | | | | | ॥
একদিকেউ দয়্ রে ভানু চৌদিকে প সর্। =১৪

ইহা ছড়ারই ছন্দ ; তবে ছড়ার ছন্দে আরও বৈচিত্র্য আছে, ইহাতে আর কোনও বৈচিত্র্য নাই—কেবলমাত্র স্বরাঘাত দ্বারা মাত্রা রক্ষা করিয়া ইহা শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যায়। যদি কোথাও কোন মাত্রার অভাব হয়, তবে উচ্চারণ দ্বারা তাহার ক্ষতি পূরণ করিয়া লওয়া হয়। উদ্ধৃত পদ দুইটি চারি মাত্রার পর্ব, শেষ পর্বটি আপাতদৃষ্টিতে অপূর্ণ। ক্বচিৎ কোন গীতিকায় মধ্য বাংলার অন্য কোন রচনার প্রভাব বশত চারি মাত্রার পর্বকে ছয় মাত্রা কিংবা আট মাত্রার পর্বে বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে।

হিন্দু-মুসলমান প্রমুখ উচ্চতর সমাজের কোন নীতি অবলম্বন করিয়া পূর্ববঙ্গ-গীতিকাগুলি যে রচিত হয় নাই, সে'কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। অতএব এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক আদর্শ দ্বারা ইহাদের নীতি বিচার করা যায় না। একটি আদিম সামাজিক সংস্কারের উপরই ইহাদের ভিত্তি, কিন্তু তথাপি এ'কথা সত্য যে, সেই আদিম সমাজের উপর কালক্রমে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ-নীতিরও শাসন কোন কোন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। তাহার ফলে গীতিকাগুলিব মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। কেবল মাত্র নিরবচ্ছিন্ন আদিম সংস্কারই যদি ইহাদের ভিত্তি হইত, তাহা হইলে ইহাদের কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এত সহজে ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। আদিম জাতির সংস্কারের সঙ্গে এখানে উচ্চতর জাতির সংস্কার সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই কাহিনীর দিক দিয়া এখানে এত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে।

ব্যর্থ বা অভিশপ্ত প্রেমই গীতিকাগুলির প্রধান উপজীব্য ; প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃসংস্কারের সংঘাত যে কত

প্রবল, তাহাই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার জীবন বাস্তব, জগৎ সত্য ও ভাষা জীবন্ত। বাংলা 'উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে ময়মনসিংহ-গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 'আমাদের বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, ঘন-বিন্যস্ত তরুলতার দুর্ভেদ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি-পার্বত্য-নদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-সঙ্কুলতা আছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও নম্র কমনীয়তা ও ধর্মানুরাগের সহিত একটা দুর্দমনীয় তেজস্বিতা, দৃপ্ত আত্ম-সম্মানবোধ ও আবেগের অন্ধ মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনার্য রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই আর্য সভ্যতা ও ধর্মসংস্কৃতির প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা এই আরণ্য বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যাহা বঙ্গসাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।'[১]

কোন কোন গীতিকায় যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহারা খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল। যদিও ইহাদের ভাষায় এই প্রাচীনতা রক্ষা পাইবার কথা নহে এবং তাহা পায়ও নাই, তথাপি ইহাদের বিষয়-বস্তু হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর যে সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তাহার সঙ্গে গীতিকাগুলির ভাব-গত ঐক্য নাই—ইহার তাৎপর্য অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

একটি বিষয় এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন সে'যুগে সম্পন্ন হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপের নাটমন্দিরে মঙ্গল গান কিংবা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কথকতার আসর বসিত, তখন সমাজের নিম্নস্তরের লোক, যাহাদের সেই আসরে প্রবেশাধিকার ছিল না, তাহাদের সাহিত্য সৃষ্টি ও তাহার রসাস্বাদন নিরুদ্ধ হইয়া ছিল না; কারণ, তাহা কদাচ এমন নিরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা নিজেদের সাহিত্য নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইয়া তাহা হইতে নিজেদের ভাবেই রসাস্বাদন করিয়াছে। মধ্যযুগের উচ্চতর সমাজের সাহিত্য-সাধনার ধারাটির সঙ্গে হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমাদের পরিচয় স্থাপিত

[১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৩৯), ২০

হইলেও সে'যুগের নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের এ'যাবৎ কোনও পরিচয় স্থাপিত হইতে পারে নাই ; সেইজন্য পূর্ববঙ্গ-গীতিকা-গুলির ভাবগত অভিনবত্ব আধুনিক সমালোচকদিগের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছে। কিন্তু এ' কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মধ্যযুগের যে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের এই যুগে পরিচয় হইয়াছে, তাহাই বাংলা-দেশের মত জনবহুল ও সুসংবদ্ধ সমাজের একটি দীর্ঘ যুগের সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় নহে—মুকুন্দরাম প্রমুখ মধ্যযুগের কোন কোন কবি যে পুরাণানুগ দেব-মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার অবকাশেও পার্থিব নরনারীর সুখদুঃখ-বেদনার বাস্তব অনুভূতি রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা সেই যুগের সাহিত্যে যে কোনও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস মাত্র হইতে পারে না, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নিরক্ষর জনসাধারণ কর্তৃক রচিত লোক-সাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে পার্থিব নরনারীর সুখদুঃখের অনুভূতিসমূহ মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিয়া সে'যুগের দেবমাহাত্ম্যসূচক কাব্যগুলিকেও যে 'আবিল' করিয়া তুলিয়াছে, মুকুন্দরাম প্রমুখ মধ্যযুগের কয়েকজন বাস্তবধর্মী কবি হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ ও একক সাধনা মধ্যযুগে অজ্ঞাত ছিল। সেইজন্য মুকুন্দরাম প্রমুখ কয়েকজন কবির মধ্যে যে পার্থিব অনুভূতির প্রত্যক্ষ ধারাটির সঙ্গে পরিচয় লাভ করি, তাহাও তাঁহাদের সমসাময়িক একটি স্বতন্ত্র সাধনার স্বাধীন ধারা হইতেই আসিয়াছে। সেই ধারাটিই বাস্তব নরনারীর সুখদুঃখের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গীতিকার ধারা। গীতির ভিতর দিয়াই সে'যুগের সকল সাহিত্যরূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বাস্তব মানবের এই সুখদুঃখের কাহিনীও গীতিকার রূপেই সে'দিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। একই পুরাতন কাহিনী বর্তমান য় উপন্যাস অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

বাংলা 'উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্ব-সূচনার দিক দিয়া ময়মনসিংহ-গীতিকার স্থান সর্বোচ্চ' বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। এই দাবি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা গীতিকার চরিত্রগুলি সমালোচনা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এইখানে একটি মাত্র কথা উল্লেখ করিলেই চলিবে যে আধুনিক উপন্যাস সৃষ্টি হইবার পূর্বে লোক-কথা (folk-tale) ও গীতিকার মধ্য দিয়াই মানবিক জীবনের বাস্তব কাহিনী বর্ণনা করা হইত। ইহাদের

মধ্যে লোক-কথার উপর একটু কল্প-জগতের আবরণ থাকিত। মানবিক সুখদুঃখের কাহিনী ইহাদের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—রাক্ষস-খোক্কস ও সবাক্ পশুপক্ষীর চরিত্র অনেক সময় মানবিক অদৃষ্ট ও তাহাদের চরিত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু গীতিকার মধ্য দিয়া মানবিক সুখদুঃখের অনুভূতি অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে রূপায়িত হইয়াছে। অতএব লৌকিক কথা-সাহিত্য অপেক্ষাও গীতিকা আধুনিক উপন্যাসের অধিকতর নিকটবর্তী। মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্যের অন্যতম শাখা মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়াও মানবিক অনুভূতি অনেক সময় রূপলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে অলৌকিক দেবত্বকে সম্মুখে রাখিয়া কিংবা উপলক্ষ্য করিয়া তাহা রূপায়িত হইয়াছে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই; কিন্তু গীতিকায় তাহার স্বাধীন বিকাশের কোন বাধা হয় নাই। সেইজন্য আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পূর্ব সূচনার দিক দিয়া গীতিকার দাবিই 'সর্বোচ্চ' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এ'কথা সত্য যে, গীতিকাগুলির মধ্য দিয়া বাংলা উপন্যাস রচনার যে সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারার সহিত যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। কারণ, প্রথমতঃ তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে ইহার লোক-সাহিত্যের কোন যোগ ছিল না। তাহার সাহিত্য-সাধনা লোক-সাহিত্যের সহজ ও জাতীয় ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া একটি কৃত্রিম পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। তারপর খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হইল, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজি প্রভাবের ফল-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল এবং নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনই ইহার ভিত্তি হইল। সেইজন্য প্রত্যেক দেশেই যেমন তাহার নিজস্ব লোক-কথা কিংবা গীতিকার ধারাটি অনুসরণ করিয়াই আধুনিক উপন্যাস বিকাশ লাভ করিয়াছে, বাংলা দেশে তাহা হইতে পারে নাই। জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা বাংলার সমাজ বহুকাল যাবৎ খণ্ডিত; বিশেষতঃ এই দেশে উচ্চতর সমাজ ও নিম্নতর সমাজের মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ব্যবধান রহিয়াছে; সেই সূত্রে ইহার চণ্ডীমণ্ডপের সাহিত্য ও উন্মুক্ত মাঠের সাহিত্যের মধ্যেও গোড়া হইতেই পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের কৃত্রিম ধারাটিই ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের সহায়তায় নবপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক দরবারের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, উন্মুক্ত মাঠের সাহিত্য পল্লীর

মাঠে মাঠেই বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কোন সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করিয়া আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতির অলঙ্কার-স্বরূপ হইতে পারে নাই। সেইজন্য বাংলার লোক-কথা ও গীতিকার মধ্যে বাংলা উপন্যাসের সূচনা দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা আধুনিক উপন্যাস পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'এই পল্লীসাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত, ভারতচন্দ্রের বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ প্রভাব যদি আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত না করিত, তবে বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিন আরও অগ্রবর্তী হইত ও নবজাত শিশুর পূর্ণ-পরিণতি আরও সতেজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।'[১]

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গীতিকার ভাষা জীবন্ত, ইহাতে কোন কৃত্রিমতা নাই। তাহার ফলেই ইহার বাস্তব ধর্ম সর্বত্র রক্ষা পাইয়াছে। ইহা প্রত্যেক অঞ্চলেরই নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষা (dialect)য় রচিত। ইহা বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষা বলিয়া ইহা কথ্যভাষার সাধুরূপ হইতে দূরবর্তী। সেইজন্য নিজস্ব অঞ্চল ব্যতীত ইহা বোধগম্য হওয়া অনেক সময় দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কথ্যভাষা-গত পরস্পর পার্থক্য এত বেশি যে, গীতিকাগুলির মধ্যে ভাবগত সর্বজনীনত্ব থাকা সত্ত্বেও, ইহারা নিজস্ব অঞ্চলের বাহিরে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। ইংরেজি Robin Hood গীতিকা সমগ্র ইংলণ্ড, এমন কি স্কট্‌ল্যাণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলি পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের বাহিরে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ও বিশিষ্ট সামাজিক ভিত্তিই ইহার মূল। অতএব একদিক দিয়া ইহাদের ভাষা বাস্তব গুণ বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইলেও, অন্য দিক দিয়া ইহাদের ভাষা প্রচারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। সে'জন্যই গীতিকাগুলি অকালে বিস্মৃত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারও ইহাদের বিলুপ্ত হইবার অন্যতম কারণ। মুদ্রিত হইয়া ইহারা প্রকাশিত না হইলে; ইহাদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

[১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, ২১

নাথ

বাংলা দেশ হইতে এ'যাবৎ যে সকল গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাথ-গীতিকার কথাই সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয়; কারণ, ভাষার দিক দিয়া ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা দৃশ্যত যত প্রাচীন বলিয়াই মনে হউক, ইহাদের কোন গীতিকাই যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সংকলন নহে, তাহাও আজ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ইহাদের ভাষার ব্যাকরণ-গত (morphological) প্রাচীনত্ব বিশেষ নাই, ইহাদের প্রাচীনত্ব শব্দগত, অর্থাৎ কোন কোন প্রাচীন শব্দ ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও, যে ব্যাকরণের নিয়ম ইহাদের মধ্যে পালন করা হইয়াছে, তাহা আধুনিক। ইহা বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলের পল্লীসাহিত্য বলিয়া স্বভাবতঃই ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন শব্দ রক্ষা পাইয়াছে—ইহাদের রচনা যে প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না। পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, লোক-সাহিত্যের ভাষায় প্রাচীনতা রক্ষা পাইতে পারে না। ইহা শ্রুতিপরম্পরায় সমসাময়িক রূপ লাভ করিতে করিতেই পরিবর্তিত হইতে থাকে—ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে যে সকল অপরিচিত শব্দ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ নহে—বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত গ্রাম্যশব্দ মাত্র। এই গ্রাম্য-শব্দগুলিই শিক্ষিত নাগরিক সমাজের নিকট প্রাচীন শব্দ বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করে। এই বিষয়টি একটু ধীরভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে; কারণ, নাথ-গীতিকাগুলিতে বিষয়-বস্তুর প্রাচীনত্ব ও ইহাদিগের মধ্যে প্রান্তিক গ্রাম্যভাষার ব্যবহার দেখিয়া এই শব্দগুলিকে প্রাচীন শব্দ মনে করিয়া কেহ কেহ নাথ-গীতিকাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে'র রচনা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই দাবির আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে—নাথ-গীতিকায় গোপীচন্দ্র নামক এক রাজপুত্রের উল্লেখ আছে, তাঁহার সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই ইহার একটি বিভাগ রচিত হইয়াছে। এই গোপীচন্দ্রকে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকেই উড়িষ্যার তিরুমলয় শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত

বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার নাথ-গীতিকাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মত অনেকেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 'গায়েনেরা ওস্তাদের মুখে শুনিয়া বা একখানা পুঁথি দেখিয়া যুগীযাত্রা মুখস্থ করে এবং গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ায়। ঐ রকমই একটি গায়েনের মুখ হইতে শুনিয়া গ্রীয়ারসন সাহেব যাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন, ভাষা হিসাবে তাহা ঐ গায়েনের অপেক্ষা বড় বেশি পুরাতন হইবে না, এইরূপ ধরাই স্বাভাবিক। রাম সম্বন্ধে রচনা হইলেই যেমন তাহা ত্রেতা-দ্বাপরের হয় না, গোবিন্দচন্দ্র-মাণিকচন্দ্র সম্বন্ধে রচনা হইলেই তেমনি তাহা ১১শ-১২শ শতাব্দীর হয় না, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হৃদয়-প্রধান ব্যক্তিগণ অনুরাগ-প্রাবল্যে একবার যে ধারণা পোষণ করিয়া বসেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গায়েনের মুখ হইতে শুনিয়া লেখা মাণিকচন্দ্রের গান আজিও ১১শ-১২শ খৃষ্টাব্দের রচনা বলিয়া দীনেশ বাবুর নিকট আদৃত।'[১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব মনে করেন, তিরুমলয় শৈলগাত্রে যে গোবিন্দচন্দ্রের নাম উৎকীর্ণ আছে, গোপীচন্দ্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি—গোপীচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক ছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে নাথ-গীতিকা একাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে করিবার কোন সুনির্দিষ্ট কারণ নাই। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আর একটি যুক্তি এই ছিল যে, 'এই গাথায় কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা পরিদৃষ্ট হয়, ইহা প্রধানতঃ হিন্দুরাজত্বের প্রথা।'[২] কিন্তু ইহা সত্য নহে। ৪০ বৎসর পূর্বেও পূর্ববঙ্গে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অতএব সমসাময়িক ভাষার মত ইহাও একটি সমসাময়িক প্রথা মাত্র। সুতরাং এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া গীতিকাগুলি হিন্দুযুগ বা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না।

১ গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, (ঢাকা, ১৩৩২), সম্পাদকীয় মন্তব্য, পৃঃ ৭৫
২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৩৩৪), পৃঃ ৫২

নাথ-গীতিকার দুইটি ভাগ—একটি গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী, অপরটি গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী। গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী 'গোর্খবিজয়', 'গোরক্ষ-বিজয়' ও 'মীন-চেতন' নামে প্রকাশিত হইয়াছে, 'গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী', 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী এখানে সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাইবে।

একদিন পার্বতী শিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার শিষ্যগণ বিবাহ করে না কেন? তুমি আদেশ কর, তাহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হউক।' শিব বলিলেন, 'তাহারা সকলেই কাম-ক্রোধ-লোভমুক্ত। তাহারা বিবাহ করিবে না।' পার্বতী বলিলেন, 'কাম-ভাব কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, আমি তাহাদিগকে কটাক্ষে ভুলাইতে পারি। তুমি আদেশ কর, আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি।' শিব সম্মত হইলেন, তিনি পাঁচ জন সিদ্ধাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিবার আসন দিলেন। পরমা সুন্দরী নারীরূপ ধারণ করিয়া পার্বতী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া অন্ন পরিবেষণ করিলেন। অন্ন পরিবেষণ-কালে পরিপূর্ণ জল-পাত্রের উপর তাঁহার দেহের ছায়া পড়িল, দেখিয়া সিদ্ধাগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মীননাথ মনে মনে বলিলেন, 'এমন নারী যদি জীবনে লাভ করিতে পারিতাম, তবে তাহাকে লইয়া কেলি-কৌতুকে সমস্ত জীবন যাপন করিতাম।' পার্বতী তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, কদলীপত্তনে গিয়া তুমি ষোল শত নারীর সমভিব্যাহারে জীবন যাপন কর।' হাড়িসিদ্ধা জলমধ্যে পার্বতীর ছায়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'এমন সুন্দরী নারী যদি আমি পাই, তবে হাড়িকন (উঠানে ঝাঁট দেওয়া) করিয়াও তাহার পাশে পড়িয়া থাকি।' দেবী তাঁহারও অভিলাষ পূর্ণ হইবার বর দিয়া বলিলেন, হাতে ঝাড়ু ও কাঁধে কোদাল লইয়া হাড়ির রূপ ধারণ করিয়া তুমি ময়নামতীর গৃহে চলিয়া যাও।' সিদ্ধা কানফা যখন জলপাত্রে দেবীর ছায়ারূপ দেখিতে পাইলেন, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'এমন সুন্দরী নারী যদি আমার গৃহে থাকিত, তবে তাহার সঙ্গে কেলি করিয়া আমি মৃত্যুতেও সুখ পাইতাম।' পার্বতী তাঁহারও অভিলাষ পূর্ণ হইবে বলিয়া বর দিলেন এবং বলিলেন, 'দ্রুত তুমি ডাহুকা চলিয়া যাও, সেখানে গিয়া বহরির গৃহে তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর।' গাভুর সিদ্ধা যখন

দেবীর রূপ দেখিতে পাইলেন, তখন মনে মনে বলিলেন, 'এমন সুন্দরী নারী যদি আমর গৃহে থাকিত, তাহার জন্য আমার হাত-পা কাটা গেলেও আমি কিছু মনে করিতাম না।' দেবী তাঁহাকেও 'তথাস্তু' বলিয়া বর দিলেন এবং তাঁহার সৎমার নিকট তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন—সৎমা তাঁহার প্রণয়-ভিক্ষা করিবেন, তাহার ফলেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। গোর্খনাথ যখন জলপাত্রের মধ্যে দেবীর ছায়ারূপ দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন,

> তবে ভাবিল গোর্খে মনে করি সার।
> এরূপ জননী যদি থাক-এ আহ্মার॥
> তাহান কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
> এমন জননী আহ্মি কভো নাহি পাই॥

একমাত্র গোর্খনাথই দেবীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; অন্যান্য শিষ্যগণ যে যাঁহার বর বা অভিশাপ ভোগ করিবার জন্য নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। গোর্খনাথের উপর পার্বতীর এই ছলনা নিষ্ফল হইল দেখিয়া তিনি তাঁহার অন্য পরীক্ষা লইবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহার কাছে কিছুতেই নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিলেন না। অচিরেই গোর্খনাথের সম্মুখে তিনি পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নূতন নূতন উপায়ে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোর্খনাথ তাঁহার চরিত্র-বলে সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন, বার বারই পার্বতী অপমানিত হইলেন। পত্নীর অপমানে শিব মর্মাহত হইয়া নিজেই গোর্খনাথকে এইবার এক কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলেন—বিরহিণী নামক এক রাজকন্যা শিবের নিকট অমর স্বামীর বর প্রার্থনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, শিব তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গোর্খনাথকে স্বামিরূপে লাভ করিবার বর দিলেন। গোর্খনাথ ছয়মাসের শিশুতে পরিবর্তিত হইয়া কন্যাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। শিবের পরীক্ষাতেও গোর্খনাথ উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিত্র-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। একদিন গোর্খনাথ এক বকুল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সিদ্ধা কানফা শূন্যপথে যাইতেছেন। গোর্খের আদেশে তাঁহাকে নামিয়া আসিতে হইল। তাঁহার নিকট হইতে তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে গিয়া ষোলশত নারীর সঙ্গে ব্যভিচার-জীবন যাপন

করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন—আর তিনদিন মাত্র তাঁর আয়ু অবশিষ্ট আছে। শুনিয়া গোর্খনাথ গুরুকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। বহু কৌশলে তিনি কদলী রাজ্যে মোহগ্রস্ত গুরুর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, উপদেশ দ্বারা গুরুর মোহ অপনোদন করিলেন, তাঁহার চৈতন্য হইল। মীননাথ পুনরায় যোগ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

কাহিনীটির প্রধান গুণ, ইহার মানবিক আবেদন ; এই গুণেই ইহা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইহার মধ্যে সাধন-ভজন ও সাধক-সিদ্ধার কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহা মূল কাহিনীর স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ ইহার প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া সহজ মানবিক অনুভূতির বিকাশ হইয়াছে। গোর্খনাথের মহিমা ইহার মধ্য দিয়া প্রচার লাভ করিলেও নাথ-ধর্মের মহিমা ইহার ভিতর দিয়া কীর্তিত হয় নাই। ইহার দেব-চরিত্র শিব-পার্বতী যেমন মানবিক ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতার অধীন, তেমনই ইহার সিদ্ধাদের চরিত্রও মানবিক দুর্বলতার অধীন। গোর্খনাথের চারিত্রিক আদর্শ ইহাতে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের আধ্যাত্মিক প্রেরণা দ্বারা সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে না—আধ্যাত্মিক সাধনা-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-জীবনের মধ্যেও এইরূপ আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, অতএব ইহার মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু মাত্র নাই। মানব-পঙ্ককুণ্ডের মধ্য হইতেও যে কোন কোন সময় অতিমানবের (superman) হৃৎপদ্ম বিকাশ লাভ করে, ইহা তাহারই অন্যতম প্রমাণ মাত্র। গোর্খনাথের চরিত্রই এই কাহিনীর মেরুদণ্ড, এই শ্রেণীর সমুন্নত এক একটি চরিত্র কেন্দ্র করিয়াই কথা-সাহিত্যের কাহিনী রচিত হইয়াছে ; অতএব গোর্খনাথের চরিত্র সাধারণ কথা-সাহিত্যেরও ব্যতিক্রম নহে। এখানে গোর্খনাথ-মীননাথ সম্পর্কিত গীতিকার কয়েকটি চরিত্র লইয়া একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলেই উল্লিখিত মন্তব্যগুলির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমতঃ শিব-চরিত্রের কথাই ধরা যাউক। নাথ-গীতিকার শিব সংস্কৃত পুরাণের শিব ত নহেনই, এমন কি বাংলা মঙ্গলকাব্যের শিবও নহেন—তিনি উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কৃষকের এক নিজস্ব সৃষ্টি। নাথ-গীতিকার মধ্য দিয়া তাঁহার পরিচয় প্রকাশ পাইলেও, নাথ-ধর্মের কোন আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যেরই তিনি অধিকারী নহেন, তিনি সাধারণ মানবিক অনুভূতির দাস মাত্র। শিষ্যদিগের

উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু গোর্খনাথ ব্যতীত তাঁহার সেই বিশ্বাস আর কেহ রক্ষা করিতে পারিলেন না; সেইজন্য গোর্খনাথের প্রতি যে তাঁহার বিশেষ কোন স্নেহ-বোধ ছিল, তাহা নহে। যখন গোর্খনাথ পরীক্ষায় বার বারই পার্বতীকে পরাজিত করিতে লাগিলেন, তখন গোর্খনাথের উপর শিবেরও আক্রোশ জাগিয়া গেল—তিনি তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ হইতে চ্যুত করিবার জন্য বিরহিণীকে তাঁহাকেই স্বামিরূপে পাইবার জন্য বর দিলেন। কিন্তু গোর্খনাথ তাঁহার কৌশল ব্যর্থ করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি শিব হইতেও বড়। পার্বতী গোর্খনাথকে পরীক্ষা করিবার জন্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া শিবের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। তিনি গোর্খনাথকে আসিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন, 'আমায় স্ত্রীকে তুমি কি করিয়াছে?' 'কোথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা?' শুনিয়া গোর্খনাথ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন,

'ভাঙ্গ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে॥'

গোর্খের কথায় শিব অপমান বোধ করিলেন, তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। গুরুশিষ্যের সম্পর্কের এখানে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। শিবের দেবত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়া এখানে তাঁহার মধ্যে সহজ মানবিকত্বের বিকাশ হইল।

মঙ্গলকাব্যের শিব-চরিত্রের সঙ্গে নাথ-গীতিকার শিব-চরিত্রের একটি স্থূল পার্থক্য অতি সহজেই অনুভব করা যায়। মঙ্গলকাব্যে শিব ব্যভিচারী ও লম্পট, ঐহিক অভাব-অনটন নিপীড়িত ও কোপন-স্বভাবা স্ত্রী চণ্ডী কর্তৃক সর্বদা লাঞ্ছিত; কিন্তু নাথ-গীতিকার শিব নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া অধঃপতিত নহেন, সাংসারিক অভাব অনুভব করেন না, কিংবা স্ত্রীর হস্ত হইতে কোন প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না। মঙ্গলকাব্যের শিব ভক্তের ঐহিক সুখদুঃখে নির্বিকার, নাথ-গীতিকার শিব তেমন নির্বিকার নহেন; শিষ্যের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আছে, কিন্তু যখন শিষ্য তাঁহার স্ত্রীর সকল প্রকার কৌশল ব্যর্থ করিয়া সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, তখন শিষ্যের প্রতি তিনি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, মঙ্গলকাব্যের মত নাথ-গীতিকায় শিবের দাম্পত্য জীবন অশান্তিপূর্ণ নহে—পরস্পর বিশ্বাস ও আকর্ষণের ভিতর দিয়া ইহা শান্তিময়।

এইবার পার্বতীর চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে হয়। গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনীতে শিব হইতে পার্বতীর চরিত্রটি অধিকতর সুপরিস্ফুট হইয়াছে। একান্ত স্বাভাবিক নারীমন লইয়া তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, কোনও পুরুষ কামভাব শূন্য হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে পুরুষ-সম্পর্কিত যে ভাবটি চিত্রাঙ্গদার নারীমনে উদিত হইয়াছিল, তাঁহার মনেও সেই ভাবটির উদয় হইল। চিত্রাঙ্গদার মত কোন বিশেষ পুরুষকে যে তিনি লাভ করিতে চাহেন, তাহা নহে—পুরুষের শক্তি মাত্র তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন; নিজের শিষ্য-সম্পর্কিত তাঁহার ভোলানাথ স্বামীর বিশ্বাস তিনি টলাইতে চাহেন। এই ক্রূর কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই তিনি চারিজন সাধকের জীবনে সর্বনাশ করিলেন। গোর্খনাথের নিকট তাঁহার এই শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, এই ঈর্ষাক্ষিপ্ত মন লইয়া তিনি নারীজীবনের চরম লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াও গোর্খনাথকে এক জঘন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন, গোর্খনাথ এই পরীক্ষায়ও সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু তিনি নিজে যে নৈতিক স্তরে নামিয়া গেলেন, তাহা হইতে তাঁহার আর উদ্ধার পাইবার কোন উপায় রহিল না। গীতিকার কবিগণ দেবদেবীর প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করিতেন না; কারণ, তাঁহাদের কোন পরিচয় তাঁহাদের জানা ছিল না, বরং তাঁহাদের পরিবর্তে পার্থিব নর-নারীই তাঁহারা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের মহিমাই সকল অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন—সেইজন্য গীতিকায় দেব-চরিত্র অপেক্ষা মানব-চরিত্রই অধিকতর মহিমা-মণ্ডিত হইয়াছে। লোক-সাহিত্য মাত্রেরই ইহা বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যও মূলতঃ লোক-সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হইতেই জাত বলিয়া তাহার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী-চরিত্রের সঙ্গে নাথ-গীতিকার পার্বতী চরিত্রের তুলনা করা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ক্রূরা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা ও দাম্পত্য কলহপ্রিয়া। নাথ-গীতিকার পার্বতীর চরিত্রে ক্রূরতা কিংবা দাম্পত্য কলহ-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণতার দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর বিশেষ পার্থক্য নাই—মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর নৈতিক রুচি উন্নততর। কিন্তু নাথ-গীতিকার পার্বতী নৈতিক রুচির দিক দিয়া নিতান্ত গ্রাম্য প্রকৃতির। দেবতা সম্পর্কে পল্লীর কৃষকের কোন শ্রদ্ধাবোধ

ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে লইয়া তাঁহারা বাঁদর নাচাইয়াছেন। লোক-সাহিত্যের কোন বিভাগেই দেবতার কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, ইহার সর্বত্রই একমাত্র যাহা সত্য, তাহা মানুষ। নাথ-গীতিকাতেও ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোর্খনাথ-মীননাথ সম্পর্কিত গীতিকার মানব-চরিত্রের মধ্যে গোর্খনাথ ও মীননাথের চরিত্রই প্রধান। ইহাদের মধ্যে গোর্খনাথ সর্ববিধ মানবিক দুর্বলতা জয় করিয়া অতি-মানবের (superman) স্তরে উঠিয়া গিয়াছেন, মীননাথ মানবিক দুর্বলতা জয় করিতে পারেন নাই। এই কাহিনীর মধ্যে দুইটি চরিত্রের দুই দিক হইতে সার্থকতা রহিয়াছে।

গোর্খনাথ-চরিত্র কাহিনীর মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তাঁহার সুদৃঢ় চরিত্র কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য চরিত্রের মানবিক দুর্বলতা সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। সমগ্র কাহিনীর মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রটি একটি মানদণ্ডের মত স্থির হইয়া রহিয়াছে, ইহার সম্পর্ক হইতেই অন্যান্য চরিত্রের মূল্য বিচার করা যায়। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে মীননাথ প্রমুখ অন্যান্য সিদ্ধার চরিত্রের যে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারাই কাহিনীর একটি নাটকীয় গুণ প্রকাশ পাইয়াছে ; গোর্খনাথের পাশেই তাঁহার বিপরীত-ধর্মী চরিত্র মীননাথ অবস্থান করিয়াছে বলিয়া ইঁহাদের পরস্পর বৈপরীত্য দ্বারা দুইটি চরিত্রই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোর্খনাথের জীবনে অলৌকিকতার কথা আছে সত্য, কিন্তু যে অলৌকিকতা মানুষ তাহার নিজের সাধনা বা অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত অলৌকিকতা তাঁহার মধ্যে কিছু নাই। সেই জন্য তাঁহাকে দেবতা (divine) বা সাধক (mystic) না বলিয়া অতি-মানব বলাই সঙ্গত। অভ্যাস দ্বারা মানুষের দুর্বলতা মানুষই জয় করিতে পারে ; অভ্যাসের মধ্যে যদি কোন প্রকার শৈথিল্য না থাকে, তবে তাহা দ্বারা এমন বস্তু লাভ করা যায়, যাহা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে পারে। শিষ্য হইয়া গোর্খনাথ হৃদয়ের যে কামভাব জয় করিয়াছিলেন, গুরু হইয়াও মীননাথ তাহা পারেন নাই—ইহাই 'গোর্খবিজয়' বা 'মীনচেতনে'র বর্ণনীয় বিষয়। ইহার মধ্যে যে একটি সুগভীর জীবনবোধের পরিচয় ছিল, তাহা বাহির হইতে সহসা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। গুরু হইলেই যে তিনি মানবিক দুর্বলতার সকল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া দেবতার সঙ্গে সমাসীন হইবেন এবং

শিষ্য হইলেই যে তিনি তাঁহার নিম্নে অবস্থান করিবেন, পল্লীকবি যে এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। মানবিক দুর্বলতা প্রকাশের মধ্যে যে গুরুশিষ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না, কাহিনীর এই ইঙ্গিতটির মধ্যে মানবচরিত্র-বিষয়ক সুগভীর বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

নিতান্ত স্বাভাবিক উপায়ে মীননাথের পতন নির্দেশ করা হইয়াছে। বাহ্যিক সাধন-ভজনের অন্তরালেও যে একটি চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা সর্বদাই প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং অনুকূল অবসর লাভ করিলেই যে তাহা বাহ্যিক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করে, এই শাশ্বত সত্যই সিদ্ধা মীননাথের পতনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কঠোর সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া যিনি গোর্খনাথের মত শিষ্যের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, নারী-সৌন্দর্য্যের ছায়ারূপ মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরস্থিত চিরন্তন দুর্বলতা সজাগ হইয়া উঠিল। মানুষের মনে যৌনপ্রবৃত্তি যদি দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ হইয়া থাকিবার পর একবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারে, তবে তাহার বেগ যে রোধ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাই মীননাথের জীবনে দেখা গিয়াছে। রুশ লেখক টলষ্টয়ের একটি দীর্ঘ গল্পের মধ্যেও এই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। শৃঙ্খলিত করিয়া যে প্রবৃত্তিকে শাসন করে, একবার কোন উপায়ে শৃঙ্খলমুক্ত হইতে পারিলে সেই প্রবৃত্তিই তাহার শাসন দণ্ড তখন নিজের হাতে তুলিয়া লয়; রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যের ভিতর ইহারই আর একটি পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে।

বাহ্য সংস্কারের বাঁধ কাহার যে কোন্ মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না, কেহ এইজন্য সতর্ক হইয়াও থাকে না; কারণ, অভ্যাসের ফলেই মানুষের মনে এ'বিষয়ে একটা আত্মবিশ্বাসও জন্মিয়া যায়। সেইজন্যই ইহাতে যে পতন আসে, তাহা পূর্ব হইতে সূচিত হইতে পারে না, বরং নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই আসে। মীননাথও একদিন যখন পার্বতীর 'জলের ছায়ায় দেখে শরীর কোমল', তখনই.সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক ভাবান্তর অনুভব করিলেন, ইহা তিনি আর রোধ করিতে পারিলেন না। দেবীর বর বা অভিশাপ রূপক মাত্র, তাঁহার সেই মুহূর্তের ভাবান্তরই তাঁহাকে নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মে সর্বনাশের নিম্নতম স্তরে ঠেলিয়া দিল। মীননাথের চরিত্রের

মধ্যে এই একান্ত মানবিক অনুভূতির সন্ধান এই কাহিনীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

মোহ যখন একবার মানুষের সকল দেহ ও মন আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখন সত্যের আলোক কোন দিক দিয়াই যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাও মীননাথের জীবনে পল্লীকবিগণ দেখাইয়াছেন। নারীর সঙ্গই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মীননাথ সে'দিন মনে করিয়াছেন এবং ইহারই সমর্থনে নানা যুক্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন—

মোর গুরু মহাদেব জগত-ঈশ্বর।
গঙ্গাগৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর॥
আর দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর।
হেনরূপে করে গুরু কেলি-কুতুহল॥
তান আছে গৃহবাস আহ্মি কোন হই।
ভবে মোর এক গতি শুন আহ্মি কই॥

মাতাল যেমন মদ খাইবারও একটি যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে যায়, মোহমত্ত মীননাথও তেমনই তাহার নারীসঙ্গেরও যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু গোর্খনাথ এই যুক্তিও খণ্ড করিলেন, 'শিব মনুষ্য নহেন, তিনি বিষপান করিয়াও অমর, কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষ, তোমার সঙ্গে তাঁহার তুলনা সাজে না।'

অতি ধীরে ধীরে মীননাথের মনে পুনরায় চৈতন্যের উদয় হইয়াছে, আকস্মিক ভাবে তাহা হয় নাই। একদিন যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সাময়িক মোহের জাল ছিন্ন করিয়া পুনরায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, শিষ্য গোর্খনাথ তাঁহার সেই চৈতন্যোদয়ে সহায়তা করিলেন—এইখানেই কাহিনীটির বিশেষত্ব।

কদলীর নারীদিগের মধ্যে মঙ্গলা, কমলা ও যোগিনীর চরিত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মঙ্গলা ও কমলা তাহাদের মোহের জাল বিস্তার করিয়া মীননাথকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল; ঐশ্বর্য্য, আরাম, সন্তান ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মোহ ক্ষণস্থায়ী, ইহার শক্তি অনন্ত নহে; সেইজন্য চিরকালের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যোগিনীর চরিত্রটি ধর্মমঙ্গলের নয়ানী এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মালিনী চরিত্রের অগ্রদূত। নানা প্রলোভন দেখাইয়া যোগিনী গোর্খনাথের হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া যাইতে চাহিতেছে,—

কাটিমু চিকন সুতি তোহ্মিহ বুনিবা ধুতি
হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি।
নয়ানে নয়ানে চাহ হাত লাড়ি কথা কহ
চল যোগী আহ্মার যে বাড়ী॥

ইহার মধ্য দিয়া তাহার একটি বাস্তব নারীহৃদয় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

এই কাহিনীর মধ্যে যে স্ত্রীরাজ্য কদলীর উল্লেখ আছে, তাহা কোথায়? ইহা কি কোন কাল্পনিক দেশ? কিন্তু এ'বিষয়ে একটু লক্ষ্য করিলে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মাতৃ-তান্ত্রিক (matriarchal) কোন সমাজকেই এখানে স্ত্রীরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সংলগ্ন গারো ও খাসি জাতীয় সমাজ ভারতীয় আদিম সমাজের মধ্যে আজ পর্যন্তও ইহাদের মাতৃ-তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও খাসি দেশের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন ইহার রাণী—দেশে কোন রাজা থাকিত না; কারণ, মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের নিয়মে কন্যাই মাতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে, পুত্র নহে। সেইজন্য

কদলীর্ত দেখে যুবতী সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হয় সে যে স্ত্রী হয় রাজা॥

খাসি দেশের এমনই এক রাণীর সঙ্গে কামরূপের অহোম রাজকর্মচারীর প্রণয় ও বিবাহের এক কাহিনী আসামের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। অতএব এই শ্রেণীরই বাংলার প্রতিবেশী কোন মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজকে কদলীরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, কদলীরাজ্য বলিতে আসামের অন্তর্গত কাছাড়ই মনে করা হইয়াছে। যদিও হিন্দু-প্রভাবের ফলে কাছাড়েও বর্তমানে পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই প্রবর্তিত হইয়াছে, তথাপি একদা ইহাতেও ইহার প্রতিবেশী খাসিসমাজের মত মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই প্রচলিত থাকা সম্ভব। অতএব এই হিসাবে কাছাড়কেও কদলীরাজ্য বলিয়া নির্দেশ করা অসঙ্গত হয় না।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'বিশাল অদ্রি-শ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ্ন, "গোরক্ষ-বিজয়" এ'দেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগ-নির্দেশক চিহ্ন। এই চিহ্নের পর ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের এলাকা, তখন ব্রাহ্মণ আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিতেছেন; গ্রাম্যভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বঙ্গভাষাকে সাজাইতেছেন।'[১] এই উক্তিটি গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলার লোক-সাহিত্য বা পল্লীসাহিত্যের যে একটি ধারা বাংলা ভাষার জন্মের সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ধারার মধ্যে কোন দিনই বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, ইহা আধুনিক কাল পর্যন্ত নিজের পথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। গোরক্ষ-বিজয় লোক-সাহিত্যের ধারারই অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগে যেমন ইহার উদ্ভব, তেমনই ইহার প্রভাবের বহির্ভূত অঞ্চলে ইহার বিকাশ। সেইজন্য ইহার মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ্য উপকরণ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। অতএব ইহা 'যুগ-নির্দেশক চিহ্ন' বলিয়া মনে করা ভুল। 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র মধ্যে আসিয়া প্রাক্-ব্রাহ্মণ্য যুগ কিংবা কোন যুগই অবসান লাভ করে নাই। অতএব ইহা দ্বারা কোন যুগই নির্দিষ্ট হয় নাই, বাংলার লোক-সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহার ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাদের সম্পর্কে সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন, 'এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী।' কিন্তু ইহাও সত্য নহে; কারণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহির্ভূত অঞ্চলে ইহাদের উদ্ভব ও বিকাশ বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব নাই,—ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই ইহারা বিকাশ লাভ করিয়াছে। দেশের উচ্চতর সমাজ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে, তথাকথিত নিম্নতর সমাজের মধ্যেই নাথ-গীতিকার প্রচার হইয়াছে—এই উভয় সমাজের মধ্যে যেমন সংযোগ নাই, তেমনই ইহাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়াও কোন সুস্পষ্ট পারস্পরিক প্রভাব অনুভব করা যায় না।

'গোর্খ-বিজয়ে'র যে সকল পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভণিতাগুলি

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ঐ, পৃঃ ৬০

গীতিকা-রচয়িতার বিবেচনা করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে কে 'প্রকৃত' বা 'মূল' রচয়িতা তাহার অনুসন্ধানের জন্য কেহ কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু লোক-সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের মধ্য হইতে প্রকৃত রচয়িতার সন্ধান পাওয়া কঠিন। অনেক সময় ইহার একজন রচয়িতা থাকে না, কিংবা থাকিলেও লোক-সমাজ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন রকম ব্যগ্রতা প্রকাশ করে না বলিয়াই তাহার নাম অবিলম্বে লুপ্ত হইয়া যায়। তবে এই সকল ভণিতা কাহাদের? ইহা বুঝিতে কিছুতেই বেগ পাইতে হয় না যে, ইহারা গায়েনের ভণিতা,—রচয়িতার ভণিতা নহে। গায়েনগণও ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু সময়োচিত পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকেন এবং সেই অধিকারেই তাঁহারা মধ্যযুগের অন্যান্য উচ্চতর সাহিত্যের অনুকরণে নিজেরাও ইহাদের মধ্যে নিজেদের নাম যোগ করিয়া দেন। তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত বহু রচনার মধ্যেই গায়েনের ভণিতার সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ভণিতার অভাবই লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; যেখানে ভণিতার ব্যবহার দেখা যায়, সেখানে উচ্চতর সাহিত্যের প্রভাবই অনুভূত হয়। অতএব ফয়জুল্লা, ভবানী দাস, শ্যাম দাস ইঁহারা কেহই মূল 'গোর্খ-বিজয়' কাহিনীর রচয়িতা নহেন, একটি প্রচলিত গীতিকারই তাঁহারা বিভিন্ন গায়েন মাত্র। তবে তাঁহারা কোন কোন পদ নিজেরাও মূল কাহিনীর মধ্যে যোগ করিয়া থাকিবেন—এই অধিকারেই তাঁহারা নিজেদের নাম ইহার কোন কোন স্থলে স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন।

এখন নাথ-গীতিকার অন্যতম অংশ মাণিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনীর কথা উল্লেখ করিব। এই কাহিনীটির মানবিক আবেদন অধিকতর প্রত্যক্ষ। সেইজন্য ইহা জাতিধর্ম ও দেশকাল-নির্বিশেষে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচার লাভ করিয়াছে। যদিও মূলতঃ নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায়ই ইহার এই ব্যাপক প্রচার সম্ভব হইয়াছিল, তথাপি নাথধর্মের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবার পরও যে ইহা এই বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহা ইহার এই বিশিষ্ট মানবিকতার গুণের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করিতেছি—

বিলাসী রাজা মাণিকচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় পাঁচটি দারপরিগ্রহ করিলেন, পাঁচটি পত্নীই যুবতী ও পরমা সুন্দরী ; ইহাদের সঙ্গে তাঁহার প্রধানা মহিষী প্রৌঢ়া ময়নামতীর কিছুতেই বনিবনাও হইতেছিল না। সেইজন্য রাজা ময়নামতীকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। রাজধানী হইতে দূরবর্তী ফেরুসা নামক স্থানে ময়নামতী একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন। মাণিকচন্দ্রের আসন্নকাল উপস্থিত হইল, ময়নামতী প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া নানা অলৌকিক উপায়ে রাজার প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যর্থকাম হইলেন ; মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পর ময়নামতীর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহার নাম গোপীচন্দ্র। শিশু গোপীচন্দ্রকে নামে মাত্র সিংহাসনে বসাইয়া রাণী ময়নামতী নিজেই রাজ্যের শাসন-কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। গোপীচন্দ্র যৌবনে পদার্পণ করিলেন, অদুনা ও পদুনা নাম্নী দুই সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যের শাসনভার নিজ হাতে লইলেন ; পত্নীর প্রেম ও প্রজার শ্রদ্ধা লাভ করিয়া তিনি পরম আনন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল—রাজমাতা ময়নামতী আদেশ করিলেন, গোপীচন্দ্রকে বার বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। গোপীচন্দ্র জননীর আদেশ অমান্য করিতে চাহিলেন, মাতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিন্দা করিলেন। দুইজন রাণী রাজমাতাকে তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আদেশ শুনিয়া প্রজাগণ পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বিফল হইল। মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন পরিধান করিয়া কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সেই তরুণ যৌবনেই রাজপুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল। হাড়িসিদ্ধা তাঁহার সন্ন্যাসের সঙ্গী হইলেন। দুই রাণীর কাতর ক্রন্দনে রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়াও রাজপুত্র বার বার পরিত্যক্ত প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলেন—রাণীদের অশ্রুস্নাত মুখ দুইটি বার বার তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ বহু দূর পিছনে পড়িয়া রহিল, রাজপুত্রের চরম দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। হাড়িসিদ্ধা তাঁহাকে হীরা নাম্নী এক গণিকার গৃহে বার বৎসরের জন্য বাঁধা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার আর এক পরীক্ষা আরম্ভ হইল। হীরা তরুণ রাজপুত্রের পায় নিজের যৌবন অঞ্জলি দিল, কিন্তু পত্নীর প্রেমে,

তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। এই কলুষিত প্রেমের অভিনয়ের দিকে তিনি মুখ ফিরাইয়াও তাকাইলেন না। হীরা প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল; রাজপুত্রকে কঠিন দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিতে চাহিল। কিন্তু একমাত্র পত্নীপ্রেমের দুর্জয় শক্তিতেই রাজপুত্র সকল দুঃখ জয় করিলেন—হাড়িসিদ্ধার পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দুঃখের অগ্নিতে প্রেমের সোনা জ্বলিয়া আরও উজ্জ্বল হইল।

গোপীচন্দ্র এই কাহিনীর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাঁহার ভোগের লালসাই কাহিনীটিকে বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। পরিপূর্ণ লালসার মধ্যে সন্ন্যাস-জীবনের বিচ্ছেদ পড়িয়া গেল, এক দুর্দমনীয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাঁহার কৌপীন ধারণ করিতে হইল; অন্তরের মধ্যে এই দুইটি বিক্ষুব্ধভাবের সংঘাত তাঁহার আচরণের ভিতর দিয়া সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। ভোগের প্রতি সুগভীর আকর্ষণের জন্যই জননীর সন্ন্যাসের আদেশে তাঁহার উপর তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন; এমন কি, তাঁহার চরিত্রে তিনি অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। সংসারের প্রতি ইহা তাঁহার অন্ধ আসক্তিরই পরিচায়ক। মাতার সম্পর্কে তাঁহার কোন আদর্শবোধ নাই। কিন্তু জননীর শাসনই যখন শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল, তখন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপরই তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু সে অবস্থায়ও জননীর উপর অভিমান দূর হইল না। সোনার থালায় যখন জননী তাঁহাকে ভিক্ষা পরিবেষণ করিবার জন্য আসিলেন,

> যেন মনে থালত অন্ন দেখিল।
> কপালত মরিয়া চড় কান্দিবার লাগিল ॥
> 'যখন আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর।
> স্বর্ণর থালত অন্ন খাইনু বিস্তর ॥
> এখন হইনু কড়াকর ভিখারী।
> স্বর্ণর থালত অন্ন খাইতে না পারি ॥'
> একখানা কলার পাত আনিল কাটিয়া।
> তাহাত অন্নগুটিক লইল ঢালিয়া ॥

ইহার মধ্যে কেবলমাত্র যে সন্ন্যাসের আদর্শ ই রক্ষা পাইয়াছে, তাহা নহে—ইহার প্রতিটি ছত্রে জননীর প্রতি সন্ন্যাসী সন্তানের অভিমানের ভাব সুস্পষ্ট

হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হীরা নটীর গৃহে গোপীচন্দ্রের চরম পরীক্ষার আয়োজন হইয়াছিল। হীরা সুন্দরী যুবতী, অতুল ঐশ্বর্যশালিনী। যে ঐশ্বর্য গোপীচন্দ্র তাঁহার পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে ফেলিয়া আসিয়াছেন, হীরা তাঁহাকে সেই ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার প্রণয়-ভিক্ষা করিল; কিন্তু গোপীচন্দ্র তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সন্ন্যাস-জীবনের কোন অবাস্তব আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণায় যে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাহা নহে—একান্ত বাস্তব একটি প্রেরণায়ই সেদিন তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার পত্নী-প্রেম। পত্নী-প্রেম যেখানে সত্য, গণিকার প্রলোভন সেখানে কি করিয়া কার্যকর হইতে পারে? অতএব গোপীচন্দ্র তাহার দিক হইতে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন; দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও তাঁহার সেই প্রেমের প্রদীপ অনির্বাণ রহিল।

গোপীচন্দ্রের দুই মহিষী অদুনা এবং পদুনার চরিত্রও নিতান্ত বাস্তবধর্মী তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র প্রেমের সৌরভে আকুল, কিন্তু বহির্জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা-বিষয়ে তাঁহারা শিশু মাত্র। চারিদিকে প্রেমের জাল বিস্তার করিয়া তাঁহারা 'শীতল মন্দির ঘরে' তাঁহাদের হৃদয়ের রাজাকে ধরিয়া রাখিতে চাহেন—নিয়তির নির্মমতার কথা তাঁহাদের সুকোমল হৃদয়ে স্থানও পায় না। এই গীতিকায় ইঁহাদের এই বেদনার অনুভূতি মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। রাজাকে ধরিয়া রাখিবার সকল কৌশলই যখন তাঁহাদের ব্যর্থ হইল, তখন অন্তরের একান্ত মিনতি দিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন—

না যাইও না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর॥
বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও, আমার বৃথা গাভুরালি॥
নিদের স্বপনে রাজা হব দরশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥

সন্ন্যাসীর জীবনে যে নারী সঙ্গিনী হইতে পারে না, এ'কথা তাঁহারা বুঝিলেন না; শিশুকে যে ভাবে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে হয়, রাজা অবশেষে তাঁহাদিগকে সেই প্রকার বনের বাঘের ভয় দেখাইলেন, তাহাও তাঁহারা শুনিতে চাহিলেন না;

খায় না কেনে বনের বাঘে তাক নাই ডর।
নিষ্কলঙ্কে মরণ হউক স্বামীর পদতল॥
তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া রমু পালাইয়া যাবু কোথা॥

তারপর সন্ন্যাসোন্মুখ রাজাকে এই বলিয়া তাঁহারা অভিযোগ দিলেন,

যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে।
তখন কেনে ধর্মী রাজা না গেলেন সন্ন্যাসী হইয়ে॥

ইহাদের ভিতর দিয়া যে একটি বাস্তব নারীমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, কোন সাহিত্যেই তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। ময়নামতীর চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কাহিনীর মধ্যে অলৌকিকতার পরিবর্তে বাস্তবতার প্রভাব কত বেশি। কারণ, ময়নামতী গোর্খনাথের শিষ্য ও মহাজ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াও তাঁহার চরিত্র-দোষের জন্য সমাজের নিকট প্রকাশ্য নিন্দাভাজন হইয়াছেন। এমন কি, পুত্রও তাঁহার মুখের সম্মুখেই তাঁহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অলৌকিকতার প্রতি যদি পল্লীকবিদিগের শ্রদ্ধা থাকিত, তবে ময়নামতীকে অলৌকিকতা-সিদ্ধ মনে করিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি কোন প্রকার নৈতিক দোষারোপ করিবার তাহারা কল্পনা করিত না—অলৌকিকতা দ্বারা তাঁহার সব দোষ খণ্ডন হইয়া যাইত। কিন্তু ময়নামতীকে তাহারা রক্তমাংসে গঠিতা সাধারণ নারী বলিয়াই মনে করিয়াছে; সেইজন্য তাঁহার আচরণের মধ্যে সাধারণ দশজন নারীর ব্যতিক্রম যাহা দেখিয়াছে, তাহা তাহারা ক্ষমা করিতে পারে নাই।

গোপীচন্দ্র যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবে তিরুমলয় শৈলগাত্রে যে বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিই গোপীচন্দ্র কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। লোক-সাহিত্যে কবি-কল্পনার সঙ্গে বাস্তব সত্য এমন ভাবে একাকার হইয়া যায় যে, প্রকৃত কোন ঐতিহাসিক উপাদান ইহার মধ্য হইতে উদ্ধার করা যায় না। তবে ইতিহাসের মধ্য হইতে যদি গোপীচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যাইত, তবে এই নাথ-গীতিকাগুলি অন্ততঃ কখন সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান যাইত, কিন্তু তাহার অভাবে এই সম্বন্ধে কোন অনুমানই নির্ভুল হইতে পারে না।

পূর্ব মৈমনসিংহ

মৈমনসিংহ বাংলা দেশের মধ্যে বৃহত্তম জিলা—কেবল আয়তনের দিক দিয়া নহে, জন-সংখ্যার দিক দিয়াও তাহাই; ইহা ইউরোপের এক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমান। ইহার এই বিস্তৃত আয়তন ও বিপুল জন-সংখ্যা ব্যাপিয়া যে বিশিষ্ট একই আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে—ইহা প্রধানতঃ দুইটি ভৌগোলিক বিভাগ দ্বারা বিভক্ত; এই দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে দুইটি আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ভৌগোলিক বিভাগ দুইটি ইহাদের অবস্থান অনুযায়ী পশ্চিম মৈমনসিংহ ও পূর্ব মৈমনসিংহ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। জিলার মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা এই দুইটি বিভাগ সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপুত্র নদের মূল প্রবাহ যমুনার খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্বে তাহা এই পথেই আসিয়া মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হইত। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চল বিস্তৃত জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন, এই জলাভূমি 'হাওর' নামে পরিচিত। সাগর কথাটিই পূর্ব মৈমনসিংহের প্রাদেশিক ভাষায় 'হাওর' বলিয়া উচ্চারিত হয়। এই সকল জলাভূমির পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া কংশাই, ধনু, ঘোড়াউত্রা, আড়িয়ল খাঁ ও মেঘনা নদী প্রবাহিত এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্য ভাগ দিয়াও ইহাদের শাখা উপশাখা যথা, ফুলেশ্বরী, নরসুন্দা, সূতী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। এই বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদনদী-প্লাবিত বিস্তৃত নিম্নভূমি বা ভাটি অঞ্চলই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র জন্মভূমি প্রকৃতির নিত্য সলিল-সেকে এই অঞ্চলেরই পঙ্কিল মৃত্তিকায় বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার শতদলগুলি বিকশিত হইয়াছিল। বর্তমানে এই অঞ্চলই প্রাধনতঃ কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা মহকুমা দ্বারা বিভক্ত, সদর মহকুমার পূর্বাংশ অর্থাৎ নান্দাইল ও ঈশ্বরগঞ্জ থানাও ইহারই সীমাভুক্ত। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গীতিকাগুলির প্রতি পদে যুক্ত হইয়া আছে; সেইজন্য একটি সর্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও আঞ্চলিক আবেদনটি ইহাদের মধ্যে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়। এইজন্যই এই গীতিকাগুলি ইহার নিজস্ব সীমা অতিক্রম করিয়া বাংলার অন্যত্র বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

কেবল মাত্র পূর্ব মৈমনসিংহের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লইয়াই যে ইহার গীতিকা-গুলি রচিত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহার বিশিষ্ট সামাজিক ভিত্তির

উপরও ইহারা পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও সমাজই ইহাদের লক্ষ্য। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হইয়া আছে; কারণ, তাহা নিত্য; কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থা হইতে ইহাদের মৌলিক প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহা আজ অপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, পরবর্তী কালের প্রভাব বশতঃ সেই সমাজের মধ্যে বাহির হইতে বহু নূতন উপকরণ আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার সেই ভিত্তিটির সন্ধান করিয়া না লইতে পারিলে, ইহাদের যথার্থ রসাস্বাদন সম্ভব হয় না।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ব মৈমনসিংহের রাষ্ট্রীয় অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া গীতিকাগুলির মূল অনুসন্ধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন;[১] কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বিশেষতঃ প্রান্তিক অঞ্চলের সমাজের যোগ আমাদের দেশে সকল সময় যে খুব নিবিড় নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাংলা ভাষার জন্মকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহার যে ক্রমবিকাশ অনুসরণ করা যায়, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সমূহের প্রভাব খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। আধুনিক কালের মত মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির বা সমাজের স্বার্থ আমাদের দেশে এত নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিল না। গৌড় ও মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লইয়া শত শত বৎসর ধরিয়া রাজায় রাজায় যে রক্তের হোরিখেলা চলিয়াছিল, তাহাদের কোন পরিচয়ই ত বাংলার তদানীন্তন লোক-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই! বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের নিজস্ব ধারা এই সকল রক্তক্ষয়ী রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম দ্বারা ব্যাহত হইতে পারে নাই—কারণ, রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের সঙ্গে কোন দিনই এ'দেশের নিতান্ত সাধারণ সমাজের যোগ স্থাপিত হয় নাই। অতএব গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন বাংলা দেশের কেন্দ্রীয় ভৌগোলিক যোগ হইতে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মত বিশাল নদনদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন, আসামের কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্য হইতে দুর্গম গারো ও অন্যান্য পাহাড় দ্বারা খণ্ডিত পূর্ব মৈমনসিংহের নিম্নভূমি যে এক কালে হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়াঙ্‌ চুয়াঙ্‌ (হুয়েন সাঙ্গ) কামরূপ গিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়,

[১] মৈমনসিংহ-গীতিকা (১৯২২) ভূমিকা, ।৵৹

কিন্তু স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে তিনি যে কদাচ 'এই অঞ্চলে' অর্থাৎ পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে আসিয়া এই সকল দেশের লোকের চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষার অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি যাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কামরূপের অধিবাসী, পূর্ব মৈমনসিংহের উক্ত গীতি-ভূমির অধিবাসী নহে। কিন্তু কামরূপ রাজ্যের নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য হইতে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ব মৈমনসিংহের সঙ্গে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কোনও যোগ ছিল না। ইহার অধিবাসীর 'চরিত্র' ও 'শিক্ষাদীক্ষা' যদি প্রশংসারই বিষয় হইয়া থাকে, তবে তাহা হিন্দু আদর্শের অনুগামী ছিল না, ইহার একটি স্বতন্ত্র আদর্শ ছিল। তাহার কথাই এখানে উল্লেখ করিব।

পূর্ব মৈমনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রমুখ উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু ও সৈয়দ-পাঠান প্রমুখ উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমানের বসতি স্থাপিত হইলেও, এই অঞ্চলের বৃহত্তর লোক-সমাজের সঙ্গে উচ্চতর সমাজের মৌলিক কোনও সম্পর্ক নাই। উচ্চতর সমাজভুক্ত নরনারীর সংখ্যা বৃহত্তর সমাজের অন্তর্ভুক্ত নরনারীর সংখ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য; সেইজন্য উচ্চতর শ্রেণীর বিশেষ কোনও সাংস্কৃতিক প্রভাব ইহার সাধারণ সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। উচ্চতর শ্রেণী সমূহ এ'দেশের মৌলিক সামাজিক পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন নিজস্ব একটি ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডী রচনা করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে—গঙ্গা-বারাণসী ও মক্কা-মদিনার সঙ্গে ইহাদের যোগ, কিন্তু নিজস্ব দেশের বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ইহাদের যোগ নাই। অতএব হিন্দু কিংবা মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির ইতিহাস অনুসরণ করিয়া এ'দেশের উচ্চতর সমাজটির ইতিহাস নির্ণয় করিতে পারা গেলেও, ইহার বৃহত্তর সমাজটির মৌলিক পরিচয় স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হইতেই সন্ধান করিতে হইবে।

পূর্ব মৈমনসিংহের সাধারণ জন-সমাজ কয়েকটি প্রবল আর্যেতর জাতি দ্বারা গঠিত—তাহাদের মধ্যে প্রধানই কোচ। ইহা মূল ইন্দো-মোঙ্গলয়েড (Indo-Mongoloid) জাতির অন্যতম শাখা বোড়ো জাতি হইতে উদ্ভূত—এই বোড়ো জাতিরই অন্যান্য শাখা গারো, হাজং ও রাজবংশী; ইহারাও কোচ শাখার মতই এই অঞ্চলের মৌলিক মানব-সমাজ গঠনে সহায়তা করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির একটি প্রধান শাখা বোড়ো জাতিরই মৌলিক ভিত্তির উপর এই অঞ্চলের মানব-সমাজ গঠিত। বোড়ো জাতির

একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহা মাতৃ-তান্ত্রিক (Matriarchal)। এখনও ইহারই অন্যান্য শাখা গারো ও খাসি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবলতম মাতৃ-তান্ত্রিক জাতি বলিয়া পরিচিত। এই গারো জাতিরই বাংলা-ভাষাভাষী ও মৈমনসিংহ জিলার সমতল ভূমির অধিবাসী শাখা হাজং নামে পরিচিত। হাজংদিগের বাসভূমি হইতেই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অভিনয়-ক্ষেত্র আরম্ভ হইয়া তাহা দক্ষিণ দিকে মেঘনা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অতএব একটি প্রবল মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের সংস্কার ইহার ভিত্তিমূলে কার্যকর রহিয়াছে। সুতরাং মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা সম্যক্ বুঝিতে পারা গেলেই গীতিকাগুলির কয়েকটি প্রধান তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে।

মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ স্ত্রী-প্রধান ; ইহাতে নারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার সামাজিক ভাবেই স্বীকার করা হয়। অবশ্য স্বাধীন প্রেমের স্বীকৃতির অর্থ নারীর স্বৈরাচার-প্রবৃত্তির স্বীকৃতি নহে। কুমারী নারীর যে প্রেম বিবাহেই পরিণতি লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই ইহাতে স্বীকার করা হয় ; কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিবাহিতা নারীর ব্যভিচার কিংবা স্বৈরাচার কঠিন দণ্ডে শাসিত হয়। এই জন্যই পরিণত বয়স্ক কুমারীগণই বিবাহের অধিকারিণী হয়, বাল্য-বিবাহ কিংবা গৌরীদান মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত ; শুধু মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজেই নহে, পৃথিবীর কোনও আদিম অধিবাসীর সমাজেই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই। পূর্ব মৈমনসিংহের গীতিকাগুলি প্রধানতঃ পরিণত বয়স্কা কুমারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার ও ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনা লইয়াই রচিত। ইহাদের এই প্রেরণা হিন্দু-মুসলমান সমাজ-নিরপেক্ষ ; ইহা এই মৌলিক মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হইতেই আসিয়াছে। উচ্চনীচ হিন্দুর সমাজ যেমন বাল্য-বিবাহ দ্বারা দূষিত, তেমনই মুসলমান সমাজের একাংশও পর্দা দ্বারা আবৃত। অতএব স্বাধীন প্রেমের অবকাশ ইহাদের মধ্যে নাই। সুতরাং হিন্দু কিংবা মুসলমান সমাজের আদর্শ দ্বারা যাঁহারা এই গীতিকাগুলির সমাজ-নীতি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মূল তাৎপর্যের কোনই সন্ধান পান নাই।

যে আদিম মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের ভিত্তির উপর এই গীতিকাগুলির সমাজ-জীবন মূলতঃ পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহার উপর কালক্রমে উচ্চতর হিন্দু ও

মুসলমান সমাজের আদর্শও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ; কিন্তু এই প্রভাব ইহার ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই—উপর হইতেই অনেক সময় কতকগুলি বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। (উচ্চতর ধর্মের এই বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা ইহাদের কোন কোন কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে অনেক সময় কাহিনীর গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন আদর্শের সম্মুখীন না হইলে কাহিনীর মধ্যে যথার্থ নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে না, জটিলতা-সৃষ্টি দ্বারা ইহার প্রতি ঔৎসুক্য উদ্রেক্ করাও সম্ভব হয় না ; সেইজন্য এই গীতিকাগুলির মধ্যে মৌলিক আদিম ধর্মের সঙ্গে যে পরবর্তী উচ্চতর ধর্মের আদর্শগত সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ইহাদের কাহিনীর নাটকীয় গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। অতএব গীতিকাগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন একটি মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা নহে—ইহার মাতৃ-তান্ত্রিক ভিত্তির উপরিভাগে পরবর্তী কালে অন্যান্য সমাজেরও পতাকা স্থাপন করা হইয়াছে।) কিন্তু ইহার উপরিভাগ হইতেই যদি ইহার মর্মমূলের পরিচয় সন্ধান করিতে যাই, তবে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ স্ত্রী-প্রধান ; সেইজন্যই এই গীতিকা-গুলির মধ্যে স্ত্রী-চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। গীতিকাগুলি প্রেম-মূলক, অতএব প্রেমের ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রাধান্য দেখা যায়, অন্যান্য কর্মের ক্ষেত্রে নহে। একটি বলিষ্ঠ নারীত্বের মর্যাদা গীতিকাগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ; নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য ইহাদের মধ্য দিয়া গৌরব লাভ করিয়াছে। নারীর সতীত্বের এখানে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, স্ত্রী-প্রধান সমাজের মধ্যে স্বাধীন প্রেমের মর্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীন প্রেম কথাটিকে কেহ স্বৈরাচার বলিয়া মনে না করেন। প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে স্বৈরাচার আসিতে পারে না ; একনিষ্ঠাই প্রেমের ধর্ম। তবে স্বাধীন প্রেমের অর্থ এই যে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা, তাহাকে নারীর নিজেরই স্বাধীন ভাবে নির্বাচন করিয়া লইবার অধিকার—ইহা বাহির হইতে কেহ তাহার উপর আরোপ করিবে না। অতএব ইহার সঙ্গে কোনদিন বোঝাপড়া করিয়া লইবার কোন প্রয়োজন হয় না—নারী-হৃদয়ে আপনা হইতে আপনি ইহার জন্ম হয় বলিয়া সহজাত বৃত্তির মত ইহার শক্তি অতুলনীয় হইয়া দাঁড়ায়। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নায়িকাগণ এই অতুলনীয়

প্রেমশক্তির অধিকারিণী; এই শক্তির দ্বারাই তাহাদের নারীধর্ম ও সতীধর্ম রক্ষা পাইয়াছে। অতএব এই সতীত্ব সমাজের গতানুগতিক বিধি-নিরপেক্ষ; গতানুগতিক সমাজ-বিধি দ্বারা যে সতীত্ববোধ জাগ্রত হয়, তাহার শক্তি অপেক্ষা ইহার শক্তি অনেক প্রবল। সেইজন্য গীতিকার নায়িকাগণ দীর্ঘদিন পরপুরুষের গৃহে বন্দিনী থাকিয়াও একমাত্র প্রেমের শক্তিতে নিজেদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং নারীর সতীত্ব সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে চিরাচরিত ধারণা প্রচলিত আছে, এই গীতিকাগুলি পাঠ করিলে সেই ধারণায় আঘাত লাগে। সতীত্ব-বোধ নারীর একটি নিজস্ব ও ব্যক্তিগত মর্যাদা-বোধ; সমাজ বাহির হইতে ইহার বিধি রচনা করিয়া নারীকে ইহা দ্বারা শাসন করিলেও, তাহার মনে যদি ইহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হয়, তবে বাহিরের শাসন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। কিন্তু যে সমাজে বাহির হইতে এই সম্পর্কে একটি শাসন-বিধি পালন করা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে নারী সাধারণতঃ এই সম্পর্কিত নিজের অনুভূতিকে সর্বদা সজাগ রাখিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ নাও করিতে পারে। কিন্তু যে সমাজ ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র নারীর উপরই ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই সমাজের নারীকে এই সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিবার প্রয়োজন হয়—তাহাতে তাহার এই চৈতন্য কোন সময়ই শিথিল হইতে পারে না। যে সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীর স্বাধীন চলাফেরার অধিকার আছে, সেই সমাজে নারীধর্ম এইভাবেই রক্ষা পাইয়া থাকে।

এই গীতিকাগুলির মধ্য দিয়া নারীর একটি অপূর্ব শক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। তাহার এই শক্তি প্রেমের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে—প্রেমের জন্য দুঃখ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, সর্বসমর্পণ করিয়া নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করিতে পারে, গীতিকাগুলি তাহাই পরিচায়ক। নারীর মধ্যে প্রেমের শক্তি যে কি দুর্জয়, তাহাও ইহাদের মধ্য হইতে প্রমাণিত হয়। পল্লীকবির সহজ সরল দৃষ্টিতে শাশ্বত নারীর অনাবৃত রূপটি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে, কোন প্রকার কৃত্রিমতা দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই। সেইজন্য ইহার নারীচরিত্র অপরিমেয় শক্তির অধিকারী।

পল্লীকবিদিগের প্রেম-বিষয়ক রচনা হওয়া সত্বেও এই গীতিকাগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, নীতি ও রুচির দিক দিয়া ইহারা দূষিত নহে;

ইহাদের নৈতিক আবহাওয়া উন্নত। যে রুচিদুষ্টি মধ্যযুগের উচ্চতর আখ্যায়িকা-কাব্যের ধারা আবিল করিয়াছিল, তাহার স্পর্শ মাত্র ইহাদের মধ্যে অনুভব করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিসর্জন 'নাটকের' এক স্থানে বলিয়াছেন, 'দেবতার নামে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।' মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবতার সম্মুখে মনুষ্যত্ব বলি দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে রুচিবিকার দেখা গিয়াছিল, দেবতার নামে নিজেদের ঘৃণিত রুচির পরিচয় প্রকাশ করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র পল্লীকবিদিগের সম্মুখে কোন দেব-প্রতিমা ছিল না, সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের রচনার ভিতর দিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রকাশ করিবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রান্ত আদর্শই মনুষ্যত্বকে বিচলিত করে। যেখানে কোন আদর্শ নাই, সেখানে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের কোন বাধা হয় না।

লোক-সঙ্গীত আলোচনা সম্পর্কে পূর্বে বলিয়াছি, প্রকৃত প্রেম-সঙ্গীত কথনও কুরুচির পরিচায়ক হইতে পারে না, জগতের লোক-সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত নাই। লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত মাত্রই দর্পণের মত নির্মল, ইহাতে কোন আবিলতা স্থান পায় না; সেইজন্যই বাংলা দেশে তাহা অতি সহজেই দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হইতে পারিয়াছে। সহজ প্রেমের ধর্মই নির্মলতা। কিন্তু বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম স্বতন্ত্র। মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলির অবলম্বন সহজ প্রেম; সেইজন্য নীতি ও রুচির দিক দিয়া তাহা সুনির্মল। সে'যুগের উচ্চতর সাহিত্যের কবিগণ এ বিষয়ে পল্লীকবিদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই গীতিকাগুলি 'বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃত-যুগের পূর্বাধ্যায়' স্বরূপ। মধ্যযুগের বাংলায় যখন সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্যের চর্চা হইতেছিল, এই গীতিকাগুলি তাহারই সমসাময়িক; তবে ইহাদের উপর যে সংস্কৃত অনুশীলনের কোন প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায় না, তাহার কারণ এই যে, ইহারা নিরক্ষর সমাজের সৃষ্টি—শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে এই সমাজের কোনই যোগ ছিল না। অতএব ইহাদের সম্পর্কে এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, ইহারা সংস্কৃত-সাহিত্য অনুশীলনের যুগে উদ্ভূত হইলেও সংস্কৃত-শিক্ষিত সমাজের বাহিরে বহুদূরে নিরক্ষর সমাজের মধ্যে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, মৌখিক সাহিত্যের ধারা ইহাদের মধ্যে অনুস্যূত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতের কোনও প্রভাব নাই—বাংলার সমগ্র

লোক-সাহিত্য স্বভাবতঃই এই প্রকার সংস্কৃত-প্রভাব মুক্ত—ইহার ধারা স্বতন্ত্র, ইহার যুগ-পরিচয় স্বতন্ত্র।

পূর্বের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র চরিত্রগুলি হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে; কারণ, হিন্দুর সমাজ-নীতি যেমন ইহারা স্বীকার করে নাই, মুসলমানের সমাজ-নীতিও ইহাদের মধ্যে অস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ইহাদের যদি কোন পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, ইহারা মানুষ। সেইজন্য ইহাতে উচ্চবর্ণের বলিয়া পরিচিত নায়ক, নিম্নবর্ণের বলিয়া পরিচিত নায়িকার জন্য জীবন উৎসর্গ করে। যেখানে ইহাদের কোন বিশেষ সামাজিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানেও বিশিষ্ট কোন সমাজের শাসন দ্বারা তাহাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, ধর্ম ও সমাজ-নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তি দ্বারাই তাহাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। লোক-সাহিত্য কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি নহে, ইহা ধর্মবোধ-নিরপেক্ষ মানব-সমাজেরই সৃষ্টি। তবে কোনও প্রবল মুসলমানকে যখন দুর্বল হিন্দু নারীর উপর উৎপীড়ন করিতে দেখি, তখন ইহা ধর্মবিদ্বেষ-প্রসূত বলিয়া মনে করা ভুল হয়—ইহা প্রবল কর্তৃক দুর্বলের উপর অত্যাচারের চিরন্তনী নীতিরই নিদর্শন। এখানে সমসাময়িক সমাজের পরিচয়ে যে প্রবল, সে মুসলমানের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং যে দুর্বল, সে হিন্দুনারীর রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র—ইহার অন্য কোনও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নাই। যে দেশে হিন্দু-মুসলমান নাই, সেই দেশেও অনুরূপ ঘটনা অভিনীত হইতেছে—মানব-সমাজের উৎপত্তি কাল হইতেই এই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। তথাপি গীতিকাগুলির বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্যে কোন কোন সময় হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রভাব বিচ্ছিন্ন ভাবেও যে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু এই পরিচয় বাহিরের পরিচয় মাত্র, ইহাদের অন্তরের পরিচয় নহে।

এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রত্যেকটি পালা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যাইবে। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র 'কাজলরেখা' গীতিকা নহে, গীতি-কথা, ইহার বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় যে সকল গীতিকা পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও এই সঙ্গে আলোচনা করা যাইবে।

প্রথমেই 'মহুয়া' পালাটির কথা আলোচনা করা যাইবে। ইহার মধ্য দিয়াই মৈমনসিংহ-গীতিকার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিলে চরিত্র-পরিকল্পনার দিক দিয়া গীতিকাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। প্রথমেই কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা যাউক।

বেদের দলের সর্দারের নাম হুমরা। একবার সে তাহার দলবল লইয়া ধনু নদীর তীরে কাঞ্চনপুর নামক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। সেই গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একটি শিশুকন্যা ছিল, হুমরা তাহাকে চুরি করিয়া পলাইয়া গেল। কন্যাটিকে হুম্‌রা নিজের সন্তানের মত করিয়া লালন পালন করিতে লাগিল, তাহার নাম রাখিল মহুয়া; তাহাকে নানা ক্রীড়া-কৌশল শিখাইল। তাহাকে লইয়া দেশ-বিদেশে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। মহুয়া যৌবনে পদার্পণ করিল, তাহার সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করিল। হুম্‌রা তাহার দল লইয়া একবার বামনকান্দা নামক এক গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদ সেই গ্রামের তালুকদার; তাহার গৃহে বেদের দল খেলা দেখাইয়া আসিল। নদের চাঁদ মহুয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। মহুয়াও নদের চাঁদকে দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নদের চাঁদ বেদের দলকে সেই গ্রামে বাস করিবার জন্য বাড়ী ও জমি দিল—তাহারা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সেই গ্রামেই বাস করিতে লাগিল। নিভৃত স্থানে মিলিত হইয়া নদের চাঁদ ও মহুয়া পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিল। হুম্‌রা তাহা জানিতে পারিয়া একদিন দলবল সহ মহুয়াকে লইয়া গ্রাম হইতে পলাইয়া গেল। নদের চাঁদ মহুয়ার সন্ধান করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিল, বহু অনুসন্ধানের পর তাহার সাক্ষাৎ পাইল। হুম্‌রা তাহাকে দেখিতে পাইয়া মহুয়াকে তাহার প্রাণবধ করিতে বলিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে মহুয়া নদের চাঁদকে লইয়া বেদের দল ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। পথিমধ্যে এক সদাগর নদের চাঁদের প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিয়া মহুয়াকে লাভ করিতে চাহিল। মহুয়া কৌশলে সদাগরেরই প্রাণনাশ করিয়া পলাইয়া গেল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া মহুয়া মৃতপ্রায় নদের চাঁদের সন্ধান পাইল। মহুয়া পুনরায় এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর কবলে পড়িল। কোনমতে রুগ্ন নদের চাঁদকে কাঁধে লইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় হইতে মহুয়া পলাইল। কিছু দূরে গিয়া তাহারা একস্থানে সুখে বসবাস করিতে লাগিল। এমন সময়

তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বেদের দল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। হুম্‌রা নদের চাঁদকে বধ করিবার জন্য মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলিয়া দিল, মহুয়া সেই ছুরি নিজের বক্ষে বসাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই মুহূর্তে বেদের দল নদের চাঁদের প্রাণনাশ করিল। তারপর সেইখানেই দুইজনকে এক কবরের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। কেবল মহুয়ার আজন্ম সুখদুঃখের সঙ্গিনী পালঙ্‌ সই সেইখানে লুটাইয়া পড়িয়া চোখের জলে কবরের মাটি ভিজাইতে লাগিল।

ইহার কাহিনীর একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে গীতিকার ধর্মটি বহুলাংশেই রক্ষা পাইয়াছে। ইহার কাহিনী প্রথম হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হইয়াছে ; কোন কোন সময় মনে হয়, ইহার ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া পল্লীকবি একটি কথাও অপব্যয় করেন নাই, প্রত্যেকটি কথাই ওজন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

> ছয় মাসের শিশুকন্যা পরমা সুন্দরী।
> রাত্রি নিশাকালে হুম্‌রা তারে করল চুরি ॥
> চুরি না কর‍্যা হুম্‌রা ছাড়্যা গেল দেশ।
> কইবাম্‌ সে কন্যার কথা শুন সবিশেষ ॥

এখানে পল্লীকবি একটি নাটকীয় ঘটনার বিবরণ সুদীর্ঘ বর্ণনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য কিংবা মধ্যযুগের অন্যান্য আখ্যায়িকা-মূলক উচ্চতর কোন রচনায় কবি এখানে শিশুকন্যা অপহরণের একটি রোমাঞ্চকর বর্ণনা দান না করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারিতেন না। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইন্দা মেটের শিশু লাউসেনকে হরণের বৃত্তান্তই তাহার প্রমাণ। এখানে অপহৃতা শিশুকন্যার জন্য মাতাপিতার সুদীর্ঘ বিলাপ শুনিতে পাওয়া গেল না, এই অপহরণ-কার্যে হুম্‌রা কি ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করিল, তাহারও কোন বিবরণ প্রদত্ত হইল না, শিশুকন্যা অপহরণ করিয়া দলশুদ্ধ বেদে কি কৌশলে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহারও কোন সন্ধান দেওয়া হইল না। হুম্‌রা তাহার পাঠক-পাঠিকাদিগকে সঙ্গে লইয়াই যেন সুপ্ত কাঞ্চনপুর গ্রামখানি পিছনে ফেলিয়া চলিয়া আসিল। গীতিকার মূল কাহিনীর সম্পর্কে এই সকল বিবরণ যে অপ্রাসঙ্গিক পল্লীকবি তাঁহার সহজাত অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। দ্রুতবেগে কাহিনীর এই

অগ্রগতির লক্ষণকে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক 'leaping and lingering' আখ্যা দিয়াছেন।

কাহিনীটি যদি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তবে প্রথম ভাগ অর্থাৎ বামনকান্দা গ্রাম হইতে বেদের দলের পলায়ন পর্যন্ত ইহার এই গতিবেগ রক্ষা পাইয়াছে। ইহার পর হইতে ইহার গতি একটু স্তিমিত হইয়াছে। ইহার কারণ, ইহার শেষাংশে ঘটনার বাহুল্য। গীতিকার শ্রোতার নিকট রোমাঞ্চকর ঘটনার একটি বিশিষ্ট আবেদন আছে; অতএব সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইলেও, শ্রোতার নিকট ইহার আবেদনের দিক দিয়া ইহা ব্যর্থ বলিয়া মনে হইবে না। সেইজন্যই ভূমিকাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, লোক-সাহিত্য পরিবেষণের পরিবেশটির কথা সর্বাগ্রে স্মরণ রাখিয়া ইহার রস-বিচার করা প্রয়োজন—ইহার মুদ্রিত রূপের ভিতর দিয়া ইহার যে পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা খণ্ডিত মাত্র।

নদ্যার ঠাকুর এই কাহিনীর নায়ক। সে ব্রাহ্মণ যুবক, কিন্তু তাহার জীবনে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার কিছু মাত্র নাই, অতএব তাহার পরিচয় সে যুবক মাত্র। কাহার অলক্ষিত স্পর্শে তাহার হৃদয়ে প্রেম-শতদল কখন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, সেই মুহূর্তটির জন্যই যেন সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় মহুয়াকে সে দেখিল, শতদল আপনা হইতে বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে যে প্রেমের উদয় হইল, তাহা আপনা হইতে আপনি জাত বলিয়া ইহা অপরিমিত শক্তির অধিকারী হইল—এই শক্তিই তাহার জীবনে প্রলয় সৃষ্টি করিল। এই প্রলয়ের মুখে তাহার গৃহ-সংসার ধ্বংস হইল, নিজেও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। প্রকৃত প্রেমের মধ্যে সর্বদাই প্রলয়ের বীজ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে; যেখানে বাধা আসে, সেখানেই ইহার ধ্বংসের রূপ প্রকাশ পায়। নদ্যার ঠাকুরের জীবনে বার বার বাধা আসিয়াছিল, সেইজন্য বিনাশেই ইহার সমাপ্তি হইয়াছে।

মহুয়ার প্রতি নদ্যার ঠাকুরের আকর্ষণের একটি কারণ এই কাহিনীর একটি স্থানে ইঙ্গিত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মহুয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা—দৈবদোষে বেদের দলের সঙ্গিনী। অতএব জন্মসংস্কার বশতঃই মহুয়া যেমন নদ্যার ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, নদ্যার ঠাকুরও সেই জন্যই তাহার দিকে এত তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। পল্লীকবি অত্যন্ত কৌশলের সহিত এই ইঙ্গিতটি প্রকাশ করিয়াছেন।

গীতিকাগুলি নায়িকা-প্রধান, নায়ক-প্রধান নহে। এই বিষয়ে ইহারা বাংলা কথা-সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কোনই ব্যতিক্রম নহে; কারণ, প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চতর বাংলা সাহিত্যও যে স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান, তাহা রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সকল সমালোচকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সেই সূত্রে মহুয়ার চরিত্র এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় ও প্রধান চরিত্র। তাহার জীবনের মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার সংমিশ্রণ হইয়াছে—তাহা লইয়াই তাহার জীবনের দ্বন্দ্ব। কিন্তু তাহা বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই। তাহার দ্বন্দ্ব তাহার হৃদয়ের গভীরতম স্তরে আপনার দুর্ভেদ্য জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। সৌন্দর্যই তাহার অভিশাপ—ছয় মাস বয়সে তাহার রূপ দেখিয়া এক বেদে তাহাকে মাতৃ-অঙ্কচ্যুত করিল, সে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের কন্যা হইয়া যাযাবর দলের সঙ্গিনী হইল। রূপ-যৌবনের আবেদন দিয়া সে বেদের দলের জীবিকার্জনের সহায়তা করিত, তাহার রূপেই নদ্যার ঠাকুরের চক্ষু পুড়িয়া গেল। এই রূপের জন্যই বেদের দল হইতে পলাইয়াও সে নিস্তার পাইল না। একবার সদাগরের হস্তে, পুনরায় সন্ন্যাসীর হস্তে তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল। বেদের দলও তাহার পিছন ছাড়িল না, পরিণামে নিজ হস্তে সে বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া এই অভিশপ্ত রূপের জ্বালা হইতে জুড়াইল। তাহার জীবনে অভিশাপ ছিল—যে শৈশবেই নির্মমভাবে মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত, তাহার জীবন অভিশপ্ত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পল্লীকবি এই কাহিনীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার জীবনের ভিতর দিয়া নিয়তির এই প্রচ্ছন্ন অভিশাপকে রূপায়িত করিয়াছেন।

নিরক্ষর পল্লীকবি নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়ার মধ্য দিয়া পরস্পরের প্রতি প্রেমের বিকাশ অপূর্ব কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমের উপলব্ধিতে নিরক্ষরতা কোন অন্তরায় হইতে পারে না। ইহা এমনই একটি বৃত্তি যে ইহার সম্বন্ধে নরনারী অতি সহজেই সচেতন হইয়া পড়ে এবং নিজের সহজ অনুভূতি দ্বারা অন্যের অনুভূতিও উপলব্ধি করে। অতএব প্রেম-বিষয়ক রচনায় নিরক্ষর ও শিক্ষিত কবি উভয়েই সমান দক্ষ—অনেক সময় বরং অশিক্ষিত মনের কাছে ইহার সহজ রূপটি অধিকতর প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সেইজন্য এই অপরিসর গীতিকাটির নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রেমের যে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মানব-চরিত্র সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বেদের

দলের খেলা দেখিতে গিয়া নদ্যার ঠাকুর মহুয়াকে দেখিল ; সে বুঝিতেও পারিল না, কখন তাহার হৃদয়ের প্রেম-শতদলটি প্রস্ফুটিত হইয়া গিয়াছে। কবি তাহার সূক্ষ্ম আচরণের ভিতর দিয়া মহুয়ার প্রতি তাহার মনোভাবটি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

যখন নাকি বাদ্যার ছেড়ি বাঁশে মাইল লাড়া।
বইস্যা আছিল্ নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা অইল খাড়া॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাঁশে বাজি করে।
নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইড়া বুঝি মরে॥

এই আচরণটির ভিতর দিয়াই মহুয়ার প্রতি নদ্যার ঠাকুরের মনোভাবটি স্পষ্ট ব্যক্ত হইল। অলক্ষিতে হতভাগ্য শরাহত হইয়াছে—বুঝিতেও পারিল না, কোন্ দিক দিয়া কে কখন উদ্যত পুষ্পবাণ লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল! যখন একেবারে মর্মে বিঁধিয়া গেল, তখন একটু একটু করিয়া বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহারই প্রথম অভিব্যক্তি উপরের কয়টি পদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর জলের ঘাটে ভীরু প্রণয়ীর সসঙ্কোচ আত্মনিবেদনের কী অপূর্ব একটি পরিবেশ রচনা করা হইয়াছে! আসন্ন সন্ধ্যার মুখে নির্জন নদীতীরে দাঁড়াইয়া একটি একটি করিয়া সে হৃদয়ের দল মহুয়ার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতেছে—

'জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কও না কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ॥'

বাহিরে নদীর জলে মৃদু ঢেউ উঠিয়াছে, ভিতরে তাহার হৃদয়-যমুনাতেও তেমনই তরঙ্গ জাগিতেছে,—'কেবা তোমার মাতা কন্যা কেবা তোমার পিতা?' মহুয়ার জীবন আদ্যোপান্ত একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সুরে গাঁথা—

'নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসোদর ভাই।
সোতের হেওলা অইয়া ভাসিয়া বেড়াই॥'

কি অপূর্ব উপমা! সম্মুখে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, অতএব তাহার জীবনের সঙ্গে উপমা দিতে গিয়া ইহার কথাই মনে পড়িল, 'সোতের হেওলা অইয়া ভাসিয়া বেড়াই।' মহুয়ার যাযাবর জীবনের সঙ্গে তুলনা দিবার মত ইহা হইতে সার্থক আর কোন্ উপমা কল্পনা করা যাইতে পারে? এই উপমাগুলি পল্লীকবিগণ তাঁহাদের মস্তিষ্কের ভিতর হইতে সন্ধান করিয়া লাভ

করেন নাই, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট চিত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্যই ইহারা এত জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়।

মহুয়ার মুখের কথা শুনিয়া নদ্যার ঠাকুরের ভরসা হইল, রুদ্ধ হৃদয়াবেগ সহসা অর্গলমুক্ত হইয়া আসিল—

'কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে আমি করি বিয়া॥'

মহুয়া ভাবিল, ছি, ছি, কি লজ্জার কথা! হয় ত নদ্যার ঠাকুর তাহার মনের কথা জানিতে পারিয়া গিয়াছে। সে নারী—পুরুষের মত এত অতর্কিতে ধরা দিতে পারে না, সেইজন্য সে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল—

'লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মর॥'

হতভাগ্য নদ্যার ঠাকুর! সে কি আর বাঁচিয়া আছে! যে মুহূর্তে সে মহুয়াকে দেখিয়াছে, সেই মুহূর্তেই ত সে নিজের বলিতে যাহা কিছু ছিল, সকলই বিসর্জন দিয়াছে! তবে আর লৌকিক মৃত্যুর অর্থহীন অভিনয় কেন? মহুয়ার মধ্যেই তাহার সকল অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাউক—

'কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥'

গীতিকার ঘটনাবলী প্রধানতঃ সংলাপের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইয়া থাকে, পাশ্চাত্ত্য গীতিকারও ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—সে বিষয় ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি। উদ্ধৃত অংশে গীতিকার এই বিশিষ্ট গুণটি প্রকাশ পাইয়াছে।

এই গীতিকার একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্র পালঙ্ সই। সেও হয়ত মহুয়ারই মত কোন বৃন্তচ্যুত পুষ্প। তাহার বাহিরের কোন পরিচয় ইহাতে নাই; কিন্তু তাহার অন্তরের যে পরিচয়টি ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনবদ্য। সে মহুয়ার সুখদুঃখভাগিনী এবং জীবন ও মৃত্যুর সহচরী। মহতের ত্যাগ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু ক্ষুদ্রের ত্যাগ সকলের দৃষ্টিপথের অন্তরালেই থাকিয়া যায়। তথাপি মহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়েরই প্রেরণা তাহাদের আত্মা হইতে আসে—আত্মায় আত্মায় ছোটবড় কোনও পার্থক্য নাই; সেইজন্য পালঙ্ সই বাহিরে ক্ষুদ্র হইয়াও অন্তরে মহৎ। জীবনের সুখদুঃখের ভাগিনী সখীর জন্য সে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার অন্তরের অসীম মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে।

'মহুয়া' পালাটির আরও একটি পাঠ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।[১] কাহিনীর দিক দিয়া ইহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাঠের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই; তবে এই পাঠটি সংগ্রাহক কর্তৃক কোন প্রকার সংস্কার করা হয় নাই বলিয়া অধিকতর নির্ভরযোগ্য। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গীতিকাগুলি সম্পাদন করিবার কালে ইহাদিগকে যে কতদূর সংস্কার করিয়া লইয়াছেন, তাহা এই পাঠটির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাঠের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমেই মহুয়া পালাটির নামকরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে হয়। দ্বিতীয় যে পাঠটির কথা এখানে উল্লেখ করিলাম, তাহাতে কাহিনীর নায়িকার নাম মেওয়া সুন্দরী—মহুয়া সুন্দরী নহে। মহুয়া নামটি যে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিজের প্রদত্ত, তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্ব মৈমনসিংহের প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুযায়ী মহুয়া শব্দটি মৌয়া উচ্চারিত হয়। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কাজলরেখা পালায় মহুয়ার পরিবর্তে মৌয়া বা মউয়া শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে।[২] দ্বিতীয় কথা এই যে, মহুয়া বৃক্ষ কিংবা ইহার পুষ্প পূর্ব মৈমনসিংহে সম্পূর্ণ অপরিচিত; এইজন্য শব্দটিও সাধারণ লোকের নিকট পরিচিত থাকিবার কথা নহে। অতএব একটি অপরিচিত শব্দ কোনও লোক-গীতিকার নায়িকার নামরূপে ব্যবহৃত হইবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। তবে প্রকৃত নামটি এখানে কি? দ্বিতীয় সংগ্রহটির মধ্যে যে মেওয়া সুন্দরী নামটি পাওয়া যায়, তাহাই এই গীতিকার নায়িকার প্রকৃত নাম। কারণ, মেওয়া কথাটি পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে সুপরিচিত, ইহার অর্থ ঘনীভূত দুগ্ধ। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মলুয়া পালাতেও মেওয়া কথাটির উল্লেখ আছে—

> মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
> তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥[৩]

১ বাস্তানীর গান, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত ও আর. মিত্র কর্তৃক ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা (১৩৫১) হইতে প্রকাশিত।

২ মৈমনসিংহ-গীতিকা, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৩৪৪

৩ ঐ, পৃঃ ৮৪।

কেবল মাত্র এক স্থানেই নহে, বিভিন্ন স্থানেই শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—

মাটি দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্রবলে।[১]

সেইজন্য মনে হয়, দ্বিতীয় সংগ্রহের এই দুইটি পদ—

এই না কন্যা কোলে লৈয়া উন্দ্‌রা বাত্যার নারী।
বাছ্যা গুছ্যা নাম থৈল মেওয়া না সুন্দরী॥[২]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে এই ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে—

পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুম্‌রা বাইদ্যার নারী।
ভাব্যা চিন্ত্যা নাম রাখল "মহুয়া সুন্দরী"॥[৩]

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে মহুয়ার পালাটি যে গীত হয়, তাহা সর্বত্রই 'বাদ্যানীর গান' বা 'বাদ্যানীর পালা' বলিয়াই লোকমুখে পরিচিত; কদাচ 'মহুয়ার পালা' বলিয়া পরিচিত নহে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের এ'কথা বলিবার সুযোগ হইতেছে। অতএব মেওয়া কথাটিকেই সংস্কার করিয়া যে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মহুয়াতে পরিবর্তিত করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে সঙ্কলয়িতার এই প্রকার আরও হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সংস্করণে বেদের দলের সর্দারের নাম হুম্‌রা বাদ্যা, কিন্তু ইহার পূর্বোল্লিখিত অন্যতম সংগ্রহে তাহার নাম উন্দ্রা বাদ্যা। পূর্ব মৈমনসিংহের প্রাদেশিক ভাষায় শব্দের আদিস্থিত 'হ' সর্বদাই 'অ' এবং 'হু' 'উ' উচ্চারিত হইবার কথা। পূর্ব মৈমনসিংহের ভাষায় ইঁদুরকে উন্দুর বলে, তাহা হইতেই সাধারণ লোকের মধ্যে উন্দ্‌রা বা উন্দ্রা নাম শুনিতে পাওয়া যায়; হুম্‌রা নাম শুনিতে পাওয়া যাইবার কথা নহে, প্রকৃত পক্ষে যায়ও না। অতএব উন্দ্রা শব্দটিই বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের সঙ্কলয়িতার সংস্কারের ফলে হুম্‌রায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের মধ্যে এই প্রকার অন্যান্য হস্তক্ষেপের ফলে ইহার কোন কোন অংশ কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। অতএব একমাত্র ইহার উপরই নির্ভর করিয়া ইহাদের বিচার করা যায় না।

১ ঐ, পৃঃ ২৭৪
২ বাদ্যানীর গান, ঐ, পৃঃ ১২
৩ মৈমনসিংহ-গীতিকা, ঐ, পৃঃ ৬

মহুয়া-গীতিকাটির কোন কোন অংশ স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন লোক-সঙ্গীত। মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে এমন সংমিশ্রণ অনেক সময় অপরিহার্য হইয়া উঠে, কিন্তু গীতিকার কাহিনীর ধারায় এই স্বতন্ত্র অংশগুলি সহজ যোগ স্থাপন করিতে পারে না। অতএব ইহাদের দ্বারা অনেক সময় কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়। বামনকান্দা গ্রাম হইতে বিদায় লইবার পূর্বে মহুয়া নিভৃতে নদের ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য কথার সঙ্গে যে বলিতেছে—

আমার বাড়ীত যাইও রে, বন্ধু, বইতে দিয়াম পিড়া।
জলপান করিতে দিয়াম শালি ধানের চিড়া॥
শালি ধানের চিড়া দিয়াম আরও শবরী কলা।
ঘরে আছে মইষের দই রে, বন্ধু, খাইবা তিনো বেলা॥

এই অংশ একটি স্বাধীন লোক-সঙ্গীতের অঙ্গ—অনেকটা অনুকূল পরিবেশের সুযোগ লাভ করিয়া গায়েন এই গীতিকার মধ্যেই তাহা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে। প্রায় সকল গীতিকার মধ্যেই এই প্রকার রচনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যাইবে। কাহিনীর ধারার সঙ্গে ইহাদের নিবিড় যোগ থাকে না বলিয়া ইহাতে অনেক সময় রস যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনই কাহিনীর স্বাধীন গতিও ব্যাহত হয়। একমাত্র অভিজ্ঞ গীতিকা-সংগ্রাহক এই অতিরিক্ত অংশগুলি গীতিকার অঙ্গ হইতে বর্জন করিয়া ইহার গতি-স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। কিন্তু 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে তাহা সম্ভব হয় নাই।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র অন্তর্গত মলুয়া পালাটির নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে একটি তেজোদীপ্ত প্রখর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, নারীত্বের এই দুর্লভ রূপ আর কোন গীতিকার মধ্যেই এমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কাহিনীটি এই প্রকার—চান্দ বিনোদ বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান। অকাল বৃষ্টিতে একবার ক্ষেতের ধান নষ্ট হইয়া গিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, মাতাপুত্র অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। অবশেষে একদিন চান্দ পিঁজরা হাতে লইয়া কুড়া পাখী শিকার করিবার জন্য বিদেশ যাত্রা করিল। বিনোদ আড়ালিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই গ্রামের মোড়লের কন্যা মলুয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, মলুয়াও বিনোদকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল; কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য মলুয়ার পিতা বিনোদের হস্তে কন্যাদান করিতে অস্বীকার করিলেন। বিনোদ

গৃহে ফিরিয়া অর্থোপার্জনের উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ অর্জন করিয়া দেশে ফিরিল, এইবার আর মলুয়ার পিতা তাহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিতে আপত্তি করিলেন না। বিনোদ মলুয়াকে বিবাহ করিয়া নিজের গৃহে তুলিল। একদিন কাজি মলুয়াকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইল; এক কুট্টিনী নারী তাহার নিকট পাঠাইয়া তাহার পাপ-অভিলাষ ব্যক্ত করিল। মলুয়া কুট্টিনীকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। মিথ্যা দেনার দায়ে কাজি এইবার বিনোদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল, ফলে বিনোদের সংসারে পুনরায় দারিদ্র্য দেখা দিল। শাশুড়ীকে লইয়া সূতা কাটিয়া পরের বাড়ীতে ধান ভানিয়া মলুয়ার দিন কাটিতে লাগিল। কাজি এইবার এক নূতন বিপদের সৃষ্টি করিল—বিনোদের উপর এক পরওয়ানা জারি করিয়া নির্দেশ দিল, 'সাতদিনের মধ্যে তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে দেওয়ান সাহেবের হাউলিতে লইয়া উপস্থিত কর, নতুবা তোমাকে জীয়ন্তে কবর দেওয়া হইবে।' বিনোদ আদেশ অমান্য করিল। কাজির পাইক-পেয়াদা বিনোদকে জীয়ন্তে কবর দিতে লইয়া গেল, মলুয়াকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেওয়ান সাহেবের অন্তঃপুরে উপস্থিত করিল। মলুয়ার পাঁচ ভাই বিনোদকে বাঁচাইল; কিন্তু মলুয়ার উদ্ধার করিতে পারিল না। কৌশলে নিজের নারীধর্ম রক্ষা করিয়া মলুয়া তিন মাস পর দেওয়ান সাহেবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল; কাজির শূলদণ্ড হইল। কিন্তু বিনোদের আত্মীয়গণ মলুয়াকে গৃহে লইতে অস্বীকার করিল। বিনোদ আত্মীয়-স্বজনের কথায় মলুয়াকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিল। মলুয়া স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিল না, সেইখানেই দাসীবৃত্তি করিতে লাগিল। একদিন বিনোদকে সর্পে দংশন করিল, বাঁচিবার কোন আশা রহিল না; মলুয়া তাহার পাঁচ ভাইয়ের সহায়তায় তাহাকে বাঁচাইল। তথাপি আত্মীয়-স্বজন তাহাকে গৃহে লইতে নিষেধ করিল। বাঁচিয়া থাকিলে স্বামীর কলঙ্ক ঘুচিবে না মনে করিয়া মলুয়া নদীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল।

এই সুদীর্ঘ কাহিনী নিরবচ্ছিন্ন ঘটনার সূত্র দ্বারা গ্রথিত হয় নাই, তাহা গীতিকার লক্ষণ নহে; বরং তাহার পরিবর্তে ইহা মলুয়ার জীবনের বিশিষ্ট কতকগুলি ঘটনার উপর চকিত আলোকসম্পাত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাই সার্থক গীতিকার লক্ষণ। দেশে আকস্মিক দুর্ভিক্ষ, চাঁদ বিনোদের

বিদেশ-যাত্রা, মলুয়ার সঙ্গে চাঁদ বিনোদের প্রথম দর্শন, অনুরাগ-সঞ্চার, বিবাহ, কাজির দৃষ্টি, কলঙ্কিত জীবন হইতে পরিত্রাণ এবং শেষ পর্যন্ত মলুয়ার আত্মবিসর্জন—এই সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা মলুয়ার জীবনের অখণ্ড জীবন-স্রোত রচনা করিয়াছে।

সমগ্র পালাটি জুড়িয়া একটি মাত্র চরিত্রেরই যেন সদর্প পদধ্বনি শুনিতেছি—তাহা মলুয়ার। জলের ঘাটে চাঁদ বিনোদের ঘুমন্ত রূপ তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দৃশ্যে ভগ্ন তরী নিমজ্জিত করিয়া নদীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করা অবধি সে যেন উর্ধ্বশ্বাসে কাহিনীর মধ্য দিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম দর্শনেই প্রেম-সঞ্চারের উপর চিরন্তন দুর্বাসার যে নিত্য অভিশাপ বর্ষিত হয়, মলুয়াও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। তাহার নির্বিচার আত্মসমর্পণের মধ্যে যে নির্ভীক স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার শক্তি দ্বারাই সে তাহার বিড়ম্বিত ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। সমাজ তাহার সতীত্বের যে পুরস্কারই দিক না কেন, তাহার নিজের কাছে ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য ছিল। নারীর সতীত্ব যে নারীরই একটি বিশিষ্ট শক্তি, ইহা সমাজ-শাসনের যে কোন অপেক্ষাই রাখে না, মলুয়ার চরিত্রই তাহার প্রমাণ। সে নিজের শক্তি দ্বারা নিজের সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ সমাজ নারীচরিত্রের এই পরিচয়টির সন্ধান জানে না বলিয়াই বাহির হইতে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। এইখানেই দুইটি বিভিন্নমুখী সংস্কারের মধ্যে সংঘাত হইয়াছে—একটি নারী চরিত্রের অন্তর্মুখী শাশ্বত সংস্কার ও আর একটি হিন্দু সমাজের বহির্মুখী অনুশাসন—এই সংঘাতই এই কাহিনীর ট্র্যাজিডির মূল।

কিন্তু আর এক দিয়া বিচার করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে, চাঁদ বিনোদের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবের মধ্যেও এই কাহিনীর ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত ছিল। চাঁদ বিনোদের প্রেম রূপজ মোহ জাত—তাহার প্রেমে যদি সত্য থাকিত, তাহার যদি সুদৃঢ় চরিত্রবল থাকিত, তবে ব্রাহ্মণ্য শাসন এই ক্ষেত্রে কিছুই করিতে পারিত না। কারণ, চাঁদ বিনোদের চরিত্রে কোন ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অতএব চাঁদ বিনোদের চারিত্রিক দৌর্বল্য ব্রাহ্মণ্য শাসনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই ট্র্যাজিডি সংঘটিত করিয়াছে।

মলুয়ার মৃত্যু আত্মহত্যা, মহুয়ার মৃত্যু আত্মত্যাগ। সমাজ ও স্বামীর প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান লইয়া মলুয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সীতার পাতাল

প্রবেশের সঙ্গে তাহার মৃত্যুর তুলনা হইতে পারে, কিন্তু এক অনতিক্রম্য অবস্থার সম্মুখীন হইয়া স্বামিপ্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মহুয়া আত্ম-ত্যাগ করিয়াছে, অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

নারীই শক্তির আধার ; পুরুষ তাহার তুলনায় যে কত দুর্বল, সে তাহার যে কত অযোগ্য, এই কাহিনীর নায়ক চাঁদ বিনোদই তাহার প্রমাণ। প্রেম পুরুষের কৌতুক, কিন্তু নারীর জীবন। যাহার প্রেমের জন্য তাহার প্রাণ বাঁচিল, সমাজের কথায় সে তাহাকেই বিসর্জন দিল—সমাজের সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া সে একবার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখিল না। কিন্তু যে শক্তি দ্বারা মলুয়া অত্যাচারীর হাত হইতে নিজের নারীত্ব রক্ষা করিয়াছে, সেই শক্তি দ্বারাই সে তাহার স্বামীর এই অপমান জয় করিল। সে তাহার স্বামি-গৃহে সতিনীর দাসী হইয়া থাকিয়াও প্রেমের গৌরবে যেন মহিষীর মত বিরাজ করিতে লাগিল। এখানে প্রকৃত পরাজয় হইল তাহার স্বামীরই—তাহার নহে।

মলুয়া কাহিনীতে পরিবার-বোধ প্রবল ('dominant family sentiment')। তাহাকে শেষে যখন সমাজের দয়াহীন বিচার ও চরিত্র-দৌর্বল্যে 'বাহির কামুলি' হইতে হইল, তখন তাহার মধ্য দিয়া যে নীরব সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত এই বিষয়ে আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না।

মলুয়ার পালাটি একটু বর্ণনাত্মক, সেইজন্য অন্যান্য পালা অপেক্ষা ইহা দীর্ঘ। ইহার মধ্যে উচ্চতর আখ্যায়িকা-কাব্য বা মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী রান্না ও বিবাহাচারের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় ; এই সকল বর্ণনা গীতিকার একটি ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই পালাটি 'কুড়া শিকারীর গান' নামে পূর্ব মৈমনসিংহের সর্বত্র পরিচিত ; ইহার 'মলুয়া' নামটি সম্পাদক-প্রদত্ত।

সংক্ষিপ্ততার গুণে 'চন্দ্রাবতী' পালাটির গীতিকাগত বৈশিষ্ট্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। একটি মাত্র হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে যেন এই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীটি শেষ হইয়াছে। কাহিনীটি এই—পিতার শিবপূজার জন্য চন্দ্রাবতী প্রত্যহ ফুল তুলিতে নির্জন পুকুরের ধারে যায়, একদিন জয়ানন্দের সঙ্গে তাহার সেখানেই সাক্ষাৎ হইল। অপরিচয়ের ব্যবধান দূর হইয়া গিয়া ক্রমে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিল, উভয়ে উভয়ের জন্য অন্তরের নিভৃত কোণে অভূতপূর্ব

বেদনা অনুভব করিল। উভয়ের মধ্যে মিলনে কোন বাধা ছিল না, বিবাহের প্রস্তাবও হইল, চন্দ্রাবতীর পিতা সে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এমন সময় শুনিতে পাওয়া গেল, জয়ানন্দ এক পরনারীতে আসক্ত। বিবাহে বাধা পড়িল। চন্দ্রাবতী হৃদয়কে পাষাণ করিয়া ফেলিল, অবশিষ্ট জীবন অনূঢ়া থাকিয়া শিবপূজায় যাপন করিতে সঙ্কল্প করিল। পিতা তাহার উপর রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ দিলেন। জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, অনুতপ্ত চিত্তে একদিন চন্দ্রাবতীর নিকট শেষ দর্শন প্রার্থনা করিল, কিন্তু রুদ্ধ দেবালয়ের মধ্যে চন্দ্রাবতী তাহার হৃদয়কে অসাড় করিয়া লইবার সাধনা করিতেছিল, জয়ানন্দের প্রার্থনা ব্যর্থ হইল। সে মালতীর ফুল দিয়া তাহার শেষ কথা বাহির হইতে রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে লিখিয়া রাখিয়া গেল। সেইদিনই চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে গিয়া দেখিতে পাইল, জয়ানন্দের প্রাণহীন দেহ জলের উপর ভাসিতেছে।

এখানেও নারীর শক্তি ও পুরুষের দুর্বলতারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমের যে একাগ্র নিষ্ঠা নারীকে মহীয়সী করিয়াছে, তাহারই শক্তিদ্বারা সে জীবনের সকল আঘাত জয় করিতে পারে। পুরুষের সেই শক্তি যে নাই, জয়ানন্দ তাহার প্রমাণ। আহত প্রেম নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়া এক নিরন্ধ্র কঠোর অভিমানের রূপ লাভ করিয়া কিরূপে 'sublimity' স্পর্শ করিতে পারে, চন্দ্রাবতী তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রেম এখানে বহির্জগতকে রুদ্ধ করিয়া আত্মতন্ময় হইয়াছে—মোহভঙ্গের পর জয়ানন্দের করাঘাতও তাহার তপোভঙ্গ করিতে পারে নাই। জয়ানন্দের চরিত্রে দৃঢ়তা নাই, সেইজন্য প্রেমেও নিষ্ঠা নাই; অতএব সে যেমন তাঁহার প্রণয়িণীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামিনীতে আসক্ত হইতে পারে, তেমনই সে আকস্মিক উত্তেজনায় জীবনও বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু এই জীবন বিসর্জনের মধ্যে তাহার আত্মহত্যার পাপই বৃদ্ধি পাইয়াছে, আত্মত্যাগের গৌরব প্রকাশ পায় নাই। জীবন বিসর্জন না দিয়াও চন্দ্রাবতী তাঁহার প্রেমের নিষ্ঠার জন্য যে গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছে, হতভাগ্য চঞ্চলমতি জয়ানন্দ মৃত্যুর মধ্যেও তাহার একাংশেরও অধিকারী হইতে পারে নাই! তাহার জন্য চন্দ্রাবতীও এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না—নারীর নিকট পুরুষের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরাজয় আর কি হইতে পারে? নারীর এই মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমাই গীতিকাগুলির সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বে

বলিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় জীবনের কাহিনী বর্ণনার পরিবর্তে জীবনের কতকগুলি নাটকীয় মুহূর্তকে চকিত বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত করিয়া লইয়াই গীতিকা রচিত হইয়া থাকে ; 'চন্দ্রাবতী' গীতিকার মধ্যে এই গুণটির সর্বোত্তম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই ফুল তোলা, তারপরই প্রেমের প্রকাশ এবং অতি দ্রুত বিবাহের প্রস্তাব ও আয়োজন—সব মিলিয়া খণ্ড খণ্ড ঘটনা একটি অখণ্ড জীবন-স্রোত ফুটাইয়া তুলিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা সার্থক গীতিকার লক্ষণ।)

আধুনিক উপন্যাসের উপযোগী ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি করিয়া একটি সুস্পষ্ট কাহিনীর ধারা শেষ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার সার্থক প্রয়াস 'কমলা' নামক গীতিকাটির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা 'কমলার বারমাসী' নামে পরিচিত; সংকলয়িতা সংক্ষেপে ইহাকে 'কমলা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে; প্রথমতঃ ইহা মিলনান্তক, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে আনুপূর্বিক একজন গায়েনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। এই গায়েনকে কেহ কেহ রচয়িতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কাহিনীটি এখানে সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতেছি—কমলা মাণিক চাকলাদারের কন্যা। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহার মত সুন্দরী বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাণিক চাক্‌লাদারের এক কারকুন (হিসাব-রক্ষক কর্মচারী) তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, তাহাকে লাভ করিবার জন্য চিকন গয়লানী নামক এক কুট্টিনীকে তাহার নিকট পাঠাইল। কমলা গয়লানীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। কারকুনের ক্রোধ বাড়িয়া গেল, সে দেশের রাজার নিকট চাক্‌লাদারের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা সংবাদ দিল যে, চাক্‌লাদার মাটি খুঁড়িয়া বহু মোহর পাইয়াছেন, তাহা নিজে একাই ভোগ করিতেছেন। মোহরের লোভে রাজা চাক্‌লাদার ও তাহার একমাত্র পুত্রকে বন্দী করিলেন। তারপর কারকুন নিজেই চাক্‌লাদারীর সনদ লইয়া মাণিকের সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইল। বিপন্ন কমলা মাতাকে লইয়া মাতুলালয়ে চলিয়া গেল। সেখানেও কমলার মাতুলের নিকট কারকুন এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে, কমলা ব্যভিচারিণী, তাহাকে গৃহে স্থান দিলে তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। এই পত্র পাঠ করিয়া কমলা একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া এক বৃদ্ধ মইষাল বা মহিষ-পালকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। একদিন রাজার ছেলে মইষালের

গৃহে কমলাকে দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল; মইষালকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কমলাকে সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজার ছেলে কমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট নিজের সুগভীর প্রণয় নিবেদন করিল। কমলা বলিল, 'সময় মত পরিচয় দিব, এখন নহে।' প্রত্যহ রাজার ছেলে কমলাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কমলা তাহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। একদিন রাজবাড়ীতে পূজার বাদ্য বাজিতে লাগিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালীর পূজা করিবেন—বন্দী পিতা-পুত্রকে দেবীর নিকট বলি দেওয়া হইবে। কমলা সকলই বুঝিতে পারিল। রাজার ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, 'আজ আমার পরিচয় দিব, তাহার পূর্বে আমার কথার সাক্ষি-স্বরূপ চিকন গয়লানী; কারকুন, মামা, মাসী, বৃদ্ধ মইষাল ইহাদিগকে রাজ-দরবারে হাজির কর।' তাহাদিগকে রাজার সম্মুখে হাজির করা হইল, কমলা রাজার সম্মুখে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রাজা মাণিক চাক্‌লাদার ও তাঁহার পুত্রকে মুক্ত করিয়া দিয়া কারকুনকে দেবীপূজায় বলি দিবার জন্য আদেশ দিলেন। রাজার ছেলের সঙ্গে কমলার বিবাহ হইল।

অন্যান্য গীতিকার মত ইহাও প্রেমাখ্যান-মূলক, এই প্রেমাখ্যানের ভূমিকা-স্বরূপ ইহার প্রথমেই কতকগুলি বিচিত্র ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে—এই ঘটনাগুলিও প্রেমের পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল। সেইজন্য কাহিনীর প্রথমাংশে ইহার মূল লক্ষ্যটুকু অস্পষ্ট হইয়া আছে। এই প্রেম-কাহিনীর নায়ক কাহিনীর শেষাংশে আসিয়া অবতীর্ণ হইবার ফলে তাহার রূপটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ঘটনার বাহুল্যে ইহার নায়কের চরিত্রটি একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যে তেজস্বিতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইহার নায়িকা কমলার চরিত্রের মধ্য দিয়াও তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মহুয়া চরিত্রের দৃপ্ততা ও তীব্রতা একমাত্র কমলার মধ্যে পাওয়া যায়। যে বিশ্বাসে মহুয়া হুম্‌রা প্রদত্ত বিষলক্ষের ছুরি অস্বীকার করিয়াছে, কমলার নেতাই কুট্টিনীকে আঘাত করিবার পশ্চাতে সেই প্রেম-প্রতীতি নাই। কমলা-গীতিকায় নায়িকার প্রেম আসিয়াছে আরও পরে—প্রায় এক দুর্যোগ রাত্রির শেষে। মহুয়ার মধ্যে প্রেমিকা নারীর চিত্র—কিন্তু কমলার ক্ষেত্রে নারীত্বই যেন অধিকতর প্রখর। ইহার কাহিনীর চমৎকারিত্ব সহজেই পাঠকের মন মুগ্ধ করিতে পারে। ইহা মিলনান্তক হইবার ফলে

গীতিকার সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম হইয়া রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবিসর্জনের একটি সকরুণ চিত্র 'দেওয়ান ভাবনা' পালাটির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কাহিনী এইরূপ—দশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া সুনাই জননীকে সঙ্গে লইয়া দরিদ্র মাতুলের গলগ্রহ হইল। মাতুল নিঃসন্তান, সেইজন্য ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে অনাদর করিল না, যথাসাধ্য ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল। সুনাইর বিবাহের বয়স হইল দেখিয়া পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সুনাই মাধব নামে এক যুবককে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, মাধবও তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দেওয়ান ভাবনার নিকট সুনাইর রূপযৌবনের সংবাদ গিয়া পৌছিল। ভাবনা দরিদ্র মাতুলকে অর্থ ও জমির প্রলোভন দেখাইয়া সুনাইকে তাহার নিকট বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিল। মাতুল ইহাতে স্বীকৃত হইল। সুনাই মাধবের নিকট তাহাকে ভাবনার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল। পরদিন যখন সুনাই জল আনিতে গেল, তখন ভাবনার লোক তাহাকে জলের ঘাট হইতে ধরিয়া লইয়া গেল। কিন্তু ভাবনার নিকট তাহাকে লইয়া পৌছিবার পূর্বেই, মাধব তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়া বিবাহ করিল। ভাবনা মাধবের পিতাকে বন্দী করিল। পিতার উদ্ধারের বিনিময়ে মাধব নিজে ভাবনার কারাগারে প্রবেশ করিল। ভাবনা মাধবের পিতাকে বলিয়া দিল, সুনাইকে পাইলে সে মাধবকে ছাড়িয়া দিবে। মাধবের পিতা গৃহে ফিরিয়া সুনাইর নিকট এ'কথা বলিলেন। সুনাই প্রিয়তমকে উদ্ধার করিবার জন্য ভাবনার নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইল, তারপর সঙ্গে বিষবড়ি লইয়া যাত্রা করিল। মাধব কিছুই জানিতে পারিল না। সুনাই পৌছিবা মাত্র মাধব কারামুক্ত হইল, কিন্তু ভাবনা সুনাইর নিকট আসিয়া দেখিতে পাইল, তাহার প্রাণহীন দেহ পালঙ্কের উপর লুটাইতেছে।

দশ বৎসর বয়সে যে পিতৃহীন হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়াছে, তাহার জীবন অভিশপ্ত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সেইজন্য তাহার প্রেমেও অভিশাপ প্রবেশ করিল। তাহার দুরন্ত রূপযৌবন তাহার প্রণয়াস্পদকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিবার বাধা হইল। নির্মম অভিশাপের রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া দেওয়ান ভাবনার উদয় হইল। প্রণয়াস্পদের সঙ্গে মিলনের

পূর্বেই এই অভিশাপ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেইজন্য মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। সুনাইর মৃত্যু আত্মত্যাগ,—মলুয়ার মত আত্মহত্যা নহে। এখানে উভয়েরই প্রেমে নিবিড়তা ছিল, সেইজন্য আত্মত্যাগের প্রেরণাও নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। প্রণয়াস্পদকে রক্ষা করিবার জন্য সুনাই'র এই উদার আত্মত্যাগ, কেবল মাত্র গীতিকার নহে, যে কোন মহাকাব্যের বিষয় হইতে পারে।

মাধবের চরিত্রটি ইহার মধ্যে অপরিস্ফুট হইলেও দুই একটি আভাসে ও ইঙ্গিতে তাহার যে দৃপ্ত পৌরুষের একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা গীতিকার অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের ব্যতিক্রম বলিয়াই বোধ হয়। সে বাহুবলে দেওয়ান ভাবনার অনুচরদিগের কবল হইতে তাহার প্রণয়িনীকে উদ্ধার করিল, তারপর নিজের পত্নীর সম্মান রক্ষা করিয়া নিজে দেওয়ান ভাবনার কারাবরণ করিল। তাহার এই পৌরুষ ও ত্যাগ সুনাইকে তাহার অপূর্ব আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করিল; কারণ, সুনাই বুঝিতে পারিল, সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার স্বামী দেওয়ান ভাবনার কবল হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না—তাহার প্রতি সুগভীর প্রেমই তাহার এই সুমহান্ আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দিয়াছিল। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র এই একটি মাত্র পুরুষ চরিত্রে যথার্থ পৌরুষের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রূপজ মোহের মধ্যে এখানে প্রেমের জন্ম হইলেও মোহকে জয় করিয়া পৌরুষ এখানে যথার্থ প্রেমের পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল। মাধব নিজের শক্তি দ্বারা অপহরণকারী দস্যুর হাত হইতে নিজের প্রণয়িনীকে উদ্ধার করিয়াছিল,

জলের উপর হইল রণ নিশির আমলে।
কোথা রইল দাঁড়ী মাঝি পইড়া মরে জলে॥

মাধবের এই পৌরুষের পরিচয়ের মধ্যে তাহার প্রেম মোহমুক্ত হইল এবং তাহাই সুনাইকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিল।

দরিদ্র ও লোভী ব্রাহ্মণ সুনাইর মাতুলের চরিত্রটি একটি বাস্তব সৃষ্টি। পল্লীকবিগণ মানব-চরিত্র যাহা যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা সেই ভাবেই রূপায়িত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকা চরিত্রের মধ্য দিয়া কোন কোন সময় গূঢ় শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইলেও, অন্যান্য সাধারণ চরিত্র সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব রূপ লাভ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাস্তবধর্মী

উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্য দিয়া অতি সহজেই প্রকাশ পাইয়াছে। সুনাইর মাতুল দরিদ্র 'যজমান্যা বামুন' তাহারই অন্যতম প্রমাণ। এই অপরিসর গীতিকাটি ঘটনারাশিতে পরিপূর্ণ। ঘটনাগুলি ইহার মধ্যে সুবিন্যস্ত হইয়াছে, কোথাও বিশৃঙ্খল হইয়া নাই। গীতিকার এই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলির মধ্যে 'দস্যু কেনারামের পালা'র কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যান্য গীতিকার মত নরনারীর প্রেম ইহার ভিত্তি নহে—ইহার ভিত্তি সাধারণ মানব-প্রেম। ইহাতে মানুষেরই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া এক নরঘাতক দস্যুর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইয়াছে। ইহার মূল কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু স্বতন্ত্র একজন বিশিষ্ট কবির রচিত মনসা-মঙ্গলের আনুপূর্বিক কাহিনীটি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ইহার মূল কাহিনীর রসটি নিবিড় হইতে পারে নাই। এই পালাটির বিচার করিতে হইলে ইহার বহিরাগত এই স্বতন্ত্র অংশটি পরিত্যাগ করিয়াই লওয়া প্রয়োজন। সেই ভাবেই কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

শৈশবে ব্রাহ্মণ-সন্তান কেনারাম মাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে আশ্রয় লইল। কিন্তু দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, মাতুল তাহাকে পাঁচ কাঠা ধানের বিনিময়ে এক হালুয়ার নিকট বিক্রয় করিল। হালুয়ার পুত্রগণ ডাকাত; শৈশবেই কেনারামের ডাকাতি বিদ্যায় দীক্ষালাভ হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে দুর্দান্ত নরঘাতক দস্যুতে পরিণত হইল। তাহার নাম শুনিয়া লোক শিহরিয়া উঠিত। একবার দ্বিজ বংশীদাস তাঁহার মনসা-গানের দল লইয়া কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে কেনারামের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। কেনারাম দলবল সহ তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। বংশীদাস জন্মের শেষ একবার মনসার গান গাহিয়া লইবার প্রার্থনা করিলেন। কেনারাম সম্মত হইল। দ্বিজ বংশী গান আরম্ভ করিলেন, কেনারাম শুনিতে লাগিল। যখন দ্বিজ বংশী বেহুলার ভাসান অংশ গাহিলেন, তখন কেনারাম হাতের খাঁড়া দূরে ফেলিয়া দিয়া দ্বিজ বংশীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, আজন্ম-সঞ্চিত পাপের জন্য তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না। দ্বিজ বংশী তাহাকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তদবধি কেনারাম একজন পরম ভক্তরূপে সমাজে পরিচিত হইল।

এই কাহিনীর মধ্যে কবির যে কি শক্তি, সমাজ-জীবনে তাঁহার যে কি দান, তাহাদের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—সহানুভূতির সঙ্গে কবি মানুষের দুঃখের কথা প্রকাশ করেন, তাহাতে নরঘাতক দস্যুর হৃদয়ও বিগলিত হয়, সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। কেনারামই এই কাহিনীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাহার চরিত্রের মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ইহাই বড় কথা নহে। তাহার চরিত্রের পরিবর্তন এখানে সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে কি না, তাহাই বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে দুইটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কেনারামের জন্ম-সংস্কার। দেখিতে পাওয়া যায়, মনসার বরে কেনারামের জন্ম হইয়াছে। অপুত্রক ব্রাহ্মণ-দম্পতি যখন সন্তান কামনা করিয়া দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, তখন এক রাত্রিতে দেবতা স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের পুত্রবর দিয়াছিলেন, তাহার ফলেই কেনারামের জন্ম। অতএব মনসার বরে তাহার প্রথম জন্ম হইয়াছিল, দ্বিজ বংশীর মুখ হইতে মনসার গান শুনিয়া তাহার পুনর্জন্ম হইল। গীতিকার মধ্যে এই ইঙ্গিতটির একটি উচ্চাঙ্গ কবিত্ব-মূল্য আছে। দ্বিতীয়তঃ কেনারাম ব্রাহ্মণ-সন্তান, ডাকাতি তাহার কৌলিক ব্যবসায় নহে, অবস্থাধীন হইয়া ইহাতে তাহার অভ্যাস হইয়াছে মাত্র; অতএব এই অভ্যাস অপরিত্যাজ্য নহে। দ্বিজ বংশীর মুখে মানুষের জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্যের কাহিনী শুনিয়া তাহার উচ্চকুল-সুলভ করুণাগুণের বিকাশ হইল; ইহাতেই তাহার চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসঙ্গতি কিছু মাত্র নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, এই গীতিকায় আয়ত্ত (acquired) ও সহজাত (inherent) সংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব নির্দেশ করিয়া পরিণামে সহজাত সংস্কারেরই জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটির উপর রামায়ণোক্ত রত্নাকর দস্যুর কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার উপর কোনও বহিঃপ্রভাব নাই।

'রূপবতী' নামক গীতিকাটির প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে স্বাধীন প্রেমের কথা নাই, বরং দৈব-বিড়ম্বনায় মাতা যাহার নিকটই কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা আছে। কাহিনীটি এই—রামপুরের রাজার নাম রামচন্দ্র; তাঁহার একটি মাত্র কন্যা, নাম রূপবতী।

বালিকা কন্যা গৃহে রাখিয়া রাজা কার্যোপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে গেলেন। বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন না দেখিয়া রাণী তাঁহার নিকট একটি পত্র লিখিলেন—কন্যাকে আর অবিবাহিতা রাখা যায় না ; দেশে ফিরিয়া তাহার বিবাহের একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করা হইল। পত্র পাইয়া রাজা দেশে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া রাণী জানিতে পারিলেন, তাঁহার পত্রখানিই কাল হইয়াছে—নবাব পত্রখানি দেখিতে পাইয়া কন্যাটিকে তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। শুনিয়া রাজার আহার-নিদ্রা দূর হইয়াছে। রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিবেন, তাহার হস্তেই কন্যা-দান করিবেন, তারপর যাহা হয় হইবে। শুনিয়া রাণী মদন নামক তাঁহাদের এক রূপবান্ যুবক কর্মচারীকে পরদিন রাজার শয়ন-গৃহের দ্বারে উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। প্রভাতে তাহার মুখই প্রথম দেখিতে পাইয়া রাজা তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাহাদের ভোগের জন্য একখানি গ্রাম লিখিয়া দিলেন।

এই কাহিনীর একটি পাঠান্তর আছে, তাহাতে ইহার শেষাংশ এইরূপ—নবাবের নির্দেশ মত রাজা তাঁহাকেই নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাণী ইহার পূর্বেই একদিন নিশীথরাত্রে গোপনে মদন নামক তাঁহাদের এক যুবক কর্মচারীর হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া নৌকাযোগে সেই রাত্রেই দূরদেশে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পর মদন তাহার মাতাপিতার সংবাদ লইবার জন্য দেশে আসিয়া রূপবতীর পিতার লোকজন কর্তৃক ধৃত হইল, রূপবতীকে অপহরণ করিবার অপরাধে রাজা তাহাকে বলি দিবার আদেশ দিলেন। পরে রূপবতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং কন্যা-জামাতাকে বসবাসের জন্য বিস্তৃত জমিদারী লিখিয়া দিলেন। নবাব দরবার হইতে এই বিষয়ে আর কোনও সংবাদ আসিল না।

এই কাহিনীর দ্বিতীয় পাঠটি অধিকতর কাব্যগুণ-সম্পন্ন—প্রথম পাঠটির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। দ্বিতীয় পাঠটিতে নারীচরিত্রের মধ্যে আর একটি নূতন শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এই শক্তি সংগ্রামের শক্তি নহে, ইহা নির্বিচার আত্মসমর্পণের শক্তি। নির্বিচার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই রূপবতীর

চরিত্রের সার্থকতা। এই গীতিকাটির একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা গীতিকার বিষয় নহে, ইহা রূপকথার বিষয়—ইহাতে প্রেম মুখ্য নহে, ইহার মধ্যে বিবাহে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথাও নাই—ইহার নির্বিচার আত্মসমর্পণের শক্তির মধ্যে প্রেমানুভূতি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহা রূপকথা, তবে রূপকথা যেমন একান্ত কল্পনাশ্রয়ী, ইহা তাহা নহে—ইহা রূপকথা হইয়াও বাস্তব জীবনের উপাদানে গঠিত। অতএব ইহার মধ্যে রূপকথার রূপ ও গীতিকার রস দুই-ই আছে। ইহার রচনা স্থানে স্থানে উচ্চ কবিত্বগুণ-সমৃদ্ধ—

আন্ধাইরা নিঝুম রাতি আস্‌মানে জ্বলে তারা।
মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া॥
লাজেতে গলিয়া পড়ে কন্যার মাথার কেশ।
আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা পরে নিজ বেশ॥
না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ।
নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সমর্পণ॥

তবে এখানে একটি কথা মনে হইতে পারে। রূপবতীর এই আত্মসমর্পণ কি সম্পূর্ণই নিবিচার? ইহার মধ্যে তাহার প্রণয়-স্বপ্নের সার্থকতার কি কোনও পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া নাই? জননী তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিবার জন্য যে মদনকেই নির্বাচন করিলেন, এই বিষয়ে আর কোনও দিক যে তিনি মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখিলেন না, তাহার মূলে কি ইহাদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কোনও ইঙ্গিত তিনি ইতিপূর্বে লাভ করেন নাই? এই মিলনে কি রূপবতীর মৌন স্বীকৃতি ছিল না? 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নায়িকাদের কেহই ত সমাজ কিংবা মাতাপিতার নির্দেশ একান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া ব্যাক্তিগত প্রণয়-স্বপ্ন বিসর্জন দেয় নাই—বরং যেখানে ইহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে, সেখানে নিজেরাই বিদ্রোহিণী হইয়াছে। অতএব এখানে ত তাহার কোনও ব্যাতিক্রম হইবার কথা নাই। তবে এ'কথাই সত্য যে, এই বিবাহে রূপবতীর প্রণয়-স্বপ্ন সার্থকতা লাভ করিয়াছিল—সে মদনকে পূর্বেই মনে মনে আত্মদান করিয়াছিল। তবে তাহার বিস্তৃত পরিচয় এই কাহিনীতে নাই—থাকিবার কথাও নহে।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকা 'দেওয়ানা মদিনা।' ইহার কাহিনী এই প্রকার—দুইটি বালক-পুত্র সংসারে রাখিয়া বান্যাচঙ্গ্ সহরের দেওয়ান সোনাফরের পত্নীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর সময় আলাল ও দুলালকে দেওয়ানের হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার পত্নী পুনরায় তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিবারণ করিয়া গেলেন ; কারণ, জননীর আশঙ্কা হইল, সংমা সংসারে আসিলে তাঁহার পুত্র দুইটির লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। সোনাফর কিছুদিন মৃতা পত্নীর কথা রক্ষা করিলেন, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন ও পার্ষদদিগের পরামর্শে তাঁহাকে অবশেষে পুনরায় বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি পুত্রদিগকে নিজের কাছে রাখিয়া পূর্বের মতই আদর করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে সংমার নিকট অন্তঃপুরে যাইতে দিলেন না। ইহাতে সংমার হিংসা আরও বাড়িয়া গেল। সংমা সঙ্কল্প করিল, আপদ দুইটিকে যে ভাবেই হউক সংসার হইতে বিদায় করিতে হইবে। তারপর একদিন তাহার কৌশলে তাহারা নৌকাপথে নীত হইয়া দূর দেশান্তরে নির্বাসিত হইল। আলাল ও দুলাল এক সদাগরের গৃহে আশ্রয় লাভ করিল—তাহারা সদাগরের রাখালের কার্যে নিযুক্ত হইল। দেওয়ানের পুত্র হইয়া এই কার্য তাহারা সহ্য করিতে পারিল না, একদিন আলাল সেখান হইতে পলাইয়া গেল। এইবার আলাল এক সহৃদয় দেওয়ানের গৃহে আশ্রয় পাইল, তাঁহার নাম সেকেন্দর। দেওয়ান তাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতে লাগিলেন, সেও সাধ্যমত দেওয়ানের সেবায় দিন যাপন করিতে লাগিল। দেওয়ান তাহাকে মাহিনা দিতে চাহিলে সে লইল না ; বলিল, 'একসঙ্গে একদিন লইব।' দেওয়ানের দুই কন্যা ছিল—মমিনা ও আমিনা। একটি কন্যাকে দেওয়ান আলালের নিকট বিবাহ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার কোন কুলপরিচয় না পাইয়া কি করিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। একদিন আলাল দেওয়ানের নিকট তাহার মাহিয়ানা চাহিল—বলিল, 'আমি অর্থ চাই না—বান্যাচঙ্গ্ সহরের সংলগ্ন আমার একটি বাড়ী করিবার সাধ হইয়াছে, সেখানকার দেওয়ানের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাহাতে সেই বাড়ী নির্মিত হইতে পারে, তাহার উপযুক্ত ফৌজ আমার সঙ্গে দিন।' দেওয়ান তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। সোনাফরের মৃত্যুর পর ইতিমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর বালক-পুত্র বান্যাচঙ্গের দেওয়ান হইয়াছিল, তাহাকে পরাজিত করিয়া আলাল পিতার

দেওয়ানি অধিকার করিয়া লইল। সেকেন্দর এইবার তাঁহার এক কন্যাকে আলালের নিকট বিবাহ দিতে চাহিলেন; আলাল বলিল, 'আমার এক ভাই আছে, তাহাকে সন্ধান করিয়া আনিয়া আমরা দুইজনে আপনার দুই কন্যা বিবাহ করিব।' এই বলিয়া আলাল দুলালের সন্ধানে বাহির হইল। বহু অনুসন্ধানের পর এক গ্রামে আসিয়া আলাল তাহার সন্ধান পাইল। তাহাকে দেশে ফিরিয়া পিতার দেওয়ানির অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বলিল। দুলাল সঙ্কটে পড়িল, সে ইতিমধ্যে সেই গ্রামেই এক গৃহস্থ কন্যাকে বিবাহ করিয়া এতকাল সেখানেই বসবাস করিতেছে। তাহার স্ত্রীর নাম মদিনা; এই স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছে, নাম সুরুজ। ইহারা সাধারণ গৃহস্থ, ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেওয়ানি করা চলে না, লোক-নিন্দা হইবে,—অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়! আলাল বলিল, 'সেজন্য ভাবিও না, আমরা দুইজনে এক দেওয়ানের দুই কন্যা বিবাহ করিব, ইহাদিগকে ছাড়িয়া চল। স্ত্রীকে তালাক্ দিতে অধর্ম নাই।' শুনিয়া দুলাল তাহাই করিল, মদিনার ভাইয়ের নিকট তালাক্‌নামা লিখিয়া দিয়া কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া আলালের সঙ্গে চলিয়া গেল। মদিনা বিশ্বাস করিল না যে, তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার ফিরিয়া আসিবার আশায় সে দুঃখের দিন গুণিতে লাগিল; কিন্তু তাহার আর সহিল না, একদিন কবরের মাটিতে আশ্রয় লইল। অনুতপ্ত দুলাল ফিরিয়া আসিল; কিন্তু দেখিল, তাহার গৃহ শ্মশান হইয়া গিয়াছে; সুরুজ জননীর কবরের উপর কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে। দুলাল ফকির সাজিয়া মদিনার কবরের উপরে একটি কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল।

কাহিনীর দুইটি অংশ—প্রথম অংশ রূপকথা, দ্বিতীয় অংশ গীতিকা। ইহার মধ্যে মদিনার চরিত্রই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মৈমনসিংহ-গীতিকা-গুলির ভিতর দিয়া নারীশক্তির বিভিন্ন দিকের পরিচয় প্রকাশ-পাইয়াছে—মদিনা চরিত্র তাহাদেরই যে কেবল অন্যতম, তাহা নহে—কতকগুলি দিক দিয়া ইহাই সর্বোত্তম বলিয়া মনে হইবে; কারণ, ইহার একটি সহজ সরল গার্হস্থ্য রূপ আছে, এই রূপটি কেবল মাত্র কল্পনাশ্রিত বা আদর্শায়িত নহে বলিয়াই ইহা বাস্তব ও জীবন্ত; সেইজন্য এই রূপটি চোখের সম্মুখে যেন সহজেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে! কেবল মাত্র অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সম্মুখ সংগ্রাম কিংবা আত্মত্যাগের

ভিতর দিয়াই যে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা নহে—নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়াও যে তাহার এক অপূর্ব মহিমা প্রকাশ পাইতে পারে, মদিনার জীবনে তাহাই দেখা যায়। মদিনার সকরুণ প্রতীক্ষার মধ্যে এক শোকার্ত দৃষ্টি আছে, এক ব্যথা-বিধুর বিশ্বাস আছে (গল্‌স্‌ওয়াদির *Apple Tree*-র নায়িকার মত), এই বিশ্বাস অনেকটাই যেন ভাব-নিষ্ঠ। স্বামী যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না; সমগ্র প্রাণ দিয়া যেখানে সে একদিন তাহার স্বামিপ্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিয়াছে, সেখানে ত এই বিশ্বাস আসিতে পারে না। তাহার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছিল—তাহার প্রেমের আকর্ষণেই তাহার অনুতপ্ত স্বামী পুনরায় একদিন অলীক দেওয়ানির মোহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার পার্শ্বেই ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেদিন সে আর নিজে বাঁচিয়া ছিল না সত্য, তথাপি তাহার প্রেম বাঁচিয়া ছিল; তাহা না হইলে দুলাল সেদিন কি লইয়া দেওয়ানা হইয়াছিল? কি লইয়া সংসারের সকল আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া তাহার কবরের উপর কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে ফকির সাজিয়া নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল? মদিনার অমর প্রেমই তাহাকে এই আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কবিগণ বুঝিয়াছিলেন, নারীর প্রেমে যে নিষ্ঠা আছে, পুরুষের প্রেমে তাহা নাই। সেইজন্যই চন্দ্রাবতী ও মদিনার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। দুলাল অভিজাত বংশীয় ঐশ্বর্যশালীর সন্তান; সেইজন্য বাহিরের ঐশ্বর্য তাহার জীবনের ফাঁকে ফাঁকে ইসারা করিয়া যাইত। আলালের আকস্মিক আবির্ভাবে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়া সেই ইসারায় সাড়া দিল; কিন্তু সহজেই বুঝিল, বাহিরের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যবোধ অন্তর পূর্ণ করিতে পারে না; অন্তর আর একটি অন্তরের জন্য হাহাকার করিতে থাকে এবং তাহাই ফিরিয়া পাইবার জন্য সে পুনরায় তাহার পরিত্যক্ত পল্লীর জীর্ণ কুটীরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিলেই ত আর তাহা সহজে ফিরিয়া পাওয়া যায় না! ভ্রান্তি-বশতঃ অবহেলা করিয়া যে লতা বৃন্তচ্যুত করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছি, আমার ভ্রান্তি অপনোদনের পর আসিয়া তাহা কি আর সেই ভাবেই ফিরিয়া পাইতে পারি? লতা শুকাইবে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল ব্যয়িত হইবে।

'কঙ্ক ও লীলা' বা 'লীলার বারমাসী' গীতিকাটি বিচিত্র নাটকীয় ঘটনায় সমৃদ্ধ। ইহার কাহিনী এই—ছয়মাস বয়সেই শিশু কঙ্ক মাতৃপিতৃহীন হইল। সংসারে দেখিবার কেহ নাই, অবশেষে এক নিঃসন্তান চণ্ডাল-দম্পতি ব্রাহ্মণ শিশুটিকে লালন-পালন করিতে লাগিল। তাহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন চণ্ডাল-দম্পতিও পরলোক গমন করিল। কঙ্ক দ্বিতীয় বার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। এইবার গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে তাহার আশ্রয় জুটিল। গর্গের এক কন্যা ছিল, লীলা; আট বৎসর বয়সে লীলা মাতৃহারা হইল। গর্গ কঙ্ক ও লীলা উভয়েরই মাতাপিতার স্থান পূর্ণ করিলেন। লীলা যৌবনে পদার্পণ করিল, কঙ্কের প্রতি তাহার অনুরাগ সে আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না। ইতিমধ্যে গ্রামে এক পীরের আবির্ভাব হইল, কঙ্ক তাহার নিকট যাতায়াত করিয়া অবশেষে গোপনে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, তাহার আদেশে কঙ্ক সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করিল। কঙ্কের কবি-খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চণ্ডালের গৃহে পালিত হইয়াছিল বলিয়া কঙ্ককে বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গর্গ সমাজে তুলিয়া লইলেন; ইহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, কঙ্কের নামে নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। এই সূত্রেই গর্গ শুনিতে পাইলেন যে, কঙ্ক মুসলমান পীরের নিকট দীক্ষা লইয়াছে এবং লীলার প্রতি সুগভীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছে। শুনিয়া গর্গ ক্রোধান্ধ হইয়া উভয়ের প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন কঙ্কের অন্নে তিনি বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন, লীলা তাহা দেখিতে পাইয়া কঙ্ককে তাহার পিতার আশ্রয় হইতে পলাইয়া যাইতে বলিল। কঙ্ক লীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া গেল। দিন যাইতে লাগিল, কঙ্কের বিরহ লীলার ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। গর্গ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, কঙ্ককে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার দুই জন শিষ্যকে পাঠাইলেন, ছয়মাস কাল অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। দুঃখে বেদনায় লীলা শয্যাগ্রহণ করিল, অবশেষে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইল। কঙ্ক যখন ফিরিল, তখন শ্মশানে লীলার দেহ ভস্মীভূত হইতেছে। গর্গকে সঙ্গে লইয়া কঙ্ক পুনরায় তীর্থের পথে বাহির হইল।

কঙ্কের চরিত্রই ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। প্রথম হইতে কাহিনীর শেষ পর্যন্ত বিচিত্র ঘটনারাশির ভিতর দিয়া তাহার চরিত্র বিকাশ লাভ

করিয়াছে। মাতৃহীন ব্রাহ্মণ-শিশু চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হইল; চণ্ডাল-চণ্ডালিনীকে নিজের জনক-জননী বলিয়া জানিল, কিছুদিনের মধ্যে সেই আশ্রয় হইতেও সে চ্যুত হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গর্গ তাহাকে নিজের গৃহে স্থান দিলেন। গর্গের পত্নীকে জননীরূপে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার পূর্বেই ব্রাহ্মণী পরলোক গমন করিলেন। জননীর স্নেহলাভ কঙ্কের অদৃষ্টে ছিল না। এইবার সে মাতৃহারা গর্গ-কন্যা লীলাকে নূতন পরিচয়ের ভিতর দিয়া লাভ করিল, কিন্তু তাহার সম্পর্কিত কোন অনুভূতিই বাহিরে প্রকাশযোগ্য নহে—লীলা গুরুকন্যা, সহোদরার তুল্য। এই দ্বন্দ্ব কঙ্কের দুর্জয় হইয়া উঠিল। সে ব্রাহ্মণ মাতা-পিতার সন্তান হইয়া চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছে, পুনরায় সে ব্রাহ্মণের সংসর্গে আসিয়াছে—ইহার ফলে সে তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথটি হারাইয়া ফেলিল। গোপনে গিয়া সে এক পীরের নিকট দীক্ষা লইল। কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণা তাহার জীবনে সত্য ছিল না; একমাত্র যাহা সত্য ছিল, তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত না, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবারও নহে। কঙ্কের পরীক্ষা আরম্ভ হইল, গুরুর সাময়িক চিত্ত-বিক্ষোভের জন্য তাহাকে লীলার পরামর্শে দেশত্যাগ করিতে হইল। তাহাকে যাহাতে লীলা ভুলিয়া না যায়, সে জন্য তাহার পোষা পাখীটিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবার কথা বলিয়া গেল,

ঘরে আছে পোষা রে পাখী হীরামণ শারী।
তাহারে ডাকিও, রে লীলা, 'কঙ্ক' নাম ধরি॥

দীর্ঘকাল পর যখন সে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে—কঙ্কের মর্মের কথা মর্মেই রহিয়া গেল; একটি মাত্র যে হৃদয়ের মধ্যে তাহার নিজ হৃদয়ের গূঢ় অনুভূতিটি প্রতিস্পন্দিত হইয়াছিল, তাহা তখন চিতার আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। কঙ্কের প্রত্যাবর্তন যেন একটি স্বপ্ন—মৃত্যুর মুহূর্তে অন্তিম জীবনীশক্তি কেন্দ্রিত হইয়া এক মুহূর্তের জন্য মনে যে শেষ চৈতন্য সঞ্চারিত হয়, তাহা দ্বারাই যেন লীলা কঙ্কের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—তারপরই সব শেষ হইয়া গেল। পল্লীকবিগণ শৈশব হইতেই কঙ্ককে স্নেহ-ভালবাসা, আশা-নৈরাশ্য ও প্রেম-বৈরাগ্য দিয়া গঠন করিয়াছিলেন। তাহাদের পরিকল্পনায় চরিত্রটির একটি সার্থক সুন্দর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

বংশীদাস ও চন্দ্রাবতীর মত কঙ্ক জনশ্রুতিমূলক (traditional) চরিত্র। লীলার চরিত্রটি ভূলুণ্ঠিতা একটি লতার মত—বাল্যে জননীর এবং যৌবনে প্রণয়াস্পদের আশ্রয়-চ্যুতা ; নিরাশ্রিতা লতা যেমন দেহ ও মনের দিক দিয়া বাড়িতে পারে না—দেহে পুষ্টি থাকে না, পুষ্পে পল্লবে মনের বিকাশ সম্ভব হয় না, তেমনই লীলা অপরিস্ফুট থাকিয়াই শুকাইয়া গেল। তাহার রূপটি পল্লীকবির সুগভীর আন্তরিক মমতায় মাখা। বিষয়-নির্লিপ্ত উদার ব্রাহ্মণ গুরু গর্গ সমাজের ক্রূরতা স্বভাবতঃই সহ্য করিতে পারিলেন না। যিনি যত বড় জ্ঞানীই হউন, হৃদয়াবেগকে শাসন করিবার শিক্ষা তাঁহার না থাকিলে, তাহা দ্বারা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে যে কত শোচনীয় পরিণাম সম্ভব হয়, তিনিই তাহার প্রমাণ। বিষমিশ্রিত অন্ন আহার করিয়া সুরভি গাভী প্রাণত্যাগ করিল—মাতৃহীন গোবৎস হাম্বা রব করিতে করিতে আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। একদিন যে হৃদয়াবেগের বশবর্তী হইয়া তিনি শ্মশান হইতে চণ্ডাল-শিশুকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই হৃদয়াবেগের বশবর্তী হইয়াই তিনি পশুর দুঃখেও কাতর হইয়া পড়িলেন। হৃদয়ে পুনরায় কারুণ্যের জন্ম হইল, তখনই কঙ্কের বিচ্ছেদ তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

গুরু গর্গের চরিত্রের মধ্যেই এই কাহিনীর ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয়, 'গর্গ ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন না'। হিন্দু ধর্ম এবং ইহার সংস্কার বিষয়ক তাঁহার কোনও গোঁড়ামি কিংবা অন্ধতা ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও চণ্ডালের শ্মশানের প্রান্ত দিয়া চলিবার সময় চোখ কান বুজিয়া পথ চলেন না, সেই পরম অপবিত্র শ্মশানের ধূলিমাখা রোরুদ্যমান অসহায় চণ্ডাল-শিশুকেও সেখান হইতে কুড়াইয়া গৃহে লইয়া আসেন। তাঁহার এই হৃদয়-দৌর্বল্যের জন্যই এই কাহিনীর করুণ পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিল। একদিক দিয়া ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা, অপর দিক দিয়া বিপন্ন মানবতার প্রতি সহানুভূতিবোধ এই উভয়ের দ্বন্দ্বেই তাঁহার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য দূর হইল ; এমন কি, তাহা কঙ্ক ও লীলার জীবনকেও স্পর্শ করিয়া তাহাদেরও পরিণতি মর্মান্তিক করিয়া তুলিল।

এই কাহিনীর মধ্যে যে গর্গের দৈববাণী শুনিবার কথা আছে, তাহা অলৌকিক নহে—গীতিকায় অলৌকিকতার কোনও স্থান নাই—ইহা গর্গের বিবেকের বাণী, ইহাকেই দৈববাণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্যে নারীর যে একটি স্থান আছে, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নারীচরিত্রগুলির সঙ্গে তাহার সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। ভারতীয় সাহিত্যে সমাজ-শাসনকে সকল দিক হইতে স্বীকার করিয়া নারীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; সেইজন্য ইহাতে তাহার জননীর রূপটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রেমিকা নারীর পরিচয়ও তাহাতে বিচিত্র রস ও সৌন্দর্যে বিকাশ-লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই প্রেম একান্ত ভাবে সমাজের ধর্ম ও নীতি দ্বারা শাসিত ছিল বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া নারীমনের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হয় নাই। যেখানে অনুভূতির স্বাধীন বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি হয়, সেখানে তাহার মধ্যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতে পারে না। সংস্কৃত কাব্য-নাট্য ও বাংলা মঙ্গল ও বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া নায়িকার প্রেম বিকাশ করিয়াছে। সেইজন্য ইহাদিগের মধ্যে একদিক দিয়া যেমন আন্তরিকতার অভাব হইয়াছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টিও সম্ভব হয় নাই। সংস্কৃত রামায়ণ কিংবা মহাভারতের কোন নায়িকা-চরিত্রের মধ্যেই বিশুদ্ধ প্রেমিকা সত্তার কোনও পরিচয় নাই; কালিদাস তাঁহার নাটক এবং কাব্যের মধ্যে স্বাধীন প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমাজ-নীতির সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহা সীমায়িত হইয়াছে। কণ্ব-পালিতা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তির মধ্যে গান্ধর্ব-বিবাহের স্বীকৃতি ছিল; উমার সুকঠিন প্রেম-তপস্যার মধ্যে কোনও রক্ত-মাংসের দেহধারী প্রেমিক-চরিত্র লক্ষ্য ছিল না—মৃত্যুঞ্জয়ী স্বামী সম্পর্কিত হিন্দু নারীর যে আদর্শবোধ থাকে, তাহাই মাত্র লক্ষ্য ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-কবিতা প্রভৃতির নায়িকা-চরিত্রের প্রেরণাও সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আসিয়াছে; সুতরাং ইহাদের মধ্যেও সংস্কৃত সাহিত্যের নারীচরিত্রের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। রামায়ণের সীতার চরিত্রের আদর্শ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল আখ্যায়িকা-কাব্যের নারীচরিত্রকে প্রভাবিত করিয়াছে। এমন কি, মধ্যযুগের বাংলার জাতীয় কাব্যের নায়িকা-চরিত্র বেহুলাও এই প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।

এই পটভূমিকায় যখন 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নারী-চরিত্রগুলির দিকে লক্ষ্য করা যায়, তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা যেন একটু স্বতন্ত্র, স্বকীয় মহিমা ও গৌরবে স্বয়ংসম্পূর্ণ; নারীর একটি বিশিষ্ট সত্তা ইহাদের

ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা যেন এই অঞ্চলের নদনদী-হাওর-অরণ্য বিধৃত প্রাকৃতিক সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেইজন্য স্বভাবের মাধুর্য ও সারল্য, হিংস্রতা ও বিচিত্র হৃদয়াবেগ ইহাদের মধ্য দিয়া নানাভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি-জগতের সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে যেমন তাহার একটি ভয়াবহ শক্তির পরিচয়ও প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এই নারী চরিত্রগুলির উপরিস্থিত সেই সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে তাহাদের এক দুর্জয় শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাদের এই শক্তি তাহাদের স্বাধীন প্রেমিকা-সত্তাকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে প্রেমিকা নারীর স্বাধীন সত্তা নাই—সমাজ অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া তাহাদিগকে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, সেই পথই তাহারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নায়িকাগণ তাহাদের প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তিতে সর্ব-সংস্কারমুক্ত এবং স্বাধীন। এইখানে ভারতীয় সাহিত্যের, এমন কি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরও নায়িকা-চরিত্রের সঙ্গে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নায়িকা-চরিত্রের পার্থক্য।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রত্যেকটি নারী-চরিত্রই প্রেমিকা। ব্যক্তিমানস-জাত সেই প্রেমের নিষ্ঠাতেই তাহাদের পাতিব্রত্য—পাতিব্রত্যের সমাজ-নির্দিষ্ট সংজ্ঞা তাহাদের নিকট অর্থহীন।

একটি সুগভীর বেদনার্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কাহিনীগুলির উপর ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'কেন প্রেম নাহি পায় আপনার পথ'—এই চিরন্তন জিজ্ঞাসাই গীতিকাগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মহুয়া তাহার অভিশপ্ত জীবনের রক্তাক্ত পরিণতির মধ্যে, মলুয়া তাহার স্বজন-বিতাড়িত জীবনের দুর্ভাগ্যের অন্তিম মুহূর্তে, চন্দ্রাবতী তাহার প্রবঞ্চিত জীবনের নৈরাশ্যে, আর মদিনা ও লীলা তাহাদের অশ্রুপাত-সজল অনন্ত প্রতীক্ষার মধ্যে এই জিজ্ঞাসাই তুলিয়া ধরিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের পরিণতি মিলনাত্মক, স্বর্গারোহণে ইহার কাহিনীর সমাপ্তি; ভাব-সম্মিলনে বৈষ্ণব কবিতার উপসংহার। কিন্তু 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র পরিণতি বিয়োগান্তক—অপরিতৃপ্ত মানব-হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দনে ইহার আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত। 'There is no after-life for ballad characters, and nothing more valuable than the happiness of earthly union.' মলুয়ার আত্মহত্যার

মধ্যে পারত্রিক কোনও কল্যাণ কামনা নাই, ইহা একান্ত মানবিক অভিমান-বোধেরই বাস্তব অভিব্যক্তি। লীলার অকাল মৃত্যুও জন্মান্তরে প্রিয়-মিলনের কোনও ইঙ্গিত দিয়া যায় নাই ; এমন কি, চির-প্রতীক্ষমানা মদিনার দাম্পত্য জীবনের নিষ্ঠুর সমাপ্তির মধ্যেও পারলৌকিক মিলনের কোন আশা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সমাজ মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব কবিতার মত স্বর্গ কিংবা বৈকুণ্ঠ কামনা করে না—মর্ত্য জীবনের লাভ-ক্ষতির মধ্যেই ইহার জীবন-স্বপ্ন সীমায়িত। তবে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে যে কয়েকটি মিলনান্তক কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা রূপকথা-ধর্মী, গীতিকা-ধর্মী নহে, সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন সমাজের মিশ্র উপাদান লইয়া 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সমাজ গঠিত হইয়াছে, তবে ইহাদের মধ্যে যাহা মৌলিক, অর্থাৎ সেই আদিম সমাজের উপকরণ, তাহাই ইহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া আছে। এই বিভিন্ন সমাজের উপাদানের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কথা এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ কালক্রমে বাংলার সমাজের উপর নানা দিক হইতে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিগত-হৃদয়-বোধের দ্বন্দ্ব লইয়া যে-কয়টি গীতিকা এখানে রচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা যে খুব বেশী, তাহা বলিতে পারা যায় না। এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে যে কয়টি গীতিকার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের কথা আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, তাহাদিগকেও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে স্বতন্ত্র উপকরণের সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ 'মলুয়া' গীতিকাটির কথাই ধরা যাউক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ্য-সমাজের শাসনেই মলুয়ার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু চাঁদ বিনোদের চারিত্রিক দৌর্বল্যই এখানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের শাসনরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। মলুয়ার প্রতি চাঁদ বিনোদের প্রেম ছিল না, ছিল মোহ। প্রেম যেখানে সত্য নহে, সেখানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের শাসন একটা উপলক্ষ্য হইয়াছে মাত্র, এই মিলন কোন দিনই সার্থক হইতে পারিত না। মলুয়ার প্রেমে যে সত্য ও তাহার যে শক্তিই থাকুক, ইহা কেবল মাত্র একদিক হইতে সার্থক হইতে পারিত না। চাঁদ বিনোদ মলুয়াকে ত্যাগ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য

সমাজের শাসনের ভয়ে নহে, তাহার স্বকীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে। চন্দ্রাবতীও জয়ানন্দকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের শাসনের ভয়ে পরিত্যাগ করে নাই—\ নারীহৃদয়ের একান্ত স্বাভাবিক অভিমান-বোধ চন্দ্রাবতীর প্রাণকে সেদিন এক সুকঠিন তপস্যার মধ্য দিয়া আত্মবিসর্জন করিবার শক্তি দিয়াছিল। এখানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের শাসনের কোনও কথাই আসে না। বিবাহের সম্মতি দিবার পূর্বে সে যে পিতার নিকট হইতে জয়ানন্দকে অনুমতি লইতে বলিয়াছিল, তাহাতেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের নির্দেশ ছিল বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। ইহার ভিতর দিয়াও নারীর সহজ ভাবে ধরা দিবার স্বাভাবিক অনিচ্ছার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। পিতার প্রতি চন্দ্রাবতীর একান্ত নির্ভরতা থাকিলে নির্বিচারে সে জয়ানন্দকে আত্মসমর্পণ করিতে পারিত না। গীতিকার কোনও নারী-চরিত্রের আচরণই তাহার পিতা কিংবা অন্য কোনও অভিভাবক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় নাই—বিবাহের বিষয়ে ইহারা প্রত্যেকেই স্বাধীন।

একটি মাত্র গীতিকায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সঙ্গে যে ব্যক্তিগত হৃদয়বোধের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা 'কঙ্ক ও লীলা।' আচার-ধর্মের সঙ্গে হৃদয়-ধর্মের সংঘাতের ফলেই এই গীতিকার করুণ পরিণতি সম্ভব হইয়াছে। গুরু গর্গ জন্ম-পরিচয়হীন কঙ্ককে পুত্রের মত স্নেহ করেন। পুত্রতুল্য কঙ্ক যখন পীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে, তখন আচার-ধর্মের প্রভাব বশতঃ তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। সমস্ত গীতিকার চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র তিনিই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারাই কাহিনীর পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অন্যত্র কোথাও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দ্বারা কাহিনীর পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয় না।

বৈষ্ণব পদাবলী ও 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বাংলার এই দুই বিশিষ্ট কাব্যধারার তুলনামূলক আলোচনা করিতে গেলে যে বিষয়টি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেইটি হইল এই যে, উভয় কাব্যধারার মধ্যেই লৌকিক প্রেম স্থান লাভ করিয়াছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র একমাত্র 'দস্যু কেনারামের পালা' ছাড়া অন্যান্য নয়টি গীতিকাতেই লৌকিক প্রেমানুভূতির আশ্চর্য উত্তপ্ত স্পর্শ অনুভব করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও লৌকিক প্রেম-চেতনার বিচিত্র সুর ধ্বনিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' করিয়া আত্মগত সাধনায় জগৎ এবং জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ লৌকিক প্রেমকে আশ্রয় করিয়া প্রেমের আধ্যাত্মিক বিলাস দেখাইয়াছেন। পূর্বরাগ, অভিসার, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য, বিরহ ইত্যাদির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া শ্রীরাধা ভাব-সম্মিলনের রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যোন্মাদিনী হইয়াছেন। কিন্তু 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র নায়িকাদের জীবনে প্রেমের সেইরূপ কোন আধ্যাত্মিক বিলাস লক্ষ্য করা যায় না। গীতিকার নায়িকারা লৌকিক প্রেমেরই জয়গান করিয়াছেন। প্রেমের জন্য তাঁহারা পাগল হইয়াছেন। তাঁহারা সম্মুখ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ কিংবা নীরব সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া লৌকিক প্রেমের অপূর্ব সাধনা করিয়াছেন। প্রেমাস্পদের ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্নিহিত মূল্য ও তাহার বিকাশের বিশিষ্ট পথের অনুসন্ধানই এই সব নায়িকাদের সাধনা এবং সেই সাধনার প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করাতেই তাঁহাদের আনন্দ। বিচ্ছেদের আঘাত পাইয়া তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিলাসে মগ্ন হন নাই। এই প্রসঙ্গে গীতিকার অন্যতম নায়িকা চন্দ্রাবতীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য। প্রেমের আঘাতে সহিষ্ণুতা এক নীরন্ধ্র কঠোর অভিমানের রূপ লইয়া কিরূপে এক সমুচ্চ মহিমা লাভ করিতে পারে, চন্দ্রাবতী তাহার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। গীতিকার নায়িকারা তাঁহাদের প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদে মনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করিয়া অলৌকিক জগতে সান্ত্বনার সন্ধান করেন নাই। জীবনের কঠিন অভিশাপ হিসাবে তাঁহারা ইহার করুণ পরিণতিকে স্বীকার করিয়াছেন। বিচ্ছেদের বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাদের প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা অধিকতর দ্যুতিতে ভাস্বর হইয়াছে।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও এই দুই কাব্যধারা স্বতন্ত্র। পদাবলীর মধ্যে কাহিনীরস মুখ্য নহে। তাহা ছাড়া পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গির মধ্যে কাহিনীর মৌলিকতা সৃষ্টির অবকাশ নাই। কিন্তু গীতিকাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, একটি বিশিষ্ট কাহিনী অবলম্বন করিয়া এইগুলি রচিত হইয়াছে। গীতিকাগুলি ছোটগল্পের মত একটি মাত্র কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা (যেমন হুমরা বেদে কর্তৃক মহুয়াকে অপহরণ), নাটকীয় পরিবেশ, পরবর্তী ঘটনার জন্য রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ (suspense) গীতিকাগুলির মধ্যে আশ্চর্য গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গীতিকাগুলির এই বিশিষ্ট

কাহিনী-গুণের জন্য ইহাদিগকে 'বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূত' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

গীতিকাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা সর্বত্রই গীত হয়, কোথাও কেবল মাত্র আবৃত্তি করা হয় না; গীতের সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত ইহাদের সাধারণ সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণব পদাবলীগুলিও আবৃত্তির জন্য নহে, প্রধানতঃ গাহিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। সুগায়ক রসজ্ঞ কীর্তনীয়ার মুখে না শুনিলে পদাবলীর মাধুর্য অনুভূত হয় না। কিন্তু প্রধানতঃ গাহিবার জন্য রচিত হইলেও পদাবলী সাহিত্য লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ইহার লিখিত রূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া কাব্য-পাঠকের আনন্দ বিধান করিয়াছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণ ও অনুকরণ হইয়াছে এবং ফলে আধুনিক বাংলার দুই শক্তিশালী কবির নিকট হইতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'ভানুসিংহের পদাবলী' আমরা উপহার পাইয়াছি।

বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পদগুলিকে ললিত, স্নিগ্ধ ও ছন্দের মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মূল ছন্দ অবিকল অনুসরণ করিয়াছেন, আবার বিবিধ ছন্দের মিশ্রণে কয়েকটি নূতন ছন্দেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে।

কিন্তু গীতিকাগুলির ছন্দোরীতিতে কোনও বৈচিত্র্য নাই। একই ছন্দে ইহা আনুপূর্বিক রচিত হইয়া থাকে। ছড়ার ছন্দ ছাড়া গীতিকার আর কোনও দ্বিতীয় ছন্দই নাই।

বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ প্রায় সকলেই অলঙ্কার প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহারা যেমন অতি যত্নে ভাবানুরূপ শব্দ চয়ন করিয়াছেন, তেমনি ব্যঞ্জনাময় ভাষায় রচিত পদগুলিকে মনোহর অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছেন। বিশিষ্ট পদকর্তা গোবিন্দদাসের পদগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার পদগুলির মধ্যে প্রায় সর্বপ্রকার অলঙ্কারের উদাহরণ আছে।

গীতিকাগুলি প্রায় নিরলঙ্কৃত। কিন্তু নিরলঙ্কৃত বলিয়াই গীতিকাগুলির কাব্যদেহ শ্রীহীন হইয়া পড়ে নাই। নিরলঙ্কৃত শব্দযোজনার মধ্যে সহজ

সৌন্দর্যের যে পরিচয় ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে, তাহা আমাদিগকে চমকিত করে। তাহা ছাড়া, 'তুমি হও গহীন গাঙ্গ, আমি ডুব্যা মরি', 'নিব্যা গেছে আন্ধাইর ঘরের বাতি,' 'মুখেতে ফুট্যা রৈছে কনক চাম্পার ফুল'—ইত্যাদি রম্য চিত্রকল্পের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ তুলনাহীন।

অধিকাংশ বৈষ্ণব পদকর্তাই ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তাঁহাদের শব্দ প্রয়োগের বৈচিত্র্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের পঠনসমৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তথাপি অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পদাবলীর ভাষা বাংলা ও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণে গঠিত এক কৃত্রিম ভাষা।

কিন্তু গীতিকার ভাষা জীবন্ত; ইহাতে কোন কৃত্রিমতা নাই। গীতিকাগুলি মৈমনসিংহের নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের বহু প্রাদেশিক শব্দ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ সাধারণের বোধগম্য হওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। একদিক দিয়া গীতিকাগুলির এই বিশিষ্ট ভাষা বাস্তব-গুণ বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইলেও, অন্য দিক দিয়া ইহাতেই ইহাদের প্রচারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

উপসংহার স্বরূপ বলা যায় যে, এই দুই কাব্যধারা নিজস্ব গতিতেই প্রবাহিত হইয়াছে। একের উপর অপরের প্রভাব বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যায় না। তথাপি বৈষ্ণব পদাবলীর রসচেতনা বাঙ্গালীর মনে এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, পদাবলীর কোন কোন ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গক্রমে গীতিকার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। চাঁদ বিনোদের গৃহত্যাগের যে ছবি মলুয়া নামক গীতিকায় অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নিমাই-এর গৃহত্যাগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। নায়িকা যখন বিরহের আর্তিতে বলেন, 'কইও কইও কইওরে দূতী', তখন দূতীর নিকট বিরহক্লিষ্টা শ্রীরাধার আকুল আবেদনের কথাই আমাদের মনে পড়ে। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর সচেতন অনুসরণ নহে, জাতির রসচেতনার সমুদ্র-তলদেশে নিমজ্জিত হইয়াই নিরক্ষর পল্লীকবিগণ এই ভাব-রত্নগুলি আহরণ করিয়াছেন।

মৌখিক সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে অনুরূপ পরিবেশে সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন চিত্রকল্প ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনা করিতে গিয়া প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর চিত্রকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে—

হাট্যা না যাইতে কৈন্যার পায়ে পড়ে চুল।
মুখেতে ফুট্যা উঠে কনক চাম্পার ফুল॥

চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল।
মেঘের বরণ কৈন্যার গায়েতে লুটায় ॥
দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু ॥
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চা সোনা।
আট না বচ্ছরের সুনাই গো ঝাইড়া বান্ধে চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর গো শতেক পদ্মফুল ॥
সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্মফুল।
হাটিয়া যাইতে লীলার মাটিত পড়ে চুল।

বিরহিণী নারীর মুখে প্রায় সর্বত্রই এই এক কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—

পাখী যদি হইতারে, বন্ধু, রাখ্‌তাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে, বন্ধু আরে, গাইথ্যা রাখ্‌তাম তোরে ॥
চান্দ যদি হইতারে, বন্ধু, জাইগ্যা সারা নিশি।
চান্দ মুখ দেখিতাম তোমার নিরালায় বসি ॥

কিংবা

ফুল যদি হইতারে, বন্ধু, ফুল হইতা তুমি।
কেশেতে ছাপাই রাখ্‌তাম ঝাইড়া বান্ধ্‌তাম বেণী ॥
কাজল হইলে রাখ্‌তাম বন্ধু রে নয়ন ভরিয়া।
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধু রে দেশান্তরী হইয়া ॥

নিজের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করিতে নারী সর্বদাই বলিয়া থাকে—

সোতের হেওলা হৈয়া ভাসিয়া বেড়াই।

নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলি 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom) রূপে প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়াছে—

কোন্ কাম করিল।
বলি যে তোমারে।
আসমানের তারা।
পুন্নমাসীর চান।
মা জননী।
শুইয়া নিদ্রা যায়।

বিনা সূতের মালা।
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী।
কইয়া বুঝাই তোরে।
উইড়া যাওরে বনের পাখী।
ভিন দেশী পুরুষ।
গর্ভ সোদর ভাই।
সোতের হেওলা।
কইও মায়ের আগে।
পরাণের বন্ধু।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত হইয়া যে তিন খণ্ড 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি গীতিকাই পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত; অতএব এই ত্রিশটি গীতিকা সম্পর্কেও এখানেই আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু পূর্বালোচিত গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে বহুলাংশেই বর্তমান, সুতরাং ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এক চপলমতি তরুণ রাজকুমার ও এক রজক-কন্যার প্রেম অবলম্বন করিয়া 'ধোপার পাট' নামক গীতিকাটি রচিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহার কাহিনীর উপর চণ্ডীদাস-রামীর কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যাইতে পারে; কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে রাজকুমারের চরিত্রটি এমন এক স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হয় যে, ইহার স্বাধীন উদ্ভবের সম্ভাবনাও অবিশ্বাস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। লৌকিক প্রেমই যে বৈষ্ণব প্রেমের ভিত্তি, তাহা এই গীতিকার কয়েকটি পদ হইতে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়।

'মইষাল বন্ধু' নামক যে পালাটির দুইটি স্বতন্ত্র পাঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মূলতঃ অভিন্ন, বিভিন্ন গায়েনের মুখে পড়িয়া বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। মহিষের রাখাল ডিঙ্গাধরের সঙ্গে সাজুতী কন্যার প্রেম বর্ণনাই উভয় পাঠের উদ্দেশ্য। যে ঘটনা-সমৃদ্ধি গীতিকাগুলিকে নাট্যগুণ দান করিয়াছে, ইহাও সেই গুণ হইতে বঞ্চিত নহে। সংগ্রহটি অসম্পূর্ণ বলিয়া কাহিনীর পরিণতি ইহার মধ্যে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

কবিত্বের দৈন্য ঘটনার বাহুল্য দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রয়াস যে-সকল গীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে 'ভেলুয়া' অন্যতম। ইহা মদন সাধু ও ভেলুয়ার প্রণয়-বৃত্তান্ত লইয়া রচিত। ইহার সামাজিক আদর্শ হিন্দুসমাজের নিতান্ত বিরোধী বলিয়া স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহা 'মগ প্রভাবের দ্বারা চিহ্নিত' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই অনুমান আমাদের এই বিষয়ক পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের অনুকূল।

এইভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত অন্যান্য গীতিকার মধ্যে ভাব ও কাহিনীগত আর বিশেষ কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, একই বাঁধাধরা ও প্রায় অভিন্ন বিষয়বস্তু লইয়া ইহারা রচিত হইয়াছে, তবে ইহাদের মধ্যেও যে সকল বিষয়ে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কথাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পালা ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া রচিত—তাহাদের মধ্যে 'ঈশা খাঁ'-ই প্রধান। ইহার সম্পর্কিত একটি পালা 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশা খাঁ পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র, অতএব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই গীতিভূমির কবিগণ যে লৌকিক কাব্য রচনা করিবেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সংগৃহীত এই গীতিকাখানি কেবল ঘটনার তালিকা মাত্র, ইহাতে কবিত্বের স্পর্শ নাই। আরও দুই একটি ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া যে গীতিকা রচনার প্রয়াস দেখা গিয়াছে, তাহাও কবিত্বের দিক দিয়া অনুরূপ ব্যর্থ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করিবার ফলে পল্লীকবির প্রতিভা-বিকাশের বাধা হইয়াছে; কারণ, তাঁহাদের পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত চরিত্র সমূহের কর্ম ও চিন্তার ধারা এক, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির কর্মের ধারা অন্য; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

এই সংগ্রহের কতকগুলি রচনা গীতিকা নহে, গীতিকথা মাত্র এবং অন্যান্য কতকগুলি অসম্পূর্ণ। গীতিকথাগুলি যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে; অসম্পূর্ণ রচনাগুলির যথাযথ মূল্যবিচার সম্ভব নহে। সেইজন্য তাহাদের আলোচনা এখানে পরিত্যক্ত হইল।

দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য যে সকল অঞ্চল হইতে কয়েকটি মাত্র গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নোয়াখালী-চট্টগ্রাম লইয়া ইহার একটি সীমা নির্দেশ করিতে পারা যায়—সমুদ্রোপকূলচারী কোন জাতি মূলতঃ এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া কালক্রমে বহিরাগত নূতন কোনও জাতির সঙ্গে মিশ্রণ লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে এই অঞ্চলে বিশিষ্ট একটি লোক-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব মৈমনসিংহের নিভৃত পল্লীর নিবিড় সমাজ-জীবন এখানে ছিল না, ইহার সমুদ্রপথ সর্বদা বহিরাগতের নিকট উন্মুক্ত ছিল বলিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীকে সর্বদাই দুঃসাহসিক কার্যের সাধনা করিয়া বহিঃশত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক থাকিতে হইত। অতএব ইহার অধিবাসীর মধ্যে যেমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনী লইয়াই এই অঞ্চলের গীতিকা-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সমুদ্রোপকূলের অধিবাসীর সামাজিক জীবন দেশের অভ্যন্তরস্থ অধিবাসীর সমাজ জীবনের মত নিবিড়তা লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য ইহাদের ভিতর দিয়া কোন সুনিবিড় সাহিত্য-রসসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির সঙ্গে ইহাদের এই পার্থক্য অতি সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। এই অঞ্চলের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাতে মুসলমান কথাসাহিত্যের প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল; কারণ, মুসলমান ধর্মের সঙ্গে এই অঞ্চলের পরিচয় অত্যন্ত প্রাচীন—বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পূর্বেই আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে আসিয়া চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তখন হইতে এই অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতির ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অতএব ইহার উপর মুসলমান ধর্মের সঙ্গে মুসলমান কথা-সাহিত্যের প্রভাব অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই অঞ্চলেই সর্বাধিক সংখ্যক মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইঁহারা অধিকাংশই মুসলমান ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

রচনা ও অনুবাদ করিয়া এই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান ধর্মের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলেই এই অঞ্চলে বহু মুসলমান সাধুফকিরের আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের সম্পর্কিত বহু অলৌকিক কাহিনীও সমাজে প্রচার লাভ করিয়াছিল, এই সকল কাহিনী এই অঞ্চলের গীতিকা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পীরের প্রভাব এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার ফলে, কেবল মাত্র যে স্থানীয় পীরদিগের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত ইহার অধিবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত, তাহা নহে—উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থলে যে সকল পীর তাঁহাদের অলৌকিক সাধন-ভজন দ্বারা মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচিত্র জীবন-কাহিনীও এই অঞ্চলে অতি সহজেই প্রচার লাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, লোকের মুখে মুখে এতদূর পর্যন্ত প্রচারিত এই সকল জীবন-বৃত্তান্তের মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, ইহা কাব্যের উপাদান রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে 'নিজাম ডাকাতের পালা' নামক গীতিকাটি প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গীতিকাটির মধ্য দিয়াই নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কবিত্ব নাই, যে সহজ মানবিক অনুভূতির স্পর্শ পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলিকে অপরূপ সাহিত্য-গৌরব দান করিয়াছে, ইহাতে তাহারও অভাব অনুভব করা যায়—ইহার মধ্য দিয়া একটি অলৌকিক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, এই প্রকার উপাখ্যান মুসলমান কথসাহিত্যেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে রচিত। এই অঞ্চলে অনুরূপ মৌলিক ও অনুবাদ রচনার অভাব নাই। এই উপাখ্যানের নায়ক নিজামের পরিবর্তন কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত রত্নাকর দস্যুর পরিবর্তনের অনুরূপ। ইহা হইতে এমন মনে করা ভুল হইবে যে, রামায়ণের প্রভাব বশতই ইহার কাহিনী এমন করিয়া রচিত হইয়াছে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামায়ণের কতকগুলি বিভিন্ন কাহিনীর মূলে লোক-সাহিত্যেরই প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে। রত্নাকর দস্যুর কবি বাল্মীকিতে পরিবর্তনের বিষয়টি লোক-সাহিত্যের একটি সাধারণ বিষয়। অতএব ইহা একদিক দিয়া যেমন রামায়ণের মধ্যে উক্ত বৃত্তান্তের প্রেরণা দান করিয়াছে, অন্য দিকে তেমনই বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের মধ্য দিয়াও বিভিন্ন রূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবেই আমরা পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকার 'দস্যু কেনারামের পালা' ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ-গীতিকার 'নিজাম ডাকাতের পালা'র সন্ধান পাইয়াছি। ইহারা পারস্পরিক প্রভাব-জাত নহে।

নিজাম ডাকাতের কাহিনীর পরই এই অঞ্চলের মনসুর ডাকাতের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহার কাহিনী চট্টগ্রাম জিলা হইতে সংগৃহীত 'কাফেন চোরা' নামক গীতিকায় স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রেমাখ্যান যেমন পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকার একমাত্র বৈশিষ্ট্য, দস্যুর আখ্যান তেমনই দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উপকূল অঞ্চলের জলদস্যু ও অভ্যন্তর অঞ্চলের পার্বত্য লুণ্ঠনকারী—যুগপৎ ইহাদের সম্মুখীন হইয়া এই অঞ্চলের অধিবাসী যে সর্বদাই দস্যুতস্করের বিভীষিকা দর্শন করিবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এই অঞ্চলের পর্বত ও অরণ্যসঙ্কুল প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের সঙ্গে যে ভীষণতার সংমিশ্রণ হইয়াছে, তাহা ইহার সাধারণ অধিবাসীর চরিত্রের মধ্যেও প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য এই সকল ভয়ঙ্কর প্রকৃতির নরঘাতক দস্যুও শেষ পর্যন্ত অন্তরের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য উদ্ধার করিয়া পরিণামে সাধুপুরুষে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই লোক-সাহিত্যে নরনারীর চরিত্র পরিকল্পিত হইয়া থাকে, লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র নহে।

এই অঞ্চলের প্রায় অনুরূপ আর একটি গীতিকার নাম 'চৌধুরীর লড়াই।' ইহা নোয়াখালী জিলাতেই অধিকতর প্রচলিত; কারণ, ইহার নায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী নোয়াখালী জিলারই একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। রাজচন্দ্র এক হিসাবে নিজাম ও মনসুর ডাকাত হইতেও অধম চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার হাতে যে শক্তি ছিল, তাহা দুর্বলের উপর বিশেষতঃ নারীর উপর অত্যাচারেই নিয়োজিত হইত। এই নির্মম অত্যাচারের বিবরণীতে এই গীতিকা ভারাক্রান্ত। মানব-চরিত্রের বহির্মুখী দিকটা ইহাতে এত বিস্তৃত করিয়া দেখাইবার ফলে ইহার অন্তর্মুখী পরিচয়টি সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই। এই অঞ্চলের গীতিকাগুলির ইহা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গীতিকাটি আরও কতকগুলি বিষয়ে পূর্ব মৈমনসিংহের গীতিকাগুলি হইতে স্বতন্ত্র। বহির্মুখী বিষয়গুলি ইহার মধ্যে বিস্তৃত ভাবে দেখাইবার ফলে ইহাদের

মধ্য হইতে বহু অপ্রীতিকর উপকরণ বাহির হইয়া আসিয়াছে; অন্তরের অন্তস্তলে যে স্নিগ্ধ পবিত্রতা বিরাজ করে, দেহের উপরিস্তরে তাহার অভাব আছে। কারণ, সেখানে সর্বদা ধূলিবালি আসিয়া পড়িয়া তাহা মলিন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য এই গীতিকার মধ্যে দুর্নীতির কথা আসিয়াছে; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পল্লীকবির রচনা হইলেও গীতিকাগুলি নৈতিক দিক দিয়া উন্নত। রাজসভার বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে বসিয়া ভারতচন্দ্র যে অশ্লীল কৌতুকরস সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, উন্মুক্ত জনসাধারণের মধ্যে রস-পরিবেষণ করিতে গিয়া পল্লীকবিগণ সে সুযোগ পান নাই। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের 'চৌধুরীর লড়াই' এই দিক দিয়া একটি ব্যতিক্রম। ইহার মধ্যে গীতিকার কোন স্বচ্ছ গুণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই বলিয়া ইহা কদর্য শৈবালে ভরিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকার সঙ্গে এই অঞ্চলের গীতিকাগুলির এই পার্থক্যটুকুও বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার মত।

দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলির মধ্যে প্রেম-বিষয়ক রচনা যে একেবারেই নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না; দুই তিনটি গীতিকার মধ্যে প্রেম বিষয়ও অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়েও পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলির সঙ্গে ইহাদের একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত গীতিকাগুলির মধ্যে নায়ক-চরিত্র নায়িকা-চরিত্র অপেক্ষা নিষ্প্রভ—এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে নায়ক নায়িকার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে যে দুই তিনটি প্রেমাখ্যানমূলক গীতিকার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদের নায়ক-চরিত্র নায়িকা-চরিত্রের সকল দিক দিয়াই উপযুক্ত। দৃঢ়তা ও নিষ্ঠায় নায়ক ও নায়িকার চরিত্র যদি তুল্যরূপ না হয়, তবে কাহিনীর যথার্থ রস-স্ফূর্তি হইতে পারে না। পূর্ব মৈমনসিংহের অধিকাংশ গীতিকারই এই ত্রুটি বর্তমান আছে; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ হইতে সামান্য যে কয়টি প্রেমাখ্যানমূলক গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নায়ক-চরিত্রের এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। এই সম্পর্কে এই অঞ্চলের 'ভেলুয়া' নামক গীতিকাটির উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহার কাহিনীর নায়ক আমির সওদাগরের চরিত্র একদিক দিয়া যেমন কুসুমের মত কোমল, অন্য দিক দিয়া তেমনই বজ্রের মত কঠোর। তাহার চরিত্রে এই পৌরুষের স্পর্শই কাহিনীটিকে একটি অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে। পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকায় নারীচরিত্রেরই প্রাধান্য, কিন্তু এই অঞ্চলের গীতিকায়

পুরুষ-চরিত্র নারীচরিত্রের সমমর্যাদার অধিকারী ; ইহার কারণ, এই অঞ্চলের সামাজিক জীবনে নারী হইতে পুরুষের স্থান উপরে ছিল, তাহার কারণ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে, উক্ত দুই অঞ্চলের মৌলিক সামাজিক ভিত্তিই স্বতন্ত্র।

এই অঞ্চলের গীতিকাগুলির প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই পর্তুগীজ জলদস্যু-দিগের উপদ্রবের বৃত্তান্ত অত্যন্ত জলন্ত ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে ; এই বিষয়ে 'নুরন্নেহা ও কবরেব কথা' পালাটির কথা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অরক্ষিত সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল বলিয়া এখানেই জলদস্যুর অত্যাচার যে একদিন চরমে পৌঁছিয়াছিল, এই গীতিকাটির মধ্য দিয়া এই ঐতিহাসিক তথ্যটি অত্যন্ত জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই গীতিকাগুলির একটি বিশিষ্ট মূল্য স্বীকার করিতে হয়। তবে এ'কথাও সত্য যে, বাহ্যিক ঘটনা দ্বারা অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া এই অঞ্চলের গীতিকাগুলির আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য তত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র মধ্যে এই অঞ্চল হইতে সংগৃহীত আর যে সকল রচনা স্থান পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র 'কমল সদাগর' ব্যতীত আর একটিও গীতিকা নহে, বর্ণনা মাত্র। ইহাদের মধ্যে হস্তি-শিকারের একটি বর্ণনা অবলম্বন করিয়া 'হাতি খেদা' নামক একটি বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত সাহ সুজার কন্যার করুণ হৃদয়-বেদনা বর্ণনা করিয়া 'সুজা তনয়ার বিলাপ' রচিত হইয়াছে। 'পরীবানুর হাঁহলা'-ও অনুরূপ একটি রচনা। পূর্বোক্ত 'কমল সদাগর' রচনাটি বাংলার সুপরিচিত রূপকথা শীত-বসন্তের পালারূপ মাত্র —ইহার মধ্য দিয়া কবিত্বের যথার্থ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পশ্চিম শ্রীহট্ট হইতে যে দুই একটি পালাগান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র অঞ্চলভুক্ত বলিয়া দাবী করা যায় না ; কারণ, ইহা পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের সংলগ্ন, অতএব ইহাও বৃহত্তর পূর্ব মৈমনসিংহের সীমাভুক্ত। বাংলার আর কোন অঞ্চল হইতে এই শ্রেণীর গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই—যাহা হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ; অতএব এই অধ্যায়ে তাহাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ; 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য়ও এই প্রকার কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছড়া কিংবা কোন

সাময়িক ঘটনার বর্ণনা মাত্র। গীতিকা-সংগ্রহে ইহাদের সঙ্কলিত হইবার কোনও সার্থকতা নাই।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবার পর অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে এই উভয় অঞ্চল হইতেই আরও কিছু কিছু গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই যে উচ্চ সাহিত্যগুণ প্রকাশ পাইয়াছে, এ'কথা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহাদের কোনও কোনও গীতিকা যে আমাদের আলোচিত গীতিকাগুলির সমধর্মী তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোনও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ইহারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া ইহাদিগকে আমাদের বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিবার উপায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে নাই এমন অনেক গীতিকা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ থাকা সত্ত্বেও লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ইহাদিগের পুনরুদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই; কারণ, বাংলার সমাজ-জীবনের সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গীতিকাগুলি যে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিছুদিন পূর্বেও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল গীতিকা শুনিতে পাওয়া যাইত, আজ তাহা আর শুনিতে পাওয়া যায় না; কেবল মাত্র বহুল প্রচলিত কোনও কোনও গীতিকার যে সকল অংশ গীতিস্বর-প্রধান, তাহা স্বাধীন লোক-গীতিরূপে এখনও কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছে—কিন্তু নাগরিক সঙ্গীতের প্রভাব বশতঃ তাহাও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কথা

পৃথিবীর সকল দেশেই গল্প বলিবার রীতি প্রচলিত আছে। গল্প শুনিবার আগ্রহ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ মার্জিত হইয়া নূতন নূতন বিষয়-বস্তুর সন্ধান ও নূতনতর উপায়ে তাহাদের পরিবেষণ করিবার কৌশল আয়ত্ত করা হইলেও, লোক-সমাজের সাধারণ স্তরে রসগ্রহণের যে একটি সাধারণ মান (standard) আছে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক দেশেই একটি লৌকিক (popular) কথাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা প্রত্যেক জাতিরই লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনার ভিতর দিয়াই লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হইয়া থাকে; পদ্যের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ করা হয়, তাহা গীতিকা ও 'এপিক' নামে পরিচিত; গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনী প্রকাশ করা হয়, ইংরেজিতে তাহাকেই সাধারণ ভাবে folk-tale বলা হয়। লোক-কথা বলিলে বাংলায় এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহা কেবল মাত্র কথা বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

লোক-কথার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রুতি-পরম্পরায় যে সকল বিষয়-বস্তু চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ইহার উপকরণ—কোনও মৌলিক বিষয়-বস্তু ইহার উপজীব্য হইতে পারে না। আধুনিক কথা-সাহিত্যের সঙ্গে এখানেই ইহার মৌলিক পার্থক্য। আধুনিক ছোটগল্প কিংবা উপন্যাস লেখকের নিজস্ব মৌলিক কল্পনার ফল; ইহার বিষয়, চরিত্র, পরিবেশ প্রত্যেকটি উপকরণই লেখকের নিজস্ব উদ্ভাবিত; কিন্তু একটি মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক (traditional) ধারা অনুসরণ করিয়া লোক-কথা সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। কতকগুলি অপ্রচলিত ও আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের একটি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন আবেদন থাকে, তাহা দ্বারাই ইহারা কালজয়ী হইয়া অমরত্ব লাভ করে। ইহাদের অন্তর্নিহিত একটি সর্বজনীন আবেদন থাকা সত্ত্বেও, বাহিরের দিক দিয়া ইহাদের

মধ্যে রসের বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। কোন কোন লোক-কথা অতিরিক্ত রোমান্স-ধর্মী, কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে ইহারা স্বাধীন বিহার করিয়া থাকে, ইংরেজিতে ইহাদিগকে fairy tale ও বাংলায় রূপকথা বলা হয়। ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যের সিণ্ডেরিলা (Cinderella) ইহার দৃষ্টান্ত, বাংলায় মধুমালা ও কাজলরেখার কাহিনী ইহার নিদর্শন। কোন কোন লোক-কথায় কল্পনার এত উদ্দাম বিস্তৃতি নাই—পড়িলেই মনে হইবে, আমারই সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্যের কাহিনী যেন ইহাদের মধ্যে পাঠ করিতেছি, এই হিসাবে ইহারা আধুনিক কথা-সাহিত্য বা গল্প-উপন্যাসের সহোদরা। ইংরেজিতে *Ali Baba and Forty Thieves* ইহার দৃষ্টান্ত। বাংলার লোক-সাহিত্যেও ইহার অসংখ্য নিদর্শন বর্তমান আছে। কতকগুলি লোক-কথার ভিতর দিয়া জীবনের ছোট-খাট অসঙ্গতি ও দোষত্রুটি কৌতুকের স্পর্শ লাভ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষভাবে হয় ত তাহাদের মধ্যে মানুষকেই লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হয় না, পশু কিংবা পক্ষীর চরিত্রের মাধ্যমেই মানবিক দুর্বলতা ব্যক্ত হইয়া থাকে, তথাপি ইহাদের মধ্য দিয়া যে একটি স্বচ্ছ কৌতুক (humour) রস প্রবাহিত হয়, তাহা সহজেই সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, পশুপক্ষীর চরিত্র তাহাদের রসাস্বাদনে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। নীতি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেও লোক-কথা রচিত হইয়া থাকে। মানুষ এবং তাহার সমাজ যুগে যুগে বাহিরের দিক দিয়া যতই পরিবর্তিত হউক, ইহাদের একটি অন্তরের ধর্ম আছে, এই অন্তরের ধর্মের গুণেই মানুষ চিরদিনই মানুষ—সে যেমন পশুর স্তরে নামিয়া যায় নাই, তেমনই দেবতার আসনেও উন্নীত হইতে পারে নাই। সমাজের কতকগুলি নীতিই মানুষের এই মনুষ্যত্ব চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ধর্মোপদেশ কিংবা বক্তৃতার আকারে নীতির মহিমা লোক-সমাজে কোনদিনই প্রচার লাভ করে নাই, কোন কোন লোক-কথার ভিতর দিয়া এই নীতি প্রচারিত হইয়াছে। নীতিগুলি সরস ও প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল নীতিকথা উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। ইহাদের সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, নীতিপ্রচার ইহাদের উদ্দেশ্য হইলেও, রস-সৃষ্টি ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যর্থ হয় না ; কারণ একান্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবন ভিত্তি করিয়া এই সকল কাহিনী রচিত হইয়াছে, নৈতিক লক্ষ্য ইহাদেয় রসরূপ আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই। লোক-কথার এই সকল

প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সর্বদা সুস্পষ্ট বিভাগ নির্দেশ করিতে পারা যায় না, তাহা সত্য ; তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য প্রত্যেক দেশেই লোক-সাহিত্য সমালোচকগণ ইহাদিগকে কতকগুলি সাধারণ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর সকল দেশের লোক-কথাই যদি ধরা যায়, তবে তাহা আলোচনার সুবিধার জন্য তাহাদিগকে সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ এইরূপ কতকগুলি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করিযা থাকেন—

সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক-কথার অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন আছে, ইংরেজিতে তাহাকে fairy tale বলে ; কিন্তু এই ইংরেজি নামটি দ্বারা ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না ; কারণ, fairy শব্দের অর্থ পরী। ইহাদের মধ্যে পরীর কথা যে থাকিতেই হইবে, তাহা নহে ; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না—ইহা দীর্ঘায়তন, বিভিন্ন বিষয় (motif) ও বিচিত্র শাখাকাহিনী (episode) দ্বারা জটিল ; ইহার পরিবেশটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল—সুনির্দিষ্ট কোনও স্থান ও সুস্পষ্ট কোনও চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হয় না, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ। ইহার নায়ক সাধারণতঃ কোনও অপরিচিত দেশের রাজপুত্র এক নূতন অপরিচিত দেশে প্রবেশ করিয়া অসম্ভব কতকগুলি বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরিণামে সেই দেশের রাজার কন্যাকে বিবাহ ও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিবে। জার্মেন ভাষায় এই শ্রেণীর লোক-কথাকে *marchen* বলে। এই শব্দটি দ্বারা ইহার ভাবটি যত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, ইউরোপীয় ভাষার আর কোনও শব্দ দ্বারা তাহা তত স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। তথাপি সাধারণতঃ ইংরেজিতে ইহাকে fairy tale ও ফরাসীতে *conte populaire* বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বাংলাতে তাহাই রূপকথা বলিয়া পরিচিত—বাংলার সুপরিচিত 'ঠাকুমার ঝুলি'ই ইহার উদাহরণ।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ আর এক শ্রেণীর লোক-কথা *novella* বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহার ঘটনাবলী লোক-কথার ঘটনাবলীর মত অসম্ভব অবিশ্বাস্য এবং রোমাঞ্চকর হইলেও, তাহাদের ঘটনাস্থল রূপকথার ঘটনাস্থলের মত কল্পরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য নহে, বরং বাস্তব রাজ্য, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুঃসীমা-বেষ্টিত কোন দেশের মধ্যেই এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে—ইহার

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত *Arabian Nights*। সাধারণতঃ মধ্যপ্রাচ্যের কথা-সাহিত্যের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। এই *novella* কথাটিকে বাংলায় উপন্যাস বা লৌকিক উপন্যাস বলিয়া অনুবাদ করা হইয়া থাকে। এই অর্থেই *Arabian Nights, Persian Nights* প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের লোক-কথা সংগ্রহ বাংলায় আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস প্রভৃতি নামে পরিচিত।

একটি মাত্র কেন্দ্রীয় দুঃসাহসী ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বীর-চরিত্র অবলম্বন করিয়া যে একাধিক কাহিনী রচিত হয়, তাহাকে Hero Tale বা বীরকথা বলে—ইহা রূপকথা ও লৌকিক উপন্যাসের মিশ্র উপাদানে রচিত। ইহাতে পারিপার্শ্বিক ঘটনা অপেক্ষা নায়ক-চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করে। ইংরেজি লোক-সাহিত্যের প্রভাব বশতঃ আধুনিক বাংলায় এই আদর্শেই 'মোহন' চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বাংলার জাতীয় লোক-সাহিত্যে ইহার কোনও দৃষ্টান্ত নাই; কারণ, বহির্মুখী বীরত্ব ও পৌরুষের আদর্শ দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালী কোনদিন উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যে Hercules-এর কাহিনী ইহার অন্তর্গত।

এক শ্রেণীর লোক-কথাকে ইংরেজিতে local tradition বলে। জার্মেন ভাষায় ইহা *Sage* ও ফরাসী ভাষায় *tradition populaire* নামে পরিচিত। ইহা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ; তবে ইহার ঘটনা যতই অলৌকিক হউক না কেন, তাহা প্রকৃতই কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস উৎপাদন করা হয়; পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে Pied Piper of Hamelin-এর পল্পরূপ ইহার নিদর্শন। বাংলায় এই শ্রেণীর বিবরণ লইয়া সাধারণতঃ গীতিকাই রচিত হইয়াছে, লোক-কথা রচিত হয় নাই; কিংবা রচিত হইলেও সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই।

সৃষ্টির অজ্ঞাত লীলা-রহস্য বর্ণনা করিয়া যে সকল অলৌকিক বিবরণ রচিত হইয়া থাকে, ইংরেজিতে তাহাকে myth বলা হয়, বাংলায় তাহা লৌকিক পুরাণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একান্ত অলৌকিক বিশ্বাস-প্রসূত বলিয়া ইহাদিগকে লোক-সাহিত্যের মর্যাদা কতদূর দেওয়া যায়, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে লোক-সাহিত্যের বিচ্ছিন্ন উপাদান অনেক সময় পাওয়া গেলেও, তাহাদের কোনও পূর্ণাঙ্গ এবং পরিণত রূপের পরিচয় লাভ করা যায় না।

লোক-কথায় পশুপক্ষীর চরিত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। কতকগুলি কাহিনী একমাত্র পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়া থাকে, কোন কোন কাহিনীতে নরনারী ও পশুপক্ষী উভয়েই সমান অংশ গ্রহণ করে। ইহাদিগকে ইংরেজিতে Animal Tale বলে। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ বিশেষ কোন পশুর নির্বুদ্ধিতা দ্বারা কৌতুক রসের সৃষ্টি করা হয়; ধূর্ত ও নির্বোধ এই দুই শ্রেণীর পশুপক্ষীই ইহাতে থাকে—চরিত্রগত এই বৈপরীত্য নির্দেশ করিবার ফলে, ইহাদের মধ্যে একটি সহজ নাটকীয় গুণ প্রকাশ পায়। বাংলার এই শ্রেণীর লোক-কথাকে উপকথা বলা যাইতে পারে। যে সকল Animal Tale বা উপকথার সঙ্গে একটি নীতি বা উপদেশ সংযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে ইংরেজিতে fable বলা হয়। বাংলায় ইহা উপকথারই একটি শাখা বলিয়া নির্দেশ করিয়া নীতিকথা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজিতে *Æsop's Fable*, সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' ইহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেহ কেহ হাস্যরসাত্মক লোক-কথাকে একটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন; কিন্তু অধিকাংশ উপকথাই হাস্যরসাত্মক; অতএব ইহার জন্য স্বতন্ত্র এক বিভাগ নির্দেশ না করিয়া ইহা উপকথারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা উচিত।

লোক-কথার যে সকল বিভাগ উপরে নির্দেশ করা গেল, তাহা সর্বদাই যে ইহাদের নিজস্ব সুস্পষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে—অনেক সময় একের উপাদান অপরের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, তবে আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগই সর্বাধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ সকল দেশের লোক-কথার উপরই যে আনুপূর্বিক প্রযোজ্য, তাহা নহে—প্রত্যেক দেশেরই লোক-কথার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে ইহার বিভাগের প্রণালীও স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। বাংলা লোক-কথার শ্রেণী-বিভাগের জন্যও ইহার বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী একটি নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে।

লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় লোক-কথার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মত প্রাণ-শক্তি (vitality) আর কাহারও নাই। অবশ্য যে সকল লোক-কথা রসোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেই

এই উক্তি প্রযোজ্য। কারণ, ইহারা যে কেবল শত শত, এমন কি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সমাজের মধ্যে বাঁচিয়াই আছে, তাহা নহে—এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন লোক-কথা প্রায় সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের পূর্বতম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপের পশ্চিমতম সীমান্তবর্তী আয়র্লণ্ড পর্যন্ত লোক-কথার একটি বিশিষ্ট ধারা প্রবাহিত ছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহা যে সর্বত্রই স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্কই নাই, এ'কথা আজ আর বিশেষ কেহ স্বীকার করেন না। এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া অতীতে যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং যাহার ফলে এই অঞ্চলে একই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা প্রচার লাভ করিয়াছে, সেই সূত্র ধরিয়াই লোক-কথাগুলিও এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছে। ইউরোপ হইতে এই সকল কথা ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্তার লাভ করিয়াছে ; দূর প্রাচ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে এই প্রকার বহু লোক-কথা বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও সেখান হইতে জাপান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। জাপান হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার পথে ইহারা পশ্চিম উপকূল দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছে। লোক-সাহিত্যের আর কোনও বিষয় এই অপূর্ব প্রাণ-শক্তির অধিকারী হইয়া এমন বিস্তৃত দিগ্‌বিজয় করিয়া বিশ্বভ্রমণ করিতে পারে নাই। এই বৈশিষ্ট্যই লোক-কথাকে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় একটি অপরূপ গৌরব দান করিয়াছে।

লোক-সাহিত্যের এই বিস্ময়কর প্রাণ-শক্তির জন্য ইহার উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ইহা যদি বিশেষ কোনও সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে ইহা দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে গৃহীত হয় কি করিয়া? ইহার মধ্যে বিশিষ্ট কোন সমাজের নিজস্ব বহিঃপ্রকৃতির কি কোন স্পর্শ থাকে না? ইহা কি একই সমাজের সৃষ্টি, না যে সকল দেশে ইহা প্রচার লাভ করে, তাহাদের সকলেরই কিছু কিছু হস্তস্পর্শ ইহার মধ্যে থাকিয়া যায়? ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যের সিণ্ডেরিলা (Cinderella), স্নো হোয়াইট (Snow-White) কিংবা বাংলাদেশের কলাবতী রাজকন্যার কাহিনী পাঠ করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে

কোনও বিশিষ্ট জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় উদ্ধার করা কি সম্ভব হইবে? এমন কি, পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়াও যে সকল লোক-কথা রচিত হয়, যেমন ঈশপের কিংবা হিতোপদেশের গল্প, তাহা পাঠ করিলে ইহা কোন্ দেশে কোন্ জাতীয় কোন্ ধর্মাবলম্বী লোক রচনা করিয়াছে, তাহা অনুমান করিবার কি কোনও অবলম্বন পাওয়া যায়? এই প্রশ্নগুলির সমাধানের ভিতর দিয়া লোক-কথার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু প্রশ্নগুলির সমাধান সহজসাধ্য নহে।

লোক-কথার সীমা যতই বিস্তৃত হউক না কেন, ইহা পৃথিবীর একই স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের রসবোধ ভিত্তি করিয়াই মূলতঃ রচিত হইয়া থাকে। তারপর তাহা রচয়িতার নিজস্ব সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে, কালক্রমে সেখান হইতে ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নীত হয়। তবে এখন প্রশ্ন হইতেছে, ইহা যদি বিশেষ কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক রচিত হয়, তাহা হইলে ইহা দেশ-দেশান্তরের সমাজের মধ্যে গিয়া কি ভাবে প্রচার লাভ করিতে পারে? ইহার মূল রচয়িতা যে-সমাজের অধিবাসী, সেই সমাজের উপকরণ দিয়াই ইহা রচিত হওয়া স্বাভাবিক; অতএব দেশান্তরের সমাজে গিয়া এই সকল অপরিচিত উপাদান কি ভাবে রসসৃষ্টি করে? এই বিষয়টি গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সাধারণতঃ রূপকথা যে সকল আভ্যন্তরিক ও বাহ্য উপকরণ দ্বারা রচিত হইয়া থাকে, তাহা কোন দেশেরই একান্ত নিজস্ব সম্পদ নহে—ইহাদের একটি সর্বজনীন ভিত্তি থাকে। ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যের সুপরিচিত রূপকথা সিণ্ডেরিলার কথাই ধরা যাউক। বিমাতা কর্তৃক মাতৃহীনা সপত্নী-কন্যার নির্যাতনের কাহিনী ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। এই বিষয়টির মধ্যে যে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ একটি আবেদন আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কুটিল ঈর্ষার বিরুদ্ধে সরল সৌন্দর্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করিয়াছে। অতএব একটি সুগভীর জীবনবোধ ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বাংলার রূপকথা শীত-বসন্তের মধ্যে ইহারই আর একটি রূপ দেখিতে পাই মাত্র—ইহাতে সপত্নী-পুত্র যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, সিণ্ডেরিলাতে তাহাই সপত্নী-কন্যার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি রূপকথার ভিতর দিয়া যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহা বহিরঙ্গগত পার্থক্য মাত্র, উদ্দিষ্ট

বিষয়ের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। প্রত্যেক দেশের সমাজেই মানব-মনে ঈর্ষার ভাবটি বর্তমান আছে; ঈর্ষার বিরুদ্ধে সর্বদাই সংগ্রাম করিয়া মানুষকে বাঁচিতে হইতেছে; অতএব এই রূপকথার মূল উদ্দেশ্যটি সকল দেশের সমাজের উপরই প্রযোজ্য। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করিতে ইহার কোনও বাধা হয় নাই! কিন্তু ইহার পরিবেশটি প্রত্যেক সমাজই যথাসম্ভব নিজের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছে, সেইজন্য দেশে দেশে ইহার পাঠ-ভেদ দৃষ্ট হয়। ইউরোপেই ইহার একুশটি পাঠ-ভেদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পাঠ-ভেদ হইতে ইহার মূল কাহিনীটি কোন্ পরিবেশ অবলম্বন করিয়া প্রথম রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই—সে' অনুমানে সাধারণের কোনও প্রয়োজনও নাই; যাহা যেমন পাইতেছি, ইহার অতিরিক্ত তাহাতে আর কিছু জানিবার নাই। শ্রুতি-পরম্পরায় ইহার অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত অংশ ক্রমশঃ মার্জিত হইয়া ইহা একটি সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়া থাকে; সেইজন্য যাহা প্রত্যক্ষ, ইহাতে তাহারই মূল্য সর্বাধিক—যাহা আপনা হইতেই সমাধি-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহা মৃত্তিকাতল হইতে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষ রক্তমাংসের দেহের উপর দিয়াই রসের তড়িৎ-প্রবাহ স্পন্দিত হইতে পারে, কঙ্কালের উপর তাহার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। অতএব যে লোক-কথা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর পেপিরাসের উপর লিখিত হইয়াছিল, তাহা মমিতেই পরিণত হইয়া গিয়াছে, জীবন-রসের স্পন্দন তাহাতে আর নাই। কিন্তু ভাব অমর, সেইজন্য কেবল মাত্র তাহাই কালজয়ী হইয়া আছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক লোক-কথার এক বা একাধিক মৌলিক উদ্দিষ্ট বিষয় থাকে, ইংরেজিতে তাহাকে motif বলে; এই মৌলিক বিষয়ই লোক-কথার প্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ। প্রাণ-কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া ইহার বহিরঙ্গের গঠন-কার্য নিষ্পন্ন হয়। এই প্রাণ-কেন্দ্র অপরিবর্তিত রাখিয়া ইহার বহিরঙ্গ গঠন-কার্যে দেশে দেশে রূপান্তর দেখা দেয়। এইজন্য একই সিণ্ডেরিলার কাহিনী দেশে দেশে নূতন নূতন রূপ লাভ করিয়াও সিণ্ডেরিলার কাহিনীই রহিয়াছে। অতএব যে সমাজের মধ্যে ইহা যে রূপ লাভ করিয়া প্রচারিত থাকে, ইহার সেই রূপ সেই সমাজেরই নিজস্ব সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সেই সমাজের নিজস্ব সৃষ্টি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে!

ইহার প্রচলন হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা সেই সমাজের রুচি-বিরুদ্ধ নহে। অতএব যদি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও লোক-কথা দেশান্তর হইতে আসিয়াছে, তথাপি ইহা যে সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, সেই সমাজেরই নিজস্ব সাহিত্যোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয়; কারণ, ইহার আভ্যন্তরিক ভাব ও বহিরঙ্গগত রূপ সেই সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে ইহা তাহাতে কদাচ প্রচার লাভ করিতে পারে না। সাংস্কৃতিক উপকরণ মাত্রই স্বাঙ্গীকরণ দ্বারা স্বীকরণ হইয়া থাকে। অতএব কোনও লোক-কথা যত দূর দেশেই উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীর যত বিভিন্ন দেশেই প্রচারিত থাকুক না কেন স্বাঙ্গীকরণ দ্বারাই তাহা প্রত্যেক দেশের নিজস্ব জাতীয় সম্পদ বলিয়া গৃহীত হয়।

লোক-কথার যেমন কোনও জাতি নাই, তেমনই ইহার কোনও ধর্মও নাই। খ্রীষ্টানের লোক-কথা, য়িহুদির লোক-কথা বলিয়া যেমন কিছু নাই—হিন্দুর লোক-কথা, মুসলমানের লোক-কথা বলিয়াও কিছু নাই; জাতি বা nationality দ্বারা ইহার পরিচয়, ধর্ম দ্বারা নহে; যেমন, বাঙ্গালীর লোক-কথা, জার্মানির লোক-কথা ইত্যাদি। বাঙ্গালী জাতি যেমন হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী দ্বারা গঠিত, তেমনই জার্মান জাতিও খ্রীষ্টান এবং য়িহুদি ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা গঠিত। বাংলা ও জার্মানির লোক-সাহিত্য এই উভয় দেশের অধিবাসীর সাধারণ সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা গঠিত—কাহারও একক সৃষ্টি নহে। উচ্চতর সাহিত্যের বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্যে কোন কোন সময় ধর্মীয় প্রভাব অনুভব করিতে পারা গেলেও, লোক-সাহিত্যের অন্তর ও বহির্ভাগ তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। লোক-কথার কোন অংশেই কোন ধর্মীয় প্রভাব থাকে না বলিয়া, ইহা দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করিবার পক্ষে কোনও বাধা হয় না।

লোক-কথা গদ্যে রচিত হয় বলিয়া দেশান্তরে প্রচার লাভ করিবার পক্ষে ইহার যত সুবিধা, লোক-সাহিত্যের অন্য কোনও বিষয়ের পক্ষে তাহা তত সুবিধা নহে; কারণ, ছড়া, গীতি কিংবা গীতিকা পদ্যে রচিত বলিয়া ইহাদের এক একটি বহিরঙ্গগত রূপ ও রস আছে, তাহা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করিলে ইহাদের প্রাণ-মূলে আঘাত লাগে। ইহাই কাব্যের ধর্ম, কাব্যের বহিরঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, একটি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আর একটির রস উপলব্ধি করা যায় না। সেইজন্য পদ্য রচনা দেশান্তরে গিয়া ভাষান্তরিত হইলে ইহাদের মৌলিক রূপ বিকৃত হইয়া যায়,

অতএব ইহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়; কিন্তু বিষয়-বস্তু ও তাহার বিন্যাস আনু-পূর্বিক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লোক-কথা সহজেই দেশান্তরে গিয়া ভাষান্তরিত হইতে পারে। বাংলার সুপরিচিত 'কাক ও চড়ুই'র গল্পটি ('গেরস্ত ভাই, দাও ত আগুন, গড়্ব কাস্তে, খাবে গাই, দিবে দুধ' ইত্যাদি) ব্রহ্মদেশের ভাষায় আনুপূর্বিক পরিবর্তিত হইয়া তথাকার লোক-সাহিত্যে প্রচারিত হইতে কোনও বাধা হয় নাই।[১] কিন্তু ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে কোন গীতিকা কিংবা লোক-গীতি সেখানে গিয়া প্রচার লাভ করিতে পারে নাই।

লোক-কথা দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করিবার আরও কতকগুলি সুবিধা আছে। তাহাদের মধ্যে রূপকথার কথাই প্রথমে ধরা যাউক। বাস্তব রাজ্যের সঙ্গে রূপকথার কোনও সম্পর্ক নাই—ইহা বিশেষ কোনও দেশ বা কালের সমাজ, ধর্ম, নীতি ও সৌন্দর্যবোধ আশ্রয় না করিয়া একটি নির্বিশেষ রসরূপ লাভ করিয়া থাকে। সকল দেশেরই মানুষের মনে চিরন্তন যে কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উপরই ইহার আবেদন—ক্ষণস্থায়ী কোন বস্তু বা ভাবের উপর ইহার কোনও আবেদন নাই। ইহার মধ্যে যে বিস্ময় ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় আছে, তাহা দেশ ও কালের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক স্তরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে। সেইজন্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে আয়র্লণ্ড পর্যন্ত, একই শ্রেণীর কতকগুলি রূপকথা প্রায় সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে।

উপকথা অর্থাৎ পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত কথাগুলির ব্যাপক প্রচারেরও একটি বিশিষ্ট সুবিধা ছিল। যে সকল পশুপক্ষী ইহাদের নায়ক-নায়িকা রূপে অভিনয় করিয়াছে, ইহারা সকল দেশেই সুপরিচিত; যেমন শৃগাল, কাক, কুকুর, গর্দভ, খরগোস, কচ্ছপ ইত্যাদি। কোনও অপরিচিত পশুপক্ষী কখনও ইহাদের মধ্যে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। বর্তমান নাগরিক সভ্যতা বিস্তারের পূর্বে ইহাদের সঙ্গে সমাজের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ ছিল, ইহাদের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার সঙ্গে একটি সহজ কৌতুক-বোধেরও সংমিশ্রণ থাকিত; অতএব যে দেশেই ইহাদের উদ্ভব হউক না কেন, এই সর্বজনীন পরিচয়-সূত্রে ইহারা সর্বত্রই

১ Maung Htin Aung, *Burmese Folk-tales* (Bombay, 1948) pp, 41-45.

সমান ঔৎসুক্যের সঙ্গে গৃহীত হইত। পশুপক্ষীর প্রকৃতি পৃথিবীর সর্বত্রই অভিন্ন; অতএব এই সকল কাহিনীর মধ্যে প্রত্যেক দেশের সমাজ তাহাদের সম্পর্কিত নিজস্ব অভিজ্ঞতারই পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই ভাবেই ঈশপের উপকথা ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং 'পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ' ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে নীতি বা উপদেশ আছে, তাহা মানব-সমাজের সর্বকালীন চারিত্র (ethical) নীতি; অতএব এই সূত্রে ইহাদের সর্বত্র প্রচার কিংবা সর্বজনীন রসোপলব্ধির কোনও ব্যাঘাত হয় নাই।

লোক-কথা সম্পর্কে একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, ইহার কি কোনও অন্তর্গূঢ় অর্থ আছে? ইহাতে বাহিরের দিক দিয়া যাহা বর্ণনা করা হয়, তাহাই কি শুধু ইহার বক্তব্য? এই বিষয়টি লইয়া অনেকেই গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই বক্তব্য এই যে, ইহার একটি অন্তর্গূঢ় অর্থ থাকে এবং তাহা পরিণত মনেরও রস পিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয়। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে—'many folktales, at least among people of quick wits and intellectual capacity, have not merely the surface meaning of the narrative but contain also a less explicit, perhaps in the main unconscious meaning, which we may call allegorical or symbolic, of value as a general myth bearing some relation to human nature and experience something very much wider and deeper than the plain surface meaning of the story.'[১] ইহার অর্থ সংক্ষেপে এই যে, অন্ততঃ যে সকল সমাজ বুদ্ধি ও মানসিক চর্চার দিক দিয়া কতকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে লোক-কথা প্রচলিত থাকে, তাহাতে রূপক ও সঙ্কেতের সাহায্যে অনেক সময় মানবের চরিত্র ও তাহার অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ পায়—ইহাদের ভিতর দিয়া কেবল মাত্র যে কতকগুলি ঘটনা বর্ণিত হয়, তাহাই ইহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি স্পষ্ট হইবে। স্বর্গত লালবিহারী দে'র

১ R. M. Dawkins, 'The Meaning of Folktales,' *Folk-lore* LXII (1951), p. 418.

সুপরিচিত বাংলা লোক-কথাসংগ্রহ *Folk-Tales of Bengal* গ্রন্থের দ্বিতীয় কাহিনীটির নাম 'ফকির চাঁদ'। ইহার প্রথম ভাগেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র দুইজন ঘোড়ায় চড়িয়া দেশভ্রমণে যাত্রা করিয়াছে। যাত্রাপথে তাহারা নিঃসঙ্গ; রাজোচিত আড়ম্বর সহকারে কেহ তাহাদিগকে আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্বর্ধনা জানায় নাই, মাতাপিতাও অশ্রুপাত করিয়া তাহাদের যাত্রাপথ পিছল করিয়া দেয় নাই। তারপর তাহারা যখন চলিয়াছে, তখন সম্মুখের দিকে কেবল চলিয়াছেই—কত নদনদী, গিরিগুহা, অরণ্য-প্রান্তর তাহাদের অচেনা পথের দুই পাশে পড়িয়া রহিয়াছে, কিছুই তাহাদের পথ রোধ করিতে পারে নাই। একদিন এক দুর্গম অরণ্যের মধ্যে আসিয়া তাহাদের রাত্রি হইল, অন্ধকারে পথ দেখিতে পাওয়া যায় না, নীচে অশ্ব বাঁধিয়া বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিয়া তাহারা শঙ্কিত প্রহর গণিতে লাগিল। এমন সময় পথচিহ্নহীন নির্জন অরণ্যে এক নূতন পথের নিশানা দেখা দিল। অজগরের পরিত্যক্ত মাণিক্য লাভ করিয়া তাহার প্রদীপ্ত আলোকে তাহারা সেই নূতন পথের রেখা ধরিয়া চলিল। তারপর যেখানে পৌঁছিল, সূর্যের কিরণ সেখানে পৌঁছিতে পারে না, অথচ উদ্যানে চিরবসন্তের অমলিন পুষ্পসম্ভার নিত্য সুরভি দান করে—কোন জনমানব নাই, অথচ সুবৃহৎ স্ফটিকের প্রাসাদ শুভ্র তুষারের মত সুনির্মল দেখায়; তাহার মধ্যে সোনার পালঙ্কে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার শিথানে সোনার কাঠি ও পৈথানে রূপার কাঠি। কাহিনীটি এই পর্যন্তই দেখা যাক।

এক অলৌকিক পথে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র যে জনমানবহীন দেশে আসিয়া এক ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধান পাইল, সেই দেশটি কি? ইহার সঙ্গে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর যে কোনও যোগাযোগ নাই, তাহা রূপকথাটিতে স্পষ্ট করিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জাগ্রতের জগৎ হইতে এখানে সুষুপ্তির জগতে যাত্রার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সুষুপ্তি যদি মৃত্যু বলিয়া ধরি, তাহা হইলে ইহার গূঢ় অর্থটি বিশেষ তাৎপর্য-মূলক হইতে পারে। এই যে রাজকন্যা শিথানে সোনার কাঠি ও পৈথানে রূপার কাঠি লইয়া গভীর সুষুপ্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা অনন্ত জীবন ধারারই প্রতীক্। জন্ম ও মৃত্যু জীবনের এই দুই পরিচয়। জন্মের পর যেমন মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম—ইহা সোনার কাঠি রূপার কাঠির এক অনন্ত খেলা।

এই রূপকথাটির মধ্যে এই যে একটি রূপক বা সঙ্কেত রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে পরিণত মনকে স্পর্শ করিতে পারে। জগতের সমস্ত রস যে আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ ভাবে সচেতন মন দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা নহে। অনেক সময় অনেক আনন্দেরই আমরা কারণ খুঁজিয়া পাই না। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন, 'অকারণ পুলক'। কিন্তু সেইজন্যই যে ইহার কোনও কারণ একেবারেই নাই, তাহা নহে—ইহার অর্থ এই যে, এই কারণটি সচেতন মনের নিকট ধরা না দিয়া অবচেতন বা অচেতন মনের নিকট ধরা দিয়া থাকে ; সেইজন্য ইহা আমাদের সচেতন মনের নিকট অকারণ বলিয়া বোধ হয়। উপরোক্ত রূপকথার যে গূঢ় অর্থটির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা সচেতন মনের নিকট সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু অবচেতন কিংবা অচেতন মনের নিকট ইহার আবেদন ব্যর্থ হয় না। সেইজন্য রূপকথা বর্ণনা করিতে পরিণত মন সর্বদাই আনন্দ লাভ করিয়াছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমাদের দেশে রূপকথা কিংবা লোক-কথার অন্যান্য বিষয়কে 'শিশুসাহিত্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে শিশুসাহিত্য বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে লোক-কথা শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত বলিয়া মনে হইলেও, ইহা অপরিণত মনের সৃষ্টি নহে। শিশু শ্রোতা, বয়স্ক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা। কেবল মাত্র শিশুর প্রয়োজনের জন্য পরিণত মনের সকল সম্পর্ক-নিরপেক্ষ কোনও রচনা সম্ভব হইতে পারে না। জগতের লোক-সাহিত্যে লোক-কথার যে বিপুল সম্ভার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মাত্র শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। পরিণত মন নিজের আনন্দে ইহা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা রক্ষা করিয়াছে, ইহাকে সযত্নে পালন করিয়াছে, যুগে যুগে ইহার অঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্য দান করিয়াছে, শিশু কেবল কৌতূহলী শ্রোতার কাজ করিয়াছে মাত্র। অতএব ইহা শিশুসাহিত্য নহে, ইহা লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতই পরিণত মনের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মধ্যে বয়স্ক রচয়িতা যদি আনন্দ না পাইত, ইহার পুনরাবৃত্তির মধ্যে যদি নিজে কোনও রস লাভ না করিত, কিংবা ইহাদিগকে সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের মধ্যে তাহার নিজের যদি কোনও আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ইহার ধারা কেবল মাত্র শিশুর স্মৃতিপথ বাহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিত না। অতএব

রূপকথাও শিশুসাহিত্য নহে, সুতরাং ইহার গূঢ় অর্থের যে একটি মাত্র নিদর্শন উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহা কেবল মাত্র কষ্ট-কল্পনার ফল নহে, ইহার যথার্থ আবেদন পরিণত মনের নিকট চিরদিনই কার্যকর হইয়াছে। উপকথাগুলির তাৎপর্য বরং আরও স্পষ্ট। ইহাদের মধ্যে যে পশুপক্ষীর চরিত্র থাকে, তাহারা যে মানুষেরই প্রতিনিধি, প্রকৃত অর্থে পশুপক্ষী নহে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। ইহাদের মধ্য দিয়া মানব-চরিত্র সমূহই পশুপক্ষীর মধ্যস্থতায় অভিনয় করিয়াছে মাত্র—ইহাদের মধ্য দিয়া যে কৌতুক-রসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব আবেদন আছে বলিয়া ইহারা কালজয়ী হইতে পারিয়াছে।

বিশেষতঃ অধিকাংশ লোক-কথার মধ্যে নিয়তি বা অদৃষ্টের একটি বিশেষ স্থান আছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সঙ্কলিত 'কাজলরেখা' নামক রূপকথাটি ইহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। অদৃষ্টের একটি নির্মম পরিহাস এই রূপকথাটির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে—

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
কর্মদোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী॥

কোন কার্যকারণের সুস্পষ্ট পথরেখা ধরিয়া ত আর অদৃষ্টের যাতায়াত হয় না; ইহা পরিণত জীবনেরই এক করুণ অভিজ্ঞতা; অতএব এই সকল লোক-কথার ভিতর দিয়া অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত মানুষ তাহার নিজের জীবনেরই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। পরিণত মনের নিকটই ইহাদের আবেদন। সমাজের সাধারণ স্তরের নিরক্ষর জন-সমাজ এই সকল কাহিনী শুনিয়া নিজেদের ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে চিরকাল সান্ত্বনা লাভ করিয়া আসিয়াছে। এমন কি, যে সকল লোক-কথা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ তাহাদের সম্বন্ধেও পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ বলিয়াছেন যে, তাহাতেও 'the realities of human life are presented under the veil of the fantastic adventures.'

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধেই যখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিপুল সংখ্যক লোক-কথা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল, তখনই ইহাদের সম্পর্কে লোক-শ্রুতিবিদ্গণ কতকগুলি সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। প্রথম আলোচনার বিষয় হইল এই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল লোক-কথা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বিস্তৃত ভৌগোলিক ও

সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, অনেক সময় যে পরস্পর ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি ? এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম মনে করা হইত যে, প্রত্যেক দেশে মানুষের মৌলিক বৃত্তিগুলির উপর নির্ভর করিয়া লোক-কথা রচিত হয় বলিয়া, ইহাদের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রত্যেক দেশেই স্বাধীন ভাবে রচিত, এই সম্পর্কে কেহ কাহারও নিকট ঋণী নহে। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, বরং বিভিন্ন মানব সমাজের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের ভিতর দিয়াই ক্রমে ইহাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তার হইয়াছে। এই মত সম্পর্কে এখন আর বিশেষ কাহারও কোনও সংশয় নাই। তবে কি ভাবে কখন কোন্ পথে বিভিন্ন লোক-কথা দেশ-দেশান্তরে নীত হইয়াছিল, তাহার কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ কেহই দিতে পারেন না।

তবে এই সম্পর্কে আরও একটি মত আছে, তাহাও এখানে উল্লেখ করিতে পারি। ইন্দো-ইউরোপীয় দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে আয়লণ্ড পর্যন্ত প্রচলিত বিভিন্ন দেশের লোক-কথায় যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ, এই বিস্তৃত অঞ্চল একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই মতানুসারে আর্যভাষী প্রাচীনতম জাতি যখন মধ্য এশিয়ার একই অঞ্চলে বাস করিত, তখন এই লোক-কথাগুলি ইহার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, তারপর তাহার বিভিন্ন শাখা একদিকে পশ্চিম ইউরোপ ও অপর দিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিবার সময় ইহাদিগকে নিজেদের সঙ্গে করিয়া বিভিন্ন দেশে লইয়া যায় ; সেইজন্য এই অঞ্চলের কতকগুলি লোক-কথার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুক্তি এখন আর কেহ স্বীকার করেন না। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করিবার পূর্বেই ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশে বর্তমান ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত বহু লোক-কথাই প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।

বিগত শতাব্দীর ম্যাক্সমূলর প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত পৃথিবীর বিভিন্ন উচ্চতর জাতির ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভবের মূলে একমাত্র গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির প্রভাবের অস্তিত্বই অনুভব করিতেন—এই মতবাদকে pan-Babylonianism বলিত। এই সকল পণ্ডিত তাঁহাদের এই বিশ্বাস লোক-কথার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিলেন ; তাঁহাদের মতে 'mostof the Household

Tales are, in origin, myths of the phenomena of the day and night.' গ্রহদিগের মধ্যে সূর্যই প্রধান, অতএব তাঁহাদের মতে সূর্যের উদয়াস্ত দ্বারাই অধিকাংশ লোক-কথা বিশেষতঃ রূপকথা ব্যাখ্যা করা হইত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই পণ্ডিতগণ এই মতবাদের অসারতা বুঝিতে পারিয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সমাজের আদিম ও সরল বিশ্বাসের যে ক্ষেত্র হইতে লোক-কথার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে গ্রহনক্ষত্রের জটিল ও দুর্নিরিক্ষ্য গতিবিধির সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাকিবার কথা নহে। অতএব ইহাদের সম্বন্ধে এই সকল গূঢ় ব্যাখ্যা পণ্ডিতদিগের উর্বর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত বলিয়াই সকলে মনে করিলেন।

এই সময়ে লোক-কথার উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে একটি নূতন মতের উদ্ভব হইল—ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক হইতে ইহার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য আছে ; তাহা এখানে একটু বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিতে পারি। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী পণ্ডিত (Loisoleur Deslongchampse) ভারতীয় উপকথা বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহাতে প্রমাণ করেন যে 'the originals of the European folktales were probably to be found in India.' ইহার পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পঞ্চতন্ত্রে'র জার্মাণ অনুবাদের ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত বেন্‌ফে (T. Benfey) এই অনুমানটিকে নানাদিক হইতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই মত দৃঢ়তর ও নিঃসন্দিগ্ধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—'My investigations in the field of fables, *Marchen*, and tales of the Orient and Occident have brought me to the conviction that few fables, but a great number of *Marchen* and other folktales have spread outward from India almost over the entire world.'[১]

বেন্‌ফে মনে করেন, একমাত্র ঈশপের উপকথা ব্যতীত পাশ্চাত্ত্য জগতের সমগ্র লোক-কথাই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। ঈশপের উপকথা ও ভারতীয় পশুপক্ষী চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত লোক-কথার মধ্যে তিনি একটি মৌলিক পার্থক্য অনুভব করিয়াছেন ; তাহা এই যে, ঈশপের রচনায় পশুপক্ষী

১ **Translation by S. Thompson, *The Folktale* (New York, 1946) p. 376**

সমূহ ইহাদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ করিয়াছে, কিন্তু যে সকল উপকথা ভারতবর্ষে রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইহাদের আচরণ সাধারণ মনুষ্যজাতি-সুলভ, বিশিষ্ট পশুপক্ষীর চরিত্রানুসারী নহে। অর্থাৎ ঈশপের রচনায় প্রত্যেকটি পশু কিংবা পক্ষী ইহার বাক্য ও আচরণের ভিতর দিয়া নিজস্ব চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় উপকথায় পশুপক্ষী মাত্রই নরনারী-চরিত্রের রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পার্থক্যটি হইতেই বেন্‌ফে অনুমান করিয়াছেন যে, ইহাদের উদ্ভবের ক্ষেত্রও পরস্পর বিভিন্ন। অবশ্য তাঁহার এই যুক্তির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই; অতএব তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া এ'কথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, একমাত্র ঈশপের নামে প্রচলিত কয়েকটি উপকথা ব্যতীত ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে যত উপকথা এবং রূপকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের উদ্ভব-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। কোন্ সময় হইতে ভারতীয় লোক-কথা সমূহ ইউরোপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে, এই প্রশ্নের উত্তরে বেন্‌ফে বলিয়াছেন যে, দশম খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বণিক্, পরিব্রাজক, সৈন্যসামন্ত ও অন্যান্যের মধ্যস্থতায় ভারতীয় লোক-কথা ইউরোপে মৌখিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। তারপর ইস্‌লাম ধর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ স্থাপিত হইবার পর, তাহা ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী-দিগের মধ্যস্থতায় লিখিত ভাবে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপের সকল দেশেই নূতন উদ্যমে পুনরায় প্রচারিত হয়। মুসলিম জগতের সঙ্গে খৃষ্টান জগতের নানা দিক দিয়া যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা ক্রমে সমগ্র ইউরোপ ও সেখান হইতে মার্কিণ দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। বেন্‌ফে যথার্থই মনে করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম একটি আন্তর্জাতিক ধর্মে পরিণত হইবার ফলে, ভারতীয় লোক-কথা, বিশেষতঃ জাতকের কাহিনীসমূহ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া দূরপ্রাচ্যে এবং সেখান হইতে মোঙ্গলদিগের মধ্যস্থতায় ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। মোঙ্গলগণ প্রায় দুইশত বৎসর কাল ইউরোপে প্রভুত্ব করিয়াছিল, তাহার ফলে এই সকল লোক-কথা ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া গিয়াছিল। ইহার সঙ্গে এ'কথাও মনে করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ হইতে যখন বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তখন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোক-কথা সমূহও সেই সকল

অঞ্চলে নূতন করিয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল ; কারণ, বৌদ্ধধর্মের মধ্যস্থতায় এই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্বেই যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের চতুর্দিক দিয়া ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদগুলি পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তার লাভ করিয়া জগতের লোক-কথাসাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। পণ্ডিত বেন্‌ফে বলিয়াছেন,……'on the one hand the Islamites, and on the other the Buddhists have brought about the diffusion of the folktales of India over almost the whole world.'

বেন্‌ফের পরবর্তী গবেষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জগতের লোক-কথা সাহিত্যে ভারতের এই দানের কথা আনুপূর্বিক স্বীকার না করিলেও, এই বিষয়ে ভারতবর্ষের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা এ'পর্যন্ত কেহই অস্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মনে করিয়াছেন যে, লোক-কথাগুলি আদিম জাতির সমাজ-জীবন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল ; কারণ, ইহাদের মধ্যে এখনও আদিম জাতিসুলভ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপকথার মধ্যে রাক্ষসদিগের যে নরমাংস খাইবার কথা বার বার উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা নরমাংস ভোজন (cannibalism)-এর মত কোন আদিম প্রথারই একটি নিদর্শন। অতএব ভারতবাসীর মত উচ্চতর সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতির মধ্যে উহার উদ্ভব হইতে পারে না, বর্বরতম জাতির মধ্যেই ইহার উদ্ভবের ইতিহাস সন্ধান করিতে হইবে।

লোক-কথা সজীব শিল্প, ইংরেজিতে ইহাকে Living Art বলা হইয়া থাকে। ইহা বলিবার মধ্যে যে রসসৃষ্টি হইয়া থাকে, শুনিবার মধ্যেও তেমনই একটি আনন্দের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে নীরস গদ্যের আবৃত্তি মাত্র শুনা যায় না, বরং একটি অপূর্ব শ্রুতিসুখকর রসের ব্যঞ্জনা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অনুভূতিটিকে তাঁহার অপূর্ব ভাষায় এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

'এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চী কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস-

ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা……

গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দু'টি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম--

আমার কথাটি ফুরালো,
নটে গাছটি মুড়োলো।'[১]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকৃতির যে সকল লোক-কথা শ্রুত হয়, তাহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি মৌলিক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ডেন্‌মার্ক দেশীয় পণ্ডিত এ. ওল্‌রিক (A. Olrik) ইহাদের মধ্য হইতে এই ঐক্যগুলির সন্ধান পাইয়াছেন—ইহাদের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলার লোক-কথা সম্পর্কেও ইহারা সর্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন, কোনও লোক-কথা কাহিনীর সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ঘটনা লইয়া যেমন আরম্ভ হয় না, তেমনই ইহা আকস্মিক ভাবেও কোন ঘটনার মধ্যস্থলেই সমাপ্তি টানিয়া দেয় না। যেমন ধীরে সুস্থে ইহা আরম্ভ হয়, তেমনই ধীরে সুস্থে ইহা সম্পূর্ণ হয়। 'এক যে ছিল রাজা' দিয়া যেমন ইহার আরম্ভ, তেমনই 'তারপর তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন' দিয়া ইহার সমাপ্তি। বর্ণনাকালে অনেক অংশই ইহাতে পুনরাবৃত্তি করা হইয়া থাকে; ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার 'কাক ও চড়ুই পাখী'র কাহিনীর এই সুপরিচিত অংশটির উল্লেখ করা যাইতে পারে,

'গেরস্ত ভাই, দাও ত আগুন, গড়্‌ব কাস্তে, খাবে গাই, দিবে দুধ,
খাবে কুকুর, হবে তাজা, মার্‌বে মোষ, লব শিং, খুঁড়্‌ব মাটি, গড়্‌ব
ঘটি, তুল্‌ব জল, ধুব ঠোঁট—তবে খাব চড়ুইর বুক।'

১ বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩৩৪), পৃঃ ৫৮, ৬৮

পুনরাবৃত্তির রীতি মৌখিক সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; কারণ, নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কোন বিষয় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য ইহা অপেক্ষা সহায়ক আর কিছু নাই। সেইজন্য কেবল মাত্র লোক-কথায় নহে, লোক-সাহিত্যের প্রায় সকল বিষয়েই এই প্রকার পুনরুক্তির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইবে। লোক-কথার কোনও দৃশ্যে দুইটির অতিরিক্ত চরিত্র এক সঙ্গে থাকিতে দেখা যায় না, থাকিলেও দুইটি চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করে, অন্যান্য চরিত্র পটভূমিকায় অস্পষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র দেশভ্রমণে বাহির হয়, শীত-বসন্ত এক সঙ্গে বিমাতা কর্তৃক উৎপীড়িতা হয়। প্রত্যেক লোক-কথাতেই পরস্পর বিপরীত-ধর্মী চরিত্রের সমাবেশ থাকে। রাক্ষসী ও রাজকন্যা, রাক্ষস ও রাজপুত্র—ইহারা যথাক্রমে খল (villain) ও নায়িকা বা নায়ক। উপকথার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ধূর্ত ও সরল, কৃপণ ও উদার ইত্যাদির সমাবেশেই এক একটি কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। লোক-কথার দুইটি চরিত্র যদি সম সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, তবে তাহারা যমজ বলিয়া কল্পিত হইবে : সেইজন্য শীত-বসন্তকেও অনেক সময় যমজ বলিয়া ভুল হয়। অনেক সময় যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল, লোক-কথার মধ্যে তাহারই পরিণামে জয় হয়—এই সূত্রেই কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠা কন্যা কিংবা কনিষ্ঠা রাণীরই সুখকর পরিণতি নির্দেশ করা হইয়া থাকে। লোক-কথার চরিত্র-পরিকল্পনায় কোন জটিলতা থাকে না, ইহা বিশিষ্ট একটি ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে, ইহার পরিচয় কেবল প্রত্যক্ষ—নেপথ্যের কোন গুণ ইহার উপর আরোপ করা হয় না। ইহার বিষয়-বস্তু জটিল নহে, মূল কাহিনীর কোন শাখা-উপশাখা নাই, একটিমাত্র সরল রেখার মত ইহা শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যায়। লোক-কথায় বর্ণিত প্রত্যেকটি বস্তুই নিতান্ত সাধারণ বলিয়া গণ্য করা হয়। একই প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু থাকিলে তাহাদের বর্ণনাও একই প্রকার হয় ; এমন কি, ইহাদের মধ্যে ছোটবড়র কোন পার্থক্য রক্ষা করিবারও বিশেষ কোন প্রমাণ দেখা যায় না।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, যদিও ইউরোপীয় লোক-সাহিত্য হইতেই এই ঐক্যগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তথাপি বাংলাদেশের লোক-কথায়ও ইহারা আনুপূর্বিক প্রযোজ্য হইতে পারে ; ইহা হইতেই লোক-সাহিত্যের ভাব ও অঙ্গগত সর্বজনীনত্বের পরিচয়টি আরও স্পষ্ট হইবে।

ভূমিকাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, লোক-সাহিত্য প্রত্যেক জাতিরই উচ্চতর সাহিত্যের রস ও প্রেরণা দান করিয়া থাকে, তবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে জাতীয় রসধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলার একটি রূপকথা অবলম্বন করিয়াই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক 'কীর্তি-বিলাস' রচিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষও তাঁহার 'ফণির মণি' প্রমুখ কয়েকখানি নাটক বাংলার কতকগুলি প্রচলিত রূপকথা অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সর্বব্যাপী প্রভাব বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যদি এমন কার্যকর না হইত, তাহা হইলে বাংলার লোক-কথা দ্বারা আধুনিক বাংলা সাহিত্য অধিকতর পুষ্টিলাভ করিতে পারিত।

এ'কথা আজকাল প্রায় সকল নৃতত্ত্ববিদ্‌ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, লোক-কথার মধ্যে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সময় আদিম যুগের উপাদানেরও সন্ধান পাওয়া যায়, মানব-সংস্কৃতির এই সকল আদিম উপকরণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের উপকরণ সমূহও আসিয়া স্থান লাভ করে। ইহাদের মধ্যে সর্বদা সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হয় না বলিয়া কাহিনীগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরিণত-বয়স্ক আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের নিকট বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহারা আপাতদৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাই একদিন এই মানব-সমাজের মধ্যে নিতান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল বলিয়া মনে করা হয়; নতুবা আদিম সমাজের কল্পনাশক্তি এত প্রবল ছিল না যে, তাহা দ্বারা কোন আনুপূর্বিক মৌলিক কাহিনী উদ্ভাবন করা সম্ভব হইত। বিষয়টি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

লোক-কথার রাজার সঙ্গে ঐতিহাসিক যুগের কিংবা ইতিহাসের রাজার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব রাজতান্ত্রিক বিধানে ইতিহাসের মধ্যে রাজা যে আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা পাঠ করি, লোক-কথার রাজা তদনুরূপ আচরণ করিতে আমরা শুনিতে পাই না। লোক-কথার রাজার রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত নহে, একদিনের পথ হাঁটিয়াই এমন দুই তিন রাজার রাজ্য পার হইয়া যাওয়া যায়, পক্ষীরাজে আরোহণ করিলে তো আর কথাই নাই। টুনটুনির বাসায় একটি টাকা আছে শুনিয়া রাজা ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরেন এবং তাঁহার

রাণীদের মধ্যে কেহ তাঁহার অর্থের এই অপচয় বিষয়ে টুন্‌টুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছে সন্দেহ করিয়া সাত রাণীর নাক কাটিয়া দেন। রাণী নিজের হাতে মাছ কুটেন, পুকুর হইতে মাছ ধুইয়া লইয়া আসেন, তারপর নিজ হস্তে রান্না করিয়া রাজাকে স্বয়ং পরিবেষণ করিয়া খাওয়ান। তিনি নিজেই সরোবরে স্নান করিতে যান, তারপর সেখানে গিয়া অপর তীরে স্নান-রতা কোটাল-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করেন, দুই পার হইতে দুই জনের আশা-নৈরাশ্য ও সুখদুঃখের কথাবার্তা চলে। রাজারা ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখেন, তাহার হাতেই নিজের 'পরমা সুন্দরী' কন্যা সম্প্রদান করিয়া দিতে পারেন, অনায়াসে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তির হাতে দান করিতে পারেন—হিন্দু উত্তরাধিকারের নিয়ম কিংবা সামাজিক বাধার কোন প্রশ্ন আসে না। এই সূত্রে কন্যা অর্ধেক রাজত্বের উত্তরাধিকারিণী হয়, পুত্রের উত্তরাধিকারের কথা বড় বেশি শুনিতে পাওয়া যায় না। রাজপুত্র বরং পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, তারপর এক অপরিচিত রাজ্যের রাজকন্যা এবং সেখানকারই অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়া সেইখানেই রাজত্ব করিতে থাকে, পিতৃরাজ্যে তাহাকে ফিরিতে বড় শুনা যায় না। লোক-কথার রাজা ও তাঁহার রাজ্যের পরিচয় হইতে এ'কথা কি মনে হওয়া স্বাভাবিক নহে যে, তাঁহারা ঐতিহাসিক যুগের রাজাই নহেন বরং তাঁহারা ইহারও পূর্ববর্তী যুগের উপজাতীয় নায়ক (tribal chief) মাত্র? সমাজ যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত থাকিত এবং এক একটি দলের এক একজন নায়ক থাকিত, লোক-কথার রাজচরিত্রগুলির মধ্য দিয়া তখনকারই কি পরিচয় প্রকাশ পায় নাই? রাজপুত্র পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, তারপর দেশান্তরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর পিতৃরাজ্যেই বাস করিতে থাকে—ইহার মধ্যেও একটি আদিম সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই সমাজ-ব্যবস্থার নাম মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে এই সমাজ-ব্যবস্থা এখনও সক্রিয় আছে। তাহাতে পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, কন্যাই উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে। সেইজন্য লোক-কথার রাজপুত্রকে নিরুদ্দেশের রাজ্যে সর্বদাই নিজের ভাগ্যের সন্ধান করিতে বাহির হইতে হইয়াছে এবং সেইখানেই বিবাহ করিয়া বাস করিতে হইয়াছে—নিজের রাজ্যে নূতন দেশের

অপরিচিত রাজপুত্র আসিয়া তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিয়া আসর জমাইয়া লইয়াছে। পরবর্তী কালে পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাবের ফলে কোন কোন সময় এই সকল রাজকন্যাকে লাভ করিয়া রাজপুত্রের পিতৃরাজ্যে ফিরিবার কথাও শুনিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা পরবর্তী যোজনা মাত্র। অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা এই কথা দুইটি 'বাগর্থবিব সম্পৃক্ত' বা বাক্যের সঙ্গে অর্থের যে রকম সম্পর্ক সেই রকম সম্পর্কে আবদ্ধ। যদি তাহাই হয়, তবে পিতৃরাজ্যে ফিরিবার কথা আর আসিতেই পারে না; অতএব এই পরবর্তী যোজনাটি এখানে কাহিনীর মৌলিক ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইতে পারে নাই। এই প্রকার অসামঞ্জস্যই এই সকল কাহিনীকে অনেক সময় বাহ্যত উদ্ভট রূপ দিয়াছে।

ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাহার নিকটই কন্যা সম্প্রদান করিব—রাজার এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে দুইটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কন্যার উত্তরাধিকার যেখানে স্থির আছে, সেখানে যাহার তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে কোন অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার কথা আসিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ যে সমাজে জাতিভেদের সৃষ্টি হয় নাই, তাহাতে সামাজিক কোন বাধারও প্রশ্ন আসে না। উপজাতির মধ্যে সামাজিক অধিকার সকলেরই সমান; সেইজন্য যে কেহ রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। অতএব অতি সহজেই লোক-কথার রাজার মুখ দিয়া এ'কথা বাহির হইয়া আসিতে পারে যে, ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাহার হাতে নিজের কন্যা সমর্পণ করিব। ইহার মধ্যে একটি সুগভীর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র আদিম সমাজ মাত্রই অনুরূপ গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অধীন। অতএব লোক-কথাগুলির রাজা ও তাহার আচরণের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাদের মধ্যে একটি সুপ্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় আছে। সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় ইহারা বাহিরের দিক দিয়া নানাভাবে পরিবর্তিত হইলেও, এখনও আভাসে ইঙ্গিতে ইহাদের এই অন্তর্নিহিত মৌলিক পরিচয়টি উদ্ধার করা অসম্ভব নহে।

লোক-কথা বিশেষতঃ রূপকথায় ঐন্দ্রজালিক (magical) ক্রিয়ার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ইহাদের সম্পর্কিত বিশ্বাস শিথিল হইয়া যাইবার জন্য এই বিষয়ক রূপকথাগুলি সকল শ্রেণীর আধুনিক

পাঠকের নিকট স্বভাবতঃই নিতান্ত বিরক্তিকর বোধ হয়। কিন্তু একদিন এই বিশ্বাস সমাজ-জীবনের অঙ্গ ছিল; এমন কি, কোন কোন পল্লী-অঞ্চলের নিরক্ষর জনসাধারণ এখনও ইহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিয়া থাকে। অনাবৃষ্টি হইলে এখনও নানা ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করিয়া ওঝা বা গ্রাম্যদেবতার দেয়াশীগণ বৃষ্টিপাতের প্রয়াস পায়, কোন সংক্রামিক ব্যাধির সময় আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী না হইয়া চিরাচরিত প্রথানুযায়ী নানা তুক্‌তাক্ ও পূজাহোমাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। একদিন ওঝাই ছিল সমাজের নায়ক; অতএব তাহার অনুষ্ঠিত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারাই সমগ্র সমাজ-জীবন পরিচালিত হইত। সেদিন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় কেহই অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করিত না, বরং নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই তাহা স্বীকার করিয়া লইত। অতএব যে সকল লোক-কথার ভিতর এখনও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা যে সেই সমাজেরই পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সামাজিক বাধা-নিষেধ অবলম্বন করিয়া লোক-কথায় অনুরূপ আর একটি প্রাচীন লোক-বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, ইংরাজিতে তাহা 'ট্যাবু' (Taboo) বলিয়া পরিচিত। অনেক লোক-কথার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কোন কোন কার্য আনুষ্ঠানিক ভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়। 'ঠাকুমার ঝুলি'র নীলকমল লালকমলকে খোক্কসদিগের নিকট নীলকমলের নাম করিতে বলিয়া নিজের নাম বলিতে নিষেধ করিয়াছিল, ইহা অমান্য করিয়া লালকমল বিপদে পড়িল। 'ঠাকুর দাদার ঝুলি'র কাঞ্চনমালার কাহিনীতে ইন্দ্র মালঞ্চমালাকে একটি পাখা দিয়া বলিলেন, ইহার উল্টাদিকে যেন বাতাস না করা হয়। এই নিষেধ অমান্য করিবার ফলে কাহিনীর শেষাংশের বিপর্যয়টি ঘটিয়া গেল। মনসার ব্রতকথার মধ্যে মনসা সদাগরের পুত্রবধূকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি সকল দিকেই তাকাইয়া দেখিতে পার, কেবল মাত্র দক্ষিণ দিকে তাকাইও না।' এই নিষেধ অমান্য করিবার ফলে তাহাকে স্বর্গ হইতে নির্বাসিত ও নাগদিগের অপ্রীতিভাজন হইতে হইল। আদিম সমাজের মধ্যে এই প্রকার নিষেধাজ্ঞাগুলি কেবল মাত্র গল্পের বিষয় ছিল না, ইহাদের ফল প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল; ইহাদিগকে অমান্য করিলে মৃত্যু কিংবা সামাজিক নির্বাসন ভোগ করিতে হইত। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষিত মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবে না

যে, আপাতদৃষ্টিতে এই অর্থহীন নিষেধ বাক্যগুলি অমান্য করিবার ফলে কি করিয়া কাহিনীর ধারার পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। আদিম জীবনে ইহাদের প্রভাবের ফলে ইহারা লোক-কথার ধারায় এমনই একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। অতএব আদিম সমাজে ইহাদের প্রভাবের কথা জানিতে না পারিলে কাহিনীগুলির প্রকৃত রস উপলব্ধি করা যায় না।

রূপকথায় এমন অনেক বিবরণ আছে, তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ কিংবা কোনও প্রাণীর আত্মা তাহার দেহ ছাড়িয়া ইচ্ছামত কোনও গোপন স্থানে লুক্কায়িত থাকিতে পারে; যদি কেহ কৌশলে গিয়া তাহা অধিকার করিতে পারে, তবে ইহা যাহার আত্মা সে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে পড়িয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আত্মা যে দেহ ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে, আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাসে এখনও ইহার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লোক-সমাজের মধ্যে এখনও এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, নিদ্রিত মানুষের আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া থাকে—ইহাও আদিম বিশ্বাসেরই একটি মার্জিত রূপ মাত্র। এই আদিম বিশ্বাস হইতেই মানুষ কিংবা দৈত্যদানবের আত্মা স্ফটিক স্তম্ভে ভ্রমরের মধ্যে কিংবা বৃক্ষস্থ কোন ফলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই বিশ্বাস পৃথিবীর বহু আদিম জাতির ধর্মকর্ম ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। অতএব লোক-কথায় ইহার ধারাটি সেই স্তরের সমাজ হইতেই গিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই ধারাটি নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। অতএব লোক-কথার কোন বিষয় কিংবা বিষয়াঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে যতই অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাদের গভীরতম স্তরে যে মৌলিক সত্যের ভিত্তি রহিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ইহাদিগকে একেবারেই আজগুবি (fantastic) বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।[১]

লোক-কথার যে সাধারণ বিভাগের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই যে বাংলা লোক-সাহিত্যেও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, তাহা নহে। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রকৃতি

১ বিষয়টির বিস্তৃততর আলোচনার জন্য J. A. Maocullooh, 'Folk-Memory in Folk-Tales', *Flok-Lore*, LX(1949), pp. 807-815 দ্রষ্টব্য।

অনুযায়ী তাহার লোক-কথা সৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বে বলিয়াছি যে, দেশান্তর হইতে তাহা গৃহীত হইলেও প্রত্যেক দেশেই ইহার প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা পুনর্গঠিত হইয়া থাকে। অতএব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রকৃতি-অনুযায়ী ইহার লোক-কথাও একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহার সাধারণ বিভাগ আনুপূর্বিক এখানে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বাংলাদেশে লোক-কথা এই কয়টি স্থূলভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথা।

বাংলায় যাহাকে রূপকথা বলা হয়, তাহার কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ নাই; কাহারও কাহারও এই সম্পর্কে fairy tale কথাটি মনে হইতে পারে; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, fairy অর্থ পরী; অতএব ইহা দ্বারা পরীর গল্প বুঝায়, কিন্তু বাংলার রূপকথায় পরী নাই, সুতরাং ইংরেজি fairy tale কথাটির বাংলায় রূপকথা অনুবাদ হইতে পারে না। জার্মান ভাষায় বাংলা রূপকথাটির একটি যথার্থ প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, তাহা *Marchen*; ইহার সংজ্ঞাটি উল্লেখ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা আনুপূর্বিক বাংলা রূপকথার উপর প্রযোজ্য; তাহা এই—'A *Marchen* is a tale of some length involving a succession of motifs or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never-never land humble heroes kill adversaries, succeed to kingdoms, and marry princesses'. বাংলার লোক-সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'[১] ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'ঠাকুমার ঝুলি',[২] লালবিহারী দে'র *Folk-Tales of Bengal*,[৩] দীনেশচন্দ্র সেন রচিত *Folk-Literature of Bengal*[৪] এই সকল গ্রন্থে কয়েকটি রূপকথা সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেই ইহার বৈচিত্র্য ও রসের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রূপকথার একটি স্বতন্ত্র শাখার অস্তিত্ব

১ প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩১৫

২ দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৫

৩ Calcutta, 1888

৪ Calcutta, 1920

অনুভব করিয়াছেন, তিনি তাহার নাম দিয়াছেন 'গীতি-কথা'। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা রূপকথার কোন স্বতন্ত্র শাখা নহে; কারণ, রূপ কিংবা ভাবের দিক দিয়া রূপকথার সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহাতে কথার সঙ্গে সঙ্গে গীত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা বাংলা রূপকথা মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র প্রত্যেক রূপকথাতেই কথার সঙ্গে সঙ্গে গীতি ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ রূপকথার ভাষা ব্যবহারিক গদ্য ভাষা নহে, ইহা কাব্যধর্মী—ইহা গীতি ও গদ্যের মধ্যবর্তী রেখা ধরিয়া অগ্রসর হয়; সেইজন্য এই ভাষা অতি সহজেই গীত হইয়া উঠে, তাহার ফলে আপনা হইতেই দুই কথা গদ্য বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই কথা পদ্য আসিয়া যায়। অতএব গীতিকথা বলিয়া রূপকথার স্বতন্ত্র কোন শাখা নাই, কোন কোন রূপকথায় বাহ্যতঃ গীতির বাহুল্য দেখিয়া তাহা অতিরিক্ত গীত-ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হইলেও, ইহার সঙ্গে রূপকথার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কোনও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাক্ষস ও ডাইনী (Ogres and Witches)-র চরিত্র-সমন্বিত লোক-কথা কোন কোন দেশে *Marchen* বা রূপকথা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা হয়। P. O. Bodding-এর সুপ্রসিদ্ধ *Santal Folk Tales*[১] গ্রন্থেও রাক্ষস (Ogre) সম্পর্কিত কাহিনীর জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহার একটি প্রধান কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—তাহা এই যে, রূপকথা কিংবা *Marchen* শব্দ দুইটির ইংরেজিতে কোন প্রতিশব্দ নাই। ইহাতে তৎপরিবর্তে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন Fairy Tale, Household Tale ইত্যাদি দ্বারা রাক্ষস-খোক্কস কিংবা ডাইনী সম্পর্কিত কাহিনী বুঝাইতে পারে না। কিন্তু বাংলা রূপকথা যে যথার্থই জার্মেন '*Marchen*'-এর প্রতিশব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাক্ষস-খোক্কস সম্পর্কিত কাহিনী রূপকথা কিংবা *Marchen* সংজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া যায়, অতএব জার্মেন ভাষায় যেমন ইহার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনই বাংলা ভাষায়ও ইহার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই—ইহারও রূপকথা বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আলোচনা করা যায়।

১ **Vols I-III (Oslo, 1915).**

রাক্ষস-খোক্কস সম্পর্কিত কাহিনী রূপকথার অন্তর্ভুক্ত করিবার আরও একটি যুক্তি আছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র রূপকথার রাণী, রাজপুত্র ও রাজকন্যার সঙ্গেই ইহাদের সম্পর্ক, অন্য কাহারও সঙ্গে নহে। রাক্ষসী কখনও রাণীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গোপনে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া খাইয়া বেড়ায়, কখনও বা রাজপুত্র কৌশলে ইহাদিগকে বধ করিয়া দেশান্তরের রাজার অর্ধেক রাজ্য ও তাঁহার কন্যাকে লাভ করে, আবার কখনও বা ইহারাই রাজা ও রাণীকে খাইয়া তাহাদের একমাত্র কন্যাকে সতর্ক পাহারায় পাতাল-পুরীতে বন্দিনী করিয়া রাখে। অতএব রূপকথার চরিত্রের সঙ্গে রাক্ষসের সম্পর্ক। সেইজন্য রূপকথার অন্তর্ভুক্ত ইহাদের স্থান। লোক-কথার মধ্যে রূপকথাই কাহিনীর দিক দিয়া মধ্যে মধ্যে একটু জটিল হইয়া পড়ে। মূল কাহিনীর অতিরিক্ত ইহাতে আরও এক বা একাধিক উপকাহিনী থাকিতে পারে, কোন কোন সময় তাহারা সমান্তরাল (parallel) ভাবে অবস্থান করে। যেখানে রাজপুত্র ও কোটালপুত্র এক সঙ্গে শিকার কিংবা দেশ ভ্রমণে বাহির হয়, সেখানে অনেক সময় মূল কাহিনীর সমান্তরাল ভাবে আর একটি কাহিনীর উদ্ভব হইতে পারে।

রূপকথাগুলি শিশুমনের রোমান্স ; ইহাদের মধ্য দিয়া যে রস-পিপাসা শিশু-মনে প্রথম জাগ্রত হয়, তাহার ধারা তাহার পরবর্তী জীবন পর্যন্তও অগ্রসর হইয়া যায় ; সেইজন্য পরিণত মন উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে রোমান্সের সন্ধান করিয়া থাকে। উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে রোমান্সের কল্পনা-বিলাসিতা সমাজের বাহ্য অবস্থা দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয় ; সেইজন্য ইহা কখনও যেমন দুই কূল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হয়, আবার তেমনই কখনও শুষ্ক হইয়া পড়ে। কিন্তু চিরন্তন শিশুমনে রোমান্সের নিত্য ধারা চির অব্যাহত থাকে, সেইজন্য রূপকথা-গুলি সহজেই চিরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

সাধারণ পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক কাহিনীকে ইংরেজিতে Animal Tale বলে। সাধারণ পশুপক্ষী দ্বারা এখানে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর পশু-পক্ষীই বুঝিতে হইবে, কোনও পৌরাণিক পশুপক্ষী, যেমন উচ্চৈঃশ্রবা কিংবা গরুড় ও জনশ্রুতিমূলক পশুপক্ষী যেমন পক্ষীরাজ কিংবা বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, শুকশারী বুঝিলে চলিবে না—শেষোক্ত শ্রেণীর পশুপক্ষী রূপকথার রাজ্যের অধিবাসী। শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, কাক, চিল, চড়ুই ইত্যাদি লইয়াই Animal

Tale সমূহ রচিত হইয়া থাকে। ইহাদের কাহিনী লোক-কথার মধ্যে সংক্ষিপ্ততম, এইজন্য বাংলায় ইহাদিগকে উপকথা বলা যাইতে পারে। বাংলার উপকথা কথাটি পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে, তবে সুস্পষ্টভাবে ইহার কোনও সংজ্ঞা নির্দিষ্ট নাই। পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক কাহিনী বাংলা লোক-কথার একটি বিশিষ্ট অংশ; অতএব ইহাদের সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট বিভাগ নির্দেশ করা প্রয়োজন। উপকথা দ্বারা এই বিভাগটি নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে সকল কাহিনী কেবল মাত্র পশুপক্ষী কিংবা পশুপক্ষী ও মানব-চরিত্র উভয়কে লইয়াই রচিত, তাহাদিগকেও উপকথা বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কারণ, এখানে পশুপক্ষীর চরিত্র ও মানব-চরিত্রের মধ্যে অন্তরগত কোনও পার্থক্য নাই। কারণ, পশুপক্ষী এখানে মানুষের মতই আচরণ করিয়া থাকে। উপকথা সংজ্ঞাটি Animal Tale-এর বাংলা অনুবাদ রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে কাহারও কোন সঙ্কোচ থাকিতে পারে। কিন্তু ইংরেজি animal কথাটি এখানে রূপ-বাচক মাত্র, গুণবাচক নহে। কারণ, এই সকল কাহিনীর পশুপক্ষী চরিত্র সমূহ পশুপক্ষীর আচরণ করে না, মানুষেরই আচরণ করে। অতএব ইহাদের সম্পর্কিত কোন পরিচয়ে animal বা পশু কথাটির কোন সার্থকতা নাই। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহাদের সম্পর্কে Animal Tale সংজ্ঞা অপেক্ষা উপকথা সংজ্ঞাটি অধিকতর সার্থক। নীতিমূলক উপকথা নীতিকথা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাংলা লোক-সাহিত্যে নীতিমূলক উপকথা নাই বলিলেই চলে; অতএব ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনও শাখা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ হাস্যোদ্দীপক উপকথাকে একটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিকট jest, humorous anecdote, merry tale ইত্যাদি নামে পরিচিত। পূর্বোল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ সাঁওতাল উপকথা সংগ্রাহক Rev. P. O. Bodding তাঁহার সম্পাদিত সাঁওতাল লোক-কথার একটি অংশকে Humorous Tales বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তর ব্রহ্ম হইতে যে লোক-কথা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও Humorous Tales নামক একটি বিভাগ আছে।[১] বাংলার লোক-কথা

Maung Htin, op. cit. pp. 167-226.

সম্পর্কে তদনুরূপ 'রঙ্গকথা' নামক কোন স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করা সমীচীন হয় কি না, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

এই সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ উপকথা বা Animal Tale-ই হাস্যরসোদ্দীপক। পশুপক্ষীর নির্বুদ্ধিতা লইয়া উপকথা রচিত হইয়া থাকে, নির্বুদ্ধিতা হইতেই হাস্যরসেরও উদ্রেক হয়। এমন কি, যে সকল উপকথার ভিতর দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কোন নীতি প্রচারিত হয়, তাহাদের উপরও সুনির্মল হাস্যরসের একটি স্বচ্ছ আবরণ থাকে। অতএব Humorous Tale বা রঙ্গকথাও উপকথারই একটি অঙ্গ। তবে এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে-সকল কাহিনীর মধ্যে পশুপক্ষীর চরিত্র নাই, নরনারীর চরিত্রের ভিতর দিয়াই হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাদিগকে উপকথার শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে কিনা! ইহার উত্তর এই যে, উপকথা সংজ্ঞাটি Animal Tale-এর মত সঙ্কীর্ণ নহে, বরং তাহার তুলনায় অনেক ব্যাপক। ইংরেজিতে লোক-কথার এই বিশেষ অংশের জন্য Animal Tale-এর মত একটি সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই Humorous Tale সংজ্ঞা দ্বারা ইহার অবশিষ্ট অংশটি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু উপকথা সংজ্ঞাটি ইহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক বলিয়া ইহা দ্বারা Animal Tale ও Humorous Tale উভয়ই বুঝাইতে পারে; অতএব রঙ্গকথার জন্য বাংলায় এক স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগের কোনও প্রয়োজন নাই।

প্রত্যেক দেশেই ধর্ম লৌকিক আখ্যায়িকা রচনার প্রেরণা দান করিয়াছে। 'Religion also has played a mighty role everywhere in the encouragement of the narrative art, for the religious mind has tried to understand beginnings and for ages has told stories of ancient and sacred beings.'[১] বাঙ্গালীর যে নিজস্ব একটি জাতীয় ধর্মবোধ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ'দেশে একটি বিশেষ প্রকৃতির লোক-কথা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্রতকথা নামে পরিচিত। বাংলার মেয়েলী ব্রতের ভিতর দিয়া যে ধর্মবোধের বিকাশ হইয়াছে, পারত্রিক কল্যাণ যদি তাহার লক্ষ্য থাকিত, তবে ইহাদের সম্পর্কিত আখ্যায়িকা লোক-কথা তথা

১ Stith Thompson, op. cit. pp. 5-6.

লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত না হইয়া বরং শাস্ত্র বা পুরাণেরই অন্তর্ভুক্ত হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর এই জাতীয় ধর্মবোধের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে—তাহা এই যে, ইহা পারত্রিক কল্যাণমুখী নহে, বরং ঐহিক কল্যাণমুখী। বাংলার মেয়েরা যে ব্রত পালন করে, তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বর্গ বা মোক্ষ-লাভের কামনা প্রকাশ পায় না বরং ঐহিক জীবনের অভাব-অনটন হইতে পরিত্রাণের কামনাই প্রকাশ পায়। স্বচ্ছল গৃহবাসই তাহাদের স্বর্গবাস, মানবিক সম্পর্কের বন্ধনের মধ্যেই তাহাদের মোক্ষের আনন্দ। অতএব ধর্মবোধ যেখানে এমন একান্ত বাস্তব জীবনাশ্রিত, সেখানে তাহার সম্পর্কিত শাস্ত্রও বাস্তব জীবন অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বমার্গে বিচরণ করিতে পারে না; এই সূত্রেই ব্রতকথাগুলি লোক-কথার অন্তর্ভুক্ত। ইহারা রূপকথা ও উপকথার মধ্যবর্তী—ইহাদের মধ্যে রূপকথার কল্পনার স্পর্শ যেমন আছে, তেমন উপকথার বাস্তববোধও প্রকাশ পাইয়াছে। যে গুণে মঙ্গলগান কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, সেই গুণেই ব্রতকথাগুলি দেবদেবীর বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াও, লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তবে এই দাবী যে সকল ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য তাহা নহে, কোন কোন রচনা অতিরিক্ত দৈবভাব-ভারাক্রান্ত; বলা বাহুল্য, এই সকল কাহিনীর মধ্যে পরবর্তী হিন্দু-প্রভাবই প্রকট হইয়াছে, বাঙ্গালীর জাতীয় রসচৈতন্য সেখানে বিমূঢ় বলিয়া মনে হইবে। তথাপি ব্রতকথা বাংলা লোক-কথার স্বতন্ত্র একটি বিভাগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়।

রূপকথা

লোক-কথার মধ্যে রূপকথা আকারে দীর্ঘতম। কিন্তু বিষয় পরিবেশের মধ্যে ইহাতে খুব বেশী বৈচিত্র্য নাই। কতকগুলি সাধারণ বিষয় প্রায় কতকগুলি অভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়া ইহাতে ব্যক্ত হয়। ইহাদের বিশ্লেষণ করিলে এই প্রকার একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ বা ছাঁচ (model) নির্দেশ করা যাইতে পারে ;—কোনও অপুত্রক রাজা কোনও দৈব উপায়ে এক পুত্র লাভ করিবেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই রাজপুত্র ভাগ্যের অন্বেষণে দেশান্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে। অতঃপর নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক দুর্লভ রাজকন্যাকে লাভ করিবে। তারপর সেই রাজকন্যার অর্ধেক পিতৃরাজ্য লাভ করিয়া সেখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে থাকিবে। কোন কোন সময় তাহার নিজের পিতৃরাজ্যেও যে ফিরিয়া আসিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা পরবর্তী যোজনা মাত্র।

অপুত্রক রাজার পুত্রলাভের মধ্যে যে দৈব উপায়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও বিশেষ কতকগুলি ধারা আছে। কোন সন্ন্যাসী আসিয়া রাজ-মহিষীকে একটি ঐন্দ্রজালিক (magical) শক্তি-সম্পন্ন ফল খাইতে দিবেন। একজন রাণী হইলে তিনি একাই সেই ফলটি আহার করিবেন। ফলের কোনও অংশ, এমন কি বোঁটাটিও ফেলিয়া দিতে পারিবেন না, তাহা হইলে বিকলাঙ্গ সন্তান হইবে। একাধিক রাণী থাকিলে সকলে তাহা সমান ভাগ করিয়া খাইবেন। ভাগ করিবার ব্যাপারে কনিষ্ঠা রাণীকে অন্যান্য রাণীগণ ঈর্ষাবশতঃ নানাভাবে বঞ্চনা করিবে, তাহার ফলে তাঁহার গর্ভে বিকলাঙ্গ শিশু কিংবা পশুপক্ষী সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, অন্যান্য রাণীদের গর্ভে পূর্ণাঙ্গ মানব-সন্তান জন্মলাভ করিবে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা কনিষ্ঠা রাণীকে তাঁহার সন্তান সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন। কিন্তু কালক্রমে দেখা যাইবে, ছোটরাণীর বিকলাঙ্গ কিংবা পশুপক্ষিরূপ সন্তানগণই অলৌকিক শক্তির অধিকারী, পদে পদে তাহারাই অন্যান্য রাজপুত্রদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে। রাজা কালক্রমে সকল কথা জানিতে পারিয়া কনিষ্ঠা রাণীকে পুনরায় প্রাসাদে গ্রহণ করিবেন এবং অন্যান্য রাণী ও তাহাদের পুত্রদিগের জন্য শূলদণ্ডের

ব্যবস্থা করিবেন, কদাচিৎ কনিষ্ঠা রাণী ও তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যস্থতায় তাহাদের দণ্ডবিধান স্থগিত থাকিবে।

কিন্তু রাজার যদি এক রাণী থাকে, তবে দৈব উপায়ে তাঁহার গর্ভে যে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সে দেশান্তরে তাহার ভাগ্যের অন্বেষণে বাহির হইবে। কখনও কেবল মাত্র শিকার করিবার কিংবা দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বাড়ী হইতে বাহির হইবে; কিন্তু শুধু শিকার কিংবা দেশভ্রমণ কার্য সম্পন্ন করিয়াই দেশে ফিরিবে না। নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার ভিতর দিয়া তাহার অভিযান সম্মুখ দিকেই অগ্রসর হইয়া যাইবে। তারপর কোন চরম দুঃসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিয়া কোন রাজকন্যাকে লাভ করিবে।

রূপকথার কোন চরিত্রেরই কোন নাম নাই—কেবল রাজা, রাজপুত্র, রাণী ইত্যাদি তাহাদের পরিচয়। রাজার কোন রাজ্যেরও নাম নাই—কেবল এক দেশের এক রাজা। যে সকল নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-কান্তার অতিক্রম করিয়া রাজপুত্র অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, তাহাদেরও কোনও নাম নাই। কেবল মাত্র একটি মাঠ ও একটি ঘাটের নাম কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তেপান্তরের মাঠ ও তিরপিনির ঘাট; কিন্তু ইহারা কোথায়, তাহা জানিবার জন্য কাহারও কোন কৌতূহল দেখা যায় না। ইহাদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানিয়া নিশ্চিন্ত আছি যে, ইহারা 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার'। এইজন্য জাতীয় কাব্য কিংবা 'এপিকে'র সঙ্গে তুলনা করিয়া রূপকথা প্রাচীনতর রচনা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন,—'The characters of the *tale* are usually annonymous, and the places are vague and nameless. The characters of the epic are named, they are national heroes; the events are localised; they occur in Greece, Colchis and so forth. So I concluded that the *donnee* was ancient and popular, the epic was comparatively recent and artistic.'[১] এতদ্ব্যতীত সমগ্র লোক-সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র রূপকথায়ই নরবলি, রাক্ষস কর্তৃক নরমাংসাহার (cannibalism) প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাইয়া, ইহা যে কেবল মাত্র লোক-সাহিত্যেরই প্রাচীনতম বিষয় বলিয়া মনে

১ A Lang, Introduction to Cox *Cinderella*, pp. xi ff, Quoted by S. Thompsn, op, cit. p. 880.

করা হইয়াছে, তাহা নহে—প্রাগৈতিহাসিক এক বর্বর যুগে রচিত আদিম সমাজের প্রথম রসসৃষ্টি বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। পরবর্তী কালে ইহার মধ্যে বহু উচ্চতর রসোপাদান আসিয়া মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, ইহার সঙ্গে বর্বর সমাজের মৌলিক সম্পর্কের পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। এই মতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও বুঝিতে পারা যায় যে, রূপকথার মধ্যে যথার্থ ই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সাংস্কৃতিক উপাদানের একত্র সমাবেশ হয়।

উপরে রূপকথার চরিত্র ও ঘটনাস্থলের যে নামগোত্র বা পরিচয়-হীনতার কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার ফলে ইহারা অতি সহজেই দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিবার সুবিধা লাভ করিয়াছিল। ইহারা বিশেষ হইতে নির্বিশেষের স্তরে গিয়া পৌছিয়াছিল বলিয়াই, ইহারা প্রত্যেকের হইয়াও সকলের সামগ্রী হইতে পারিয়াছিল। পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক উপকথা সমূহ যেমন পশুপক্ষীর সর্বজনীন পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অবাধে বিশ্বভ্রমণ করিয়াছে, তেমনই নির্বিশেষ চরিত্রমূলক রূপকথাগুলিও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিশ্বের রস-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিয়া চলিয়াছে। চরিত্রগত নির্বিশেষত্ব লোক-কথার একটি বিশিষ্ট ধর্ম—এই ধর্মবলেই ইহার প্রাণ-ধারা অব্যাহত আছে।

বাংলা রূপকথার যে আদর্শটি উপরে নির্দেশ করা গেল, তাহা সমগ্র ভাবে সকল দেশ কিংবা জাতিরই নিজস্ব সামগ্রী বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার বিষয় বা বিষয়াঙ্গ সমূহ সকল দেশের সকল স্তরের সমাজের উপরই প্রযোজ্য। ইহার দুইটি দিক—একটি মানবিক, আর একটি অতি-মানবিক। রাজার পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা, বড় রাণীদিগের কনিষ্ঠা রাণীর প্রতি ঈর্ষা প্রভৃতি বিষয় যেমন মানবিক, তেমনই রাজার পুত্রলাভের উপায় কিংবা বিকলাঙ্গ বা পশু-পক্ষিসন্তানের অপরিসীম ক্ষমতা লাভ অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই অলৌকিকতার পরিকল্পনায় মানবিক অভিজ্ঞতাই কার্যকরী হইয়াছে। আদিম সমাজের দলপতি কিংবা রাজাকে সর্বদাই অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করা হইত; পৃথিবীর বহু আদিম সমাজে এখনও 'রাজা' ও 'ওঝা' (magician) একই ব্যক্তি। অতএব আদিম সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী ইহার দলপতি বা 'রাজ'-পরিবারের মধ্যে সর্বদাই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে পারিত। এই সকল দলপতি বা 'রাজা'রা সর্বদাই বহুপত্নীক থাকিত।

তাহারই কথা 'এক রাজার সাত রাণী'র মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই অলৌকিক গুণ ও শক্তিসম্পন্ন 'রাজা'দিগের পুত্রলাভও অলৌকিক ভাবেই সম্ভব হইত বলিয়া সমাজ মনে করিত—কারণ, সন্তান-লাভের মূলে যে জৈব (biological) কারণ নিহিত আছে, তাহা আজ পর্যন্তও পৃথিবীর বহু আদিম সমাজ উপলব্ধি করিতে পারে না। যেখানে প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত থাকে, সেখানে যাহা দ্বারা কার্যকে সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা স্বভাবতঃই অলৌকিক হইয়া পড়ে। সেইজন্য গাছের বোঁটাশুদ্ধ ফল বা সোনার পাখীর মাংস খাইয়া কিংবা 'পুত্র-সরোবরে' স্নান করিয়া নারী অন্তঃসত্ত্বা হয় বলিয়া তাহাতে উল্লেখিত হয়। রূপকথার এই সুপরিচিত বিষয়টি সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণের নিকট supernatural birth motif বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্রই লোক-সাহিত্যে এই বিষয়টি স্থান পাইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ হইতে এই সকল কাহিনী পৃথিবীর অন্যত্র গিয়া থাকে, তথাপি বলিতে হয় যে, দেশান্তরে গিয়াও ইহারা লোক-রুচির প্রতিকূল হয় নাই। তারপর অত্যাচারিতা ছোট রাণীর পুত্র বা রাজার কনিষ্ঠ পুত্র যে তাঁহার অন্যান্য পুত্রের তুলনায় শক্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহাও দুর্বলের প্রতি সমাজের সহজ মানবিক সহানুভূতির ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণ ইহাকে 'successful youngest child' এই সাধারণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, 'It is normally true that in all tales of this kind the youngest child is also especially unpromising, either because of appearance, shiftless habits, or habitual bad treatment by others. But even though such qualities are emphasised in the narrative, it is never forgotten that the distinguishing quality of these heroes and heroines is the fact that they are the youngest.'[১]

বাংলার রূপকথার নিয়তি বা ভাগ্য একটি অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কেবল মাত্র কার্য-কারণের বিচার-সূত্র অবলম্বন করিয়া

১ S. Thompson, op. cit. p. 125. see motif L 10.

জীবনের বহু রহস্য আধুনিক শিক্ষিত মনের নিকটও উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে-যুগের সমাজে এই বিচার-বুদ্ধিরও উন্মেষ হয় নাই, তাহাতে বুদ্ধি দ্বারা তাহা সমাধান করিবার কোনও উপায়ই ছিল না। 'In the face of so much that remains unexplained in the life of man, of so many rewards that come to the undeserving, and of so much unmerited trouble and disaster it is no wonder that folktales should concern themselves with the working of luck.[১]' নিয়তির প্রতি বিশ্বাস ভারতবাসীর মজ্জাগত, সেইজন্য এ'দেশের লোক-সাহিত্যেও ইহার প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। নিয়তি 'বিধাতা-পুরুষ'-এর রূপ ধারণ করিয়া শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে নিশীথে সূতিকাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তারপর স্তিমিত আলোকে অদৃশ্য অক্ষরে শিশুর ললাট-ফলকে তাহার ভাগ্যলিপি লিখিয়া রাখিয়া যান। তিনি অ-দৃষ্ট, সেইজন্য তাঁহার যাতায়াত হয় সঙ্গোপনে; কিন্তু কাহারও যদি এই বিষয়ক কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি থাকে, তবে তিনি তাঁহার আগমন এবং নির্গমন অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া শিশুর জন্য কি ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও জানিয়া লইতে পারেন; কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অমোঘ; তাহা যতই কঠিন হউক, তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। এই ভাগ্য-বিধাতার নির্দেশেই যে দাসী সে রাণী হয়, যে রাণী সে দাসী হইয়া তাহারই পদ-সেবা করে; ভরা সমুদ্রে তাহার নৌকা চড়ায় আট্‌কাইয়া যায়। ইহা কেবল মাত্র লোক-কথার বহিরঙ্গগত অলঙ্কার নহে, ইহা কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করে। ইহা দ্বারা জীবনের ধারা যথার্থই নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া সাধারণ সমাজ বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেইজন্য ইহা দ্বারা কাহিনীর অসম্ভাব্যতা সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে না।

'প্রথম জাগিলেন মধুমালা·········

বাংলার রূপকথার অলোকপুরীতে স্বপ্নদৃষ্টি বিস্তার করিলে তাহার মধ্যে সর্বপ্রথম যে মায়াবিনীর রূপ জাগিয়া উঠে, তিনিই মধুমালা। বাঙ্গালী মাত্রেরই শৈশব-স্মৃতিতে মধুমালার স্বপ্নরূপ বিজড়িত হইয়া আছে; কাহারও নিকট তাহা অস্পষ্ট, কাহারও নিকট তাহা স্পষ্ট—কাহারও অচেতন-মনে কাহারও বা

১. ibid, p 141-2.

অবচেতন মনে তাহার আশ্রয়—কিন্তু প্রত্যেকেরই অনুভূতি এক—'স্বপ্নে দেখি আমি মধুমালার মুখ রে!' রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের অবিসংবাদিত অধীশ্বরী মধুমালা। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এ'ল বান' এই ছড়াটি ছিল তাঁহার শৈশবের মেঘদূত; মধুমালা এই মেঘদূতোল্লেখিত উত্তর মেঘের অলকাপুরীর বন্দিনী যক্ষপ্রিয়া। মধুমালার কাহিনী চিরন্তন মানবতার এক অপরূপ বিরহ-মিলন-কাব্য।

এক রাজা। কিন্তু রাজার মনে সুখ নাই; রাজা নিঃসন্তান, এই জন্য মালী শেষ রাত্রেই রাজবাড়ী ঝাঁট দিয়া যায়, আটকুড়া রাজার মুখ দেখিয়া তাহার দিনের আহার পণ্ড হয়। একদিন রাজা মালীর মনের কথা জানিতে পারিলেন, জানিয়া মনের দুঃখে ঘরে কবাট দিলেন; তাঁহার এ'মুখ আর কাহাকেও দেখাইবেন না। রাজা আর রাজসভায় গিয়া বসেন না। রাজ্যশুদ্ধ হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজ্য রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। এমন সময় একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজদ্বারে দেখা দিলেন। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রাজা কবাট খুলিলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে পুত্রলাভের জন্য একটি সোনার পাখী দিয়া তাহার মাংস খাইতে বলিয়া দিলেন; তারপর সাবধান করিয়া দিলেন, বার বৎসর পর্যন্ত যেন রাজপুত্র চন্দ্রসূর্যের মুখ না দেখিতে পান, তাহা হইলে উদাসী হইয়া যাইবেন। রাজার পুত্র হইল, পাতালে পাথর-পুরী নির্মাণ করাইয়া রাজা তাহাতে রাণী ও রাজপুত্রকে সতর্ক পাহারায় বন্দী করিয়া রাখিলেন। বার বৎসর পূর্ণ হইতে আর মাত্র তিন দিন বাকী।

এমন সময় রাজপুত্র বলিলেন, 'মা, আমার বার বৎসর বয়স হইতে চলিল, চন্দ্র-সূর্য কেমন দেখিলাম না। আমাকে যদি চন্দ্রসূর্য দেখিতে না দাও, তাহা হইলে আমি আজই প্রাণত্যাগ করিব।' এখন উপায়? রাজার নিকট সংবাদ গেল, রাজা পুরুৎ-গণৎকার সকলকে ডাকিলেন, ডাকিয়া ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আর উপায় কি? যদি রাজপুত্র আজই প্রাণ-ত্যাগ করিতে চান, তবে পাথর-পুরীর কবাট ঘুচাইয়া দেওয়া হউক।' রাজাও অগত্যা তাহাই করিলেন। মদনকুমার পাতালের পাথরপুরী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। দিন যায়। একদিন রাজপুত্র রাজসভায় গিয়া রাজাকে বলিলেন, 'রাজার ছেলে হইয়া একদিন শিকার করিয়া দেখিলাম না; শিকারে যাইব; আপনি অনুমতি দিন।' শুনিয়া রাজা সিংহাসনের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন;

পাত্রমিত্র সকলে রাজপুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন, 'একদণ্ড রাজারাণী আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, কি করিয়া মৃগয়ায় ছাড়িয়া দিবেন? আপনি এই বাসনা পরিত্যাগ করুন।' রাজপুত্র কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে রাজা বাধ্য হইয়া লোক-লস্কর সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে শিকারে পাঠাইলেন। যাইতে যাইতে রাজপুত্র অনেক দূর গেলেন—কোথাও কোন শিকার পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হইলে হতাশ হইয়া এক জায়গায় কানাৎ ফেলিলেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন এক নিদ্রিত রাজকন্যার সোনার খাটের পাশে নিজের সোনার খাটে তিনি শুইয়া আছেন, রাজকন্যার নাম মধুমালা। সেই মুখ আর ভুলিতে পারিলেন না। ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া উদাসী হইয়া রাজপুরীতে ফিরিলেন। তখন হইতে জাগরণে, স্বপ্নে ও নিদ্রায় কেবলই তাঁহার মুখে এক কথা—'হায় মধুমালা, হায় মধুমালা।' কোথায় সেই মধুমালার দেশ কেহই জানে না, রাজপুত্রও জানেন না; কি করিবেন ভাবিয়া রাজারাণীও পাগলের মত হইলেন। রাজপুত্র মধুমালার সন্ধানের জন্য বাহির হইতে চাহিলেন, রাজারাণী বাধা দিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না, অবশেষে চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া রাজপুত্র বাহির হইয়া পড়িলেন। মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল, সঙ্গী লোক-লস্করেরও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। রাজপুত্র সমুদ্রের জলে ভাসিয়া চলিলেন, মুখে তখনও তাঁহার এক কথা,—'মধুমাল, মধুমালা।' ভাসিতে ভাসিতে আর এক রাজার রাজ্যে গিয়া তীরে উঠিলেন। সেই দেশের রাজকন্যা মধুমালার দেশের একটু সন্ধান জানিতেন, তাঁহার নিকট হইতে রাজপুত্র সেই সন্ধান জানিয়া লইয়া পুনরায় মধুমালার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এই ভাবে আরও দুই রাজার রাজ্য পার হইয়া মধুমালার সন্ধান পাইলেন—সমুদ্রের মাঝখানে এক পুরী তাহাতেই মধুমালা বাস করেন। রাত্রি হইলে সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যান—ঘরের মধ্যে তিন সারি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, পিঁজরায় শারী ও শুক তাঁহার প্রহরী রূপে জাগে। রাজপুত্র সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন, স্বপ্নে দেখা সেই মুখ দেখিয়া চিনিলেন। মধুমালাও রাজপুত্রকে সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিয়া অবধি তাহার জন্য পাগলিনী হইয়া গিয়াছিলেন—উভয়ের মিলন হইল।

কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত করিয়া এখানে বর্ণনা করিবার জন্য ইহার রস খণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু রস-পরিবেষণ এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে, কিংবা তাহা সম্ভবও

নহে। বাংলার রূপকথার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ইহার মধ্য দিয়া কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই এখানে আমি সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে চাই। এই কাহিনীর চরিত্রগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহারা কোন বিশেষ চরিত্র নহে, বরং প্রত্যেকটি চরিত্রই নির্বিশেষ বা ছাঁচ (type) মাত্র। চরিত্র পরিকল্পনার দিক দিয়া রাজপুত্র এখানে কোন বিশেষ রূপ লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার ভিতর দিয়া একটি চিরন্তন মানবিক আকৃতি নিতান্ত নির্বিশেষ ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে রক্তমাংসের একটি বিশিষ্ট মানুষ যুগাশ্রয়ী হইয়াও যুগাতীত রূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার মধ্য দিয়া যে ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সকল যুগে সকল মানুষের পক্ষেই একান্ত স্বাভাবিক, অথচ কোন যুগের কোন মানুষকেই ইহা আশ্রয় করে নাই। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই রূপকথা অতি সহজেই দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করিতে পারে এবং অনন্ত মানুষের রাজ্যে ইহার নবীনতা কোনদিন হ্রাস পায় না। নির্বিশেষের ক্ষেত্র হইতে রূপকথার চরিত্রগুলিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার যুগে সবিশেষের মধ্যে রূপায়িত করা লইয়াই আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপকথার রাজপুত্রই আধুনিক কথাসাহিত্যের জগৎসিংহ এবং রূপকথার মধুমালাই তিলোত্তমা—শৈলেশ্বরের শিব-মন্দিরে এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রিতে বিদ্যুতালোকের চকিত-দর্শনের সঙ্গে পথচিহ্নহীন দুর্গম অরণ্যের মাঝখানে স্বপ্নদর্শনের কোনও পার্থক্য নাই; যে সামান্য পার্থক্য আছে, তাহা কেবল চিত্রগত, ভাবগত নহে। অতএব লোক-কথার মধ্যে সমাজ-মনে যে নির্বিশেষ ভাবচৈতন্যের উদয় হইয়াছিল, তাহাই আধুনিক উপন্যাস সবিশেষ পাত্রে পরিবেষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

রূপকথার চরিত্র-পরিকল্পনায় নির্বিশেষ রূপ প্রকাশ পাইলেও ইহার স্বাভাবিকতা কিংবা সঙ্গতি কদাচ ক্ষুণ্ণ করা হয় না। তাহা হইলে সমগ্রভাবে কাহিনীর মধ্যে কোনও রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারিত না। মধুমালা কাহিনীর রাজপুত্র চরিত্রটি তাহার প্রমাণ। অজানাকে জানিবার, অদেখাকে দেখিবার অদম্য কৌতূহল লইয়া রাজপুত্রের জন্ম হইয়াছে, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে ইহাই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। যদিও ইহা একটি সর্বজনীন মানবিক ধর্ম, তথাপি তাঁহার মধ্যে ইহার প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়। সেইজন্য দেখিতে পাই, বার বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি আর অপেক্ষা

করিতে পারিলেন না, মাতাপিতার নিষেধ অমান্য করিয়াও তিনি চন্দ্রসূর্যের মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; তাঁহার আকাংক্ষার মধ্যে যেমন তীব্রতা ছিল, তেমনই নিষ্ঠা ছিল; সেইজন্য তাঁহার শক্তিও হইয়া উঠিল দুর্জয় —তাহা আর কাহারও বাধা মানিল না। বার বৎসরের অবরুদ্ধ কবাট তাহাতেই ঘুচিয়া গেল। রাজপুত্রের এই আচরণটির মধ্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমগ্র কর্ম ও সাধনার বীজ নিহিত ছিল। মাতাপিতার নিষেধ অমান্য করিয়া তাঁহার মৃগয়া-যাত্রার মধ্যে তাঁহার এই আচরণের পুনরভিনয় হইয়াছে মাত্র। রাজপুত্রের কামনার মধ্যে এই নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই মধুমালাকে স্বপ্নে দর্শন মাত্রই সমগ্রভাবে তাঁহার মনপ্রাণ তাঁহার চিন্তায়ই ন্যস্ত হইল। নির্জন অরণ্যের ধ্যান-লোকে আসিয়া তিনি যে স্বপ্ন-সঙ্গিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তাহার জন্য স্বভাবতঃই তাঁহার সমগ্র অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তারপর তাঁহার সেই স্বপ্নময়ীর সন্ধানের ভিতর দিয়াও তাঁহার আজন্ম-আচরিত একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও শক্তিই কার্যকরী হইয়াছে। চরিত্রটির আনুপূর্বিক এই যে সঙ্গতি, ইহাই কাহিনীর রস নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, রাজপুত্রের জন্ম-মূলে একটি সোনার পাখীর কথা আছে। এই পাখীর স্বভাবটি রাজপুত্রের সমগ্র আচরণের ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাখী কোন বন্ধন স্বীকার করে না, উন্মুক্ত আকাশের বুকে অলস পক্ষ-বিহারেই ইহার আনন্দ। রাজপুত্রও পাথর-পুরীর লৌহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মাতাপিতার স্নেহবন্ধন অস্বীকার করিয়া এক অনন্ত সৌন্দর্যের আকাশে কল্পনার অলস পক্ষ বিস্তার করিয়া বেড়াইয়াছেন—কাহিনীর মধ্যেও আছে যে, এক সোনার ময়ূরে আরোহণ করিয়া তিনি মধুমালার সন্ধানে এক রাজার রাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যে উড়িয়া গিয়াছেন।

মধুমালার কাহিনীর বিষয় শাশ্বত প্রেম। প্রেমের শক্তি যে কি দুর্জয়, তাহাই রাজপুত্রের আচরণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রূপকথা 'শিশু-সাহিত্য' নহে, পরিণত ও বিদগ্ধ মন ব্যতীত এই অপূর্ব প্রেম-কাহিনীর তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে না। যে যুগে উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের উদ্ভব হয় নাই, এই কাহিনী সেই যুগের পরিণত মনেরই রস-পিপাসা চরিতার্থ করিত, শিশুদিগের সঙ্গে ইহার কোন

সম্পর্ক ছিল না। কারণ, কি মন্ত্রের বলে যে রাজপুত সাত দিন সাত রাত্রি সমুদ্রের জলে ভাসিয়া বাঁচিয়া রহিলেন, তারপর অপরিচিত দেশের অজ্ঞাতলোক হইতে মধুমালার সন্ধান করিলেন, 'শিশু' তাহা কি করিয়া বুঝিবে? আর ইহাই যদি বুঝিতে না পারিবে, তবে এই কাহিনীর রস কোথা হইতে আসিবে? সেই মন্ত্র যে প্রেম, তাহা একমাত্র পরিণত মন ব্যতীত বুঝিতে পারিবে না। অধিকাংশ রূপকথারই উপজীব্য প্রেম, এই দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে মৈমনসিংহ গীতিকার সাদৃশ্য আছে। প্রেমের জন্য ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও আত্মসমর্পণের যে পরিচয় সেই গীতিকাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, রূপকথাগুলির মধ্যেও তাহার পরিচয় প্রকাশ পায়। গীতিকার কিছু কিছু উপাদান রূপকথা হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে, অতএব ইহা পরিণত মনেরই সাহিত্য, 'শিশু-সাহিত্য' নহে। আধুনিক যুগে শিক্ষিত পরিণত মন উপন্যাস প্রমুখ উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে অনুরূপ প্রেম-বিষয়ক রচনা-পাঠের আনন্দ লাভ করিয়া থাকে বলিয়া রূপকথাগুলি তাহার অপ্রীতিকর হইয়া শিশুর আনন্দ-সামগ্রী বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু মূলতঃ ইহা যেমন লোক-সমাজের পরিণত প্রতিভারই রস-সৃষ্টি, তেমনই পরিণত মনেরই রসের ভাণ্ডার।

এই সম্পর্কে শঙ্খমালার কাহিনীটিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে—তাহাতে প্রোষিতভর্তৃকা শঙ্খমালার নৈতিক চরিত্রের প্রতি কটাক্ষের কথা আছে এবং তাহার উপর সমগ্র কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে, ইহাও শিশুমনের রসোপলব্ধির বিষয় নহে। পরিণত মন নরনারীর জীবনের যে সকল জটিল আচরণের রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইতে পারে, শিশুমন স্বভাবতঃই তাহাতে অক্ষম। অতএব রূপকথা শিশু-সাহিত্য নহে, কোন দেশেই কেবল মাত্র শিশুর সঙ্গেই ইহার একমাত্র সম্পর্ক স্বীকার করা হয় না—আমাদের দেশে এই সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

বিষয়ের দিক দিয়া প্রেমের পরই অদৃষ্ট বা নিয়তি রূপকথার প্রধান অবলম্বন। এই বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য 'কাজলরেখা'।[১] এক সদাগর।

১ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' (পূর্বোদ্ধৃত) পৃঃ ৩১৫-৪৭, 'ইহা 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে একটি রূপকথা; অতএব এখানেই ইহার বিচার করা যাইবে। এই রূপ-কথাটির স্বতন্ত্র একটি পাঠ কাঁকণমালা, 'কাঞ্চনমালা' নামে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' (পঞ্চদশ সংস্করণ) পৃঃ ৬৫-৭৪তে প্রকাশিত হইয়াছে।

এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে একটি ধর্মমতি শুকপক্ষী দিয়াছিলেন। শুকপক্ষীর পরামর্শ মত সদাগর সকল কাজ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার গৃহ ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সদাগরের একমাত্র কন্যার নাম কাজলরেখা। তাহার বয়স হইয়াছে দেখিয়া সদাগর শুকপক্ষীর নিকট তাহার বিবাহের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুকপক্ষী বলিল, 'মৃত স্বামীর সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে। ইহার এই অদৃষ্ট কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না, ইহাকে বনবাস দিয়া আইস।' শুনিয়া সদাগরের দুঃখের আর সীমা রহিল না। অবশেষে একদিন সদাগর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিলেন, অনেক দূরে গিয়া এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি ভাঙ্গা মন্দির দেখিতে পাইয়া দুইজনে তাহার বারান্দায় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিয়া পড়িলেন। কাজলরেখা তাহার পিতার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার বড় তৃষ্ণা পাইল, পিতার নিকট জল পান করিতে চাহিল। সদাগর বলিলেন, 'তুমি এইখানে একটু বস, আমি জল লইয়া আসি।' বলিয়া তিনি জলের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। কাজলরেখা এ'দিক সেদিক চাহিয়া দেখিল, মন্দিরটির দ্বার রুদ্ধ; নিকটে গিয়া দ্বারে স্পর্শ করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। কাজল ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইয়া গেল, শত চেষ্টাতেও আর খুলিল না। কাজল কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পালঙ্কে এক মৃত রাজপুত্র, তাঁহার সর্বাঙ্গে সূঁচ ফুটানো, চোখের দুইটি পাতায় দুইটি সূঁচ ফুটাইয়া তাহা বুজাইয়া রাখা হইয়াছে। সদাগর জল লইয়া ফিরিলেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কাজলের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; মন্দিরের মধ্য হইতে কাজল সাড়া দিল। সদাগর বাহির হইতে মন্দিরের দরজা খুলিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু খুলিতে পারিলেন না। তখন সদাগর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মন্দিরের মধ্যে কি দেখিতেছ?' কাজল যাহা দেখিতেছিল, তাহা বলিল। সদাগর বলিলেন, 'তোমার অদৃষ্টের লিখন আমি খণ্ডাইতে পারিলাম না, চন্দ্রসূর্য সাক্ষী করিয়া আমি এই মৃত রাজপুত্রের নিকট তোমাকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি, ইহাকে তুমি স্বামী বলিয়া জ্ঞান করিও।' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন; কাজলরেখাকে দেখিয়া বলিলেন, 'মা তুমি ভয় পাইও না, একটি একটি করিয়া তোমার স্বামীর

গা হইতে সূঁচগুলি খুলিয়া ফেল, কেবল চোখের সূঁচ দুইটি খুলিও না ; এই গাছের পাতা দিয়া গেলাম, সকল সূঁচ খোলা হইলে চোখের সূঁচ দুইটি খুলিয়া এই পাতার রস চোখে দিও, তবেই তোমার স্বামী বাঁচিয়া উঠিবে ; কিন্তু স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দিও না, পরিচয় দিলে বিধবা হইবে। ধর্ম্মমতি শুকপক্ষী রাজপুত্রের নিকট তোমার পরিচয় দিবে।' বলিয়া সন্ন্যাসী নিরুদ্দেশ হইলেন। কাজলরেখা সাতদিন সাতরাত্রি জাগিয়া রাজপুত্রের গা হইতে একটি একটি করিয়া সূঁচ খুলিয়া ফেলিল। চোখের সূঁচ দুইটি খুলিবার আগে মনে করিল, ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসি। ভাবিয়া শিলনোড়ার উপর গাছের পাতা কয়টি রাখিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। পুকুর ঘাটে গিয়া যখন পৌছিল, তখন এক ব্যক্তি তাহার এক যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল, 'এক সন্ন্যাসী বলিয়া গেল, তোমার একজন দাসীর প্রয়োজন, অতএব ইহাকে লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, ইচ্ছা হইলে ইহাকে কিনিয়া লইতে পার।' কাজলরেখা হাত হইতে কাঁকন খুলিয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে তাহাকে কিনিয়া লইল ; তারপর বলিল, 'তুমি মন্দিরে গিয়া গাছের পাতা কয়টি বাটিয়া রাখ, আমি স্নান করিয়া আসিয়া ইহার রস রাজপুত্রের চোখে দিব ; সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, তবেই রাজপুত্র বাঁচিয়া উঠিবে।' বলিয়া দাসীকে মন্দিরটি দেখাইয়া নিজে স্নান করিতে ঘাটে নামিল। দাসী মন্দিরে আসিয়া পাতা কয়টি বাটিয়া নিজেই সেই রস রাজপুত্রের চোখে দিল—রাজপুত্র চোখ মেলিয়া চাহিয়াই দাসীকে সম্মুখে দেখিলেন। দাসী বলিল, 'রাজপুত্র, আমি তোমার প্রাণ দিয়াছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর।' রাজপুত্র স্বীকৃত হইয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহাকেই নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। এমন সময় স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে কাজলরেখা মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজপুত্র দেখিবা মাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কে ?' কাজলরেখা কিছু বলিবার আগেই দাসী বলিল, 'আমার দাসী, হাতের কাঁকন দিয়া কিনিয়াছি, সেইজন্য কঙ্কণ দাসী নাম রাখিয়াছি।' কাজলরেখা কিছুই বলিতে পারিল না ; কারণ সন্ন্যাসীর নিষেধ—নিজের পরিচয় দিতে পারিবে না, দিলে বিধবা হইবে। অতএব মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া নিজের সংসারে নিজের দাসীকেই দাসীর মত সেবা করিতে লাগিল। রাজপুত্রও তাহার কোন পরিচয় জানিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে তাহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ দিনের পর দিন

বাড়িতে লাগিল। এইভাবে বার বৎসর কাজলরেখার দুঃখের জীবন কাটিল, তারপর একদিন ধর্মমতি শুক তাহার সকল পরিচয় প্রকাশ করিল। তখন রাজপুত্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া নকল রাণীকে দণ্ড দিলেন।

নিয়তির গতি দুর্নিরীক্ষ্য—কোন কার্যকারণের সূত্রে বাঁধা নহে। অতএব এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে যে সকল অবাস্তবতা ও অসম্ভাব্যতা থাকে, তাহাও নিয়তির দুর্ভেদ্য লীলা-রহস্য বিবেচনা করিয়া পাঠক-মন গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করে না। নিয়তির স্পর্শ দ্বারা সংসারের বহু ঘটনারই কারণ যখন অজ্ঞাত হইয়া আছে, তখন লোক-কথায়ও সকল বিষয়েরই সুস্পষ্ট কারণ কেহ দাবি করিতেও শিখে নাই। ভাগ্যবিড়ম্বিত সমাজের প্রত্যেক নরনারীই এই সকল কাহিনীর মধ্যে নিজেদের জীবনের ছায়া দেখিতে পায়—প্রত্যেকেই নিজের জীবনের অনুরূপ ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে।

এই কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজলরেখার চরিত্র। সহিষ্ণুতার এক অপরিসীম শক্তি তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; ধনী সদাগরের একমাত্র কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও, সে দুর্ভাগ্য হইতে নূতন দুর্ভাগ্যের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আত্মশক্তিতে তাহার বিশ্বাস কখনও শিথিল হয় নাই। এই শক্তি দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া লইবার শক্তি, তাহার আঘাত সহ্য করিবার শক্তি, নিজের নারীধর্মে অটুট বিশ্বাসের শক্তি। একদিন সকল দুঃখের তাহার অবসান হইবে, এই বিশ্বাস লইয়া সে সকল দুঃখ ধীরভাবে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে'দিন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনা হইতে না আসে, ততক্ষণ সে অধীর হইয়া থাকিয়া তাহার বিধাতা-নির্দিষ্ট দুঃখভার আরও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে যায় নাই। এই অপরূপ সহিষ্ণুতার মহিমায় কাজলরেখার চরিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি রূপকথার স্ত্রীচরিত্র এবং মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার স্ত্রীচরিত্রে পার্থক্য নাই; কারণ, একই রস-সংস্কারের ধারা অনুসরণ করিয়া উভয়েই উদ্ভূত হইয়াছে। এই সূত্রে কাজলরেখা শঙ্খমালা ও মলুয়ার সহোদরা।

রূপকথা সর্বদাই রূপকাশ্রিত হইয়া থাকে, সেইজন্য ইহার রূপকথা বা রূপক কথা নামটি বড়ই সার্থক। কাজলরেখার কাহিনীতেও একটি রূপকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। সর্বাঙ্গে সূঁচবিদ্ধ মৃত রাজপুত্র বিষয়টিও একটি রূপক; ইহার তাৎপর্য—সর্বাঙ্গে তীরবিদ্ধ মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত এক

রাজকুমার। মৃত-কল্প স্বামীর গা হইতে পরম অধ্যবসায়, সতর্কতা ও ধৈর্যের সঙ্গে তীরগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া লইয়া সেবা ও পরিচর্যার ভিতর দিয়া পত্নী কর্তৃক তাহার নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের কথাই সূঁচ রাজকুমারের রূপক কাহিনীর ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতা মৃতকল্প পতির হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিয়া গিয়াছে—কন্যা তাহার নিজ শক্তি দ্বারা মৃতকল্প স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিয়া কল্যাণ মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহাই কাজলরেখার কাহিনীর মূল তাৎপর্য। আমাদের দেশে গঙ্গাযাত্রী স্বামীর নিকট কুলীন কন্যা সমর্পণের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়—ইহা যেন তাহারই রূপক।

কাজলরেখা বেহুলার সহোদরা। কিন্তু বেহুলা অলৌকিকতার সহায়তায় তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে, কাজলরেখা কেবল মাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে কাজলরেখার কাহিনীতে অধিকতর কাব্যগুণ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

এই কাহিনীর শুকপক্ষীও একটি রূপক মাত্র। শুকপক্ষী একদিন কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিবে—ইহার অর্থ সেবা, ধৈর্য, সংযম ও নিষ্ঠার ভিতর দিয়া রাজপুত্রই প্রকৃত কাজলরেখাকে একদিন চিনিয়া লইবেন। কাজলরেখা রাজপুত্রের যে সেবা করিয়াছে, তাহা রাজপুত্র নিজের চোখে দেখিতে পান নাই—কারণ, তখন তিনি মৃত বা মৃতকল্প। কাজলরেখার চরিত্রের এই দিকটার পরিচয় তাহার নিজের চোখে চিনিয়া লইবার প্রয়োজন ছিল; তাহা না হইলে তাহাদের মিলন কেবল মাত্র রূপজ মোহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহাতে জীবনে কল্যাণ আসিতে পারে না। সেবার মধ্য দিয়া রাজপুত্র কাজলরেখার সেই পরিচয় যখন নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন শুক পক্ষীর পরিচয় দান অর্থহীন হইয়া পড়িল। দুঃখ ভোগই তপস্যা, ইহাই চিত্ত-শুদ্ধির উপায়। অতএব দুঃখের ভিতর দিয়া মিলনই স্থায়ী কল্যাণের সন্ধান দেয়। কাজলরেখার দুঃখ ভোগ যেন মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত পরিত্যক্তা শকুন্তলার তপস্যা।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার রাক্ষস-খোক্কসের গল্পগুলিকেও রূপকথারই অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। ইহাদের উদ্ভব সম্পর্কে কেহ মনে করিয়াছেন যে, মৃত্যুর প্রতি

মানুষের স্বাভাবিক ভীতি হইতেই ইহাদের জন্ম। 'The ogre is nothing but the dead, who has been variously imagined by different people.'[১] যখনই আমরা কোন রাক্ষস-খোক্কসের অত্যাচার এবং ইহা হইতে কোন রাজপুত্র কর্তৃক পরিত্রাণের কথা শুনি, তখনই আমাদের মৃত্যু এবং মৃত্যুভয়ত্রাতার কথা স্মরণ হয়। যে অশরীরী প্রেতাত্মা নানা ভাবে আমাদিগের ভীতির উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া সর্বদা মনে হয়, রাক্ষস-খোক্কস তাহাদেরই কল্পরূপ মাত্র। এই সকল কাহিনী পরিকল্পনার মূলে লোক-সমাজের মৃতের প্রতি স্বাভাবিক ভীতি ও তাহার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রবৃত্তিরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 'the *rakas*, really represent some race or other, with which the people has been in some inimical contact, people with strange and not understood habits, looked upon as savages in comparison with the narrator's race and consequently held in fear.'[২] মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে (communually) বাস করিত, তখন সর্বদাই প্রবলতর দল দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিভীষিকা দেখিত, সেই প্রবলতর জাতি সম্পর্কিত তাহাদের ভীতির মনোভাব রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনীগুলির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

মৃত্যুভয়ই হউক, কিংবা প্রবলতর জাতি কর্তৃক আক্রমণের ভয়ই হউক, আদিম সমাজের ভীতির একটি অনিশ্চিত ক্ষেত্র হইতেই যে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে, এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এই রাক্ষসগণ কামরূপী, ইচ্ছামত যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, কোনও নিশ্চিত পরিচয় ইহাদের ছিল না, কেবল মাত্র কয়েকটি গুণই ইহাদের সুনিশ্চিত ছিল—তাহাদের একটি এই যে, ইহারা নরমাংসাহারী (cannibal)। ইহারা স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই হইতে পারে, তাহাদের নিজের কোন পুত্রকন্যার পরিচয় পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র একটি পালিত কন্যার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—তিনি রাজকন্যা, তাহাদের হস্তে বন্দিনী। অপরিমিত দৈনিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা নির্বোধ—অতি সহজেই মানুষের পাতা ফাঁদে পা বাড়াইয়া দিয়া মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে। বাংলার সকল রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনীই এইরূপ।

১ S. Thompson, op. cit. p. 887.
২ P. O. Bodding, *Santal Folk Tales* op, cit, II, p. 282.

উপকথা

পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল কাহিনী রচিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে বাংলায় উপকথা বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর কাহিনীর দুইটি উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ কৌতুক-সৃষ্টি ও দ্বিতীয়তঃ নীতি-প্রচার। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ যেদিন অরণ্যে কিংবা পর্বত-গুহায় বাস করিত, সেদিন পশুর সঙ্গে সে কোন পার্থক্য অনুভব করিত না। যে মননশীলতা বা বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে পশু হইতে পৃথক্ করিয়াছে, তাহা তখনও মানুষের মধ্যে সম্যক্ বিকাশ লাভ করে নাই, পশুরই মত তাহারা তখনও কেবলমাত্র বৃত্তি (instinct)-তাড়িত হইয়াই জীবন ধারণ করিত। সেইজন্য 'animals are simply men in fur or feather' বলিয়া তাহারা মনে করিত। একটি উপজাতীয় লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায়—'In the beginning of things, men were as animals and animals as men.'[১] এ'দেশের জনশ্রুতি অনুসারেও শুনিতে পাওয়া যায়, সত্যযুগে পশুপক্ষী মানুষের মত কথা বলিতে পারিত। পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক লোক-কথা সমূহ সেই আদিম জীবনের সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপরই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহারই ধারা আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য আধুনিক পরিবেশের মধ্যে ইহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় প্রাচীনতম কথাসাহিত্য-সংগ্রহের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত এ'দেশের লোক-সাহিত্য পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক রচনায় বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মনে করিয়াছেন, একমাত্র ঈশপের উপকথা ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে যে পশু-পক্ষীর চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহা সমগ্রই ভারতীয় লোক-সাহিত্যের দান। অতি-আধুনিক কালে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এই বিষয়ে ভারতবর্ষের পার্শ্বে আফ্রিকার জন্যও একটুকু স্থান দাবি করিতে

১ *Folk-Lore* LX (1949), p. 309.

চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতবাসীর এই বিষয়ক মৌলিক প্রতিভার কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বাংলার উপকথায় যে সকল পশুপক্ষীর চরিত্র স্থান পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শৃগালই প্রধান। এই বিষয়ে বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী উপজাতীয় সাঁওতাল প্রতিবেশীর লোক-কথার সঙ্গে ইহার অপূর্ব ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল ও বাঙ্গালী উভয় জাতিরই উপকথায় শৃগালই সর্বপ্রধান চরিত্র; ব্রহ্মদেশে, খরগোস্, মালয়ে মৃগ্-ইঁদুর (mouse-deer), আফ্রিকায় শশক-ভায়া (Brer Rabbit) ও ইউরোপীয় উপকথায় খেঁকশিয়ালী (Reynard the Fox)-র যে স্থান, বাংলা ও সাঁওতাল জাতির লোক-কথায় শৃগালেরও সেই স্থান। অতএব বাঙ্গালীর বাংলা উপকথার এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যটি পূর্বদিক হইতে আসে নাই, পশ্চিম দিক হইতে আসিয়াছে। এই শৃগাল চরিত্রটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 'the jackal is not throughout described and characterized in a uniform way. Usually he is a clever and dexterous animal, which is always prepared to assist those who have suffered wrong in asserting their right. In some tales, however, he acts in a different way. He is malicious and treacherous, but usually he is defeated in the end, just like the foolish devil in European folklore.'[১] বাংলা লোক-কথার পাঠকের নিকট বিষয়টি এতই পরিচিত যে, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার কোনই প্রয়োজন করে না। কিন্তু ইহার কারণ কি? উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ এই সম্পর্কে অনুমান করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র জাতির সাংস্কৃতিক উপাদান আসিয়া একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—একটি কোল-মুণ্ডা জাতির (সাঁওতাল ইহার একটি শাখা) ও অপরটি আর্যভাষাভাষী জাতির। তিনি অনুমান করিয়াছেন, কোল মুণ্ডা জাতির মধ্যেই শৃগাল-সম্পর্কিত কাহিনীর সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল; ইহার নিকট হইতেই আর্যভাষিগণ তাহা গ্রহণ করে, কিন্তু আর্যভাষিগণ তাহাদের নিজস্ব সমাজের কতকগুলি নীতি ও ধর্মকথা ইহাদের মধ্য দিয়া প্রচার করিবার জন্য ইহাদিগকে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া কিছু কিছু

১ Sten Konow, Preface to P. O. Bodding, op. cit. vol. I., p IX.

পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। তাহার ফলেই শৃগাল পরোপকারী বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল। আর্য ও অনার্য উপাদান লইয়া আর্যভাষিগণই সমগ্র পশুজগতের একটি নূতন পরিকল্পনা করেন—তাহাতে সিংহ রাজা ও কোল-মুণ্ডা জাতি পরিকল্পিত পশুসমাজের সর্বপ্রধান চরিত্র শৃগাল মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়। শৃগালের এই মন্ত্রিত্বের পদ হইতেই তাহাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া কল্পনা করা হয়। তখন হইতে দৈহিক শক্তির দিক দিয়া সিংহ ও মানসিক বুদ্ধির দিক দিয়া শৃগাল পশুসমাজের উপর আধিপত্য স্থাপনকারী বলিয়া পরিকল্পিত হয়। শৃগাল-সম্পর্কিত এই মিশ্র পরিকল্পনা কালক্রমে পুনরায় কোল-মুণ্ডা সমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সূত্রেই অনুমান করা হইয়াছে যে, 'The crafty and treacherous jackal would then represent the more original types.'[১] অর্থাৎ শৃগাল-সম্পর্কিত বিশ্বাস-ঘাতকতাগুণের পরিকল্পনাই অধিকতর প্রাচীন এবং মৌলিক।

এই অনুমান যদি নির্ভুল হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বাংলার পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী সাঁওতাল উপজাতির নিকট হইতেই প্রধানতঃ বাঙ্গালী তাহার শৃগাল-সম্পর্কিত উপকথাগুলি লাভ করিয়াছে। সাঁওতাল পরগণা হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ এ'যাবৎ যে সকল লোক-কথা প্রকাশ করিয়াছেন,[২] তাহাদের সঙ্গে বাংলা দেশে প্রচলিত উপকথা সমূহের বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়া এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

দুইটি বিপরীত-ধর্মী সাংস্কৃতিক উপাদান একত্র সংমিশ্রণের ফলে শৃগাল চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্য দিয়া অনেক সময় কোন কোন কাহিনীর রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাংলার লোক-কথায় সুপরিচিত শৃগাল ও কুমীরের কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।[৩] কাহিনীর প্রথমে দেখিতে পাওয়া গেল, শৃগাল একজন পণ্ডিত ব্যক্তি—লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ

১ ibid p. X.

২ P. O. Bodding op, cit ; C. H. Bompas, *Folklore of the Santal Parganas* (London. 1909) ; A. Compbell, *Santal Folk Tales* (Pokhuria 1891), etc.

৩ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ঠাকুমার ঝুলি (ঐ), পৃঃ ২০৯-২১ ; উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, টুনটুনির বই, (কলিকাতা, ১৩৬২),পৃঃ ১৩৭—১৪৪।

অনুরাগ। তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার গুণ হইতেই তাহার এই পাণ্ডিত্যের পরিকল্পনাটি আসিয়াছে। একটি সহজ কৌতুক-রসের ভিতর দিয়া কাহিনীটির সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু অচিরেই এই রসের প্রবাহটি বাধা প্রাপ্ত হইল। কুমীর যখন তাহার সাতটি শিশুপুত্রের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ্বাস হইয়া শৃগালকে পণ্ডিত জানিয়া তাহার হস্তেই তাহার প্রতিকারের সকল দায়িত্ব অর্পণ করিল, তখনই শৃগালের সকল শুভবুদ্ধি লোপ পাইল, সে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কুমীরের সাতটি শিশুসন্তানকেই একে একে বিনাশ করিল। এই পরিকল্পনাটির মধ্যে ভাবগত বিরোধ আছে—কাহিনীর প্রারম্ভিক কৌতুক-রসের সহজ প্রবাহটি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বিপরীতধর্মী আর একটি রস বা করুণ রস দ্বারা ব্যাহত হইয়াছে। নির্বোধ জননীর অসহায় সাতটি শিশুপুত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা হত্যা করিবার পরিকল্পনার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক করুণ-রসের বিকাশ হয়, তাহা দ্বারাই কাহিনীর কৌতুক-রসটি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবেও ইহা কাহিনীর পরিণতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই, এই নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শৃগালকে কোন দণ্ডই ভোগ করিতে হইল না, বরং সন্তান-শোকাতুরা হতভাগিনী জননীই ইহার প্রতিশোধ লইতে গিয়া বার বার নিজের সন্তানহন্তার নিকট নিজেই পরাভূত ও হাস্যাস্পদ হইল, তখন কাহিনীর উপরি-ভাগের হাস্য-তরল আবরণ ভেদ করিয়া ভিতর হইতে একটি করুণ আর্তনাদ যেন বার বার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ইহাই কাহিনীটির মধ্যে ভাবগত বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যক্ষ কৌতুক-রসের ভিতর দিয়া কাহিনীর সূত্রপাত হইয়া ইহা প্রচ্ছন্ন করুণ-রসের স্তরে অবনমিত হইয়াছে। উপরে যে বিশেষজ্ঞের কথা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহার উক্তির মধ্যেই এই বিরোধের কারণটির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শৃগাল-সম্পর্কিত পাণ্ডিত্য-গুণের পরিকল্পনা আর্যভাষীর সমাজ হইতে আসিয়াছে এবং বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা মূলতঃ অষ্ট্রীক ভাষী, বা কোল-মুণ্ডা সমাজ হইতে আসিয়াছে। সাঁওতাল জাতির মধ্যে এই কাহিনীটি যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহার মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইবার অবকাশ পায় নাই; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কুমীর অবশিষ্ট তাহার একটি সন্তানকে বধ করিবার পূর্বেই শৃগালের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়াছে, অবশেষে

একটি মাত্র সন্তান লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে।[১] বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ভিতর দিয়া কাহিনীর পরিণতি নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার রস নিবিড় হইয়া উঠিতে বাধা হয় নাই। কারণ, একটি সুস্পষ্ট পরিণতি-নির্দেশের ভিতর দিয়াই কাহিনী যথার্থ কার্যকরী বলিয়া অনুভূত হয়। বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শৃগালের কোনও দণ্ড ভোগ না করিবার ফলে কাহিনীর পরিণতি কার্যকরী (effective) হইয়া উঠিতে পারে নাই। শৃগাল-চরিত্র সম্পর্কিত এই প্রকার বিরোধ বাংলার অধিকাংশ উপকথাতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ, সাঁওতাল জাতির মধ্য হইতে এই সকল কাহিনী বাংলা দেশে আসিলেও ইহারা কালক্রমে এ'দেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাব বশতঃ কিছু কিছু নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। নূতন উপাদানের সঙ্গে পুরাতন উপাদানের সর্বত্র সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই।

ছড়ার আলোচনা সম্পর্কে শৃগাল চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা উপকথার শৃগাল চরিত্রের উপর প্রযোজ্য নহে; কারণ, ছড়াগুলি বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব জাতীয় উপাদানে রচিত, কিন্তু উপকথাগুলির মধ্যে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা উপকথায় পশুপক্ষীর চরিত্রের মধ্যে শৃগালের পর আর যে কয়টি জীবের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের স্থান প্রায় প্রত্যেকেরই সমান—পশুর মধ্যে বাঘ ও পক্ষীর মধ্যে কাক, চড়ুই ও টুনটুনি ইহারা প্রায় সকলেই সমান স্থানের অধিকারী। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, যদিও বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে গোরু, কুকুর ও বিড়ালের মত পরিচিত জীব আর নাই, তথাপি তাহাদের সম্পর্কিত কোনও উপকথার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না। অথচ কুকুর কিংবা বিড়ালের বুদ্ধি-সম্পর্কিত বিশ্বাস এ'দেশের সমাজে অপ্রচলিত থাকিবার কোনও কারণ নাই। কুকুর অপবিত্র জিনিস আহার করিয়া থাকে বলিয়া ইহার সম্পর্কে কোন কাহিনী এ'দেশে প্রচার লাভ করিতে না পারিলেও, বিড়াল সম্পর্কে এ'কথা বলিতে পারা যায় না; মনে হয়, ইহার কারণ, সুগভীর মনস্তত্ত্বমূলক, জাতিতত্ত্বমূলক নহে। যদিও সংস্কৃত উপকথায় কচ্ছপের

১ Bompas, op. cit. p. 888

স্থান আছে, তথাপি বাংলার নিজস্ব উপকথায় কচ্ছপেরও বিশেষ স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না ; অথচ বাংলা দেশের মত কচ্ছপ ভারতবর্ষে আর কোথাও সুলভ নহে। তারপর মোরগ এবং শূকরের কথাও এ'সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারা যায়। যদিও বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলে ইহাদের চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, তথাপি বাংলা দেশে ইহাদের সম্পর্কিত কোন উপকথা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট—বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই শূকর অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। তারপর ইহার কুৎসিত আকার ও আচরণের জন্য ইহার সম্পর্কিত কোন কল্পনা হইতে সকলেই সাধারণতঃ বিরত থাকে। কিন্তু মোরগ সম্পর্কে এ'কথা বলিতে পারা যায় না। মোরগ বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর গৃহপালিত জীব। কারণ, পশ্চিম বাংলার নিম্নশ্রেণীর সমাজেও ইহা গৃহে পালিত, এমন কি গ্রাম্য দেবদেবীর নিকট বলি রূপে প্রদত্ত হয়। ইহার আচার এবং আচরণ সম্পর্কে বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীই সম্পূর্ণ পরিচিত ; অতএব বাংলার উপকথায় ইহার কোন স্থান না থাকা একটু বিস্ময়কর। অথচ বাংলার পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তবর্তী আসাম ও উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলের এবং পশ্চিম প্রান্তবর্তী ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলের লোক-কথায় ইহার বিশিষ্ট স্থান আছে। ছোটনাগপুর অঞ্চল অপেক্ষা আসাম ও উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলে ইহার প্রভাব অধিক। ইহা হইতে একটি বিষয় বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলার উপকথার মধ্যে এ'দেশের মুসলমান কিংবা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজের কোন প্রভাব স্থাপিত হইতে পারে নাই ; কিংবা এমনও হইতে পারে যে, বাংলা দেশ হইতে যে সকল উপকথা এ'যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সকলই উচ্চতর হিন্দু সমাজ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে ; সেইজন্যই ইহাদের মধ্যে হিন্দু আদর্শ ও রুচির প্রভাব ব্যতীত অন্য কোন আদর্শ বা রুচির প্রভাব অনুভব করা যায় না। যদিও বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতিগত আভ্যন্তরিক পার্থক্য কিছু নাই, তথাপি যতদিন পর্যন্ত ইহার মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর সমাজ হইতেও স্বতন্ত্র ভাবে ইহার নিজস্ব লোক-কথাগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও কথাই বলিতে পারা যাইবে না।

বাংলা দেশে পৃথিবীর হিংস্রতম ব্যাঘ্রের বাস হইলেও, ইহার হিংস্র কোনও পরিচয় এ'দেশের লোক-কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই। পশুপক্ষী

সম্পর্কিত লোক-কথা সমূহ অধিকাংশই হাস্যরসাত্মক বলিয়া, ইহাদের ভয়ঙ্কর-গুণ বর্জন করিয়াই ইহাদিগকে লোক-সাহিত্যের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। সেইজন্য বাংলার উপকথায় ব্যাঘ্র সর্বদাই হাস্যাস্পদ, কদাচ ভীতির কারণ নহে। অপরিমিত দৈহিক শক্তি ও নরমাংসলোলুপতা থাকা সত্ত্বেও, বাংলার উপকথায় ব্যাঘ্র এক ফোঁটাও নররক্ত পান করিতে পারে নাই, মানুষের বুদ্ধির নিকট বার বার পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অপমান ভোগ করিয়াছে মাত্র। বাংলার উপকথায় ব্যাঘ্র কেবল মাত্র নির্বোধই নয়, ভীরুও বটে। কেহ যদি দৈবাৎ ইহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিতে পারে, তবে ইহা কোনও দিক বিবেচনা না করিয়া প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে থাকিবে, ঘাড় ফিরাইয়াও দেখিবে না কে পিঠে চড়িয়া বসিয়াছে—কেবল মনে করিবে, তাহার পিঠে যখন চড়িয়াছে, তখন সে তাহা হইতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন জীব হইবে এবং তাহার প্রাণনাশের জন্যই এই কাজ করিয়াছে। এই ভয়েই তাহার কল্পিত আততায়ীকে পিঠে লইয়াই সে দৌড়াইতে থাকিবে। বাংলার উপকথায় বাঘের এক কল্পিত আততায়ী আছে, তাহার নাম টাগ। এই টাগের ভয়ে বাংলার উপকথার বাঘ সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। তাহার আরও দুইটি কল্পিত শত্রু আছে, একজনের নাম ভোম্বল দাস এবং আর একজনের নাম নরহরি দাস। তাহারা এইভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে—

ব্যাঘ্রের মামা আমি ভোম্বল দাস।
সাত সাত বাঘে আমার এক এক গ্রাস ॥
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস।
পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস ॥

অন্তরাল হইতে বাঘ এই কথা শুনিবা মাত্র প্রাণ ভয়ে দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, বাংলার উপকথায় ব্যাঘ্রের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটি বাংলার পশ্চিম দিক হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, সংস্কৃত উপকথায় ব্যাঘ্রের চরিত্র ভয়ঙ্কর এবং বিশ্বাসঘাতক (তুলনীয় 'বৃদ্ধব্যাঘ্র-ব্রাহ্মণ-কথা' ইত্যাদি)। ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যেও ইহার চরিত্র অনুরূপ ভয়ঙ্কর,[১] কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই

১ Bompas, op. cit, pp. 320-22, 27-28, etc.

সেখানে বাংলা দেশের অনুরূপ চরিত্রটিরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় ;[১] কিন্তু উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলের উপকথায় ব্যাঘ্র চরিত্রে কেবল বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়।[২] অতএব মনে হয়, বাংলার উপকথায় ব্যাঘ্রের চরিত্রের এই বিশিষ্ট পরিকল্পনাটি পূর্ব-দক্ষিণ অর্থাৎ মালয়-ব্রহ্ম হইতে বাংলা দেশে আসিয়াছে ; তারপর বাংলা দেশ হইতে তাহা কালক্রমে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচার লাভ করিয়াছে। সেইজন্য সাঁওতাল পরগণায় ইহার উক্ত দুইটি বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ বাংলা দেশ হইতেই ব্যাঘ্রের উপকথা সমূহ ব্রহ্মদেশে নীত হইয়াছে, সেইজন্যই ব্রহ্মদেশের ব্যাঘ্র-চরিত্র, বাংলারই সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু ব্রহ্ম ও মালয়ে নিজস্ব ব্যাঘ্রের উপকথা যে ছিল না, তাহা অনুমান করাও কঠিন। বাঙ্গালীর লোক-রুচির প্রতিকূল বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কোন ঐতিহাসিক কারণেই হউক, ব্যাঘ্র-চরিত্রের কোল-মুণ্ডা কিংবা সংস্কৃত কথাসাহিত্যের পরিচয়টি বাংলা দেশে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এ'বিষয়ে বাঙ্গালীর নিজস্ব যে জাতীয় কোন পরিকল্পনা ছিল না, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না ; কারণ, ব্যাঘ্র বাঙ্গালীর পরিচিত জীব হওয়া সত্ত্বেও, তাহার নিজস্ব পরিচয় অনুযায়ী ইহার চারিত্রিক কোনও বৈশিষ্ট্য এ'দেশের উপকথায় স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

বাংলা প্রবাদে যদিও কাককে ধূর্ত বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে, তথাপি বাংলা উপকথায় কাক নির্বোধ। চড়ুই ত এতটুকু পাখী, তাহার বুকের মাংস খাইবার তাহার অভিলাষ হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সে সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু চড়ুইর মত পাখীও আত্মরক্ষার জন্য যে কৌশল উদ্ভাবন করিল, তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ; সে চড়ুইর কথায় গৃহস্থের দ্বারে গিয়া এই কথা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—

'গেরস্ত ভাই, দাও তো আগুন
গড়্‌বে কাস্তে, কাটুব ঘাস,
খাবে গাই, দেবে দুধ, খাবে কুত্তা,

১ Bodding, II. op. cit. pp. 112-117, 117-128, etc.

২ Aung, op. cit pp. 8-10, 17-20, etc.

হবে তাজা, মারবে মোষ,
লব শিং, খুড়্‌ব মাটি, গড়্‌ব ঘটি,
তুল্‌ব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

তারপর নিজেরই পাখা পুড়িয়া এই অভিলাষ পরিত্যাগ করিল।

ক্ষুদ্র এবং অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ লোক-কথার একটি বিশিষ্ট ধর্ম। সেইজন্য রাজার কনিষ্ঠ পুত্র কিংবা কন্যা ইহারা বিকলাঙ্গই হউক কিংবা 'বুদ্ধু-ভুতুম'ই হউক, জ্যেষ্ঠদিগকে সর্ব্বদা বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে। এই মনোভাবেরই সূত্র ধরিয়া চড়ুই এবং টুন্‌টুনির মত ক্ষুদ্রতম অসহায় পক্ষীর উপর বাংলা উপকথায় সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, ইহাদিগকে অসীম বুদ্ধির অধিকারী করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। চড়ুই কেবল কাকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে যে পরিত্রাণই লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—কাককে চড়ুই মিথ্যা প্রলোভন দিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরাইয়াছে, পরিণামে তাহার ঠোঁটটি পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহার লোভের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছে। টুন্‌টুনিও বুদ্ধিবলে সাত রাণীর নাক কাটিয়াছে, রাজার ধন তাহার ঘরে লইয়া সঞ্চয় করিয়াছে, রাজাকে অখাদ্য ভোজন করাইয়াছে। ইহারা ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞেয় বলিয়াই ইহাদের উপর এই কল্পিত শক্তি আরোপ করা হইয়াছে; কারণ, লোক-সমাজের মধ্যে যেমন সকলই সমান—কেহ ক্ষুদ্র কিংবা কেহ বৃহৎ নয়—তেমনই ইহার পরিকল্পনায় পশুপক্ষীর সমাজেও ক্ষুদ্র বলিয়া কেহ নাই, বৃহৎ বলিয়াও কেহ নাই। সেইজন্য চড়ুই ও টুন্‌টুনির দৈহিক ক্ষুদ্রতা তাহাদের বুদ্ধি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঘ্রেরও দৈহিক বৃহত্ত্ব ইহার বুদ্ধির অভাবের পরিকল্পনা দ্বারা খর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে লোক-সমাজেরই একটি প্রতিচ্ছায়া উপকথার পশুসমাজের উপরও বিস্তার লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়।

তারপর আরও একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দৈহিক শক্তিতে বাঙ্গালী চিরদিনই দুর্বল; তাহার দৈহিক শক্তির অভাব সে মস্তিষ্কের বুদ্ধি দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়াছে। দৈহিক শক্তির সাধারণ পথে জাতীয় জীবনে বাঙ্গালী কোন দিনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য সে তাহার লোক-কথায় দৈহিক শক্তিসম্পন্ন জীব মাত্রকেই নিতান্ত নির্বোধ বলিয়া উপহাস করিয়াছে।

অতএব পশুর মধ্যে শৃগাল, পক্ষীর মধ্যে টুন্‌টুনি ও চড়ুইর নিকট হস্তী, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি সর্বদাই পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

অবিমিশ্র পশুপক্ষীর চরিত্র লইয়া যে বাংলার উপকথা রচিত হইয়াছে, তাহা নহে—অনেক কাহিনীর মধ্যে নরনারীর চরিত্রও পশুপক্ষীর পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়া তাহাদের নিতান্ত পরিচিত প্রতিবেশীর মতই আচরণ করিয়াছে। নরনারীর চরিত্রের সম্মুখীন হইয়া পশুপক্ষী যেমন সঙ্কুচিত হয় নাই, তেমনই পশুপক্ষীর চরিত্রের সম্মুখীন হইয়াও নরনারী কোন প্রকার ভয় কিংবা সঙ্কোচ বোধ করে নাই—অত্যন্ত সহজ ভাবেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়াছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে পরিকল্পিত এই সহজ সম্পর্কটির ভিতর দিয়া লোক-সমাজ উপকথার পশুপক্ষীর চরিত্রকে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। ইহাদের নরনারীর চরিত্র রূপকথার নরনারীর চরিত্রের মতই নির্বিশেষ—ইহাদের যেমন কোন নামধাম নাই, তেমন কোন পরিচয়ও নাই; কেবল এক জোলা, এক নাপিত, এক বামুন, বুড়ী ইত্যাদি; ইহাদের আর কোনও পরিচয় কেহ জানে না। এই সকল চরিত্রের মধ্যে খুব বেশি বৈচিত্র্যও নাই। বিভিন্ন উপকথায় সাধারণতঃ এই কয়টি মানব চরিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—জোলা, নাপিত ও বামুন। জোলা নির্বোধ, নাপিত ধূর্ত, বামুন দরিদ্র ও লোভী। কখন কখনও এক বুড়ীর কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, সে বয়স এবং বুদ্ধির দোষে অন্য কর্তৃক প্রতারিত হয়। এই কয়টি চরিত্রই অবাধে পশুপক্ষীর চরিত্রের সঙ্গে সহযোগিতা দ্বারা যেমন নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে, তেমনই কোন কোন কাহিনীতে স্বাধীনভাবে কিংবা অন্য কোন নরনারীর চরিত্রের সহযোগিতায়ও নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ করিতে পারে। এই সকল উপকথায় কৌতুক-রসেরই প্রাধান্য থাকে, জোলার নির্বুদ্ধিতা, নাপিতের ধূর্ততা এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের লোভ কিংবা নির্বুদ্ধিতা দ্বারা সহজ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। এই সকল গুণে মানুষ ও পশুর দিক দিয়া কোন পার্থক্য থাকে না; সেইজন্য জোলার নির্বুদ্ধিতা ব্যাঘ্রের চরিত্রে, নাপিতের ধূর্ততা শৃগালের মধ্যে কিংবা দরিদ্র ব্রাহ্মণের লোভ কোন কোন অভিজাত পশুর মধ্য দিয়াও প্রকাশ করা হয়। এই দিক দিয়া বাংলার উপকথার রাজ্যে নরনারী ও পশুপক্ষী একাকার হইয়া বাস করিতেছে। যে গণ-তান্ত্রিক ভিত্তির উপর লোক-সমাজ (folk-society) গঠিত, তাহাতে

পশুপক্ষীকেও মানুষের সঙ্গে সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে। উপকথাগুলির ভিতর দিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি যে অশ্রদ্ধার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ তাৎপর্যমূলক ; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্মাশ্রিত উচ্চতর সমাজের বহির্ভাগে ইহাদের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলির ভিতর দিয়াও ব্রাহ্মণের অনুরূপ গ্লানিকর চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তাহার মূলেও যে বর্ণাশ্রমধর্ম-বিরোধী মনোভাবই কার্যকরী হইয়াছে, তাহা সকলেই মনে করিয়া থাকেন। অনুরূপ মনোভাব হইতেই বাংলার এই শ্রেণীর কথাগুলি জন্মলাভ করিয়াছে। বাংলা উপকথার মধ্যে পশুপক্ষীর সম্পর্ক ব্যতীতও কেবল মাত্র নরনারীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত কাহিনীরও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তাহাদের মধ্যে চোর-ডাকাতের গল্প বাংলার উপকথার একটি প্রধান অংশ। চোরের গল্পের মধ্যে উপস্থিত-বুদ্ধির ও ডাকাতের গল্পের মধ্যে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন চোরের গল্প সংস্কৃত উপকথার ভিত্তিতে রচিত হইলেও, বাংলার ডাকাতের গল্পগুলি এ'দেশের জনশ্রুতির ভিত্তির উপর রচিত।

কোন কোন লোক-কথা সংগ্রাহক যে অঞ্চল হইতে তাহাদের লোক-কথা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সেখানেই ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এই ধারণা কতকটা সত্য হইলেও লোক-কথা সম্পর্কে তাহা সত্য নহে। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ Sten Konow লিখিয়াছেন, 'We must not forget that the folktales and popular traditions of a people are nowhere entirely of indigeneous growth, Not rarely they have been imported from abroad. They are nevertheless the property of the people, if they have been adapted to its mentality : in folklore as in civilization generally property is not only inherited but also acquired.[১]

অনেক সময় কি রকম নিখুঁত ভাবে যে লোক-কথা ও তাহার বহিরঙ্গ এক জাতি আর এক জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা বাংলার

১ Sten Konow, op, cit, p. VI.

কাক ও চড়ুই পাখীর কথার সঙ্গে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত একই কাহিনীর ছড়াগুলির নিম্নোদ্ধৃত ইংরেজি অনুবাদের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—

বাংলা দেশের কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়—

কুমোর, কুমোর! দে তো ঘটি,
তুল্‌ব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।[১]

উত্তর ব্রহ্মে প্রচলিত ছড়াটির ইংরেজী অনুবাদ এই—

Pot, Pot, come with me,
To fetch the water,
To wash the beak,
To eat the little wren.[২]

বাংলা দেশে শুনিতে পাওয়া যায়—

গেরস্ত ভাই, দাও তো আগুন,
গড়্‌ব কাস্তে, কাট্‌ব ঘাস্‌,
খাবে গাই, দেবে দুধ, খাবে কুত্তা,
হবে তাজা, মারবে মোষ,
লব শিং, খুড়্‌ব মাটি, গড়্‌ব ঘটি,
তুল্‌ব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।

উত্তর ব্রহ্মে প্রচলিত কাহিনীতেও একই সুর, একই ছন্দ, একই কথা—

'Fire Fire, come with me,
To burn the Forest,
To clear the land,
To grow the grass
To feed the Buffalo,
To wallow the Mud,

১ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, টুনটুনির বই (কলিকাতা, ১৩৬২), পৃঃ ৭৪-৭৬।

২ Aung, op, cit, p, 42-45.

To mend the pot,
To fetch the water
To wash the Beak,
To eat the little wren.'

বাংলা দেশে যে সকল উপকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে কেবল মাত্র বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপকথার যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে—পূর্ব-দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ ও মালয় এবং পশ্চিমে উড়িষ্যা এমন কি মধ্যভারতের আদিবাসী অঞ্চলের উপকথারও বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।[১] এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে বাংলা দেশের সঙ্গে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থানের পরিবর্তে বাংলার সংলগ্ন চতুর্দিকস্থ আদিবাসী অঞ্চল এবং উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মালাবার, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গেই অধিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কে কাহার নিকট হইতে এই বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সুগভীর অনুসন্ধান ব্যতীত বলিতে পারা যাইবে না; কিন্তু এই বিষয়ে দৃষ্টি চারিদিকে উন্মুক্ত রাখিলে ইহাদের রসোপলব্ধির সহায়ক হইবে। পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়াছেন যে, ভারতের আর্যেতরভাষী জাতিই লোক-কথার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তাঁহাদের অনুমান এই যে, 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বৃহৎ-কথা' মূলতঃ আর্যেতর অর্থাৎ অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড়ভাষী জাতিরই দান।[২] যদি তাহাই হয়, তবে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতীয় অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান ব্যতীত ভারতীয় কোনও উপকথারই উৎপত্তি সন্ধান করিতে পারা যাইবে না।

১ এই সম্পর্কে এই লোক-কথা-সংগ্রহগুলি পাঠ করা যাইতে পারে—Bompas, op. cit., Bodding. op. cit,. Verrier Elwin, *Folk-Tales of Mahakoshal* (Bombay, 1944); Aung, op., cit., Kunja Behari Das, *Folklore of Orissa* (Santiniketan, 1950).

২ Sten Konow, op. cit. p. IX.

ব্রতকথা

ব্রতকথাগুলি বাংলা লোক-কথার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহাদের সমগ্রই বাংলা দেশেই উদ্ভূত হইয়া এখানেই বিকাশ লাভ করিয়াছে ; বাংলার একাধিক ব্রতকথা বাংলার বাহিরে, এমন কি সুদূর গুজরাট অঞ্চলে পর্যন্ত প্রচলিত আছে ; অতএব এমনও হইতে পারে যে, যদিও ইহাদের অধিকাংশই বাংলা দেশেরই জলবায়ু দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মৌলিক প্রেরণা পৌরাণিক কিংবা লৌকিক হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া বাংলা দেশের বাহির হইতে আসিয়া এ'দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ক্রমে বাঙ্গালীর জাতীয় রসোপকরণ দ্বারা ইহা এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর ইহা হইতে বহির্বাংলার কোনও উপাদান উদ্ধার করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলার লৌকিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া ব্রতকথাগুলি রচিত। অতএব এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, অলৌকিক দেবতা সম্পর্কিত বিষয়-বস্তু লোক-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে কি করিয়া? পূর্বে ইহার উত্তর একবার সংক্ষেপে দিয়াছি, তথাপি বিষয়টি সম্পর্কে যাহাতে কাহারও ভ্রান্ত ধারণা না থাকিয়া যায়, সে'জন্য এখানে আরও একটু সামান্য বিস্তৃত করিয়া তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে সকল দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে, তাঁহারা কেহই হিন্দু পুরাণোক্ত দেবদেবী নহেন। অনেক সময় তাঁহাদের নাম দেখিয়া এই ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু নামে কিছুই আসিয়া যায় না—দেবদেবীদিগের প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নামে নহে, তাঁহাদের আচরণে। অতএব লক্ষ্মী নাম দেখিলেই তিনি পৌরাণিক বিষ্ণুর সমুদ্রমন্থনোদ্ভবা পত্নী বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আদিম সমাজের সঙ্গে উচ্চতর সমাজের সংমিশ্রণের (fusion) ফলে সমাজের মধ্যে দেবতা সম্পর্কে অনিষ্টকারিণী শক্তির (malignant power) পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে একটি শুভঙ্করী (benevolent) শক্তির পরিকল্পনাও স্থান পাইয়াছিল। আর্য ও আর্যেতর সমাজের মিশ্রণের ফলে যে-সকল দেশে নূতন সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কেবল মাত্র তাহাদেরই মধ্যে দেব চরিত্রবিষয়ক এই দুইটি বিপরীতধর্মী গুণের একত্র

সমাবেশ হইয়াছে। নতুবা যে সকল জাতি অবিমিশ্র আদিম সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেবতা-সম্পর্কিত কোন শুভবোধ স্থান লাভ করিতে পারে নাই। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশে আদিম সংস্কারের সঙ্গে উচ্চতর সংস্কৃতির মিশ্রণ হইয়াছে, তাহার ফলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেবতা সম্পর্কিত দুইটি ধারণাই এ'দেশে দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণ সমাজের মধ্যে এই দুইটি ধারণা যে পরস্পর স্বাধীন ভাবে বর্তমান আছে, কিংবা কোনদিন ছিল, তাহা নহে, ইহাতে এই দুইটি ধারণা একত্র মিলিত হইয়া একটি মিশ্ররূপ লাভ করিয়াছে—তাহার ফলেই দেবতাকে যেমন অনিষ্টকারী বলিয়া মনে করা হয়, আবার তেমনই সেই অনিষ্টকারী দেবতাকেই কোন উপায়ে তুষ্ট করিতে পারিলে, তাহা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হইবার কথাও কল্পিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ এই মিশ্র পরিকল্পনায় একই দেবতার দুইটি গুণ পরিকল্পিত হয়—অনিষ্ট করিবার শক্তি তাঁহার যেমন আছে, ইষ্ট করিবার শক্তি তাঁহার তেমনই আছে, কোন প্রকার অবহেলা করিলে তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, আবার তাঁহাকে কোন রকমে প্রসন্ন করিতে পারিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া প্রভূত কল্যাণ সাধনও করিয়া থাকেন। দেবদেবী-সম্পর্কিত এই বিশ্বাসই ব্রতকথার ভিতর দিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। দেবতা-সম্পর্কিত ইষ্ট এবং অনিষ্টকারী যে গুণের কথা বলিলাম, তাহাদেরও লক্ষ্য ঐহিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ দেবতা যখন ইষ্ট সাধন করেন, তখন হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান ইত্যাদিই বাড়িবে—স্বর্গ কিংবা মোক্ষ লাভ হইবে না এবং দেবতা যখন অনিষ্ট সাধন করেন, তখন হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়ালে গরু মরিবে, মরাইয়ে ধান শূন্য হইবে—স্বর্গচ্যুতি কিংবা নরকবাস হইবে না। অতএব অনিষ্টকারী দেবতাই হউন, কিংবা ইষ্টকারী দেবতাই হউন, তাঁহার অনিষ্ট কিংবা ইষ্ট করিবার শক্তি ঐহিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহা মানব-জীবনের বাস্তব সুখ-দুঃখ, আশানৈরাশ্যের সঙ্গেই জড়িত, এমন কি, এই দেবতাগণ সাধারণ মানুষের মূর্তি ধারণ করিয়া মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানুষের মতই আচরণ করিয়া থাকেন—সুখে হাসেন, দুঃখে কাঁদেন, কখনও প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠেন, কখনও বা সহানুভূতিতে গলিয়া যান। অতএব ইহারাও মানুষ ছাড়া আর কি? তবে যেহেতু দেবতা বলিয়া তাঁহাদিগকে কল্পনা করা

হয়, অতএব তাঁহাদের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত শক্তি থাকে বলিয়া মনে করা হয় ; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই শক্তিও ঐহিক জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। অতএব এই যে দেবতা, যাঁহার শক্তি ঐহিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যাঁহার অধিষ্ঠান মানব-সমাজের মধ্যেই বলিয়া কল্পিত, তিনি দেবতা হইয়াও মানুষ ব্যতিরেকে কিছুই নহেন ; অতএব তাঁহাকে লইয়া যে কাহিনী রচিত হয়, তাহা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার অযোগ্য হইতে পারে না। উপকথার রাজ্যে পশু ও মানুষ একাকার হইয়া বাস করে, ব্রতকথার রাজ্যেও মানুষ এবং দেবতা একাকার হইয়া আছে। এই সর্বব্যাপী একাত্মানুভূতির একটি প্রধান কারণ এই যে, যে-সমাজ হইতে লোক-সাহিত্যের উদ্ভব, সেই সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না। লোক-সমাজের মধ্যে ব্যষ্টির কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই, সে'কথা ভূমিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধহীন সমাজ হইতে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনায়ও স্বভাবতঃই বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন কোন চরিত্রের স্থান থাকিতে পারে না। যেখানে প্রত্যক্ষদৃষ্ট মানুষ ও পশুতে কোনও পার্থক্য রক্ষা পাইল না, সেখানে অপ্রত্যক্ষ দেবতার সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কি ভাবে রক্ষা পাইতে পারে ? যে বস্তু প্রত্যক্ষ, তাহারই প্রভাব অপ্রত্যক্ষ বস্তুর উপর গিয়া পড়ে ; অতএব মানুষ দ্বারাই দেবতা প্রভাবিত হয়—দেবতা দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয় না। এই দেবতাগণ অনেক সময় অদৃষ্টের স্থানও অধিকার করিয়াছেন। মানব-জীবনে অদৃষ্ট বা নিয়তির প্রভাব কেবল মাত্র লোক-সাহিত্যে কেন, উচ্চতর সাহিত্যের ভিতর দিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে ; মানব-জীবনের ইহা এক পরীক্ষিত সত্য ; অতএব এই দেব-দেবীগণ যদি অদৃষ্ট বা নিয়তিরই রূপক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের উপস্থিতি দ্বারা ব্রতকথার সাহিত্যগুণ হ্রাস পাইতে পারে না।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্রতকথার দেবতা-দিগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের ভাবগত সম্পর্ক আছে। প্রকৃত পক্ষে ব্রতকথা ভিত্তি করিয়াই উচ্চতর সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রতকথার একটি স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র আছে বলিয়াই মঙ্গলকাব্য ইহার ধারাটি লুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই। মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে যে মানবিক গুণের সন্ধান পাওয়া যায়, ব্রতকথার দেবচরিত্রেও সেই

গুণেরই সন্ধান পাওয়া যায় ; আঙ্গিক পুরিপুষ্টি লাভ করিয়া মঙ্গলকাব্য উচ্চতর সাহিত্যের স্তরে পৌছিয়া গেলেও, ইহার সনাতন ধারাটি অবলম্বন করিবার জন্য ব্রতকথা আজিও লোক-সাহিত্যের সাধারণ স্তরেই আবদ্ধ হইয়া আছে—উদ্দেশ্যের দিক দিয়া পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অতএব দেখা গেল, ঐহিক জীবনই ব্রতকথার লক্ষ্য, ইহার দেবদেবীগণ কোথাও মানুষের মত সুখদুঃখভাগী, কোথাও অদৃষ্ট বা নিয়তির রূপক। অতএব ব্রতকথার বিষয়-বস্তু কিংবা দেব-চরিত্র লোক-সাহিত্যের পরিপন্থী নহে।

লোক-কথায় সাধারণ যে সকল মৌলিক বিষয় (motif) থাকে, প্রায় প্রত্যেক ব্রতকথাতেই তাহাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এইজন্য মনে হয়, বহু রূপকথা কিংবা উপকথা ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য ব্রতকথায় পরিণত হইয়াছে। রূপকথার কাজ অবসর-বিনোদন, কিন্তু ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য কর্তব্য সাধন। গার্হস্থ্য সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার উদ্দেশ্যে কোন কোন রূপকথা ব্রতকথার রূপে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত না দিলে আমার বক্তব্য বিষয়টি এখানে সুপরিস্ফুট হইবে না। এই সম্পর্কে সুপরিচিত সঙ্কটার ব্রতকথাটি উল্লেখ করিব।

'এক দেশে এক রাজার সাত রাণী ছিল। কোন রাণীর ছেলেমেয়ে হয় নি' ব'লে রাজা মনের দুঃখে থাকেন। একদিন সকালে রাজা দেখ্‌লেন যে, ঝাড়ুদার বাড়ী ঝাঁট দেয় নি'। এই দেখে তিনি ঝাড়ুদারকে ধ'রে আনবার জন্যে কোটালকে পাঠালেন। কোটাল ঝাড়ুদারের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লে যে, ঝাড়ুদার ভাত খাচ্ছে ; তাই দেখে কোটাল জিজ্ঞেস কর্‌লে, "তুই আজ রাজবাড়ী ঝাঁট না দিয়ে ভাত খাচ্ছিস্ ?" ঝাড়ুদার বললে, "কি করব হুজুর ! ওই আঁটকুড়ো রাজার মুখ দেখে আমার দিনের বেলায় কোনদিন ভাত জোটেনি, সেইজন্য আজ খেয়ে যাচ্ছি।" এই কথা শুনে কোটাল রেগে গিয়ে রাজাকে সব বল্‌লে। রাজার শুনে ভারি দুঃখ হল, আর কাউকে মুখ দেখাবেন না ব'লে ঘরে দোর দিয়ে রইলেন।

'এমন সময় এক সন্ন্যাসী এ'সে রাজাকে ডাক্‌লেন। রাজা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এ'লেন। আস্‌তেই সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "আর তোকে ভাব্‌তে হবে না, এইবার তোর ছেলে হবে।" এই ব'লে একটি শেকড় দিয়ে বল্‌লেন, "এইটে বেটে রাণীদের খেতে বল্, তা হ'লেই সাত রাণীর সাত ছেলে হ'বে। আর যে

ছেলেটি সব চেয়ে ভাল হ'বে, সেইটি আমাকে দিতে হ'বে।" এই ব'লে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। রাণীরা সেই শেকড় বেটে খেলে ; এমন সময় ছোটরাণী এ'সে বল্‌লে, "কই আমায় ত দিলে না?" তখন রাণীরা বল্‌লে "ওই যা! ভুলে গেছি। তা তুই শিলটা ধুয়ে খা, তা হলেই হবে।" ভাল মানুষ ছোটরাণী, কাজেই তাদের কথামত তাই খেলে। তারপর সকলের গর্ভ হ'ল, দশমাস দশদিনে সবাই প্রসব ক'রলে, কিন্তু ছেলেরা কেউ বা কালা, কেউ বা কাণা, কেউ বা খোঁড়া এই রকম হ'ল। আর ছোটরাণী একটি শাঁখ প্রসব ক'র্‌লে। রাজা তাই দেখে ছোটরাণীকে ত্যাগ করলেন। ছোটরাণী মনের দুঃখে একটি কুঁড়েতে সেই শাঁখ নিয়ে বাস করতে লাগ্‌লো। রাত্রে ছোটরাণীর মনে হ'ত, কে যেন তার মাই খাচ্ছে, কিন্তু জেগে উঠে কিছুই দেখ্‌তে পেত না। একদিন ছোটরাণী ঘুমবার ভান ক'রে শুয়েছিল। খানিক পরে দেখ্‌লে শাঁখের ভিতর থেকে একটি সুন্দর ছেলে বেরিয়ে এলো। তাই না দেখে ছোটরাণী তাড়াতাড়ি উঠে সেই ছেলেটিকে বুকে ক'রে নিয়ে শাঁখটা ভেঙ্গে দিলে, দিয়ে বল্‌লে, "আর আমি তোমায় ছাড়ব না।" ছেলেটি বল্‌লে "মা, তুমি কি করলে? সেই সন্ন্যাসী আমায় এইবার এ'সে নিয়ে যাবে।" রাণীর ভারী ভাবনা হ'লো। সকাল হ'তেই রাজার কাছে গিয়ে সব কথা ব'লে ছেলে কোলে দিলে। দিতেই রাজা রাণীকে বল্‌লেন, "আমি তোমায় ভুল ক'রে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" এই বলে রাণীকে ঘরে নিয়ে গেলেন। বার বছর পরে সেই সন্ন্যাসী ফিরে এলো ; এসে ছেলে চাইলে। রাজা বল্লেন, "ছয় রাণীর ছয় ছেলে, আর ছোটরাণীর একটি শাঁখ হ'য়েছে। আপনি এ'র মধ্যে যাকে পছন্দ হয়, নিন।" সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "না, এ'রা ত কেহই সুন্দর নয়" এই ব'লে একটি শাঁখ বাজিয়ে ডাক্‌লেন, "কৈ আমার শঙ্খনাথ কৈ?" সন্ন্যাসী ডাক্‌তেই ছোটরাণীর ছেলেটি ছুটে এল। তখন সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "আপনি আমাকে ঠকাবার মতলব কচ্ছিলেন ; এই ছেলেকে আমার চাই।" এই বলে সন্ন্যাসী ছেলে নিয়ে চ'লে গেলেন। রাজারাণী চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। রাণীর কান্নাতে পাড়ার মেয়েরা রাজ-বাটীতে ছুটে এল। তার ভেতর থেকে একজন গিন্নী সব কথা শুনে ছোটরাণীকে বল্লে, "মা, তুমি সঙ্কটার ব্রত কর, তা' হ'লেই ছেলে ঘরে ফিরে আস্‌বে।" রাণী সে কথা শুনে শুক্রবারে সমস্ত দিন উপোস ক'রে এক মনে সঙ্কটার পূজো করতে লাগ্‌লো। ওদিকে সন্ন্যাসী

শঙ্খনাথকে পথে যেতে যেতে বল্‌লেন, "দেখ, বনের ভেতর একটা পথ আছে, সেখানে ভারি বাঘ-ভালুক আছে; কিন্তু খুব শীগ্‌গির যাওয়া যায়। আর যে একটা ভাল পথ আছে, সেটা দিয়ে গেলে বড্ড দেরী হয়। তুমি কোন্‌টা দিয়ে যাবে?" শঙ্খনাথ বল্‌লে, "আমি রাজার ছেলে, আমার ভয় কিছু নেই। আমি বনের ভেতর দিয়ে যাব।" সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হ'য়ে তা'কে সেই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। খানিক দূরে একটি কালীমন্দিরের কাছে একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "তুমি কাপড় জামা ছেড়ে স্নান ক'রে এ'সো, মায়ের পূজো কর্‌তে হ'বে।" স্নান ক'রে শঙ্খনাথকে কুঁড়ে ঘরে বসতে বল্‌লেন, আর দক্ষিণ দিকের দরজা খুল্‌তে বারণ ক'রে দিয়ে সন্ন্যাসী কালীপূজো কর্‌তে গেলেন। শঙ্খনাথের মনে সন্দেহ হ'লো। সে সেই দক্ষিণ দিকের দরজা আস্তে আস্তে খুল্‌লে, খুলে দেখ্‌লে যে, একটা রক্তের পুকুরে অনেক মড়ার মুণ্ডু ভাসছে। সেই মুণ্ডুগুলো তাকে দেখেই হেসে উঠ্‌লো। শঙ্খনাথ জিজ্ঞেস করলে, "তোমরা হাস্‌ছো কেন, আর তোমরা কারা?" মুণ্ডুগুলো বল্‌লে, "আমরাও রাজপুত্র, এই সন্ন্যাসী আমাদের কালীর কাছে বলি দিয়েছে, তোমাকেও আজ বলি দেবে।" শঙ্খনাথ বল্‌লে, "তবে উপায়?" মুণ্ডুরা বল্‌লে, "যদি আমাদের বাঁচাও, তবে বল্‌বো।" শঙ্খনাথ প্রতিজ্ঞা কর্‌লে। তখন তারা বল্‌লে, "সন্ন্যাসী যখন তোমায় কালীর কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌তে বল্‌বে, তখন তুমি বল্‌বে, 'আমি রাজার ছেলে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানি না, আপনি আমায় দেখিয়ে দিন।' সন্ন্যাসী তখন মাটিতে শুয়ে দেখিয়ে দেবে, আর তুমি তখনই খাঁড়া নিয়ে সন্ন্যাসীকে কেটে ফেলে তার রক্ত আর মায়ের ফুল আমাদের গায়ে ছড়িয়ে দেবে।"[১] শঙ্খনাথ সব কথা শুনে দরজা বন্ধ ক'রে বসে চুপ ক'রে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। খানিক পরে সন্ন্যাসী এ'সে শঙ্খনাথকে দেখে ভারি আনন্দিত হ'ল। ১০৭টা বলি শেষ হয়েছে, এইটে হ'লেই তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। শঙ্খনাথকে নিয়ে সে কালীর কাছে গেল, তারপর বল্‌ল, "মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে যাবে—চল।"

১ ইহার সঙ্গে একটি অনুরূপ সাঁওতাল উপকথার এই অংশ তুলনা করা যাইতে পারে—'Now the Goase will put some handfuls of rice on the ground and will say to you: 'Kneel down.' Then say: 'We do not know this. We are the children of a king. If you show it to us and teach us, we may perhaps be able to do as you say.' Presently he will show you how; then you take the sword and cut him down'...... (P. O. Bodding, op. cit. Vol. III. p. 288.)

শঙ্খনাথ বল্‌লে, "আমি রাজার ছেলে, কি ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয়, তা আমি জানি না; আপনি আমায় দেখিয়ে দিন।" সন্ন্যাসী যেমন মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে শুয়ে দেখালে, অমনি শঙ্খনাথ খাঁড়া নিয়ে তার মুণ্ডু দু'খানা ক'রে ফেল্‌লে, ফেলেই সেই রক্ত আর মায়ের ফুল নিয়ে মুণ্ডুগুলোর উপরে ছড়িয়ে দিলে। তারা সবাই বেঁচে উঠে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো। সেই দেশের রাজার কাছে এই কথা উঠ্‌লো। রাজা খুব আদর যত্ন ক'রে শঙ্খনাথকে বাড়ীতে নিয়ে এ'লেন। তারপর তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে শঙ্খনাথের বিয়ে দিলেন। তারপর হাতি ঘোড়া ধন-দৌলত দিয়ে মেয়ে-জামাইকে পাঠালেন। অন্য অন্য রাজপুত্রেরাও সঙ্গে চল্‌লো। এ'দিকে ছোটরাণী শুক্রবারে সঙ্কটার ব্রত ক'রে প্রণাম ক'রে উঠেছে। এমন সময় কে এসে বল্‌লে, "মা, তোমার ছেলে বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে আস্‌ছে।" খবর পেয়ে রাজারাণী দৌড়ে গিয়ে ছেলে-বউ বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌লেন। রাজপুত্রদের সকলকে খাতির-যত্ন কর্‌লেন। তারপর শঙ্খনাথ তার সমস্ত বিপদের কথা বল্‌লে, শুনে সকলেই অবাক্! রাজারাণী তখন মহাঘটা ক'রে সঙ্কটার ব্রত কর্‌লেন। রাজপুত্রদের সকলকে এই ব্রত করতে ব'লে দিলেন। ছোটরাণী বেটা-বউয়ের মাথায় সঙ্কটার অর্ঘ্য ছুঁইয়ে দিলেন। রাজা তাঁর রাজ্যে সকলকেই এই ব্রত কর্‌বার হুকুম দিলেন। রাজপুত্রেরা সকলেই যে যার রাজ্যে চ'লে গেল। ক্রমে মা সঙ্কটার ব্রত-কথা দেশে প্রচার হ'লো। সকলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে লাগ্‌লো।'[১]

কাহিনীটি অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী নামক যে দেবতার উল্লেখ ইহার কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পরিত্যাগ করিলেও কাহিনীর ধারায় কোনই পরিবর্তন হয় না। দৈব বা দেবতার সম্পর্কহীন ইহা একটি উৎকৃষ্ট রূপকথা। রূপকথার কতকগুলি মৌলিক বিষয় (motif) ইহার মধ্য দিয়া যে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরে আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি, কিন্তু প্রথমেই এ'কথাটি বুঝিতে হইবে যে, দেবতার উল্লেখ ইহার পরবর্তী যোজনা মাত্র। রাজার কনিষ্ঠ পুত্র সকল বাধা-বিঘ্ন জয় করিয়া পরিণামে সকল স্নেহের একক অধিকারী হইয়া

১ আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ব্রতকথা (কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৮৩-৮৭

থাকে—ইহা রূপকথার একটি অতি সাধারণ বিষয় (motif)। এই বিষয়টির মধ্যে পরবর্তী কালে দৈবানুগ্রহের কথা যুক্ত হইয়া রূপকথাটিকে ব্রতকথার আকার দিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা দ্বারা ইহার মৌলিক রূপকথার পরিবেশটি যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 'একজন গিন্নী সব কথা শুনে ছোট রাণীকে বল্লে, "মা তুমি সঙ্কটার ব্রত কর", ছোটরাণী সঙ্কটার ব্রত ক'রে প্রণাম ক'রে উঠেছে, রাজারাণী মহাঘটা ক'রে সঙ্কটা ব্রত করলেন' এই কয়টি বাক্য ব্যতীত এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে দেবতার কথা আর কিছুই নাই, এই বাক্য কয়টি কাহিনীর মধ্যে এমন অসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে যে, ইহাদের দ্বারা দেবতা সম্পর্কে বিশেষ কোন শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হইতে পারে নাই। অতএব এই কাহিনীর প্রকৃত রস রূপ-কথারই সাহিত্যরস, দৈবকাহিনীর ভক্তিরস নহে। রূপকথা হিসাবে সার্থকতার দিক দিয়া এখন ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। এই কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ পূর্বোল্লিখিত 'ঠাকুমার ঝুলি'র 'বুদ্ধু ভুতুম' এবং 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'মধুমালা'র কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশের অনুকূল। নিঃসন্তান রাজা, তাঁহার সাত রাণী, রাজার দুঃখ, সন্ন্যাসীর আবির্ভাব, গর্ভোৎপাদক ঐন্দ্রজালিক বস্তু, ছোটরাণীর প্রতি বড়রাণীদের ঈর্ষা ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক রূপকথারই সাধারণ বিষয়। অতএব এইগুণে ইহা রূপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তারপর কনিষ্ঠা রাণীর অস্বাভাবিক (শাঁখ) সন্তানের জন্ম, তাঁহার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য, শঙ্খশিশু, ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন শঙ্খ, দক্ষিণ দিকের দরজা খুলিতে নিষেধ (taboo), নিষেধ-ভঙ্গ, সবাক্ কঙ্কাল, নরবলি, রক্ত দ্বারা পুনর্জীবন দান, কৌশলে রাজপুত্র কর্তৃক খলের (villian) নিধন, রাজপুত্র কর্তৃক রাজার একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় পৃথিবীর সকল দেশে বিশেষতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত রূপকথার নিতান্ত সাধারণ বিষয় (motif) মাত্র। অতএব সঙ্কটার ব্রতকথা যে মূলতঃ রূপকথা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

কতকগুলি ব্রতকথার মধ্য দিয়া কোন দেবদেবীর উল্লেখের পরিবর্তে নিয়তি বা ললাট-লিপির অবশ্য সম্ভাব্যতার কথা বর্ণিত হইয়া থাকে। অদৃষ্টবাদী সমাজ ইহাদের দ্বারা তাহার নিজের জীবনের শোক-দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করে। ইহাদের মধ্য দিয়া সাধারণ লোক-সমাজের সহজ জীবন-বোধই অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। এই সকল গুণে ব্রতকথাগুলি লোক-সাহিত্যেরই বিশিষ্ট

অঙ্গ, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক রচনার অঙ্গ নহে। যে সকল অসম্ভব বিষয় রূপকথার স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, ব্রতকথায় তাহাদের মূলে দেবতার হস্তক্ষেপের উল্লেখ থাকে মাত্র, এতদ্ব্যতীত রূপকথায় ও ব্রতকথায় আর উল্লেখ-যোগ্য কোনও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রতকথার চরিত্র পরিকল্পনায় বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যের চিত্র নির্দেশ করিতে হইলে কথার প্রধান চরিত্র হইবেন রাজা কিংবা সদাগর এবং দুর্ভাগ্যের চিত্র নির্দেশ করিতে হইলে তাহার প্রধান চরিত্র হইবে বামুন। 'এক বামুন' কথা দুইটির সঙ্গে দারিদ্র্য কথাটি জড়িত; বামুন হইলেই বুঝিতে হইবে তিনি দরিদ্র, এমন কি ভিক্ষুক। কোন কোন ব্রতকথা 'এক ভিক্ষাস্বর (ভিক্ষুক) বামুন' দিয়াই আরম্ভ হয়। রাজা, সদাগর, বামুন ব্যতীত কদাচিৎ আরও একটি চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়—যেমন এক বুড়ী ; বুড়ীও সাধারণতঃ দুর্ভাগ্যেরই অধিকারিণী, পরে বিশেষ কোনও দেব কিংবা দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া সৌভাগ্যের অধিকারিণীও হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ছোট বৌ বা কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ব্রতকথার একটি নিতান্ত সাধারণ চরিত্র। সাধারণতঃ সে লোভী ও অনাচারী হইয়া থাকে, অবশেষে দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়া কেবলমাত্র যে তাহার চরিত্রগত এই সকল দুর্বলতা জয় করে, তাহাই নহে—সর্বাধিক সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়। ইহা লোক-কথা মাত্রেরই একটি সাধারণ বিষয়। তবে ব্রতকথায় এই বিষয়টির উপর একটু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় মাত্র।

ভাবের (idea) দিক দিয়া সকল ব্রতকথায়ই যে সাহিত্যিক মূল্য আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন কোন ব্রতকথায় পুরাণের অনুরূপ দেবমাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে, তবে তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের যে পরিবেশ রচনা হইয়া থাকে, তাহাতে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশটি যথার্থ ই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই দিক দিয়া ইহাদের একটি সাহিত্যিক আবেদন অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়া বাংলার সমাজ-জীবনের যে একটি চিত্র পাওয়া যায়, তাহার মূল্য কি ? ইহা কি আদ্যোপান্ত কল্পনাপ্রসূত, না ইহাদের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে ? ইহাদের মধ্যে রাজার সাত রাণী, সতিনী-বিদ্বেষ ইত্যাদির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, বহু-বিবাহ যে-দিন

এ'সমাজে উৎকট রূপ ধারণ করিয়াছিল, সেই দিন ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে সে'দিন খুব অপরিমিত ছিল, তাহা নহে। গৃহে সতিনীর কণ্টক ছিল বলিয়াই প্রত্যেক নারীই স্বামী-সৌভাগ্যবতী হইবার জন্য কামনা করিত, ইহা অপেক্ষা বড় কামনা তাহাদের আর কিছুই ছিল না। বহু পুত্র সে'দিন সমাজের কাম্য ছিল, সেইজন্য নারী বহুপুত্রবতী হইবার জন্য প্রার্থনা করিত। নারীর এই সকল কামনা কোন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল। অতএব ব্রতকথাগুলির সমাজ-চিত্রের একটি ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যই নহে—প্রাগৈতিহাসিক কিংবা আদিম সমাজের বহু উপকরণ ইহাদের মধ্য দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে নরবলি ও ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magical power)তে বিশ্বাস অন্যতম। অনেক ব্রত কেবল মাত্র ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বৈশাখ মাসে যে কয়টি প্রধান ব্রত উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, যেমন—পুণ্যিপুকুর ব্রত, অশ্বত্থপাতা ব্রত, পৃথিবী ব্রত ইত্যাদি সব কয়টিই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা বৃষ্টিপাত করাইয়া ধরিত্রীর শস্যসম্পদ্ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি হইতে জাত। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, প্রাগৈতিহাসিক কিংবা আদিম সমাজেরও কতকগুলি সংস্কার ব্রতগুলির ভিতর দিয়া পালন করা হয়। অতএব ইহাদের মধ্যে যে সমাজ-চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সমগ্র ভাবে একই সমাজের চিত্র বলিয়া দাবি করা ভুল হয়। ইহাদের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন জীর্ণ ভিত্তির উপর যুগে যুগে নূতন নূতন উপকরণ আসিয়া স্থিতি লাভ করিয়াছে, নূতন উপকরণগুলি ক্রমে পুরাতন হইয়া ইহাদের উপরই পুনরায় নূতনতর উপাদানের স্থান দান করিয়াছে। এইভাবে নূতন ও পুরাতন, অতীত ও বর্তমান ইহাদের মধ্যে একসঙ্গে বাস করিতেছে। অতএব সমগ্র ভাবে ইহাদিগকে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক যুগের সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না।

ধর্মাচার অবলম্বন করিয়া ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে—যে কোন সময় যথেচ্ছভাবে ইহাদিগকে আবৃত্তি করা হয় না। অর্থাৎ ইহারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে একটি আনুষ্ঠানিক (ritual) মূল্য লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে লোক-সাহিত্যের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দোষ এবং

গুণ দুই-ই দেখা দিয়াছে। দোষের দিক দিয়া প্রধানতঃ এই যে, লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে বাস্তব জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইহাদের মধ্যে নাই—ইহাদের বিশেষ একটা রূপ ও ভাব নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বৎসরের একদিন কিংবা মাসের ত্রিশ দিন পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যস্থিত একটি নির্দিষ্ট শ্রোতৃ-সমাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহা কীর্তন ও শ্রবণ করিয়া থাকে। তাহার ফলে ইহাদের সম্পর্কে কাহারও কোন কৌতুহল অনুভূত হয় না, ইহাদিগের সঙ্গে একটা যান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় মাত্র। দেবতার সম্পর্কিত কাহিনী আনুষ্ঠানিক ভাবে আবৃত্তি করা হয় বলিয়া একমাত্র ভাষা ব্যতীত ইহার আর কোন বিষয় তিল মাত্রও পরিবর্তিত হইতে পারে না। অতএব লোক-সাহিত্যের প্রত্যেক বিষয়ের চারিদিক উন্মুক্ত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন উপকরণ যেমন সঞ্চিত হয়, ইহাতে তেমন হয় না। সুতরাং কালক্রমে ইহারা শক্তিহীন হইয়া পড়ে ও পরিণামে লুপ্ত হইয়া যায়। যাহা যুগোচিত পরিবর্তন স্বীকার করে না, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না; সেইজন্য ব্রতকথাগুলি বর্তমানে এই পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে। আধুনিক যুগের নারীসমাজের মধ্যেও ইহাদের পরিচয় নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

আনুষ্ঠানিক (ritual) জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার ফলে ব্রতকথার একটি গুণও প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাদের একটি রূপ নির্দিষ্ট হইয়া যাইবার পর ইহাদের মধ্যে বাহির হইতে যে আর কোন উপকরণ প্রবেশ করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক দিক দিয়া ইহার তথ্যগুলি একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত আসিয়া সংহতি লাভ করিয়াছে—চারিদিক দিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে নাই। সেইজন্য যে-যুগে ইহারা এই রূপ লাভ করিয়াছে, সেই যুগটির যদি আমরা নির্ভুল সন্ধান করিতে পারি, তবে ইহাদের মধ্য হইতেও ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। অন্য কোনও লোক-কথায় এই গুণটি প্রকাশ পাইতে পারে নাই—তাহাদের মধ্য হইতে কোন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা যায় না।

একান্ত ভাবে ব্রতাচার অবলম্বন করিয়া ব্রতকথার বিকাশ হইয়াছে বলিয়া ইহা একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে—ইহারা অবিলম্বে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সে সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধাঁধা

আধুনিক লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণ ধাঁধাকেও লোক-সাহিত্যের একটি স্বাধীন অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। ইহার বহিরঙ্গ পরিচয়টি সংক্ষিপ্ত হইলেও সরস, অন্তর্নিহিত পরিচয়টি অপ্রত্যক্ষ হইলেও বুদ্ধিগম্য। লোক-সাহিত্যে ইহার স্থান সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন, 'Contrary to common assumption that they are mere word puzzles proposed by punsters at evening parties, riddles rank with myths, fables, folktales, and proverbs as one of the earliest and most widespread types of formulated thought'[১]। কেহ কেহ মনে করেন, ধাঁধা লোক-সাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয়; কিন্তু এই মত সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ, ধাঁধার মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং চিন্তার যে অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত আদিম জাতি-সুলভ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ধাঁধার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কেহ কেহ এমনও মনে করিয়া থাকেন যে, ইহা 'presupposes a command of language, a mastery of thought and a powerful sense of rhythm.'[২] কারণ, ইহার মধ্যে একটি মাত্র ভাব রূপকের সাহায্যে এবং জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে; এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া অসাধ্য না হইলেও সহজসাধ্য নহে—তবে ইহাদের মীমাংসা সমূহ কেবল মাত্র জনশ্রুতিমূলক বলিয়াই অপরিণত বয়স্ক বালক-বালিকাগণও ইহাদের জবাব দিতে পারে, নতুবা ইহাদের প্রত্যেকটি ইঙ্গিতের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া ইহাদের মীমাংসা করা পরিণত-বুদ্ধি মানবের পক্ষেও অনেক সময় অসম্ভব হইত। অতএব ইহাদের মধ্য দিয়া পরিণত শিল্প ও রসবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায়, কোনও অপরিণত-বুদ্ধি সমাজের শিল্প ও

১ C. F. Potter, *SDFML.*, op. cit. p. 938.

২ Durga Bhagwat. 'The Riddles of Death.' *Man in India*, XXIII (1943), p. 342.

রসসৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য প্রকৃত আদিম সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে ইহাদের উদ্ভব হয় নাই। যে সকল আদিম জাতির মধ্যে ধাঁধার ব্যবহার আছে, তাহারা উন্নততর জাতির নিকট হইতেই তাহা গ্রহণ করিয়াছে; কারণ, পৃথিবীর বহু আদিম জাতির মধ্যেই ধাঁধার প্রচলন নাই; সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীর মধ্যে ধাঁধা অজ্ঞাত।[১] কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের কোন আদিবাসী সমাজ ইহা তাহার সামাজিক প্রথার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছে—ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতির বিবাহোপলক্ষে বর ও কন্যাপক্ষ পরস্পর পরস্পরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে।

ধাঁধার ভিতর দিয়া যে কেবল পরিণত শিল্পমন ও রসবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা নহে—ইহার ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বুদ্ধির অনুশীলন কিংবা জ্ঞানের চর্চ্চা ইহার চরম লক্ষ্য নহে, ইহার চরম লক্ষ্য নির্মল হাস্যরসসৃষ্টি; তবে বুদ্ধির অনুশীলন বা লৌকিক জ্ঞানের চর্চা ইহার উপলক্ষ মাত্র হইতে পারে। ধাঁধার মধ্য দিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াই হাস্যরস সৃষ্টি হইতে পারে। তবে জীবনের যে সকল উপকরণ নিতান্ত পরিচিত ও একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাই ইহার প্রধান অবলম্বন। ঘরের ভিতরকার উনুন, শিল নোড়া, ছাতা, লাঠি, হুঁকা, খাট, বিছানা ইত্যাদি যেমন ইহার অবলম্বন, তেমনিই প্রকৃতির নিত্য-পরিচিত উপকরণ, যেমন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ ইহারাও ইহার লক্ষ্য হইয়া থাকে। দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া প্রকৃত মীমাংসাটি একটি সুচতুর বর্ণনা দ্বারা গোপন করিয়া দেওয়া হয়। এই বর্ণনার রঙ্গীন জালটি উন্মোচন করিয়া দিলেই প্রকৃত মীমাংসাটির সঙ্গে সহসা মুখোমুখী হওয়া যায়—একটি পরিচিত অথচ গোপন বস্তুর সঙ্গে আকস্মিক মুখোমুখী হইয়া যাইবার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হাস্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে; প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেহই ভাবিয়া কিংবা চিন্তা করিয়া ইহাদের মীমাংসা করে না, ইহাদের মীমাংসাগুলি ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই জনশ্রুতির ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে; তবে এই

১ F. Boas, *General Anthropology* (New York, 1938), p.598.

প্রচারের মধ্যে দিয়া জিজ্ঞাসাগুলি প্রকাশ্যভাবে থাকে এবং ইহাদের মীমাংসাগুলি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে মাত্র। প্রশ্নকর্ত্তা স্বভাবতঃই মীমাংসাগুলি গোপন রাখিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে। যাহার বিশেষ একটি মীমাংসা পূর্ব হইতেই জানা আছে, সে ধাঁধাটি শুনিবামাত্র তাহার পরিচিত উত্তরটি বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিয়া দেয়। ইহাতে প্রশ্নকর্ত্তা অপ্রতিভ হইয়া নূতন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু যাহার উক্ত মীমাংসাটি পূর্ব্ব হইতে জানা না থাকে, সে প্রশ্নটি শুনিবামাত্র তাহা লইয়া ভাবিতে আরম্ভ করে, কিন্তু এই ভাবনা তাহার স্মৃতি সম্পর্কিত, স্বাধীন-বিশ্লেষণ সম্পর্কিত নহে; অর্থাৎ ধাঁধাটি শুনিবামাত্র কোনদিন ইহা সে পূর্বে শুনিয়াছে কি না, শুনিয়া থাকিলে ইহার কি মীমাংসার কথা শুনিয়াছিল, ইহাই ভাবিয়া সে স্মৃতির রাজ্যে হাতড়াইতে আরম্ভ করে—ধাঁধাটি বিচার করিতে বসে না; কারণ, মীমাংসাগুলি জনশ্রুতি-মূলক বলিয়া ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও রসবিচার দ্বারা তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিয়া সাধারণতঃ কিছুই স্থির করা যায় না। এমন কি, যদি কিছু করাও যায়, তবে তাহা জনশ্রুতিমূলক (traditional) মীমাংসাটি হইতে যদি স্বতন্ত্র হয় তবে গৃহীত হয় না। যেমন,

বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।—(২৪ পরগণা)

২৪ পরগণা অঞ্চলে ইহার একটি মাত্র মীমাংসা আছে, তাহা আনারস—আনারস ব্যতীত অন্য কোন টিয়া পাখীর মত হরিদ্বর্ণ স্বর্ণকিরীটী বনজ বস্তু বুঝাইবে না; বুঝাইলেও এই ব্যাখ্যা গৃহীত হইবে না। কারণ, এখানে জনশ্রুতিমূলক মীমাংসাটিই চাই। অতএব উত্তরটি জানা না থাকিলে কেবল মাত্র স্মৃতির দ্বারে করাঘাত করিয়া ইহার সম্বন্ধে পূর্বস্মৃতি জাগরূক করা যাইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ভাবিয়া কিংবা চিন্তা করিয়া এ' সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায় না। ইহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, ইহাদের মধ্যে যে দুইটি বস্তুর সামঞ্জস্য নির্দেশ করা হয়, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন মীমাংসাটিকে যে বহিরঙ্গ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহা নিখুঁত বস্তুধর্মী (realistic) নহে। অর্থাৎ বহিরঙ্গ বিশ্লেষণটি যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা খুঁটিনাটি করিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতই যে প্রচলিত মীমাংসাটিতে পৌঁছিতে পারা যাইবে, তাহা নহে—অথচ এই সম্পর্কে কেহ

কোন তর্ক করে না, জনশ্রুতিমূলক মীমাংসাটিই সকলে বিনা তর্কে মানিয়া লয়। এই সম্পর্কে উদ্ধৃত ধাঁধাটির কথাই ধরা যাউক। আনারসকে একটি টিয়া পাখীর তুল্য বলিয়া মনে করা হইয়াছে। টিয়া পাখীর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার একটি রঙিন ঠোঁট থাকে। এখন এখানে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, কাঁচা পুষ্ট আনারসকে না হয় টিয়া পাখীর সঙ্গেই তুলনা করিলাম এবং ইহার শীর্ষস্থ সকণ্টক পত্রগুচ্ছকে না হয় এখানে সোনার টোপর বলিয়া মানিয়া লইলাম, কিন্তু ইহার সুন্দর রঙিন ঠোঁটটি কোন্ জিনিস দিয়া ব্যাখ্যা করিব? এই প্রশ্ন এখানে কেহই তুলিবে না। ইহার মীমাংসা আনারস, ইহার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে যাইবে না, বলিলেও কেহ শুনিবে না, ইহাই ধাঁধার নির্দেশ। পাবনা জিলায় ইহার ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়, কলার থোড় বা মোচা—ইহা দ্বারা টোপরের ভাবটি স্পষ্টতর হয়; কিন্তু পাবনার নজীর ২৪ পরগণায় চলিবে না, ২৪ পরগণার নজীর পাবনায় চলিবে না; যেখানে মীমাংসাটি যেমন প্রচলিত আছে, সেখানে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নিয়ন্ত্রিত না করিলে ইহার রস উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। অতএব একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর যে এখানে সাদৃশ্য নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা বস্তু ও কল্পজগৎ মিশ্র, কতকটা বাস্তব এবং কতকটা কল্পিত—ইহাদের মধ্যে আনুপূর্বিক বস্তু-সাদৃশ্যের সন্ধান করা নিষ্ফল। ইহা লইয়া তর্ক তুলিলেও উত্তরদাতা কেবলই বলিবে, কেন ইহার মীমাংসা যে এইরূপ হইল, তাহা জানি না—তবে ইহার মীমাংসা যে এই, কেবল মাত্র ইহাই জানি। জনশ্রুতির সঙ্গে পরিচয় গৌণ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আধুনিক শিক্ষিত মনের নিকট ধাঁধার কোন আবেদনই নাই; যে পথে ইহাদের ব্যাখ্যা হইতে পারে, সে পথ তাহার অপরিচিত বলিয়া সে যেমন ইহার মীমাংসা করিতে পারে না, তেমনই ইহাদের কোন রসও উপলব্ধি করিতে পারে না।

ধাঁধার ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন; প্রত্যেক দেশের প্রাচীন সাহিত্যেই ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, লোক-সংস্কৃতির স্তর হইতে গিয়া ইহা প্রাচীন সাহিত্যেরও (classics) অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

১ ঋগ্বেদ ১.১৬৪; ৮.২৯; ১০.১৭৭ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত বেদবাণী (১৩৩০) নামক গ্রন্থে ইহাদের একটি সূক্ত বাংলায় অনূদিত হইয়াছে (পৃঃ ২৬৭)।

অনেক সময় প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত এই প্রকার ধাঁধা সমূহ লোক-সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়া ক্রমে জনশ্রুতিমূলক সাহিত্যের ধারায় নিজেদের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যায়। এই ভাবে সাহিত্য ও লোক-শ্রুতি উভয়ের মধ্যেই ইহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

বৈদিক ও ইহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগের যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব বধ করিবার পূর্বে হোতৃ ও ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতেন—ইহাতে আর কেহ অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্রই এই ধাঁধাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মহাভারতের মধ্যে বকরূপী ধর্ম পঞ্চপাণ্ডবকে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই পরিচিত। সোমদেবের 'কথা-সরিৎ-সাগরে'র মধ্যে এক রাজকন্যা যে কি ভাবে বিনীতমতি নামক এক রাজার জিজ্ঞাসিত ধাঁধার উত্তর দিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লিখিত আছে।[১] রাজা বিনীতমতি এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ধাঁধার উত্তর দিতে না পারিয়া পরে নিজে যে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্তও ইহার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা বিক্রমাদিত্য সম্পর্কিত কাহিনীতেও ধাঁধার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। তবে সংস্কৃত কথাসাহিত্যের ধাঁধা প্রধানতঃ সুদীর্ঘ কাহিনীর আকারেই পরিবেশন করা হইয়াছে, সংক্ষিপ্ত শ্লোকাকারে ইহাদের ব্যবহার অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

ধাঁধার ব্যবহার কেবল মাত্র যে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই প্রাচীন ও লৌকিক সাহিত্যে ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, একটি ধাঁধার উত্তর বলিতে অসামর্থ্যের জন্য গ্রীক্‌দেশের প্রাচীন কবি হোমরকে মৃত্যুদণ্ড বরণ করিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয়ান্‌দিগের প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক বাইবেলের মধ্যেও যে স্যাম্‌সন্‌কে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহা সকলেরই সুপরিচিত। বাইবেলে এই প্রকার আরও বহু ধাঁধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। তাহাতে ধাঁধা কেবল মাত্র কৌতুকের বিষয় ছিল না, ইহা দ্বারা বুদ্ধির

১ N. M. Penzer, *The Ocean of Story* (London , 1926) Vol. VI, pp. 74f.

বিচার (intelligence test) করা হইত এবং ইহার উপরই উত্তরদাতার ভাগ্যাভাগ্য নির্ভর করিত। মহাভারতের বকরূপী ধর্মের পঞ্চপাণ্ডবকে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার কথা আছে, প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যেও প্রায় অনুরূপ কাহিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ছদ্মবেশিনী রাক্ষসী ফিংক্স্ (Sphinx) পথিপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পথিককে এক দুরূহ ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিত। পথিক উত্তর দিতে পারিত না, অবশেষে রাক্ষসী তাহাকে বিনাশ করিত। অবশেষে ওডিপাস সেই ধাঁধার উত্তর দিয়া রাক্ষসীর কবল হইতে রাজ্য পরিত্রাণ করিলেন। দুরূহ ধাঁধার মীমাংসা করিয়া দিয়া রাজকন্যা সহ অর্ধেক রাজত্ব লাভের কাহিনী ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যেও বিরল নহে (motif H 551)। এই বিষয়টি ভারতীয় কথা-সাহিত্য হইতেই ইউরোপ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর কোন কোন আদিম জাতির বাৎসরিক কোন কোন অনুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সেইজন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ধাঁধা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন; বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিলে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে কোন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। আবার কেহ মনে করিয়াছেন, আদিম জাতির কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন বিষয়ের বর্ণনা করা নিষিদ্ধ ছিল; অতএব সেই বিষয়টি ধাঁধায় পরোক্ষ ভাবে ব্যক্ত করা হইত; তাহা হইতেই ধাঁধা জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার রীতির উদ্ভব হইয়াছে। কেবল মাত্র কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত ও সমাজ-জীবনের আনুষ্ঠানিক কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার উদ্দেশে ভারতীয় আদিম জাতির মধ্যেও ধাঁধা বলিবার রীতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।[১] কিন্তু কি ভাবে যে এই রীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। প্রহেলিকার উদ্ভব প্রহেলিকাতেই আচ্ছন্ন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধাঁধা বা হেঁয়ালীতে পরিপূর্ণ। এই হেঁয়ালী নানা প্রকারের হইত। প্রথমতঃ তত্ত্ববিষয়ক। অনেক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা হেঁয়ালীর ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইত। এই সকল হেঁয়ালী গুরু শিষ্যের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন—বাহির হইতে অন্য কেহ

১ **Durga Bhagwat op. cit. pp. 842-46**

তাহা বুঝিতে পারিত না। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'বৌদ্ধগান ও দোহা' হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা প্রায় এক হাজার বছরের প্রাচীন—

দুহি দুহি পীঢ়া ধরন ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই॥
আঙ্গন ঘর পণ স্থন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতি॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগই॥
দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই॥
অইসন চর্যা কুক্কুরীপাত্রঁ গাইল।
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহি সমাইল॥—চর্য্যা[১]

আধুনিক বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ করিলে ইহা এই প্রকার দাঁড়াইবে—

কচ্ছপী দুহিয়া ভাঁড়ে ধরা না যায়,
গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।
আঙ্গন ঘরের কাছে শোন রে বাদ্যকরী!
নেকড়া চোরে নিল আধরাতে।
শ্বশুর নিদ্রা গেল, বউড়ী জাগে,
নেকড়া চোরে নিল, কি গিয়া মাগে।
দিবসে বউড়ী কাক হইতে ডর ভাবে,
রাতি হইলে কামরূপ যায়।
এহেন চর্যা কুক্কুরীপায়ে গাইল,
কোটি মাঝে এক হিয়ায় সামাইল।

ইহার ভণিতা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহার রচয়িতা এই বলিয়া গর্ব অনুভব করিতেছেন যে, ইহা কোটির মধ্যে একজন মাত্র বুঝিতে পারিবে। এই শ্রেণীর হেঁয়ালী যতই দুর্বোধ্য হইত, ততই মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইত। তবে তত্ত্ব-প্রচারের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহা কদাচ সাধারণ রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিত না। হেঁয়ালীর ভিতর দিয়া তত্ত্বপ্রচার

করিবার ধারাটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত নাথ-সাহিত্য পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র মধ্যেও এই শ্রেণীর হেঁয়ালীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়।

মধ্যযুগের বাংলায় আর এক শ্রেণীর ধাঁধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, তাহাদিগকে সাহিত্যিক ধাঁধা (literary riddle) বলা হয়। লৌকিক ধাঁধার সঙ্গে ইহার এই পার্থক্য যে, লৌকিক মন (popular mind) হইতে মূলতঃ উৎপন্ন হইলেও ইহারা একটি সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়াই ইহাদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক স্তর হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিলেও মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁহাদের রচনা-শক্তি অনুযায়ী ইহাদের বহিরঙ্গে একটি পরিণত সাহিত্যিক রূপ দিয়া লইয়াছেন। লোক-সমাজের নিকট ইহার এই নূতন রূপটি আনুপূর্বিক পরিচিত না হইলেও, ইহার মীমাংসাটি অজ্ঞাত নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে যে কয়টি এই শ্রেণীর ধাঁধার উল্লেখ আছে, তাহাদের সব কয়টিই এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য। ইহারা যে কেবল প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন, তাহাই নহে,—ইহাদের মধ্য দিয়া যে রসসৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এ'দেশের ধাঁধাগুলির সর্বকালীন বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' বর্ণিত আছে যে, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন এক শুকপক্ষী ব্যাধ কর্তৃক ধৃত হইয়া ইহার নির্দেশ মত রাজসভায় আনীত হইলে, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া রাজাকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সভাস্থ পণ্ডিতগণ তাহাদের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। ধাঁধাগুলি এই—

বিধাতা নির্মাণ ঘরে নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার সৃজন্ ঘর করে খান্ খান্॥ (ডিম্ব)
মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান্।
অপরাধ বিনে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার কখন না যায়।
অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায়॥ (ধান)

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছ পল্লব নয় কিন্তু অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।
মুর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ (পাখী)
বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া গা॥
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি॥ (ঘুড়ি)
শিরঃ স্থানে নিবসে পুরের দুই সার।
ভাল মন্দ সভাকার করয়ে বিচার॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তায় মুখে দিয়ে কালি॥ (চক্ষু)
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন॥ (দাবানল)
তৃষ্ণায় আকুল সেই জল খাইলে মরে।
স্নেহ নাহি করিলে তিলেক নাহি তরে॥
উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥ (প্রদীপ)
মৎস্য মকর নহে পানী পানী বুলে।
হাঙ্গর কুম্ভীর নহে দেখিলে সে গিলে॥
গিলিয়া উগারে সেই দেখে জগজন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন॥ (নৌকা)
দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়॥
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভামাঝে বৈসে॥ (উনুন)

জীয়ন্তে মৌন সেই মৈলে ভাল ডাকে।
গায়েতে নাইক ছাল বিধির বিপাকে॥
সেবা করিয়া থাকে দেবতার স্থানে।
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে॥ (শাঁখ)
বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী।
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী॥
বুঝিয়া চলিয়া বার্ত্তা দেয় আসি কানে।
বীরের কিঙ্কর নহে বুঝহ সিয়ানে॥ (মশা)
কমল জিনিয়া তার দেহের বরণ।
চরণ অনেক ধরে গজেন্দ্র গমন॥
বুঝহ পণ্ডিত তার শয়ন কুণ্ডলী।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে অদ্ভুত হিঁয়ালী॥ (কেন্নাই, কেরা)
রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীবন কালে পৃথক্ মরণে এক ঠাঁই॥
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে॥ (পাশার গুটি)
চক্ষু আছে মুখ আছে নাহি তার পা।
সভাকার হাথে থাকে কৃষ্ণবর্ণ গা॥
শিরের উপর থাকি করয়ে আহার।
শ্রীকবিকঙ্কন ভণে হিঁয়ালীর সার॥ (হুঁকা)
যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন।
ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে ঘন ঘন॥
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম খায় মুখে॥ (হুঁকা)
বৃক্ষ-অগ্রে বৈসে সেই নহে পক্ষজাতি॥
ত্রিলোচন জটাভার নহে পশুপতি॥
নদনদী নয় তার অঙ্গময় কায়।
রক্তমাংসে জড়িত নয় নারি বলয়॥ (নারিকেল)

এক বর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিঁয়ালী রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বান্ধেন পণ্ডিত॥ (পুঁথি)
এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর।
এক নাম ধরে সেই দুই কলেবর॥
প্রবল জীবন সেই না ধরে জীবন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (নাক)
দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী।
ধর ধর নহে সেই বরিষয়ে পানী॥ (মেঘ)
আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল।
মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল॥
মারিলে মধুর বোলে নহে সাধুজন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্গণ॥ (ইক্ষু)
জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ।
দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ॥
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালীর সার॥ (উকুন)

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শাখা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের মধ্যেও অনুরূপ হেঁয়ালী জিজ্ঞাসার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। তবে তাহার পরিবেশটি একটু স্বতন্ত্র। সেখানে সুরিক্ষা নাম্নী এক ঐশ্বর্যশালিনী গণিকা কাব্যের নায়ক লাউসেনকে বন্দী করিয়া তাহার মুক্তির সর্তস্বরূপ কতকগুলি হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিতেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে ব্যবহৃত এই হেঁয়ালীগুলির সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত হেঁয়ালীগুলি তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রসের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

কটীতে ঘাঘর ঘন ঝুনুঝুনু বাজে।
কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে॥
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা।
আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা॥
বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
জনেক পুরুষ তার জটে ধরে টানে॥
সুরিক্ষা কহেন, কহ হেঁয়ালীর সন্ধি।
বিরল বাটে বন পালা'ল জলজন্তু বন্দী॥ (ধীবরের জাল)
অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ।
যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ॥
গৃহস্থ জনার মৃত্যু গৃহসাঙ্গ হ'লে॥ (গুটি পোকা)
কমলে কমল-রিপু জন্ম লয়ে উঠে।
দেবতার মাথার মুকুটে বৈসে ছুটে॥ (অর্ধচন্দ্র)
যার গর্ভে জন্ম লয়' নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া॥
বাসি না সম্বল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ॥
সবার যে হিত করে নয় দুষ্ট ঠক॥ (অগ্নি)
সুরিক্ষা কহেন, শুন পুনঃ ওহে রায়।
না খাইলে শান্ত হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে।
খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি ডাকে॥
পেট ভরে বমন করে গুঁজে নাকে মুখে।
নারীগুলা গলায় গেলায় বসে বুকে॥
যদি তায় নাহি খায় করয়ে প্রহার॥ (চরকা)
নাস্তি মুখ মস্তকাদি নাস্তি হস্ত পা।
নাস্তি তু আকার ভূমে নাস্তি বাপ মা॥
নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে আহার করে মনুষ্যের রক্ত॥ (চিন্তানল)

খায় সে সহস্রমুখে পাক নাহি পায়।
উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায়॥
তায় প্রহারের ঘায় পরিত্রাহি ডাকে।
আহার উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে॥ (মাকু)

মধ্যযুগের বাংলার সমাজে ধাঁধার একটি আচারগত মূল্য ছিল। ভারতবর্ষের কোনও কোনও উপজাতির মধ্যে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধাঁধা ইহাদের বিবাহাচারের অন্তর্ভুক্ত। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির বিবাহাচারে দেখিতে পাওয়া যায়, বরপক্ষ যখন কন্যাপক্ষীয়দিগের গ্রামে প্রবেশ করিতে যায়, তখন কন্যাপক্ষীয় লোকজন তাহাদিগকে কয়েকটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে—তাহাদের জিজ্ঞাসিত ধাঁধাগুলির উত্তর দিয়া তাহারা কন্যাপক্ষীয়ের গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করে। অবশ্য বর্তমানে এই আচারটি যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হইয়া থাকে, তাহা নহে—উপজাতির সমাজে একদিকে খৃষ্টান ধর্ম ও অন্য দিক দিয়া হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ ইহাদের অন্যান্য আচারের মত ইহার মধ্যেও শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ইহা একদিন এই জাতির একটি অবশ্য পালনীয় বিবাহাচার ছিল। বাংলা দেশেও বিশেষতঃ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বাউরী জাতির মধ্যে এই আচারটির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও আদিম জাতির প্রভাব বশতঃই যে বাউরীদিগের সমাজে এই প্রথা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাংলা দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজেও যে অনুরূপ প্রথা একদিন প্রচলিত ছিল সম্প্রতি তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও কলিকাতার কোনও কোনও পরিবারে বিবাহকালীন কন্যাপক্ষের গৃহে বরযাত্রিগণ সমবেত হইলে কন্যাপক্ষীয় লোকজন তাহাদিগকে নানাপ্রকার ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিত। আপাতদৃষ্টিতে কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু উপরে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতির বিবাহাচারের অন্তর্ভুক্ত অনুরূপ যে প্রথার উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মাত্র কৌতুকসৃষ্টিই ইহার উদ্দেশ্য ছিল না—ইহা সুগভীর সামাজিক তাৎপর্যমূলক, ইহা একদিন অনুরূপভাবে বাঙ্গালী হিন্দুরও বিবাহাচারের অন্তর্ভুক্ত প্রথা ছিল—ইহার নিজস্ব সামাজিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহা নাগরিক জীবনের

মধ্যে ইহার মৌলিক লক্ষ্য হইতে স্বভাবতঃই ভ্রষ্ট হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জিলার আমতা গ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চলে রচিত একটি 'শিবমঙ্গল' কাব্য হইতে এই রীতিটি বাংলার উচ্চতর হিন্দুসমাজেও যে কত ব্যাপক ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এখানে ওরাওঁ জাতির সমাজে যেমন এখনও কন্যাপক্ষীয়গণ বরযাত্রীদিগকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপে বাসর গৃহে নারীগণ বরযাত্রীদিগের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং বরকেই ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, ইহা একই প্রথার বিভিন্ন রূপ মাত্র—ইহাদের মধ্য হইতেও এ'কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মূলতঃ ইহা ওরাওঁ জাতির বিবাহাচারের অন্তর্ভুক্ত প্রথার মতই একটি অবশ্য পালনীয় প্রথা ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি রামকৃষ্ণ রায় রচিত 'শিবায়ন' বা 'শিব-মঙ্গল' নামক কাব্যে শিবের বিবাহ-বর্ণনা উপলক্ষ্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঋষিপত্নীগণ বাসর-গৃহে শিবকে আটটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,[১]

যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ।
গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন॥
নারী সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রী জাতি।
শস্য উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি॥
হর, বুঝ প্রহেলিকা, হর, বুঝ প্রহেলিকা॥
জিজ্ঞাসে তোমারে এক-পাটলা বালিকা॥ধ্রু॥১॥ (নারিকেল)
একরূপে দুই ভাই বৈসে দুই দেশে।
চিনা পরিচয় নাই জন্মের বয়সে॥
ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে।
দেখাদেখি নাঞি মাত্র থাকে কাছে কাছে॥
তুমি বুঝহ হেঁয়ালী তুমি বুঝহ হেঁয়ালী।
একপর্ণা বলে নহে দিব হাত-তালি॥ ধ্রু॥ (চক্ষু)

১ রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, শিবায়ন, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃঃ ১৭৬-১৪৯

ডিম্ব নাঞ্রি ফুটে মাত্র বারিয়াছে পাখা।
ডিম্বের ভিতরে তার শিশু যায় দেখা ॥
দেখিল অপূর্ব ডিম্ব অনুক্ষণ উড়ে।
সতত চঞ্চল মাত্র ঠাঁঞ্রি নাঞ্রি ছাড়ে ॥
বলেন ভৃগুর রমণী বলেন ভৃগুর রমণী।
একটি ফলইয়ে আমি একমাস জিনি ॥ ধ্রু ॥ (চক্ষু)
একত্রে বসতি করে দুই সহোদর।
মাথায় টোপর পরে নহে তারা বর ॥
রাজ নহে তভু না চাইতে পায় কর।
বল দেখি হর তার কোন্ দেশে ঘর ॥
ইহা বলেন অদিতি ইহা বলেন অদিতি।
বুঝিতে নারিবে তুমি নামে পশুপতি ॥ ধ্রু। (পয়োধর ॥)
দ্বিজ নাম ধরে সেই নহে ত ব্রাহ্মণ।
অনুক্ষণ থাকে অঙ্গে দিয়া আচ্ছাদন ॥
রসনা বাজায় নাই অন্য আভরণ।
পরশ করিলে তাহে চাহি আচমন ॥
তুমি ধুস্তর বিভোলা তুমি ধুস্তর বিভোলা।
ক্ষেমা বলে হর তুমি পড় স্ত্রী-কলা ॥ ধ্রু ॥ (পক্ষী)
তারা বলে হারা হৈল চাহিয়া বুলি শীল।
দেশে না কিনিতে পাই পর্বতে দুর্মিল ॥
বাপ হেন জনে যদি পাইয়া গতাই।
চাহিবার কালে তাহা কভু নাহি পাই ॥
যদি না পার বলিতে যদি না পার বলিতে।
তবে আজি না চাহিবে পার্বতীর ভীতে ॥ ধ্রু ॥ (করকা)
অপূর্ব জালিয়ার জাল না পরশে জল।
বৃক্ষের উপরে নাম্বে নহে ফুল ফল ॥
দেবতার প্রীতি তাহে পাইতে দুরাপ।
রস মধ্যে ক্ষার নহে লবণের বাপ ॥
স্বাহার প্রহেলী স্বাহার প্রহেলী।
উত্তর না দিয়া তুমি না করিবে কেলি ॥ ধ্রু ॥ (মধু)

কালধল দুই পক্ষে নহে কাক হাঁস।
আট হাজার লক্ষ পণ, জড় কৈলে মাস ॥
পালিবে যে দুই পক্ষ কর অঙ্গীকার।
রোহিণী বলেন তবে করিবে বেহার ॥
হর, জান প্রহেলিকা, হর, জান প্রহেলিকা।
নহে পুষ্প দেহ যুতি মালতী মল্লিকা ॥ (চন্দ্র)

সাধারণতঃ ধাঁধার উত্তর দিবার যে নিয়ম অর্থাৎ সোজাসুজি ইহার অর্থটি এক কথায় বলিয়া দেওয়া সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিব ধাঁধাগুলির উত্তর দিলেন না। শিব সাধারণ মনুষ্য নহেন, সুতরাং লৌকিক প্রথা তিনি অনুসরণ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা ধাঁধাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বিদগ্ধা রমণী, অতএব প্রত্যক্ষ জবাব পাইয়া তাহাদেরও মনস্তুষ্টি হইতে পারে না ; সেইজন্য শিব প্রহেলিকার অনুরূপ রচনা দ্বারা ইহাদের উত্তর দিতেছেন। ধাঁধার উত্তর দিবার এই প্রণালীটি নিতান্ত অভিনব—বাংলার সাহিত্যিক কিংবা মৌখিক ধাঁধা ইহাদের কাহারও রচনার ক্ষেত্রেই অনুরূপ আর দ্বিতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং ধাঁধার উত্তর দিবার এই প্রণালীটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল—

এত প্রগল্‌ভতা যদি কৈল বামাগণ।
মন্দ মন্দ হাসি হর বলেন বচন ॥
শুন চিত্রকণ্ঠী ভাল বলিলে বচন।
তোমার গর্হণ বাক্য আমার চন্দন ॥
সফরী চঞ্চল চক্ষু বহ তুমি সভে।
বক প্রায় মোর চিত্ত হৈয়া গেল লোভে ॥
শুন এক-পাটলা তোমার প্রহেলিকা।
নাম কহিয়া দিলে দিবে কুমুদ-কলিকা ॥
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত।
তৃতীয় অক্ষরে তার কর ইকারান্ত ॥
সেই ত বৃক্ষের ফল শুনগ সুন্দরী।
শুন কহি এবে একপর্ণার হেঁয়ালী ॥

দুই ভাই দেখাদেখি নাঞি যেই হেতু।
আড়াল করিয়া তার মধ্যে আছে সেতু॥
আজ্ঞা যদি কর কাটিয়া ফেলি আলি।
দুই ভায়ে দেখাদেখি হয় আজিকালি।
শুন গ ধাতার মাতা ভৃগুর রমণী।
রসে বড় রসিকা বয়সে কাত্যায়নী॥
তোমার ফলইয়ে বিদগ্ধের বুদ্ধি টুটে।
পাখ বারিয়ায় আগে ডিম্ব নাঞি ফুটে॥
শুনিতে আশ্চর্য্য গ আদেশ যদি পাই।
শলকার আগ দিয়া সে ডিম্ব ফুটাই॥
শুন কশ্যপের প্রিয়া আমার উত্তর।
রাজা নহে কর লএ সেই যে বর্বর॥
ইঙ্গিত করহ যদি ঘর আমি জানি।
কর-প্রহার করিয়া ধরিয়া তারে আনি॥
ধর্ম পত্নী ক্ষমা তোমার ফলই বিচিত্র।
কোন শাস্ত্রে নাঞি শুনি দ্বিজ অপবিত্র॥
উপেক্ষা করিল সেই দ্বিজে দ্বিজরাজ।
হাসিতে রোহিণীকান্তে হব বড় লাজ॥
শুন তারাবতী তুমি বড়ই চতুরা।
গড়াইলে না পায় শীল থুইলে হয় হারা॥
বৃত্তির কারক তুমি উলটিয়া পড়।
পাইবে তাহার নাম কহিলাম দড়॥
স্বাহার হেঁয়ালী ছয় রস মধ্যে মিষ্ট।
কৈটভের জ্যেষ্ঠ ভাই মাসের কনিষ্ঠ॥
সতীর কাহিনী শুন রোহিণী সুন্দরী।
পক্ষ পালিবারে আমি সত্য নাঞি করি॥
তোমার সাধনে আমি পালিব পক্ষিণী।
হেঁয়ালীর প্রত্যুত্তর দিলা শূলপাণি॥

শুন ঋদ্ধি, আয়তি, নিয়তি তিন জনি।
কলিকা বিকশে শুনি ভ্রমরের ধ্বনি।
কমল কোড়ক যেন রবির ময়ূখে।
জলের ভিতর হৈতে উঠে উর্দ্ধমুখে॥
শুন স্বধা আই তুমি বৈদগ্ধ্যে অধিকা।
সতী সহোদরা তুমি বড়ই রসিকা॥
জিজ্ঞাসা করিলে পঞ্চফলের কি মূল্য।
বিস্তার করিয়া তাহা কহিতে বাহুল্য॥
রামকৃষ্ণ দাস গায় শিবায়ন গীত।
সেই তারে অমূল্য জথিতে যার প্রীত॥

উদ্ধৃত ধাঁধাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এক একটি সুপরিণত রসরূপের ভিতর দিয়া জিজ্ঞাসাগুলি এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে। অনেক সময় কোন কোন বাক্যের বিশেষার্থের উপর ইহাদের মীমাংসা নির্ভর করিয়াছে; এই সকল বিশেষার্থ সম্পর্কে অধিকার লাভ করিতে হইলে যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা সাধারণ লোক-সমাজের মধ্যে আশা করা যায় না। সেইজন্য ইহাদিগকে সাহিত্যিক (literary) ধাঁধা বলা হয়। কিন্তু সাহিত্যিক ধাঁধা হইলেও ইহাদের বিষয়গুলি যেমন জনশ্রুতি হইতে গৃহীত, তেমনই ইহাদের রচনা সম্পর্কিতও এক একটি মৌলিক জনশ্রুতিমূলক ভিত্তি আছে। সেই লৌকিক (folk) ধাঁধার ভিত্তির উপরই ব্যক্তিবিশেষ রং ও কারুকার্য করিয়া এইভাবে নূতন এক একটি সাহিত্যিক ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌকিক ধাঁধা (folk riddle)র মধ্যে যে বিষয়টি আরও সহজ কথায় সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, সাহিত্যিক ধাঁধায় তাহাই বিচিত্র রূপ ও অলঙ্কারের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয় মাত্র। বিষয়টি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে বুঝিতে সহজ হইবে। ডিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রায় প্রত্যেক দেশের লোক-সমাজেই বিস্ময় ও কৌতুক বোধের সৃষ্টি করিয়াছে; অতএব ইহার বিষয়ে আদিম ও সভ্য বহুজাতির মধ্যেই ধাঁধার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক ধাঁধা এই প্রকার—

একটুখানি ঘরে, চুণকাম করে।— (২৪ পরগণা)

জন্ম যখন পাই, (আমার) নড়া চড়া নাই।— (বীরভূম)

হায় তমমুজ, করি কি ?
বোঁটা নাই তার ধরি কি ?—(ঢাকা)
নিকাইল পুছাইল ঘরখানি তাত না পাড়ে কাঁই।
সোনার কটরা ভাঙ্গিলে গড়াইয়া দেওয়াইয়া নাই ॥—(শ্রীহট্ট)
The orange has new flowers—(মধ্যভারত), মুরিয়া উপজাতি
A beautiful palace without a door.—ঐ, বৈগা উপজাতি
Waters of two colours in a single China pot.—ঐ, মুস্লিম
As white as milk
As soft as silk
As litter as gall
And as hard as wall
Surrounds me. —English.
A long white barn,
Two roofs on it,
And no door at all, at all. —Irish

উদ্ধৃত লৌকিক ধাঁধাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের কোন বিষয় বিস্তৃত বর্ণনা করিবার পরিবর্তে মূল বস্তুটির কেবল মাত্র একটি কিংবা দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপরেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে; এত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে স্বাধীনভাবে ইহাদের মীমাংসা করা কঠিন; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লৌকিক ধাঁধাগুলি যেমন জনশ্রুতিমূলক, ইহাদের উত্তরগুলিও তেমনই জনশ্রুতিমূলক (traditional); ভাবিয়া কিংবা চিন্তা করিয়া এখানে কেহ কোন মীমাংসায় পৌছায় না, শ্রুতি হইতে তাহা সকলেই স্মরণ করিবার চেষ্টা করে মাত্র; এখানে যতখানি বুদ্ধির পরীক্ষা হয়, তাহা হইতে বেশি স্মৃতিরই পরীক্ষা হইয়া থাকে। সেইজন্য কোন বিষয়েরই দীর্ঘ বর্ণনার এখানে কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাহিত্যিক ধাঁধার আবেদন বুদ্ধির নিকট, স্মৃতির উপর নহে। জনশ্রুতির ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিবিশেষ ইহার উপর একটি সরস সাহিত্যিক রূপ দিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত ইহার বহিরঙ্গ রসরূপটি বিচার করিয়া মীমাংসায় পৌছিতে হয় বলিয়া ইহার সমাধানকারী মাত্রেরই ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিচার শক্তি আরোপ দ্বারা ইহার বিশেষ তাৎপর্য

হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে ডিম্ব সম্পর্কে প্রচলিত যে লৌকিক ধাঁধাগুলি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, কবি মুকুন্দরামের মধ্যে তাহাদেরই এই প্রকার সাহিত্যরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—

বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার॥
যখন পুরুষ-বর হয় বলবান।
বিধাতার সৃজন ঘর করে খান্ খান্॥

যে বিষয়টি চারিটি পদের মধ্য দিয়া এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মাত্র পদে লৌকিক ধাঁধাগুলির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। লৌকিক ধাঁধার ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রায় কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত করিবার রীতি প্রচলিত নাই। এমন কি, সংস্কৃত কথাসাহিত্যের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে এমন রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা কাহিনীগত রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। রচনা যতই দুর্বোধ্য হইত, রচয়িতা ততই গৌরব বোধ করিতেন। অতএব সংস্কৃত রচনার প্রায় সর্বত্রই সাহিত্যিক হেঁয়ালীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া যাঁহাদের সাহিত্য-সংস্কার গড়িয়া উঠিত, তাঁহারাও ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; সেইজন্য তাঁহাদের বাংলা রচনা অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত রচনার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মধ্যে তাঁহারের কাব্য-রচনার কালটি সর্বদাই দুরূহ হেঁয়ালীর আকারে প্রকাশ করা হইত, এই শ্রেণীর রচনা সাহিত্যিক ধাঁধার মত। তবে যে সাহিত্যিক ধাঁধাগুলি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, ইহারা তাহা হইতে কতকগুলি বিষয়ে স্বতন্ত্র। তাহাদের মধ্যে প্রধান এই যে, ইহারা কোনও জনশ্রুতিমূলক বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত নহে; সেইজন্য ইহাদিগকে প্রকৃত ধাঁধা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু ক্রমে এই রীতি এক সময়ে এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল যে, ইহা মধ্যযুগের বাংলার জাতীয় সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের উপর সাহিত্যিক ধাঁধারই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য রচনায় ধাঁধার প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী

হইয়াছিল, তাহা নির্দেশ করিবার জন্য এখানে এই শ্রেণীর একটি সাহিত্যিক হেঁয়ালী উদ্ধৃত করিতেছি। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের উপসংহারে এই ভাবে ইহার রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন—

শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দণ্ডে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥

ইহার মধ্যে যে হেঁয়ালীটি আছে, তাহা লোক-মন (folk mind) মীমাংসা করিতে পারিবে না, পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ মনই তাহা পারিবে; অতএব ইহা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত লৌকিক ধাঁধাগুলি উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়া যে কত ভাবে ব্যক্তি-অনুশীলনের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

সংস্কৃত কিংবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা দ্বারা যেমন উচ্চতর সমাজের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরীক্ষা করা হইত, কিংবা কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে এখনও যেমন কোন কোন সামাজিক উৎসবে ধাঁধার মধ্যে কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বিবেচনা করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত আছে, আধুনিক বাংলা সমাজে এই সকল উদ্দেশ্যে ধাঁধার কদাচ ব্যবহার হয় না। বর্তমানে ইহা একমাত্র শিশুমনের কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিক্ষিত মনও যেমন ইহার অনুশীলন করিত, বর্তমানে তাহা রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাহিত্যিক ধাঁধা রচনার ধারাটি এ'দেশে একেবারে যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যাইবে না। বাংলার পল্লীর সমাজেও এই শ্রেণীর ধাঁধা অদ্যাপি রচিত হইয়া থাকে, যেমন,

তিন অক্ষরে নাম যার সর্বঘরে আছে।
পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে॥
আগের অক্ষর ছাড়ি সর্বলোকে খায়।
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রামগুণাগুণ গায়॥ —বিছানা

অক্ষরের উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল ধাঁধা রচিত হয়, তাহাই সাহিত্যিক ধাঁধার অগ্রদূত ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমাজ-সংহতি বিনষ্ট না হইয়া যে সমাজের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান ব্যাপক ভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে, সেই সমাজে এই শ্রেণীর ধাঁধা লৌকিক ধাঁধার সংজ্ঞা হইতেও বঞ্চিত হইতে পারে না। তবে বর্তমান সময়ে শিশুপত্রিকা সমূহে যে সকল ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক ধাঁধা। যদিও এই বিষয়ের ব্যাপক অনুশীলনের অভাবে এই শ্রেণীর রচনার ভিতর দিয়া কোনও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না, তথাপি এ'কথা সত্য যে, ইহার মধ্য দিয়াই মধ্যযুগের সাহিত্যিক ধাঁধা রচনার ধারাটি রক্ষা পাইয়াছে।

বাংলার লৌকিক ধাঁধার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে, ইহা রচনার দিক দিয়া অত্যন্ত সরল ; যে বিষয়টির প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়, তাহার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকিলেও একটি কিংবা দুইটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিই এখানে লক্ষ্য রাখা হয়, বর্ণনার সঙ্গে ইহার উদ্দিষ্ট বস্তুর একটি সুদূর সামঞ্জস্য থাকে মাত্র, বর্ণনাটি একান্ত বাস্তবধর্মী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। বাংলার লৌকিক ধাঁধার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিও ক্রমে এখানে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রত্যেক দেশেই কোন কোন ধাঁধার শেষাংশে উদ্দিষ্ট উত্তরদাতাকে দুই একটি কথার সামান্য একটু আক্রমণ করিবার (challenge) ভাব প্রকাশ পায়—ইংরেজিতে ইহাদিগকে challenging riddle বলে। এই আক্রমণ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ দুই প্রকারই হইতে পারে ; যেমন পরোক্ষ আক্রমণের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, যে-সকল ধাঁধার শেষে বলা হয়, যে ইহা ভাঙ্গাইতে পারিবে সে পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান। কারণ, ইহার মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও আছে যে, যে ইহা ভাঙ্গাইতে পারিবে না, সে অপণ্ডিত বা মূর্খ। ইহার মধ্য দিয়া উত্তরদাতাকে পরোক্ষে আক্রমণ করিবার মনোভাব প্রকাশ পায়। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা,
এক কথায় যে বলতে পারে
সে মজুমদারের বেটা। (মুর্শিদাবাদ)—কুঁচ

সিন্দুরে ভুগু ভুগু কাজলের ফোঁটা।
এই শোলোকের মানে কইবে সিংহ রাজার ব্যাটা ॥
সিংহ রাজার ব্যাটা নয়রে সিংহ রাজার নাতি।
এই শোলোকের মানে কইতে লাগ্‌বে আশিন আর কার্তিক ॥

(ঢাকা)—ঐ

এখানে একটি মাত্র পদেই জিজ্ঞাসাটি প্রকাশ পাইয়াছে, অবশিষ্ট পদগুলির এখানে কোন উদ্দেশ্য নাই ; কিন্তু দুইটি কারণে অন্যান্য পদগুলি এখানে যোজনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ধাঁধাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কয়েকটি পদ যোগ করিলে ইহা এখানে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত হইবে না, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রতি-পক্ষকে একটু উত্তেজিত করিয়া দেওয়া হইল। মজুমদারের বেটা কিংবা সিংহ রাজার বেটা শব্দের অর্থ এখানে বিজ্ঞ। যে মীমাংসাটি বলিতে পারিবে, সে বিজ্ঞ ; পরোক্ষে ইহাই দাঁড়ায় যে, যে বলিতে পারিবে না, সে বিজ্ঞ নহে, অর্থাৎ মূর্খ। এই অপমানকর ইঙ্গিত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উত্তর-দাতা প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, তাহাতে প্রশ্নোত্তরের সভাটি একটু সক্রিয় ও প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিবে।

প্রত্যক্ষ আক্রমণেরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে ; এই আক্রমণ প্রত্যক্ষ বলিয়াই ইহা আরও উত্তেজনামূলক। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই—

লালবরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাঁটে।
মূর্খে কি ভাঙ্গাইবা পণ্ডিতেরই ফাটে ॥—(শ্রীহট্ট), আমপিঁপড়া

ধাঁধাটি পূরণ করিতে না পারিলে মূর্খের অখ্যাতি হাতে হাতে লইতে হইবে, ইহাই ইহার বক্তব্য ; তবে পূরণ করিতে পারিলে যে পাণ্ডিত্যের দুর্লভ খ্যাতিও অর্জন করা যাইবে, এই বিষয়েও ইহাতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্নটি যে এখানে প্রকৃতই দুরূহ, তাহা নহে এবং পণ্ডিত ব্যক্তিকে যে ইহা সমাধান করিতে বেগ পাইতে হইবার কথা, তাহাও কদাচ সত্য নহে। অনেক সময় কেবল মাত্র পাদ-পূরণের উদ্দেশ্যে এই প্রকার আক্রমণাত্মক পদ ধাঁধার সঙ্গে যোজনা করা হইয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইয়াছে। একটি মাত্র পদেই মূল জিজ্ঞাসাটি শেষ হইয়া গিয়াছে, ইহার সঙ্গে মিল রক্ষা করিয়া আর একটি পদ যোজনা করিতে হইলে আর কি কথা পাওয়া যাইতে পারে ? কথা ত যাহা ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে ; অতএব এই সম্পর্কে একটি যে রীতি

প্রচলিত আছে, এখানে তাহারই শরাণাপন্ন হওয়া গেল। সুতরাং মূল প্রশ্ন-নিরপেক্ষই এই সকল আক্রমণাত্মক পদ ধাঁধার সঙ্গে যোজনা করা থাকে, প্রশ্নটি প্রকৃতই দুরূহ কি না, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা কদাচ যোজিত হয় না।

অনেক সময় এই প্রকার উগ্র আক্রমণাত্মক ভাবের পরিবর্তে কোন কোন ধাঁধার দুর্লভ পারিতোষিক দানেরও আশ্বাস দেওয়া হয়; অবশ্য এই পারিতোষিকের প্রতিশ্রুতি যে কোনদিন রক্ষা পায়, তাহা নহে—পাইবার উপায়ও নাই; কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা পাওয়া এখানে বড় কথা নহে, আশ্বাস দিবা মাত্রই ইহার পরিবেশটি ঔৎসুক্যপূর্ণ ও সচকিত হইয়া উঠে; একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম।

এই যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিম্॥ (শ্রীহট্ট), কাঁকড়া, সিজ, বাদুড়

হাজার টাকার লোভেই যে ইহা কেহ ভাঙ্গাইতে অগ্রসর হইবে, তাহা নহে; কিংবা ভাঙ্গাইলেও যে হাজার টাকা কেহ পাইবে, তাহাও নহে; কিন্তু ইহা ভাঙ্গাইতে পারিলে হাজার টাকা পাইবার যে সন্তোষ, তাহা সকলেই লাভ করিবে। টাকা এখানে কেহ পায়ও না, চায়ও না—এখানে সকলেই চায় একটুকু আনন্দ; ধাঁধাটি ভাঙ্গাইতে পারিলে প্রত্যক্ষ ভাবে আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যাইবে; না ভাঙ্গাইতে পারিলেও যে আনন্দের ব্যাঘাত হইবে, তাহা নহে। কারণ, ইহা শিশুর কৌতুক-হাস্যের সংসার, আনন্দ দ্বারাই ইহা রচিত, বিষয়-বোধ এখান হইতে বহুদূরে নির্বাসিত হইয়া আছে; অতএব কোন কিছুতেই ইহার আনন্দের ব্যাঘাত হয় না—ধাঁধার মীমাংসা পূরণ করিতে পারিলেও শিশুর সমাজে কেহ যেমন বিজ্ঞ বলিয়া বিশেষ সম্মান লাভ করে না, তেমনই সমস্যা পূরণ করিতে না পারিলেও কেহ সমাজে মূর্খ বলিয়া পতিত হইয়া থাকে না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের প্রশ্ন এই সমাজে অবান্তর মাত্র, এই অবান্তর প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়াই হাজার টাকার কথা এখানে আসিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল দেশেই এই প্রকার আক্রমণাত্মক কিংবা পারিতোষিকের আশ্বাসমূলক ধাঁধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তবে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক মান (standard) অনুযায়ী ইহাদের আক্রমণের কিংবা আশ্বাসের প্রণালীগুলি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যভারতের

অধিবাসী মুরিয়া উপজাতির কয়েকটি এই শ্রেণীর ধাঁধার সঙ্গে উপরি-উদ্ধৃত বাংলা ধাঁধাগুলির তুলনা করা যাইতে পারে—

The tank sparkles
The fence is beautiful
If you don't answer this riddle,
Your wife's nose will be cut off. —আয়না
Rough leaves, silver branches
If you don't know this riddle,
You're a Ghasin's daughter —ইক্ষু
There's a wall round the lake,
If you can't answer this, you'll be my *kabari.*

—আয়না।

এই সকল ক্ষেত্রে মনে করা হইয়াছে যে, ইহা 'generally only used when an extra line is needed to complete the rhyme.' এতদ্ব্যতীত ইহার আর কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নাই।

কিন্তু ধাঁধায় সকল সময়ই যে পদ পূরণ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা নহে—অনেক সময় কেবল মাত্র একএকটি পদ দ্বারাই এক একটি পূর্ণাঙ্গ ধাঁধা রচিত হইতে পারে। মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত এই ধাঁধাগুলি এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—একটি পদে কেবল মাত্র প্রশ্নটি এখানে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

কোন্ মাছের মাথা নাই? —কাঁকড়া
কোন্ গাছের পাতা নাই? —সিজ
কোন্ পক্ষীর ডিম নাই? —বাদুড়

মনে হয় এই শ্রেণীর ধাঁধাই প্রাচীনতম। মধ্যভারতের গঁড় কিংবা ছোট-নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে ইহাদের নিজস্ব যে সকল ধাঁধা প্রচলিত আছে, তাহাও গদ্যে রচিত এক একটি এই প্রকার বাক্যেই সম্পূর্ণ, ইহাতেও মিলের কোনও প্রশ্ন নাই। অন্যান্য উচ্চতর জাতির ভাষা হইতে আধুনিক কালে ইহারা মিত্রাক্ষরযুক্ত ধাঁধা গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু মিত্রাক্ষর-প্রবণতা বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম।

সেইজন্য এক পদবিশিষ্ট এই প্রকার স্বাধীন এক একটি ধাঁধাকেও ইহাতে সাধারণতঃ মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ জিলা হইতে সংগৃহীত ইহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে—

কোন্ কোন্ গাছে সাজন সাজে? —শিমূল
কোন্ কোন্ গাছে বাজন বাজে? —শিরীষ
কোন্ কোন্ গাছের শিরে কাঁটা? —সিজু
কোন্ কোন্ গাছের মাথায় জটা? —তালগাছ
কোন্ কোন্ গাছের মাথায় ঘা? —সজ্‌নে
কোন্ কোন্ গাছে করে রা? —কলুর ঘানিগাছ
কোন্ কোন্ গাছে খেলায় ভাঁটা? —বেল গাছ
কোন্ কোন্ মাছের উজান কাঁটা —জাল মাছ

এখানে প্রত্যেকটি পদই এক একটি স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ ধাঁধা হওয়া সত্ত্বেও মিলের জন্য প্রত্যেকটি পদই পরবর্তী পদের অপেক্ষাকারী। প্রত্যেক পদেই এখানে ভাবগত স্বাধীনতা থাকিলেও, কেবলমাত্র মিত্রাক্ষর সৃষ্টির জন্য ইহাদের অঙ্গগত স্বাধীনতা খর্ব করা হইয়াছে। বাংলা লৌকিক ধাঁধার ক্ষেত্রে ইহাদের দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে। প্রত্যেক ধাঁধা আকারে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বাংলা লৌকিক ধাঁধা রচনায় অধিকাংশ সময়ে একটি পদই যে যথেষ্ট, তাহার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উপরে এই বিষয়ে যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, মিত্রাক্ষর সৃষ্টির প্রেরণায় পদপূরণের জন্য যেমন এক স্থলে আক্রমণ ও আশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে, অন্য এক স্থলে তেমনই স্বতন্ত্র আরও কয়েকটি স্বাধীন ধাঁধা আনিয়া ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বাংলায় আরও এক শ্রেণীর ধাঁধা রচিত হইয়া থাকে—ইহাদের একটি পদ, বিশেষতঃ প্রথম পদটি সাধারণতঃ অর্থহীন অলঙ্কারস্বরূপ মাত্র, ইহার মূল উদ্দেশ্যবাচক পদটির সঙ্গে তাহা শিথিল ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, যেমন—

থাল ঝন্ ঝন্ থাল ঝন্ ঝন্ থাল নিল চোরে।
বৃন্দাবনে আগুন লাগ্‌ল কে নিভাইতে পারে॥—(মৈমনসিং),

রৌদ্র

আকাশ থেকে পড়্‌ল থাল থাল ঝুন্ ঝুন্ করে।
বিন্নে ঝোড়ে আগুন লাগ্‌লে কে ঠেকাইতে পরে ॥—(ঢাকা), ঐ
আল ঝন্ ঝন্ আল কন্ কন্ আল নিল চোরে।
অনিল পর্বতের আগুন কে নিভাইতে পারে ॥—(শ্রীহট্ট), ঐ
থাল দুমদুম থাল দুমদুম থাল নিয়া গেইল চোরে।
বাগুচা বাড়ীত আগুন লাগ্‌চে কে নিব্‌বার পারে ॥—(রঙ্গপুর), ঐ

এখানে প্রথম পদ দুইটির কোনই অর্থ নাই, ইহার দ্বিতীয় পদ দুইটির মিল দিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র। ধাঁধার যাহা মূল প্রশ্ন, তাহা প্রথম পদ নিরপেক্ষ হইয়াই দ্বিতীয় পদটির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ'কথা সত্য যে, প্রথম পদগুলি এখানে অনাবশ্যক হইলেও, ইহাদের মধ্য দিয়া যে একটি সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ধাঁধা দুইটিকে অপরূপ রসগৌরব দান করিয়াছে ; এই রসগুণেই ইহারা সাহিত্যের মর্যাদালাভের অধিকারী হইয়াছে। প্রথম পদ দুইটির কোনও অর্থ এখানে নাই বলিয়া পার্শ্ববর্তী তিনটি জিলায়ও ইহাদের রূপ অভিন্ন হইতে পারে নাই—যেখানে অর্থ প্রকাশের দায়িত্ব আছে, সেখানে সহজে পাঠান্তর হইবার উপায় থাকে না ; কিন্তু সেখানে সেই দায়িত্ব নাই, বরং আনন্দদানই একমাত্র লক্ষ্য, সেখানেই আদর্শের প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ পায়। তবে এখানে যে মূল সুরটি মাত্র অবলম্বন, বাহ্যিক পাঠান্তর সত্ত্বেও তাহা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। এইখানে বহিরঙ্গের দিক দিয়া ধাঁধা ছড়ার ধর্ম লাভ করিয়াছে। এই প্রকার আরও কয়েকটি ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

উঠান ঠন্ ঠন্ বাড়ীত নাই।
খাই বস্তুর বাকল নাই ॥—(শ্রীহট্ট), লবণ
উঠান ঠন্‌ঠন্ বৈঠক মাটি।
কোন্ কুমারে গড়্‌ছে ঘটি ॥
বিনা দুধে হৈছে দই।
এমন কুমার পাইবাম কই ॥—(শ্রীহট্ট), চুণ
উঠান্ ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটি।
মা গর্ভতী পুতে ধরছে ছাতি ॥—(মৈমনসিং), সুপারিগাছ

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যাইতে পারে যে, উদ্ধৃত ধাঁধা-

গুলির প্রথম পদটির কোন অর্থ নাই বলিয়াই ইহা ইচ্ছামত বিভিন্নার্থবাচক যে কোন ধাঁধার সঙ্গেই যুক্ত হইতে পারিতেছে। অনেক সময় ইহা দ্বারা দ্বিতীয় পদের সঙ্গে মিল যে নির্ভুল হইতেছে, তাহাও নহে—তবে একটি সুর কানে লাগিয়া গিয়াছে, অতএব এখন তাহাই এই শ্রেণীর ধাঁধা রচনার একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক সময় এই প্রকার অর্থহীন পূরণবাচক পদগুলির মধ্যে ধ্বনিগুণ ব্যতীতও অন্য গুণ প্রকাশ পায়, কোন কোনটির মধ্যে একটি অস্পষ্ট চিত্রের আভাস পাওয়া যায়—

রাজার বাড়ীর মেনা গাছ মেন্‌মেনাইয়া চায়।
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরও খাইতে চায়॥—(শ্রীহট্ট), শিলনোড়া

রাজবাড়ীর মেনাগাছটির যে কি রূপ, তাহা কেহই জানে না; তবে উদ্ভিদ্‌-বিলাসী কোনও রাজা যদি সাধারণের অপরিচিত একটি দুর্লভ বৃক্ষ কোথা হইতেও সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে সে' সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই বৃক্ষ যতই দুর্লভ হউক, তাহার যে দৃষ্টিশক্তি থাকিবে, তাহা ত কেহই বিশ্বাস করিবে না। অতএব এখানে যে চিত্রটি পাইলাম, তাহা অবাস্তব হইয়া পড়িল, কিন্তু ধাঁধায় কাহারও ইহার প্রয়োজন নাই; উত্তর-দাতা ধাঁধাটি শুনিবা মাত্র বুঝিতে পারিবে, কোন্ পদটিতে তাহার প্রয়োজন, আর কোন্ পদটিতে তাহার প্রয়োজন নাই। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, অপ্রয়োজনীয় বলিয়া এখানে কিছুই নাই; সমস্যা-পূরণের জন্য যে পদটির এখানে প্রয়োজন নাই, একটি শ্রুতিসুখকর আবহ কিংবা দৃষ্টিসুখকর চিত্র রচনা করিবার জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। কারণ, ইহা কেবল দেনা-পাওনা, জিজ্ঞাসা-উত্তরেরই জগৎ নহে। ধ্বনি ও চিত্র, প্রশ্ন ও উত্তর সকলে মিলিয়া এখানে একটি অহেতুক আনন্দের জগৎ রচনা করে; অতএব একটি হইতে আর একটিকে এখানে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিতে পারা যায় না।

বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একটি সকৌতুক রসদৃষ্টি বিস্তার করিয়া ধাঁধার উপাদান সমূহ সংগৃহীত হইয়া থাকে। কোন অপরিচিত বস্তু ইহাতে নাই। মধ্য যুগের যে সকল সাহিত্যিক ধাঁধা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহাদের বর্ণনায় যতই পরিণত শিল্পগুণ প্রকাশ

পাউক না কেন, ইহাদের বিষয়-বস্তু চিরন্তন বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের বহির্ভূত নহে। ইহার কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লৌকিক ধাঁধাই সাহিত্যিক ধাঁধারও ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সেইজন্য বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া তাহাতে অভিনবত্ব প্রকাশ করিবার উপায় নাই। আধুনিক কালেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল লৌকিক ধাঁধা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিষয়-বস্তু আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মধ্যযুগের সঙ্গে এই বিষয়ে আধুনিক যুগের কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হয় নাই। চারি শত বৎসর পূর্বেও বাংলাদেশে যে সকল বিষয় লইয়া ধাঁধা রচিত হইত, আজ পর্যন্তও সেই বিষয়-বস্তু সমূহই ধাঁধার অবলম্বন হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ, বাহিরের দিক দিয়া সমাজ যতই পরিবর্তিত হউক, ইহার অন্তরের দিক দিয়া এমন একটি নিভৃত স্থান আছে, যেখানে ইহার কোন পরিবর্তনই সম্ভব হয় না। ধাঁধাগুলি সমাজের নিভৃতলোকেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে; সেই জন্য বাহিরের পরিবর্তন ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মধ্যযুগের পূর্বোদ্ধৃত ধাঁধাগুলির বিষয় আধুনিক যুগেও যে কি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, আধুনিক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ধাঁধাগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, ধাঁধার বিষয়ের মধ্যে একটি চিরন্তনত্ব আছে। কতকগুলি বিষয়ের ধর্মই এই যে, ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সহজে ধাঁধা রচিত হইতে পারে এবং রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা একটি অপূর্ব জীবনী শক্তি লাভ করিয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত সকল বিষয়েরই যে এই ধর্ম আছে, তাহা নহে—কতকগুলি বিষয় ইহাদের স্বভাব-গুণেই ধাঁধার উপজীব্য হয়, কতকগুলি বিষয় নিবিড়তর পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিয়াও তাহার অধিকারী হইতে পারে না।

যে সকল বিষয় একান্তভাবে ধাঁধার বিষয়ীভূত হইতে পারে, জাতিবর্ণ-দেশকাল-নিরপেক্ষ সর্বত্র এবং সর্বদাই এই গৌরব লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে সকল বস্তু ধাঁধার উপজীব্য হয়, অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বত্রই তাহা ইহার উপজীব্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সমাজ-জীবন হইতেই ধাঁধার উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় ধাঁধার বিষয় প্রায় সর্বত্রই এক। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও কতকগুলি বিষয়ে মানুষে মানুষে কিছু কিছু ঐক্য আছে; কারণ, বাহিরের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে

মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিলেও ক্ষুধাতৃষ্ণার মত কতকগুলি জৈব বৃত্তির দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া যে ধাঁধাগুলি রচিত হয়, পৃথিবীর সর্বত্র তাহাদের মধ্যে বিষয়-গত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে ডিম সম্পর্কিত একটি ধাঁধার উল্লেখ করিয়াছি, ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির খাদ্য রূপে গৃহীত হয়; সেইজন্য ইহার সম্বন্ধে যে কৌতূহল প্রকাশ পায়, তাহা সর্বত্র অভিন্ন। অতএব সুসভ্য পাশ্চাত্ত্য জাতি যেমন ইহার সম্বন্ধে এই বলিয়া বিস্ময়-বোধ করে যে, ইহাতে 'no door at all', ভারতীয় আদিবাসীর অন্তর্ভুক্ত এক 'অসভ্য' জাতিও এই বলিয়া তেমনই বিস্ময় প্রকাশ করে—'A wonderful palace without a door' (ওরাওঁ)। এই সূত্রেই বাংলা দেশে প্রচলিত ধাঁধাগুলির সঙ্গে ভারতের আদিবাসী অঞ্চলের ধাঁধার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়; কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে;—

বিদ্যুৎ

The music drops from heaven, but how is the player ?

—বৈগা

It is here, it is there, but even if you give a hundred rupees you cannot get it.—ওরাওঁ

এই দেখলাম, এই নাই, কি কইমু রাজার ঠাঁই। —(শ্রীহট্ট)

এই দেখলাম এই নাই, বেতগড়ে গাই নাই। —(মৈমনসিংহ)

চক্ষু

Two brothers and both are black. —সাঁওতাল

Touch the plate and a spring gushes out. —বৈগা

An old woman keeps opening and shutting the doors—গঁড়.

এক না জামিরের গছ।
টোকা দিতে পড়ে রস॥ —(রঙ্গপুর)

একটুখানি পুষ্করিণী টল মল করে,
একটুখানি কুটা পড়লে সর্বনাশ করে। —(মৈমনসিংহ)

যমুনার জল টলমল করে।
একটুক কুটা পাইলে সর্বনাশ করে॥ —(রঙ্গপুর)

কাঁঠাল

Rough the body
And its flesh in a leaf-cup. —অসুর

তেল চুক্ চুক্ পাতা, ফলে ধরে কাঁটা,
তার বীজ গোটা গোটা, তার হাতে লাগে আটা,
তা খেতে বড় মিঠা। —(২৪ পরগণা)
তেল চুক্‌চুক পাতা, ফলের উপর কাঁটা।
পাক্‌লে হয় মধুর মত, বীচি গোটা গোটা॥ —(রঙ্গপুর)

হুঁকা

The cotton tree that points to the sky has only one joint.—অসুর

In a tree on an anthill is the nest of a *bulbul*. —ওরাওঁ

The trunk of a tree on an anthill
In the trunk of the tree a nest
And in the nest an egg. —ঐ

একটুখানি পুষ্কুণিখান কইয়ে উব্ উব্ করে।
রাজা আইলে প্রজা আইলে তুল্যা ছেলাম করে॥ —(মৈমনসিংহ)
একখানে দুইখানে তিনখানে জোড়া।
তার উপর বসাইল আনি ফাঁকি আঙ্গ্ড়ার গুঁড়া॥ —(শ্রীহট্ট)
মধ্যি গাঙে তাল গাছ ব্রহ্মা কর্‌ছে বাসা।
কেউ খায় কেউ ছোঁয় কেউ করে আশা॥ —(ঢাকা)
ঢাকা দি লাগ্যে আগুন, কৈলগাতা গেইএ পোড়া।
শঙ্খনদী ভুটভুটাইএ, নলউআ দি ধাইএ ধুঁয়া॥ —(চট্টগ্রাম)
এই কুলেও হাল, অই কুলেও হাল।
মাঝে এক গাছ খাল॥
পো আএ বুড়াএ ছালাম করে।
তেও মর্দের ভাল॥ —(চট্টগ্রাম)

কলা

The rotten lizard with a good taste. —খরিয়া

বাপ রেয়ে পেটত।
পুত গেইয়ে হাঁটত॥ —(শ্রীহট্ট)

বাঁশ

When she reaches the age of her mother, the daughter wears her hair long. —ওরাওঁ

ঢেঙ্ ঢেঙ্ ঢেঙটা,
ছেলেবেলায় কাপড়-পরা,
বুড়োবেলায় লেংটা —(মেদিনীপুর)
পোয়াকালে বস্ত্রধারী
জোয়ান্ কালে উলঙ্গ।
বুড়াকালে জটাধারী
মধ্যে মধ্যে সুরুঙ্গ॥ —(চট্টগ্রাম)
ছোট কালে ঘোম্টা।
বড় হ'লে লেংটা॥ —(ঢাকা)

আম

The old man's tooth that dangles. —সাঁওতাল

আকাশেতে ডুলুমুলু পাতালেতে লেজ।
কন্ ঈশ্বর বানাইছে কলিজার ভিতর কেশ॥ —(চট্টগ্রাম)

শামুক

The bird that lays eggs with its mouth. —সাঁওতাল

মামারাই রাঁধে বাড়ে মামারাই খায়।
আমরা গেলে পড়ে ডুয়ার দেয়॥ —(পাবনা)
এক না বুড়ী হাট যায়।
আমাক দেখি ডুয়র দেয়॥ —(রঙ্গপুর)

এই প্রকার কতকগুলি সাধারণ বিষয় বাদ দিলে প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব পরিবেশ ও স্বকীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াও যে ধাঁধা রচিত হয়,

তাহাদের মধ্যেই কেবল জাতির বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বরফ বা তুষার-পাত সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে যে রসবোধই প্রকাশ পাউক, এই প্রকার একটি ধাঁধা বাংলার লোক-সাহিত্যে প্রচলিত থাকিতে পারে না ; যেমন,

Round the house and round the house.

And there lies a white glove in the window. —English

কারণ, এই প্রকার তুষার-পাতের চিত্র বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। কিংবা ঢেঁকি সম্পর্কিত এই প্রকার একটি ধাঁধা ইংরেজি ভাষায়ও প্রচলিত থাকিবার কথা নহে ; কারণ, এ'দেশে ঢেঁকি বলিতে যাহা বুঝায়, ইংরেজ সমাজে তাহা অপরিচিত,

গাঙ্গ পাড়ের বুড়ীগুলি নও ধান কুটে।
কাঁকালিত পাড়া দিলে কেক্কাৎ করি উঠে ॥ —(শ্রীহট্ট)
ছোট ছোট পঙ্খি জলি ধান খায়।
ল্যাজে তুলে পাড়া দিলে আশমানে ধায় ॥ —(ঢাকা)

এইখানে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে ধাঁধার মধ্য দিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে W. G. Archer লিখিয়াছেন, 'Almost all the tribes of Chota Nagpur and Central India have a similar landscape. Many of them have common implements. Their material environments are much the same. Yet out of a tribe's four hundred riddles, scarcely forty are shared.'[১] দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুণ্ডা ও ওরাওঁ জাতি পরস্পর প্রতিবেশিরূপে বাস করা সত্ত্বেও, ইহাদের ধাঁধাগুলি পরস্পর প্রায় সকলই স্বতন্ত্র। খরিয়া জাতির ধাঁধা সাঁওতাল জাতির ধাঁধা হইতে স্বতন্ত্র ; বৈগা ও মুরিয়া জাতি একই অঞ্চলের অধিবাসী, কিন্তু তাহাদেরও ধাঁধাগুলি পরস্পর প্রায় সকলই পৃথক্। কোন বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ কতকগুলি ধাঁধা প্রচারিত হইবার পরিবর্তে একই অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধাঁধা প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। ইহার কারণ, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ধাঁধাও প্রধানতঃ বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতিরই বাহন। মুণ্ডা ও

১ Man in India XXIII (1948), p. 880.

ওরাওঁ জাতি যে সকল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণের অধিকারী, লোক-সাহিত্য তাহাদের অন্যতম। ধাঁধাও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জাতির সামাজিক জীবনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এমন অবিচ্ছেদ্য। সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়া সংস্কৃতিগত এক অখণ্ডতা আছে বলিয়া এখানে এই প্রশ্ন নাই—সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে সকল বাংলা ধাঁধারই রস সমান উপভোগ্য। তথাপি এ'কথা সত্য যে, প্রাদেশিকতার জন্য কোন কোন ধাঁধা আঞ্চলিক রূপ লাভ করিয়াছে। চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট-নোয়াখালীর ধাঁধা যেমন পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চল সমূহে বোধগম্য হয় না, তেমনই মানভূম-বাঁকুড়া-বীরভূমের ধাঁধাও উক্ত অঞ্চল সমূহে বোধগম্য হয় না। তবে ভাষাগত প্রাদেশিকতার ব্যবধান কোন মতে অতিক্রম করিতে পারিলে, ইহাদের বিষয়গত রসাস্বাদনে কাহারও কোন বাধা হইতে পারে না। বিশেষতঃ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পশ্চিম বঙ্গে যে সকল ধাঁধা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহাই প্রধানতঃ প্রাদেশিকতায় রূপান্তরিত হইয়া বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচারিত হইয়াছে। অবশ্য বিশেষ কোন কোন অঞ্চলে নূতন ধাঁধা যে রচিত হয় নাই, তাহা নহে—তথাপি যে সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা বাংলার সাধারণ সমাজ-জীবনের সকল স্তরে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তাহা দ্বারা এই দেশের ছোটবড় সকল বৈষম্য সর্বদাই দূর হইয়া যাইতেছে।

বাংলার সাধারণ সমাজ-জীবনের বিশিষ্ট প্রকৃতি-অনুযায়ীই বাংলার ধাঁধাগুলি রচিত হইয়াছে, ইহার বিশিষ্ট রসবোধ দ্বারাই ইহাদের বহিরঙ্গরূপ গঠিত হইয়াছে। এই গুণে ইহারা বিষয়ের দিক দিয়া ইহাদের প্রতিবেশী জাতির সঙ্গে অভিন্ন হইলেও বহিরঙ্গ পরিচয়ের দিক দিয়া স্বতন্ত্র। আঙ্গিকের দিক দিয়া যে বাংলা ধাঁধার মধ্যে কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইবে।

ধাঁধার কোনও বাঁধা-ধরা রূপ নাই—ইহা গদ্য, অমিত্রাক্ষর কিংবা মিত্রাক্ষর পদ্য, যে কোনও রূপেই রচিত হইতে পারে; তবে লৌকিক ধাঁধাগুলির বহিরঙ্গের সঙ্গে ছড়াগুলির বহিরঙ্গের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ছড়াগুলি যেমন দীর্ঘ হইয়া থাকে, ইহারা তেমন হয় না, সেই কথা পূর্বে বলিয়াছি। নিগূঢ় একটি অর্থই প্রকাশ করা হউক, কিংবা প্রচ্ছন্ন একটি ভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করা হউক, একটি রসোজ্জল চিত্র ইহাদের ভিতর দিয়া পরিবেশন করিবার প্রবৃত্তি

প্রকাশ পায়। চিত্রটি সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত হইলেও ইহা দ্বারা যে রসের আভাস দেওয়া হয়, তাহাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়—

একটুখানি গাছে,
রাঙা বৌটি নাচে। —লঙ্কা (২৪ পরগণা)

ধাঁধাটি শুনিবা মাত্র ইহার অর্থের দিকে মন ধাবিত হইবার পূর্বে ইহার মধ্য দিয়া যে একটি রঙিন চিত্রের খণ্ডাংশ মাত্রও প্রকাশ করা হইল, তাহাতেই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি, ধাঁধা শুনিবা মাত্র কেহ ললাট কুঞ্চিত করিয়া ইহার অর্থোদ্ধার করিতে মনোনিবেশ করে না, জনশ্রুতির সহজ পথ অনুসরণ করিয়াই ইহার মীমাংসাটি স্মরণ করে মাত্র; সেইজন্য ইহার মধ্য দিয়া যে রঙিন চিত্রটি পরিবেশন করা হইল, তাহার শ্রুতিজনিত প্রফুল্লতা মন হইতে কখনও হ্রাস পাইবার অবকাশ পাইল না। রাঙা বৌটি যে কি কারণে এখানে সামাজিক কিংবা পারিবারিক সকল শাসন উপেক্ষা করিয়া অকস্মাৎ নৃত্য কৌশল দেখাইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল, এই বিষয়ে এখানে কেহ প্রশ্ন তুলিবে না। ধাঁধাটি প্রতিপক্ষের মুখ হইতে শুনিবার পূর্বেই শ্রোতার মন নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই মন লইয়াই সে এখন জগৎ সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; অতএব, তাহার সম্মুখে তখন সবই নাচিতেছে। সুতরাং এই অসামাজিক নৃত্যে তাহার মন কিছুতেই অস্বাভাবিকতা বোধ করিতে পারিবে না। মনকে নাচাইবার ক্ষমতা ধাঁধার এই বহিরঙ্গ রূপের মধ্যেই আছে। এই চিত্রধর্মী গুণ প্রায় সকল দেশের ধাঁধারই বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতীয় উপজাতি অঞ্চল হইতেও এই বিষয়ক কয়েকটি ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে; যথা,

On the bush are many yellow birds. —মুরিয়া
A little girl makes the king weep. —বৈগা

অনেক সময় অনেক চিত্র ও সুর এমন ভাবে চোখে ও কানে লাগিয়া যায় যে, বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়াও তাহা আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। পূর্বে একটি ধাঁধা উল্লেখ করিয়াছি

বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।[১]—(২৪ পরগণা), আনারস

১ আফ্রিকার স্বহিলি (Swahili) নামক উপজাতির মধ্যে আনারস সম্পর্কিত ধাঁধাটি এই, 'A hen that lays among thorns.'

এই চিত্রটি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধাঁধার ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, যেমন,

বোন থেকে বা'র হ'ল টিয়া,
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া। —(পাবনা), থোড়
বন থেকে বেরুলেন টিয়ে।
লাল টুপী মাথায় দিয়ে॥ —(বীরভূম), পেঁয়াজ
বন থেকে বেরুল টিয়ে।
লাল গামছা গায়ে দিয়ে॥ (মুর্শিদাবাদ), ঐ

এই চিত্রটিই পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে গিয়া কি ভাবে যে এক একটি স্থানীয় রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় ; যেমন,

ঝোড়ের থেকে বাড়ালো টিয়া।
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া॥ (ঢাকা), আনারস
ঝাড়র থুন নিকলিল ভোজা।
পাছাত লাঠি মাথাত বোঝা॥—(চট্টগ্রাম), আনারস

দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন করিয়াও চিত্রের অক্ষুণ্ণতা প্রায় সর্বত্র রক্ষা করা হইয়াছে—সেইজন্য প্রায় একটি চিত্র সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং অন্তর্নিহিত বিষয় বা ভাব হইতে বহিরঙ্গ চিত্রের উপরই ধাঁধার অধিকতর লক্ষ্য থাকে। এই গুণেই ধাঁধা বহিরঙ্গের বিচারে ছড়ার ধর্মী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। অর্থ বা ভাবগত আবেদন অপেক্ষা চিত্রগত আবেদনই ইহার অধিকতর সার্থক হয় ; এইজন্যই বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া উপরি-উদ্ধৃত ধাঁধাটির চিত্রধর্মই রক্ষা পাইয়াছে, অর্থ বা ভাবধর্ম কিছু মাত্র রক্ষা পায় নাই।

বিষয় অপেক্ষা চিত্রের ভিতর দিয়া যে একটি সর্বজনীন আবেদন অনেক সময় প্রকাশ পায়, তাহার জন্যও অনেক ধাঁধা ইহার আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করিতে পারে ; তাহার আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ; যেমন, পাবনা অঞ্চলে এই ধাঁধাটি প্রচলিত আছে,

উঠ্‌তে সূর্য নমস্কার
পড়্‌তে মাটি নমস্কার।—(পাবনা), থোড়

চট্টগ্রাম জিলা হইতেও এই ধাঁধাটি কোন প্রকার প্রাদেশিক বিকৃতি ব্যতীতই সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও ইহা প্রচলিত আছে। এই চিত্রটির মধ্য দিয়া একটি অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কলার থোড় যখন প্রথম উদ্গত হয়, তখন তাহা আকাশের দিকে মুখ করিয়া থাকে; অতএব সূর্যকে নমস্কার করিয়াই তাহার মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম হয়। তারপর ক্রমে ফলের ভারে মাটির দিকে মুখ করিয়া ইহা নুইয়া পড়িতে থাকে; অবশেষে একদিন মাটির দিকে মুখ করিয়াই ইহা বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে। জন্ম-মুহূর্তে যাহার দৃষ্টি ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে নিবদ্ধ ছিল, মৃত্যুর মুহূর্তে মর্ত্যমুখী হইয়া ধূলির উপর সে লুটাইয়া পড়িল। ইহার ভিতর দিয়া একটি উচ্চাঙ্গ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এত সংক্ষিপ্ত রচনায় সহজ কথায় একটি সুগভীর সত্য এমন ভাবে যে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার শক্তি নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করা যায় না। অতএব ইহা ধাঁধা হইয়াও ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু—ইহা কবিতা এবং দর্শন। উচ্চ ভাবটি এখানে একটি অপরূপ চিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; অতএব ইহার যেমন আত্মাও আছে, তেমনই দেহেরও সৌষ্ঠব আছে। সুতরাং ইহা দ্বারা কবিতার দাবি পূর্ণ হইতেছে। চিত্র ও ভাবগৌরবে অনেক ধাঁধাই কবিতা। ধাঁধার গুণে না হইলেও কবিতার গুণেই তাহা সকল বাঙ্গালীর নিকট সর্বত্র সমান প্রিয়।

ধাঁধার বস্তু সন্ধান করিতে গিয়া পল্লীকবির দৃষ্টি দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতম উপকরণের উপরও বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙ্গালীর জীবনের ক্ষুদ্রতম উপকরণও এই প্রকার রস ও ভাবগৌরব লাভ করিয়াছে। সামান্য একটুকু জিনিস মাসকলাই—ইহা দেখিতে যেমন এতটুকু, ইহার মধ্যে বিশেষত্ব বলিতেও তেমন কিছু নাই; কিন্তু সামান্য যাহা আছে, তাহাও পল্লী-কবির সহানুভূতি-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ইহার সর্বাঙ্গ কালো, কিন্তু খুব নিবিষ্ট হইয়া দেখিলে ইহার এক জায়গায় তিলকের মত ক্ষুদ্র একটি ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাই পল্লীকবির ধাঁধা রচনার প্রেরণা দান করিল—

কাল বউয়ের কপালে চিক্,
জামাই এ'লে করে হিত।—(মুর্শিদাবাদ), মাসকলাই

বধূ এবং জামাতা বাঙ্গালী গৃহের পরম-আত্মীয়, ইহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী

গৃহস্থের চিরদিনই একটি রস-মধুর সম্পর্ক আছে। অতএব কোনও বস্তুর সঙ্গে যদি তাহাদের উপমা দেওয়া যায়, তবে তাহার ভাবটি সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। সেইজন্য মাসকলাইএর কালো রঙের সঙ্গে বাঙ্গালীর গৃহের চিরপরিচিত কালো বউটির তুলনা আপনা হইতেই আসিয়া গেল। বউটি কালো হইলে কি হইবে? সে প্রসাধন-বিলাসিনী! নারী চিরদিন তাহাই, বিশেষতঃ সে যখন নববধূ হইয়া আসে, তখন ত আর কথাই নাই। অতএব বাঙ্গালীর ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার নিতান্ত ঘরের সাহিত্যের জন্য ইহা হইতে সার্থক উপমা আর কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। তারপর বধূর কথা যখন হইল, তখন তাহা অনুসরণ করিয়াই কন্যা-জামাতার চিত্রটিও ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িল—কারণ, পুত্রবধূর পরই কন্যা-জামাতা। অতএব এই ধাঁধাটির ভিতর দিয়া একটি গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিবারই মাত্র কৌশল অবলম্বন করা হইল না, ইহা বাঙ্গালীর মনকে তাহার গৃহের প্রতি মমতায় ভরিয়া দিয়া গেল—একটি অর্থ বা ভাব প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রে ও রসে শ্রোতার মন পরিপূর্ণ করিয়া দিল। এইখানেই ধাঁধা কবিতা। বাংলার অধিকাংশ ধাঁধারই এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ধাঁধা অর্থ-গুণের দিক দিয়া যতই সমৃদ্ধ হউক না, রসগুণের দিক দিয়া বাংলার ধাঁধার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না।

বিষয় অনুসারে বাংলা ধাঁধাগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা প্রকৃতি-বিষয়ক ও গার্হস্থ্য জীবন-বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধাগুলির মধ্য দিয়া যেমন কল্পনা ও রসের প্রাচুর্য অনুভব করা যায়, তেমনই গার্হস্থ্য জীবন-বিষয়ক ধাঁধাগুলির ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটির প্রতি অভিজ্ঞতার পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠে। স্বাভাবিক কবিত্বের গুণে বাস্তব জীবনের সাধারণ উপকরণসমূহ অনেক সময় অসাধারণ হইয়া উঠিয়া ইহাদিগকে রোমাণ্টিক করিয়া তুলিয়াছে। তবে রসসৃষ্টিই ধাঁধার লক্ষ্য, জ্ঞানের অনুশীলন ইহার লক্ষ্য নহে; সেইজন্য প্রকৃতিই হউক, কিংবা বাস্তব জীবনের কোনও উপকরণই হউক, ইহাদের সকলের ভিতর দিয়াই রসসৃষ্টির প্রয়াস অনুভব করা যাইবে।

বাংলা দেশে প্রচলিত কোনও ধাঁধারই এখন আর ধর্মাচারগত (ritualistic) মূল্য নাই—সকল ধাঁধাই কেবল মাত্র ধর্মবোধ নিরপেক্ষ আনন্দ

দানের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ধাঁধা ধর্ম ও আচারগত সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইয়া আসিতেছে। কেবল মাত্র মধ্যভারতের আদিবাসী গঁড় জাতির মধ্যে একশ্রেণীর ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এখনও ইহার সামাজিক আচারভুক্ত একটি প্রথা। এই ধাঁধাগুলি গঁড় জাতি ইহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত আচার রূপে ব্যবহার করে— ইহারা অন্ত্যেষ্টি ধাঁধা বলিয়া পরিচিত; ইংরেজিতে ইহাকে 'The Riddles of Death' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আদিবাসী গঁড় সমাজে যখন কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন হইতে অন্ততঃ তিন বৎসরের মধ্যে তাহার যে প্রেত-কৃত্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই উপলক্ষে এই ধাঁধাগুলির আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। ইহারা আকারে দীর্ঘ, সঙ্গীতের রূপে ইহারা পরিবেশিত হয়; এক পক্ষ ধাঁধাগুলি জিজ্ঞাসা করে, অপর পক্ষ সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট জবাবটি দিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ধাঁধা ভারতের আর কোনও অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায় না।[১]

১ Durga Bhagwat, op. cit, pp. 342-346.

প্রকৃতি

প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলি রচনায় যে সকল গাছপালা বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গিনায় নিত্য ফুলফল প্রসব করিতেছে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে—কোনও অপরিচিত কিংবা দুর্লভ বিশল্যকরণী ইহাদের উপজীব্য হয় নাই। বাঙ্গালীর নিত্য পরিচিত ফলের মধ্যে নারিকেলের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। অতএব ইহা স্বভাবতঃই ধাঁধা রচয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ; সুতরাং ইহা অবলম্বন করিয়া বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলেই দুই একটি করিয়া ধাঁধা রচিত হইয়াছে, যেমন,

হাঁড়ার উপর হাঁড়া,
তাতে নীলকমলের দাঁড়া,
তাতে কালমেঘের জল,
তাতে বিনা দুধের দই,
এমন গোয়ালা কই। —(মুর্শিদাবাদ)

আকাশের সমান দড়া,
বিনি কুমারের হাঁড়া,
বিনি দুধের দই,
এমন গোয়ালা কই। —ঐ

আকাশেতে থাকে, নারী নাম ধরে
নহে ত কামিনী।
আকাশেতে গঙ্গা বন্দী হইল কেমনি॥ — (রঙ্গপুর)

ইকড়ের তলে তলে ভিকমতির ছানি,
কোন দেশে দেখিয়াছ গাছের আগে পানী। —(শ্রীহট্ট)

চাইর পাশে লোহার আইল।
মাঝে মাঝে কেঁঅনে জোয়ার আইল॥ —(চট্টগ্রাম)

উর্দ্ধমুখী উঠে বীর, ভূমিত দিয়া পা,
মাসে মাসে করে স্নান ঠোঁটে ঠোঁটে ছা। —ঐ

এমন কি, বাংলার বাহিরেও ইহার বিষয়ে দুই একটি ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায় ; যেমন,

The elephant's eggs that are like a drum—সাঁওতাল

I live on a tree
But am not a bird.
Three eyes have I
But I am not Shankar. —(পালামৌ জিলা)

কলাগাছ যে বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গিনায় এক পায়ে দাঁড়াইয়া তাহার সুবৃহৎ পত্র প্রচার দ্বারা কি অদৃশ্য রহস্যের বাণী নিত্য ঘোষণা করিতেছে; তাহাও বাংলার ধাঁধার ভিতর দিয়া এইভাবে ধরা পড়িয়াছে,

রাজার বাড়ীর ঘোড়ী,
একই বিয়ানে বুড়ী। —(শ্রীহট্ট), কলাগাছ

রাজারো ঘুড়ী,
এক বিয়ানে বুড়ী। —(চট্টগ্রাম), ঐ

বাপ রেয়ে পেটত
পুত গেইয়ে হাটত। ঐ, কলা

পাতাটি ঢোলা ফলটি কুঁজো,
তাতে হয় দেবতা পূজো। —(মুর্শিদাবাদ), ঐ

কান্ধার উপর কান্ধা।
যে ভাঙ্গি দিতে না পারে,
তার বাপ হুদ্দা গাধা। —ঐ, কলার ছড়া

রাঙ্গা রাতা,
উহুত মাথা। —ঐ, থোড়, মোচা

জঙ্গল বাড়ী হইতে বিরাইল টিয়া।
সোনার টুপুলি মাথায় দিয়া॥ —ঐ (কোচবিহার)

চাইর আঙ্গুল পাড়ি,
সক্কল গুষ্ঠি আড়ি
আর কতদূর বাড়ি। ঐ, কলাপাতা

পান অপেক্ষা প্রিয় সম্পদ বাঙ্গালীর আর কি আছে, বিশেষতঃ ইহার প্রকৃতির মধ্যেও কতকগুলি অভিনবত্ব আছে ; সেইজন্য ইহাও সহজে আসিয়াই ধাঁধার রাজ্যে প্রবেশ করিল,

খড়িতে জড়াজড়ি ফলে অধিবাস,
ফুল নাই ফল নাই ধরে বারমাস। —(মুর্শিদাবাদ)

হেথা দিলাম থানা হয়ে গেল লতা,
ফুল নাই ফল নাই শুধু তার পাতা। —ঐ

আগা ঢলমল পাতা কোপিলাস (?),
ফুল না ফল না ধরে বারমাস। —(চট্টগ্রাম)

আগা ছুটি গোড়া অবিলাস (?),[১]
ফুল নাই গোটা নাই ধরে বারমাস। —ঐ

ইকড়ের তলে তলে ভিকমতির গাছ,
ফুল নাই গোটা নাই ধরে বারমাস।—(শ্রীহট্ট)

পানের পর সুপারি; সুপারি এবং সুপারি গাছ উভয়েরই কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, তাহাই ধাঁধার উপজীব্য হইয়াছে,

হরি হরি দণ্ড ছিরি ছিরি পাত,
মাণিক দণ্ড ষোলখানি হাত। (পাবনা), সুপারিগাছ

হরি হরি বিন্না তিরি তিরি পাত,
বাড়ীর বিন্না চব্বিশ হাত। —(শ্রীহট্ট), ঐ

উঠান ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটি,
মা গর্ভতী পুতে ধর্‌ছে ছাতি। —(মৈমনসিংহ), ঐ

মা ডিয়লী, ছা পাঅলি,
পুত গুল্‌গুল্যা। —(চট্টগ্রাম), সুপারি

প্রকৃতি-বিষয়ক কোন কোন ধাঁধার মধ্যে জিজ্ঞাসার ভাবটি একেবারেই থাকে না, বরং তাহার পরিবর্তে সৌন্দর্যমুগ্ধ রচয়িতার বিস্ময়ের ভাবটিই স্পষ্ট হইয়া উঠে,

আত্‌লা বিলের কাত্‌লা মাছ পদ্মবিলের পাতা।
কোন সহরে দেখে আইছ ফুলের উপর পাতা॥ (পূর্ববঙ্গ),
দণ্ডকলসের গাছ

লোটুম্ লোটুম চড়োট্টি কোন্ কুমারে গড়েছে,
তাতে মাণিক মুক্তো ঝরেছে। —(মুর্শিদাবাদ), ডালিম

---

১ মনে হইতেছে, মুর্শিদাবাদ জিলা হইতে সংগৃহীত প্রথমোক্ত ধাঁধাটিতে যে অধিবাস শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই চট্টগ্রাম অঞ্চলে নীত হইয়া প্রাদেশিকতার বিকৃতি লাভ করিয়া বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি না হওয়াই এই বিকৃতির কারণ।

ছিট্‌কিরি ছিট্‌কিরি পাতা।
বত্রিশ ডালে কাঁটা।
দেখ্‌তে সুন্দর খাইতে মিষ্টি ॥—(পূর্ববঙ্গ), ঐ

একটি রূঢ় জিজ্ঞাসা বা কঠিন কোনও প্রশ্নের ভাব এখানে একেবারেই নাই, মাণিক-মুক্তার মত ডালিমের দানাগুলি এখানে রচয়িতার হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছে। 'কোন্ কুমারে গড়েছে' বাক্যটিকে এখানে প্রশ্নবোধক বলিয়া গ্রহণ করা ভুল হইবে, ইহা বিস্ময়ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র! কুম্ভকারের পরিচয়ে এখানে কোনও প্রয়োজন নাই, যে-ই ডালিমটি গড়িয়া থাকুক না কেন, তাহার শক্তি বিস্ময়কর—এই ভাবটি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা কোন উত্তরের অপেক্ষা রাখে নাই। অতএব ইহা কবিতা—ইহার বহিরঙ্গেও ছড়ার ধর্ম বিদ্যমান।

রঙের প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ ধাঁধার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; প্রকৃতির লাল রংটি কখনও কখনও ধাঁধা রচয়িতার চোখে লাগিয়া যায়, সবুজ রং বোধ হয় নিত্য দেখিয়া অভ্যাসের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে ; সেই জন্য ইহার কোনও চিত্র ধাঁধায় প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু লাল রংটি চোখের উপর সর্বদাই নাচিয়া বেড়ায়,

গা করে তার খসর মসর
পাত করে তার ফেণী
ফুল করে তার লাল তামাসা,
ফল করে কুস্তনি। —(মুর্শিদাবাদ), শিমুল

শিমুল ফুলের লাল তামাসা কথাটি অপূর্ব কবিত্ব-ব্যঞ্জক। মসুর ডালটিও গৃহস্থের নিত্য পরিচিত বস্তু, ইহার রক্তিম বর্ণও অনুরূপ রস-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে—

এ পার মাল্‌সা ও পার মাল্‌সা।
মধ্যিখানে লাল তামাসা ॥ —(পূর্ববঙ্গ), মসুর ডাল

ধাঁধার নগণ্য পরিসরের মধ্যেও যে কত অমূল্য কবিত্বের সম্পদ এইরূপ উপেক্ষিত হইয়া আছে, ইহা তাহারই একটি প্রমাণ। তারপর,

এক গাছে তিন তরকারী
দাঁড়িয়ে আছে লালবিহারী। — (মুর্শিদাবাদ), সজ্‌নে

কচি কচি লাল ফুল যাহার শাখায় জড়াইয়া আছে, তাহাকে লালবিহারী অর্থাৎ লাল রং যাহার বিলাস বলিয়া সম্বোধন করা অপূর্ব কবিত্বেরই পরিচায়ক। এক গাছে তিন তরকারীর মধ্য দিয়া যেমন বৈষয়িক বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গেল, লালবিহারী শব্দটি তেমনই সকল বিষয়বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অপূর্ব কবিত্বের গৌরবে সার্থক হইয়া উঠিল। অধিকাংশ ধাঁধার মধ্যে যেমন এই বিষয়-বুদ্ধি ও কবিত্ব উভয়েরই একত্র সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তেমনই আবার কোন কোন সময় বিষয়-বুদ্ধি কবিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। উদ্ধৃত ধাঁধাটিতে গঙ্গা-যমুনার ধারার মত দুইটি ধারাই পাশাপাশি চলিয়াছে।

কুঁচটি যে রক্তে ডুবুডুবু ও লাল গামছা গায় দিয়া পেঁয়াজটি যে বন হইতে বাহির হইয়া আসে, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। রান্নাঘরের ধারে একটুকুন একটি গাছে যে রাঙা একটি লঙ্কা বাতাসে দুলিতেছে, তাহার চিত্রটি কি ভাবে যে ধাঁধায় স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাও এই ধাঁধাটি পূর্বে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি—

একটুখানি গাছে,
রাঙা বউটি নাচে। —(২৪ পরগণা), লঙ্কা

গাছের ফুল আর ফলই যে শুধু রাঙ্গা থাকে, তাহাই নহে—কোন কোন গাছের পাতাও রাঙ্গা থাকে, তাহাও ধাঁধার দৃষ্টি ধাঁধিয়া দেয়—

তিন তেরেঙ্গা ধানের ভেঙ্গা,
গোটা মধুর পাত রাঙ্গা। —(শ্রীহট্ট), পানিফল

কখনও কখনও আমাদেরই পরিচিত গাছের ফল মাণিক্য বলিয়া ভ্রম হয়,

কাঁচাতে মাণিকের ফল সর্বলোকে খায়।
পাক্‌লে মাণিকের ফল গড়াগড়ি যায়॥ —(মুর্শিদাবাদ),
ডুমুর

কেবল ফুলফল ও পাতাই নহে, গাছের কোটরে লাল পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র জীবের উপরও ধাঁধা রচয়িতার বর্ণকুতূহলী দৃষ্টি বিস্তার লাভ করিয়াছে—

লালবরণ ছয় চরণ পেট্ কাটিলে হাঁটে। —(শ্রীহট্ট)
আমপিঁপ্‌ড়া

গাঙ্ পার দিয়া যায় হরিণ।
পেট কাটা তার লেঙ্গুর গাভীন॥ —(মৈমনসিংহ)

হলুদের রং‌টি দেখিলে একটি সুন্দরী নারীর রূপের কথা মনে হয়,

তলে মাটি উপরে মাটি,
মধ্যে সুন্দরী বেটি। —(শ্রীহট্ট), হলুদ

উপরেও মাটি
নীচেও মাটি
হেণ্ডে ভিতর সম্ সম্ বেটি। —(চট্টগ্রাম), ঐ

তেঁতুলটিও পাকিলে সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে, ইহার বীচিটির একটি অপূর্ব রং—

কুল কুল কুলেরি
ভাদর মাসের ধুলোরি,
নেংটা হয়ে হাটে যায়
পাক্‌লে সুন্দরী হয়। —(মুর্শিদাবাদ), তেঁতুল

ও কুল কুলনি, গাছর আগাত তুলনি,
পাইলে হকলে খায়, লেংটা হই হাটত যায়।—(চট্টগ্রাম), ঐ

জিঁই জিঁই পাতা, বোঁ বোঁ ডাল,
ফল্‌কে যা বেঁকা, বিচি ক্যা লাল। —(চট্টগ্রাম), ঐ

তেঁতুলের সঙ্গে সঙ্গে চালিতার নামটাও আসিয়া পড়িল। নিতান্ত সাধারণ উপকরণও ইহাদের প্রকৃতি-গুণে ধাঁধার মধ্যে যে অসাধারণত্ব লাভ করিতে পারে, চালিতাই তাহার প্রমাণ—

রাজার বেটা মদন হাঁস।
খায় খোলা ফেলায় শ্বাস॥ —(মুর্শিদাবাদ) চালিতা

উপর থ্‌ুন পৈল তাল।
তালে মাইর্‌ল তিন ফাল॥ —(চট্টগ্রাম), ঐ

খেজুর ও আখ গাছ বাহির হইতে যতই নীরস বলিয়া মনে হউক না কেন, ধাঁধা-রচয়িতা ইহাদের অন্তরের পরিচয় উদ্ধার করিতে ব্যর্থকাম হয় নাই—

বাড়ীর কাছে, কাঠের গাই।
বছর বছর দুইয়ে খাই॥ —(পূর্ববঙ্গ), খেজুর গাছ

এখান থেকে করলাম দৃষ্টি।
ঐ গাছটি বড়ই মিষ্টি॥ —(ঐ) আখগাছ

মূলাটিও পল্লীকবির বিস্ময়বোধের উদ্রেক করিয়াছে; এখানেও প্রশ্ন নাই, বরং তাহার পরিবর্তে বিস্ময়-বোধই প্রকাশ পাইয়াছে—

হাতির দাঁত,
কদম্বের পাত। —(শ্রীহট্ট) মূলা

মাটির নীচে থাকিয়াও রসুনের শুভ্রতা যে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাও পল্লীকবির দৃষ্টি এড়ায় না,

মাটির তলে থাকে বেটি,
তেনা পিন্ধে আটি আটি,
নাপিতে না ছোঁয়, ধোপায় না ধোয়
তেও বেটি ছাপ (সাফ্) বয়। —(শ্রীহট্ট), রসুন
ছোট ইটা ছেম্‌রী।
নায়না ধোয়না এতই সুন্দরী॥ —(ঢাকা), ঐ

এইভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধাগুলির বহিরঙ্গ পরিকল্পনায় পল্লীকবির সৌন্দর্য্যবোধ বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে।

প্রকৃতির মধ্যে কেবল মাত্র গাছপালা ও ফুলফলই যে বাংলার ধাঁধার উপজীব্য হইয়াছে, তাহা নহে—গ্রহনক্ষত্রও ইহার উপজীব্য হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। একান্ত নিকটবর্তী প্রকৃতির উপকরণ সমূহ যত ব্যাপকভাবে ধাঁধায় ব্যবহৃত হইয়াছে, সুদূর আকাশের সূর্যচন্দ্র-নক্ষত্র তত ব্যাপকভাবে ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই। ইহার কারণও দুর্বোধ্য নহে। সূর্য-চন্দ্র-তারা যতই প্রত্যক্ষ হউক না কেন, ইহাদের সম্বন্ধে আমরা সর্বদা খুব সচেতন থাকি না। প্রাণীর পক্ষে নিঃশ্বাস অপেক্ষা প্রয়োজনীয় আর কি আছে, তথাপি ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয় জন সচেতন থাকে? সূর্য-চন্দ্রও তাহাই; ইহাদের সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব হইতেই ইহাদের সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্যও নাই। সেইজন্য গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে যে সামান্য কয়টি ধাঁধারও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাও রচনার দিক দিয়া খুব উচ্চাঙ্গের বলিতে পারা যায় না; যেমন,

এখান থেকে ছুঁড়্‌লাম থাল,
থাল গেল সমুদ্রের পার। —(পাবনা), সূর্য
আকাশ গুর গুর পাথর ঘটা।
সাত্‌শ ডালে দু'টি পাতা॥ —(পূর্ববঙ্গ), চন্দ্র ও সূর্য

রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই,
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই,
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই। —(শ্রীহট্ট),
চন্দ্র, আকাশ, তারা।

এক থাল সুপারি।
গুণিতে না পারি॥ —(পূর্ববঙ্গ), তারা
সুবিছানা পড়িয়া রইছে কেউ শোয় না।
সুফুল ফুটিয়া রইছে কেউ তোলে না॥ —(পূর্ববঙ্গ),
সাগর ও তারা

নৈসর্গিক অন্যান্য কোন বিষয় সম্পর্কেও যে কোন কোন সময় দুই একটি ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষত্ব-বর্জিত, যেমন,

সাগ্‌তনে পড়িল লাটম ভূঁইতে আগুন জ্বলে।
আমার ঠাকুর যে দিকে চায় সে দিকে জোকার পড়ে॥
—(শ্রীহট্ট), ভূমিকম্প

এই একটি মাত্র এই শ্রেণীর ধাঁধার বহিরঙ্গ-রূপের ভিতর দিয়া সামান্য একটু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে—

গাঙ্গ পারে মরিচ গাছ হালু ঢুলু করে।
কোন মাইর পুতে তার কানি যাইতে পারে॥ —ঐ, ছায়া

প্রাণীও প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। মানুষ প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই মানুষের সম্বন্ধেও মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। রাক্ষসী ফিঙ্ক্‌স ওডিপাসকে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহার মীমাংসা মানুষ। বাংলাতেও এই প্রকার দুই একটি ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায়। একটি এই—

পেট পৃষ্ঠ মাথা,
দুই হাত কুড়ি আঙ্গুল নাকটা,
চক্ষুকর্ণ নাই,
এমন জন্তু কোথায় পাই ?—(শ্রীহট্ট), মানুষ

এই ধাঁধাটির প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র; ইহাতে উদ্দিষ্ট বস্তুর একটি প্রচ্ছন্ন বর্ণনার উপর জোর দিবার পরিবর্তে একটি মাত্র দ্ব্যর্থবোধক শব্দের উপর জোর দেওয়া

হইয়াছে। শব্দটি 'নাই'। ইহার এক অর্থ নাভি, এখানে সেই অর্থটি উদ্দেশ্য। এই প্রকার আরও একটি ধাঁধা পাওয়া যায়,

আমারও নাই, তোমারও নাই,
ভেঙ্গে দিলাম বোঝও নাই। —(পাবনা), ঐ

ফিঙ্ক্‌স্‌ ওডিপাসকে যে ধাঁধাটি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা বাংলা দেশে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়,

সকালে চার পায়ে হাঁটে,
দুপুরে দুই পায়ে হাঁটে,
বিকালে তিন পায়ে হাঁটে।—(২৪ পরগণা), মানুষ

ইহার মধ্যে কোনও দ্ব্যর্থবাচক শব্দের সুযোগ গ্রহণ করিবার পরিবর্তে, মানুষের প্রকৃতিটিই প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহা ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতির মধ্যে এই ভাবে প্রচলিত আছে—Four legs in the morning. Three legs at night. মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও মানুষের মনে কম বিস্ময় উৎপাদন করে নাই, সেইজন্য তাহাদিগকে লইয়াও ধাঁধার সৃষ্টি হইয়াছে,

একটুখানি পুষ্করিণী টলমল করে।
একটুখানি কুটা পড়্‌লে সর্বনাশ করে॥—(মৈমনসিংহ), চক্ষু

এই পাড়ে খাগ্‌ড়া,
সেই পাড়ে খাগ্‌ড়া,
দুই খাগ্‌ড়ায় ঝগ্‌ড়া।—(শ্রীহট্ট), চক্ষুর পাতার লোম

আঁধার পুকুর গড়ান মাঠ।
বত্রিশটা কলাগাছ একখানা পাট॥—(পূর্ববঙ্গ), দাঁত ও জিহ্বা

কতকগুলি পরিচিত কীটপতঙ্গ ও জীব-জন্তুর আচরণও বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেইজন্য ইহারাও ধাঁধার উপজীব্য হইয়াছে,

দলে থাকে দলকুমারী দলে তাইর বাসা।
হাড় নাই গুড় নাই মাংস লুসা লুসা॥—(শ্রীহট্ট), পোকা

আট পা' আঠার হাঁটু
জাল ফেলাইল মরা ঠেটু,
শুকনায় ফেলাইয়া জাল,
গাছে উঠিয়া লৈল ফাল। —(মৈমনসিংহ), মাকড়সা

ইটে গুরগুর বৈঠা নাগর।
বিনা বৈঠায় বায় সে সাগর॥ —(পূর্ববঙ্গ), কচ্ছপ
জলে চলে না ছোঁয় পানী।
তারে বলে কোন প্রাণী॥ —(ঐ), জোনাকি
লাল শাকের ডাঁট-টা।
টুক্কা দিলে টাকাটা॥ —(ঐ), কেন্ন
কালা কচু জলে ভাসে।
হাড় নাই তার মাংস আছে॥ (ঐ), জোঁক
ছোট কালে লেজ হয় বড় হ'লে খসে।
বাঘের মত লক্কি দেয় কুত্তার মত বসে॥ —(ঐ), বেঙ্গ

এই ধাঁধা দুইটি অন্য প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উপরি-উদ্ধৃত ধাঁধাগুলির সঙ্গে এখানেও ইহাদিগকে পুনরায় উদ্ধৃত করা যায়—

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম।
এই যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিম॥—(শ্রীহট্ট), কাঁকড়া,
সিজ, বাদুড়

মামারাই রাঁধে বাড়ে মামারাই খায়।
আমরা গেলে পড়ে দুয়ার দেয়॥ —(পাবনা), শামুক

কোনও কোনও ধাঁধার অর্থ একটি মাত্র শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, একটি সংক্ষিপ্ত জনশ্রুতিমূলক কাহিনী (traditional) বর্ণনা করিয়া ইহাদের অর্থ প্রকাশ করিতে হয় ; যেমন,

আসমান তিরিমিরি চৌডালে তার বাসা।
আঁধারে গিলিল ছাউ একি তামাসা॥—(পূর্ববঙ্গ)

ইহার অর্থ এই : একটি বাজপক্ষী ছোঁ মারিয়া একটি বিড়াল ছানা তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাসায় রাখিল। বাসাটি একটি গাছের চৌডালের উপর অবস্থিত ছিল। বিড়াল ছানাটি সেখানে গিয়া যেন মরিয়া গিয়াছে, এমন ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। বাজপক্ষীটি তাহাকে মৃত ভাবিয়া সেখানেই

ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বিড়াল ছানাটি এই অবসরে বাজপাখীর বাচ্চাগুলি খাইয়া চলিয়া গেল। এই শ্রেণীর ধাঁধা আরও একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঘাটে ছ্যাও পথে ছ্যাও,
পর-পুরুষরে ছ্যাখলে ছ্যাও।
আমায় দেখে দিবার চেয়ে দিলে না। —(ঐ)

ইহার অর্থটি এই : স্ত্রী হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া ঘোম্‌টা দিতে গিয়াও দিল না, অথচ সে অন্য সব খানেই ঘোম্‌টা দিয়া থাকে। রসিক স্বামীটি ঠাট্টা করিয়া সেইজন্য স্ত্রীকে এই হেঁয়ালীটি বলিতেছে।

অনেক সময় এই প্রকার গল্প বলিবার পরিবর্তে উত্তরটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিবারও প্রয়োজন হয় ; যেমন,

ছোট একটা পুকুরে
কই ভুর্ ভুর্ করে।
কার বাবার সাধ্য আছে
জাল ফেলাতে পারে॥

এক কথায় ইহার কোনও জবাব হয় না ; ইহা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় ; যেমন, ভাত রান্না করিবার সময় জলের মধ্যে চালগুলি যখন টগ বগ করিয়া ফুটিতে থাকে, ইহা তাহারই বর্ণনা।

ধাঁধা সর্বদাই যে মিত্রাক্ষর পদ্যেই রচিত হয়, তাহা নহে—ক্বচিৎ নিছক গদ্যে রচিত ধাঁধাও শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন—

যারে আনতে গেলাম,
তা'রে দেখেই ফিরে এ'লাম।
সে যখন চলে গেল,
তা'রে নিয়ে এ'লাম॥ —(পূর্ববঙ্গ), জল

ইহাও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় ; যেমন, জল আনতে গিয়ে বৃষ্টি (জল) দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, বৃষ্টি ধরিয়া গেলে জল লইয়া আসিলাম।

গার্হস্থ্য জীবন্

গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবহারিক উপকরণের সংখ্যা এ'দেশের সাধারণ সমাজে নিতান্ত নগণ্য বলিলেও হয়। সেইজন্য ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল ধাঁধা রচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নহে। বিলাসোপকরণের মধ্যে দর্পণ বা আয়না অন্যতম, ইহার প্রকৃতি সাধারণের মনে যে বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইতে এই প্রকার ধাঁধা রচিত হইয়াছে ; যেমন,

মামায় দিলা পুখুরী ভাগিনায় দিলা পাড়।
টিয়া পাখীরে পানী খাইতে দেখায় সংসার ॥—(শ্রীহট্ট), আয়না

ইহার সঙ্গে দুইটি উপজাতীয় ধাঁধার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়—

There's a wall round the lake,
If you can't answer this, you'll be my *kabari*. মধ্যভারত,
—মুরিয়া উপজাতি

The tank sparkles
The fence is beautiful
If you don't answer this riddle,
Your wife's nose will be cut off. —ঐ

কিন্তু হুঁকা-কল্‌কের মত বাঙ্গালীর বিলাসের বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, সেইজন্য ইহা একাধিক ধাঁধার উপজীব্য হইয়াছে। এই সম্পর্কিত ধাঁধা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

নদী-মাতৃক বাংলাদেশের নিত্য পরিচিত বঁড়শী জিনিষটিও ধাঁধার ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিয়াছে,

একা গুজা
গুজায় ধরে মরা,
মরায় ধরে জিতা।—(শ্রীহট্ট), বঁড়শী

চরকা যে একদিন বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের সম্পদ ছিল, তাহা এ'দেশের কয়েকটি ধাঁধার ভিতর দিয়া এখনও বুঝিতে পারা যায়। ইহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধাঁধাগুলিও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে,

ভোন্ ভোন্ করে ভোম্‌রাও না।
গলায় পৈতা বামুনও না ॥—(পাবনা), চরকা
ভগ্ ভগ্ করে ভক্তে
কাল রংয়ের তক্তে
আট হাতে যুদ্ধ করে,
কোন্ দেবতা তারে বলে। —ঐ, ঐ

মাটির পাতিলটি গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য তৈজস ; ইহাও তাহার রসবোধ এইভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—

কাঁচা কালে তুপ্ তুপ্।
পাক্‌লে সিঁদূর ॥ —(পূর্ববঙ্গ)
লাল প্যায়দা হাটে যায়।
ক্ষণেকে ক্ষণেকে থাপুর খায় ॥ —ঐ

গার্হস্থ্য জীবনের অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ঢেঁকি ও শিলনোড়া সম্বন্ধে দুইটি ধাঁধা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না। বাংলার পল্লীতে দালান-কোঠা খুব বেশি নাই, তথাপি দু'একটি এখানে সেখানে যাহা আছে, তাহাতেও পল্লীবাসীর মনে এই প্রকার জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে,

কোঠা কোঠা নব কোঠা,
বেত লাগে আশী মুঠা ;
শুন্‌রে কাম্‌লা ভাই,
একটি বেতের বান্ধ্ নাই।—(শ্রীহট্ট), দালান

দরজার খিলটিও ধাঁধা-রচয়িতার দৃষ্টি এড়ায় নাই,

ঘুমত উঠি তাতে হাত। —ঐ, দরজার খিল

ঘরের কোণে সন্ধ্যার পর মিট্‌মিট্ করিয়া যে প্রদীপটি জ্বলিতে থাকে, তাহার উপরও ধাঁধা-রচয়িতার কৌতুহলী দৃষ্টি ধাবিত হয়,—

এক গাছ খেড়ে।
সকল ঘর বেড়ে ॥—(মৈমনসিংহ), দীপ
এক গাছ দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।—(ঢাকা), ঐ

উপরি-উদ্ধৃত ধাঁধাগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, জাতির নিজস্ব জীবনের একান্ত পরিচিত ব্যবহারিক উপকরণগুলি অবলম্বন করিয়াই ইহার

ধাঁধা রচিত হইয়া থাকে, ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বহির্ভূত কোনও উপকরণই ধাঁধার উপজীব্য হইতে পারে না। সেইজন্য ধাঁধাগুলির ভিতর দিয়া জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লাভ করা যায়।

উপরে বাংলা ধাঁধাগুলি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্তমানে ইহাদের কোনও ব্যবহারিক কিংবা আনুষ্ঠানিক (ritual) মূল্য নাই। ইহা বর্তমানে শিশুর কৌতুকের বিষয় মাত্র। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যায় যে,একদিন ইহাদের ব্যবহারিক এবং আনুষ্ঠানিক মূল্যও ছিল। মধ্যভারতের গঁড় ও পর্‌ধান এবং ছোটনাগপুরের ওরাওঁ ও বীরহোড় জাতির বিবাহোপলক্ষে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ পরস্পর আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের বিবাহাচারের অন্তর্ভুক্ত প্রথা। কিছুকাল পূর্বেও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের উচ্চতর হিন্দু সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।[১] বাঁকুড়া জিলার বাউরী জাতির মধ্যে ইহা আজিও প্রচলিত আছে।[২] ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁ জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথার সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চতম জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম জাতির একটি সামাজিক প্রথার যে এই প্রকার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুগভীর তাৎপর্যমূলক। সে যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে, এ'দেশে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে উচ্চতর সমাজে বাংলা ধাঁধার ব্যবহারিক ও আনুষ্ঠানিক মূল্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহা কেবল মাত্র শিশুর কৌতুক উপভোগ করিবার জন্য পল্লীর সমাজে কোন মতে বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু বর্তমান নাগরিক জীবনে এক শ্রেণীর নূতন ধাঁধার উদ্ভব হইয়াছে, ইহাকে নূতন সাহিত্যিক ধাঁধা বলা যায়। লৌকিক ধাঁধার সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহা কোন জনশ্রুতিমূলক (traditional) বিষয় লইয়া রচিত হয় না; যে-কোন বিষয় লইয়া ইহা রচিত হইতে পারে। লৌকিক ধাঁধা যেমন গার্হস্থ্য কিংবা সমাজ-জীবনের একান্ত পরিচিত বিষয় লইয়াই রচিত হয়, সাহিত্যিক ধাঁধা তাহা হয় না। লৌকিক ধাঁধার যেমন কোন রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না, সাহিত্যিক ধাঁধার তেমন নহে—ব্যক্তিবিশেষ নিজস্ব

১ এই তথ্যটির জন্য আমি শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ঋণী।

২ বিষ্ণুপুরের অধিবাসী শ্রীমাণিকলাল সিংহ মহাশয় আমাকে এই তথ্যটি জানাইয়াছেন।

বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা সাহিত্যিক ধাঁধা রচনা করিয়া থাকে, কিন্তু সমগ্র সমাজের সহজে রসবোধ হইতে লৌকিক ধাঁধার জন্ম হয়। সাধারণতঃ শিশু-পত্রিকা সমূহে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহাই নূতন সাহিত্যিক ধাঁধা। লৌকিক ধাঁধা মীমাংসা করিবার জন্য স্মৃতির দ্বারস্থ হইতে হয়, কিন্তু এই সাহিত্যিক ধাঁধা মীমাংসার জন্য মস্তিষ্কের নিকট আবেদন করিতে হয়—বুদ্ধি দ্বারা ইহার মীমাংসা হয়। অতএব ইহারা শিশুর উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও পরিণত-বয়স্ক অভিভাবকের সহায়তা ব্যতীত শিশু ইহার মীমাংসা করিতে পারে না। বাংলার একটি সুপরিচিত শিশু-মাসিক পত্রিকা হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

আদ্যভাগে সৃষ্টি করি অন্তেতে সংহার।
মধ্যভাগে পালি সবে—কি নাম আমার? ব্রহ্মহরি রুদ্র (শিশুসাথী)

এই ধাঁধাটির মীমাংসায় পৌছিতে হইলে সুপরিণত পৌরাণিক জ্ঞানের প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তিরও আবশ্যক হয়। এই বিশেষ পৌরাণিক জ্ঞান ও মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা যে শিশুর সহজ আনন্দ লাভের ব্যাঘাত হয়, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। লৌকিক ধাঁধা গুরুভার নহে—সেইজন্য স্মৃতির রাজ্যে ইহারা শরতের মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়ায়; ভারাক্রান্ত বলিয়া নূতন সাহিত্যিক ধাঁধা স্থাণুর মত অচল হইয়া পড়িয়া থাকে।

কিন্তু কতকগুলি ধাঁধা আছে, ইহারা লৌকিক ও সাহিত্যিক ধাঁধার মধ্যবর্তী—ধাঁধা-সম্পর্কিত লৌকিক জনশ্রুতি (popular tradition)র ভিত্তির উপরই ইহারা রচিত, তবে ইহাদের বহিরঙ্গ নূতন করিয়া পুনর্গঠিত হয়, তথাপি ইহারা লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া মৌখিক ধারাই অনুসরণ করিয়া থাকে; ইহাদিগকেও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাই সঙ্গত। রচনার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে একটি যুগোচিত পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহারা নূতন কোনও বিষয়-বস্তুর সন্ধান দেয় না, বরং তাহার পরিবর্তে লৌকিক ধাঁধার বিষয়-বস্তুই ইহাদের অবলম্বন হইয়া থাকে। আধুনিক যুগে বিশেষতঃ নাগরিক সমাজের মধ্যে ইহাদেরই নিদর্শন সর্বাধিক পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই—

কৃষ্ণ বরণ দু'খানি চরণ।
পেট কাটিলে নাই তার মরণ॥ —(পূর্ববঙ্গ), বড় পিঁপড়া

বলা বাহুল্য আমাদের পূর্বোদ্ধৃত একটি লৌকিক ধাঁধা অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে, ধাঁধার বহিরঙ্গগত গ্রাম্যতা দূরীকরণই ইহাদের পুনর্গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ; ধাঁধাটি এই—

লাল বরণ ছয় চরণ পেট্ কাটিলে হাঁটে। —(শ্রীহট্ট), আমপিঁপড়া

এই শ্রেণীর ধাঁধার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

আহার্য নয় কিন্তু খায় সর্বজন।
অনিচ্ছাতে বাধ্য হয় করিতে ভক্ষণ ॥
বৃদ্ধাতে খাইলে তাহা করে হায় হায়।
যুবকে খাইলে তাহা মরে যে লজ্জায় ॥
বালকে খাইলে তাহা করে যে রোদন।
এ হেন আশ্চর্য বস্তু ধরাতে কেমন ॥ —(পূর্ববঙ্গ), আছাড় খাওয়া

গায়েতে কণ্টকাকৃত সজারু সে নয়।
মানুষে পাইলে গন্ধ তখনি ছেদ হয় ॥ —(ঐ), কাঁঠাল

তিন বীর বার শির বত্রিশ লোচন।
ভূমিতে পড়িয়া বীর করে মহারণ ॥ (ঐ), পাশার ঘুটি

চাই নাকো তাবু খাই।
খেয়ে প্রাণে মারা যাই ॥ —(ঐ), মার খাওয়া

হাতে আছে হাতে নাই।
হাত বাড়ালে পেতে নাই ॥ —(ঐ), কনুই

অলি অলি পাখীগুলি গলি গলি যায়।
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখ খুব্‌লে খায় ॥ —(ঐ), ধোঁয়া

সবাকার ধরে শিরে নাহি ধরে কেশে।
হস্ত নাই পদ নাই ধরে কিসে—কে সে ? —(ঐ), মাথাধরা

হাতী নয়, ঘোড়া নয় মোটা মোটা পা।
তরু নয় লতা নয় ফুলে ভরা গা ॥ —(ঐ), পালঙ্ক

উদ্ধৃত ধাঁধাগুলির উত্তর হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা বাংলা ধাঁধার চিরন্তন বিষয়, প্রাচীনতম কাল হইতেই এই সকল বিষয় লইয়াই এ দেশে ধাঁধা রচিত হইতেছে, তবে ধাঁধাগুলির বহিরঙ্গে একটু আধুনিক সৌষ্ঠব দান করা হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা পূর্বোদ্ধৃত সাহিত্যিক

ধাঁধার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ; কারণ, সাহিত্যিক ধাঁধা সর্বদাই অভিনব বিষয়-বস্তুর সন্ধান করিয়া থাকে।*

*দ্রষ্টব্য :—মুন্সী আবদুল করিম, 'চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১২ বর্ষ (১৩১২), প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'কোচবিহারের হেঁয়ালী', ঐ, ১৫ বর্ষ (১৩১৫): দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, 'মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালী', ঐ, ১৯ বর্ষ (১৩১৯)। 'পূর্ব বাংলায় প্রচলিত হেঁয়ালী', আজাদ, (ঢাকা), ২৫শে সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৫৫ (১৩৬২ সাল)।

S. C. Mitra 'Riddles Current in the District of Sylhet', *J. A. S. B.* Vol. XIII, (N. S.) pp. 105-25. 'Riddles Current in the District of Chittagong', *Journal of the Anthropological Society of Bombay* Vol. XI. pp, 296-327 and 960-79 ; Vol. XII, pp, 359-68 ; Vol. XIII pp. 657-72. A few Riddles Current in the District of Pabna' Vol. XI, pp. 327-36, 'Riddles Current in the District of Murshidabad' Vol. XI, pp, 918-39.

Verrier Elwin and W. G. Archer 'An Indian Riddle Book', *Man in India*, Vol. XXIII (1913), pp. 267-315. 'Extracts from a Riddle Note Book', ibid, pp, 216-341.

ভারতবর্ষের আরও অন্যান্য অঞ্চলের ধাঁধার সঙ্গে বাংলা ধাঁধার তুলনার জন্য নিম্নলিখিত আলোচনাগুলি দ্রষ্টব্য।

J. Hinton Knowles, 'Kashmiri Riddles', *J. A. S. B.* Vol. LVI, pp. 125-54.

H. Kavyopadhyaya, 'A Grammar of the Chhattisgarhi Dialect', *J. A. S. B.* Vol. LIX, pp, 118-23.

S. C. Mitra, 'Riddles Current in Bihar', *J. A. S. B.* Vol. LXX, pp, 35-58 'Bihari Life in Bihari Riddles', *J. A. S. B.* Vol. VII, pp, 21-59.

P. Wagner, 'Some Kolarian Riddles current among the Mundaris in Chhota Nagpur *J. A. S. B.* Extra No. 1904, pp, 62-79 ;

S. S. Mehta, 'Some Riddles prevalent among the women of Guzrat' *J. Anth. S. Bom.*, XV, pp. 111-23, 129-38.

P. N. Munshi, 'A Few Parsee Riddles', *J. Anth. S. Bom.*, Vol. X, pp. 409-25 ; [E. Hedberg, Proverbs and Riddles current among the Bhils of Khandesh' *J. Anth. S. Bom.*, XIII, pp. 354-94.]

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রবাদ

প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি ; ইহা এক দিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনই অন্য দিক দিয়া আধুনিক—ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন, আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক। বিভিন্নমুখী ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বহু-পরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই ইহার লক্ষ্য—রূপক ও বক্রোক্তি প্রধানতঃ ইহার অবলম্বন। ইহা যেমন ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের কর্তব্য নির্দেশক, তেমনই সম্পাদিত কার্যাবলীরও রূঢ় সমালোচক। প্রবাদ-সম্পর্কে একটি স্পেনদেশীয় উক্তি আছে যে, 'A proverb is a short sentence based on long experience' অর্থাৎ প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। প্রবাদের ইহাই সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রবাদের যে কি রূপে উৎপত্তি হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এ'কথা সত্য যে, ব্যক্তিবিশেষের জীবনের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মনেই কোন সময় একটি তাৎপর্যমূলক বাক্যের উদ্ভব হয়। সে তাহার নিজের ভাষায় তাহা সমাজের মধ্যে ব্যক্ত করে। সমাজের দশজন তাহা শুনিয়া'যদি বুঝিতে পারে যে, অনুরূপ অভিজ্ঞতা তাহাদের জীবনেও কোনদিন সম্ভব হইয়াছিল, কিংবা হইতে পারে, তখন বাক্যটি তাহারাও গ্রহণ করে—তাহাদের দশজনের মুখে পড়িয়া বাক্যটির একটি সুমার্জ্জিত রসরূপ প্রকাশ পায়, অবশ্য এই রসরূপ যে দশজনই দিয়া থাকে, তাহা নহে—দশজনের মধ্য হইতে একটি বিদগ্ধ মনই ইহার এই রসরূপটির পরিকল্পনা করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহাতে সত্য এবং রসের যে আবেদন থাকে, তাহার জন্যই একজনের প্রদত্ত রসরূপটি দশজন সহজেই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার এই রসরূপটিই তখন সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে, শ্রুতি-পরম্পরায় তাহাই সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া যায়—ইহাই প্রবাদ।

দার্শনিক সত্য ও প্রবাদের সত্যে পার্থক্য আছে। দার্শনিক সত্য পরম সত্য, ইংরেজিতে ইহাই ultimate truth; কিন্তু প্রবাদের সত্য দশজনের অভিজ্ঞতামূলক সত্য। এই সম্পর্কে একটি সুন্দর বাংলা প্রবাদ আছে, যেমন, 'দশজন রাজি যেখানে, খোদা রাজি সেখানে' অর্থাৎ দশজন যে কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করে, ঈশ্বরের নিকটও তাহাই সত্য। অতএব, প্রবাদ দার্শনিক সূক্ত নহে—ইহা বাস্তব মানব-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সৃষ্ট; এই গুণেই ইহা সাহিত্য। এই সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদগুলি উল্লেখযোগ্য—

The voice of the people is the drum of God. (*Panjabi*)
Everybody's voice is God's voice. (*Japanese*)
The voice of the people is the voice of God. (*Latin*)
A proverb is the voice of God. (*Spanish*)
The people's voice the voice of God we call. (*English*)

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক যে সত্যোপলব্ধি, তাহাই প্রবাদের সত্যোপলব্ধি। ব্যক্তি ও সামাজিক অভিজ্ঞতা মাত্রই আপেক্ষিক; কারণ, সামাজিক অবস্থা সর্বদাই পরিবর্তনশীল; সেইজন্য বিশেষ কোন সময়ের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা হইতে ইহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব, বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখীও হইতে পারে। এই বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতা হইতে যদি প্রবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহা কোন কোন সময় পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতার্থও প্রকাশ করিতে পারে। সেইজন্য কোন বিষয়ের স্বপক্ষেও যেমন প্রবাদ প্রচলিত আছে, আবার তাহার বিপক্ষেও তেমনই প্রবাদ প্রচলিত থাকিতে পারে। শ্যালক সম্পর্কে নিন্দাসূচক এই প্রবাদটি শুনিতে পাওয়া যায়,

সাপ, শালা, জমিদার।
তিন নয় আপনার॥

আবার তাহার প্রশংসাসূচক প্রবাদও আছে; যেমন,

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা॥

জীবনের প্রায় সকল অভিজ্ঞতারই স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে এমন বহু প্রবাদ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে একজন ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'proverbs are crystalized forms of human experience, and as human experience gives no definite solution to any problem, proverbs cannot do so either.' অবশ্য ইহা দ্বারা এ'কথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রবাদের মধ্যে পরস্পর বিপরীতার্থক উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া, তাহা দ্বারা জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। বরং ইহার মধ্যে বিভিন্ন দিক হইতে জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পায়; সেইজন্য ইহাতে জীবনের বহু সমস্যারই সমাধানের ইঙ্গিত থাকে, তবে কাহারও প্রকৃত সমাধান থাকে না।

প্রবাদ সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অকপট অভিব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও একই দেশে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে যে অনেক সময় এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে একজন ইতালীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'the variety of the vicissitudes of human nature are such that with the exception of a few fundamental principles that form the basis of life, every one of our experiences offers us contrary aspects in which the good and the evil, which may be observed or deducted in any event, are disciplined. ইহার মর্মার্থ এই—মানব-জীবনের গভীরতম স্তরে কতকগুলি মৌলিক বিষয় আছে, সেখানে প্রত্যেক মানুষেরই অভিজ্ঞতা অভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু ইহার উপরি-স্তরে যেখানে নিত্য মানুষের বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিতেছে, সেখানে তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐক্য নাই বরং অনেক সময় বৈপরীত্য দেখা যায়। অতএব জীবনের কোনও মৌলিক বিষয়-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষে মানুষে যেমন ঐক্য প্রকাশ পায়, তেমনই ইহার উপরি-স্তরের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে বিরোধও দেখা দিতে পারে। অতএব যেখানে জীবনের একটি নিগূঢ় সত্য প্রকাশ পায়, সেখানে প্রবাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু জীবনের উপরি-স্তরের লঘু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্বদাই বিরোধ দেখা দিয়া থাকে; কারণ, এই ক্ষেত্রে সকলের অভিজ্ঞতা এক নহে। মনে হয়, এই উক্তিটির একটু গুরুত্ব আছে।

সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে মনে হইতে পারে যে, প্রবাদের মধ্য দিয়া যে ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ কোনও জাতির বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে একটি সর্বজনীন ভাবই প্রকাশ পায়। কিন্তু এ'কথা সত্য যে, ইহার এই সর্বজনীন ভাব যেমন সর্বজনীন কোন ভাষার পরিবর্তে বিশেষ কোন জাতির নিজস্ব ভাষার ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়, তেমনই ইহার বহিরঙ্গেও সেই জাতিরই পরিচয় মূর্ত হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া ইহা সর্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও, কোনও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বর্জিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে সত্যের সন্ধান করা হয়, দেশে দেশে তাহাতে ঐক্য আছে, কিন্তু সাহিত্যের রূপের মধ্যে দেশে দেশে ঐক্য নাই। অতএব ভাবের দিক দিয়া সাহিত্যের মধ্যে একটি সর্বজনীনত্ব থাকিলেও, ইহার বহিরঙ্গ রূপের জন্যই এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র। প্রবাদ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অতএব একজন ফরাসী পণ্ডিত যে বলিয়াছেন—'I doubt whether any proverbs are truly national.' তাঁহার এই কথা স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বেকন বলিয়াছেন, 'The genius, wit, and spirit of a nation are discovered by their proverbs.'

কেহ কেহ মনে করেন, প্রবাদসমূহের জাতীয় কিংবা ভৌগোলিক বিভাগের পরিবর্তে ইহাদের সম্পর্কে সাংস্কৃতিক বিভাগ নির্দেশ করাই কর্তব্য; যেমন, পৃথিবীর সকল কৃষিজীবী সমাজের প্রবাদ এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এই দাবিও সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ, প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর কৃষিকার্য নির্ভর করে; কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র প্রাকৃতিক অবস্থা এক নহে। অতএব এই বিষয়ক বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমার মধ্যবর্তী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ইহাদের প্রবাদের মধ্যেও ঐক্য থাকিবার কোনও কারণ নাই। বাংলার খনার বচনের মধ্যে আবহাওয়া সম্পর্কিত যে-সকল উক্তি প্রবাদের রূপ লাভ করিয়াছে, উত্তর প্রদেশ কিংবা পাঞ্জাবের কৃষকদিগের নিকট তাহাদের কোনও ব্যবহারিক মূল্য নাই। মৌলিক জীবন-বোধ সম্পর্কে যে সকল অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রবাদের মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সত্যোপলব্ধিতে কৃষিজীবী সমাজ, মৃগয়াজীবী সমাজ ও নাগরিক সমাজে কোনও পার্থক্য নাই। অতএব সাংস্কৃতিক পরিচয় দ্বারা প্রবাদের বিভাগ নির্দেশ করা যায় না।

প্রবাদের মধ্য দিয়া কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রচারিত হয় না—সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়ই ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয় মাত্র। অতএব,

অহিংসা পরম ধর্ম ॥
যথা ধর্ম তথা জয় ॥

এই সকল সদুক্তি প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্য দিয়া বাস্তব জীবনের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে এক উচ্চ ধর্মীয় নীতির আদর্শই প্রচার করা হইয়াছে। যে জন্য ধর্মীয় কোন বিষয়-বস্তু লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না বলিয়া পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি, সেই জন্যই কোন ধর্মবিষয়ক তত্ত্ব কিংবা মতও কিছুতেই প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

উচ্চ-সাধনা-লব্ধ আধ্যাত্মিকতা-বোধ কিংবা বিশিষ্ট ধর্মের কোন নৈতিক মতবাদ প্রবাদের বিষয়ীভূত না হইলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ সমাজ-নীতি সর্বদাই ইহার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ; যেমন,

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ॥
সসর্পে গৃহে বাস ॥

কারণ, ইহা ধর্মমত নহে, বরং ইহা লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানব মাত্রেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। কোন কোন সময় কোন প্রবাদের মধ্য দিয়া লৌকিক দর্শনের সহজ-বোধ্য সত্য যে প্রকাশ না পায়, তাহাও নহে, যেমন—

আস্‌তেও একা যেতেও একা।
কার সঙ্গে কার দেখা ॥
মহতের ধর্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে ॥
মহতের বাত, হাতীর দাঁত পড়ে ত নড়ে না ॥

মানব-সমাজে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মৌখিকভাবে প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায় ; লেখার প্রচলন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিখিয়া রাখিবার প্রথাও প্রচলিত হয়। প্রাচীন মিশরের *Book of the Dead* নামক গ্রন্থে যে সকল প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা খৃঃ পূঃ ৩৭০০ অব্দে মিশর দেশে প্রচলিত ছিল। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে Ptah-hotep তাঁহার প্রচারিত উপদেশাবলীর মধ্যে বহু প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

গ্রীক্ দার্শনিক এরিষ্টোটল্ই প্রথম প্রবাদ-সংগ্রাহক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সংগৃহীত প্রবাদগুলি দুই হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন গ্রীক্ দেশে প্রচলিত ছিল। এরিষ্টোটল্ প্রবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা 'fragments of an elder wisdom', অর্থাৎ প্রাচীন সমাজের বুদ্ধিমত্তার ইহারা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচয়।

লোক-সাহিত্যের অন্যান্য সকল বিষয়ের তুলনায় প্রবাদ এক দেশ হইতে অন্য দেশে সর্বাপেক্ষা সহজে প্রচার লাভ করিতে পারে—কারণ, ইহাদের আকার সংক্ষিপ্ততম এবং ইহাদের মধ্য দিয়া দেশকাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত মানব-জীবনের নিতান্ত বাস্তব তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়া থাকে। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রবাদের মধ্যে যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে কেবল এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রচারের ফল, তাহা নহে। প্রবাদ মানব-জীবনের সাধারণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও রচিত হয়; অতএব একই বিষয়ক প্রবাদ বিভিন্ন দেশে প্রায় অভিন্নরূপেই শুনিতে পাওয়া যায় 'Men are all made of the same paste', এই সূত্রে মানুষ তাহার জীবন-সংগ্রামের পথে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাহা সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন। প্রবাদের মধ্য দিয়া সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পায়। সেইজন্য একই বিষয় সম্পর্কে দেশ-দেশান্তরের প্রবাদও প্রায় অভিন্ন হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতে এ'কথা কিছুতেই মনে হইতে পারে না যে, এত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির অধিবাসীর মধ্যে বিশেষ কোন জাতির একটি মাত্র প্রবাদ এইভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে, যেমন—

মাছ আর অতিথি, দু'দিন পরেই বিষ। (বাংলা)

Fresh fish and new-come guests smell in three days.
(*English*)

Guests and fish will get old on the third day
(*Estonian*)

After three days fish and a guest who tarries become odious. (*Czech*)

Guests and fish stink on the third day. (*Montenegrin*)

Fish and guests in three days are stale. (?)

অবশ্য এ'কথা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, কোন কোন ইংরেজি প্রবাদ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার লাভ করিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক দেশের সাংস্কৃতিক উপকরণ অন্য দেশে সহজে গৃহীত হইতে পারে না। একজন ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন,—'similar conditions lead to similar culture.' অতএব যে দেশে ইংরেজি কোন প্রবাদ প্রচার লাভ করিবে, সে দেশের সংস্কৃতি ইংরেজের সংস্কৃতির অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রবাদ এই প্রকার—

As the country so the proverb. (*German*)

As the people so the proverb. (*Scottish*)

The bark of one tree will not adhere to the bark of another tree. (*Masai*)

এক গাছের ছাল কি আর গাছে লাগে ? (বাংলা)

যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ইংরেজ ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যে অভিন্ন, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না ; অতএব ইংরেজি প্রবাদ যে বাংলা কিংবা অন্যান্য সুদূর দেশে প্রচার লাভ করিতে পারিবে, তাহা নহে। সুতরাং উপরে অতিথি সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির যে প্রবাদগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই স্বাধীন উদ্ভবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রচারের ফল নহে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কতকগুলি প্রবাদের মধ্যে কখনও কখনও চিত্র ও ভাবগত এমন ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদিগকে প্রত্যেক দেশে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত বলিয়া মনে করাও অত্যন্ত কঠিন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যেমন—

পর্বতের মূষিক প্রসব। (বাংলা)

The mountain labors, and a ridiculous mouse is born. (*Horace*)

নেংটার বাটপাড়ে ভয় নাই। (বাংলা)

The pauper fears no robbery. (*Yiddish*)

খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়। (বাংলা)

He that by the plough would thrive,
Himself must either hold or drive.

বিষে বিষক্ষয়। (বাংলা)

Poison drives out poison. (*Italian*)

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই প্রকার প্রবাদ যে প্রত্যেক দেশেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে, লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ তাহাই মনে করিয়া থাকেন। মানব-চরিত্রের আভ্যন্তরিক কতকগুলি বৃত্তিগত ঐক্যই ইহাদের ঐক্যের কারণ—এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রচারের ফলে ইহাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয় নাই। প্রবাদগুলির এই প্রকার ঐক্য হইতেই মানব-চরিত্রের মধ্যে বিশ্বব্যাপী যে এক অখণ্ড ঐক্য আছে, আমরা তাহারই সন্ধান পাই। ইহার আরও একটি দৃষ্টান্ত দিব। গার্হস্থ্য জীবনে পৃথিবীর সর্বত্রই শাশুড়ী বধূর অবাঞ্ছিত। শাশুড়ীর সম্পর্কিত বধূর এই মনোভাবটি বিভিন্ন দেশের প্রবাদের ভিতর দিয়া এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

শাশুড়ী ম'ল সকালে।
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে। (বাংলা)

Happy is she who marries the son of a dead mother. (*English*)

The husband's mother is the wife's devil. (*German*)

Give up all hopes of peace so long as your mother-in-law lives. (*Latin*)

The mother-in-law remembers not that she was a daughter-in-law. (*Spanish*)

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আভ্যন্তরিক চরিত্রগত যে এক অখণ্ড ঐক্য আছে, এই প্রবাদগুলির ভিতর দিয়া তাহারই সন্ধান পাওয়া যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে তারতম্য থাকিলেও শাশ্বত মানবিক বৃত্তিগুলি সেই অনুযায়ী যে সর্বত্র সকল সময় নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহাও প্রকাশ পায়।

উপরে যে প্রবাদগুলি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা সকলই বধূ ও শাশুড়ী বিষয়ক বলিয়া এই সম্পর্কে একটি কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, নারী অধিকতর রক্ষণশীল ; সেইজন্য পৃথিবীর সর্বত্র নারীর অন্তর্নিহিত চরিত্রগুণের মধ্যে কোনও পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। এ'কথা অবশ্য কতকটা স্বীকার

করিতেই হয় ; তথাপি কেবলমাত্র নারী-সম্পর্কিত প্রবাদের মধ্যেই যে পৃথিবী ব্যাপিয়া ঐক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা নহে—পুরুষ-সম্পর্কিত প্রবাদের মধ্যেও এই প্রকার ঐক্যের অভাব নাই। অতএব চিরন্তন পুরুষ এবং চিরন্তন নারীর মধ্যে যে-সকল সাধারণ বৃত্তির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহারা রচিত হয়, সেইজন্যই ইহাদের চিত্র ও ভাবগত ঐক্য আমাদিগকে সময় সময় চমৎকৃত করে।

মানব-চরিত্রের অন্তর্নিহিত ও স্বভাব-সুলভ সাধারণ বৃত্তিগুলির পরিবর্তে যেখানে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের বহিরূপকরণ অবলম্বন করিয়া প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে, সেখানে বিভিন্ন দেশের প্রবাদের মধ্যে এই প্রকার ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গরু সম্পর্কিত প্রবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গরু পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহপালিত জীব। নানাভাবে ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন জাতি ইহা দ্বারা বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সাধন করিতেছে ; অতএব ইহার সম্পর্কিত প্রবাদগুলির ভিতর দিয়া কোনও মৌলিক ঐক্য গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার গরু-সম্পর্কিত কতকগুলি প্রবাদের সঙ্গে এই বিষয়ক পাশ্চাত্ত্য কতকগুলি প্রবাদের তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে যে অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক অনৈক্যই ইহার মূল—

গরু খেলে বাড়ে ছাগলে খেলে মুড়িয়ে যায়॥
গরুতে না চিনে হাল, মানুষে না চিনে কাল॥
গরু তোরে বেচ্‌ব না।
এখানেও ঘাস-জল সেখানেও ঘাস-জল॥
গরু না বিয়তে ঘিয়ের দর॥
গরু বিকায় ঠাটে, কাপড় বিকায় পাটে॥
গরু মর্‌বে ধর্‌বে তুলে, মানুষ মর্‌বে ধর্‌বে চেপে॥
গরু মেরে গোলোকে বাস, গঙ্গাস্নানে সর্বনাশ॥
গরু মেরে জুতো দান॥
গরু যার গোবর তার॥
গরুর ইচ্ছায় হাল চয় না॥

গরুর দোষে গয়লা নষ্ট ॥
গরুর পিরীত চেটে, মানুষের পিরীত সেঁটে ॥
গরুর বাঁটে গোবর দেওয়া ॥
গরুহাল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার ॥
এক গোয়ালের গরু ॥
কাজীর গরু খোদা রাখাল ॥
কানা গরু বামুনকে দান, বামুন বলে আন আন ॥
কানা বা কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ ॥
দুধ দেয় গরুর লাথটিও ভাল ॥ ইত্যাদি

পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত গরু-সম্পর্কিত নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদগুলির সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত এতৎসম্পর্কিত প্রবাদের বিশেষ কোনও ঐক্য অনুভূত হইবে না। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, কত বিভিন্নমুখী ক্ষেত্র হইতে এই বিষয়ক প্রবাদ সমূহের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে—

It is well that wicked cows have short horns. (*Dutch*)
Milk the cow but don't pull off the udder. (*Dutch*)
A cow is good in the field, but we turn her out of a garden. (*English*)
A lowing cow soon forgets her calf.
A red cow gives good milk.
All is not butter that comes from the cow.
Barley straw is good fodder when the cow gives water.
If you sell the cow you sell her milk too.
Let him who owns the cow take her by the tail.
Many a good cow hath an evil calf.
The cow licks no strange calf.
The cow knows not what her tail is worth till he has lost it.
Who'd keep a cow, when he may have a quart of milk for a penny ?

The cow from afar gives plenty of milk. (*French*)
The old cow thinks she never was a calf. (*French*)
The cows that low must give the least milk. (*German*)
Milk the cow which is near. (*Greek*)
Bring the cow to the hall and she'll run to the byre.
(*Scottish*)
A dead cow gives no milk. (*Yiddish*)
What use is a cow that gives plenty of milk, if she kicks pail over? (*Yiddish*)

বাংলায় গরু-সম্পর্কিত যে শতাধিক প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় কোনটির সঙ্গেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত এই সম্পর্কিত প্রবাদের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এ'কথা সত্য যে, গরু ব্যবহারিক জীবনের এত ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়া থাকে যে, সকল দেশেই ইহার সম্পর্কিত প্রত্যেকটি প্রবাদ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব, তথাপি সংগৃহীত প্রবাদগুলি সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলাদেশে প্রচলিত এই বিষয়ক প্রবাদগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশীয় প্রবাদগুলির বিশেষ কোনও ঐক্য নাই। কিন্তু অতিথি ও শাশুড়ী সম্পর্কিত যে প্রবাদগুলি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের সম্পর্কে এ'কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, ইহাদের প্রেরণা এক একটি অন্তর্মুখীন ও শাশ্বত মানবিক বৃত্তি হইতে জাত।

একই দেশের বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে যখন কোন কোন সময় অর্থগত বিরোধ পাওয়া যায়, তখন বিভিন্ন দেশের প্রবাদের মধ্যেও যে এই বিরোধ দেখা যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব বিভিন্ন দেশের এই প্রকার বহির্মুখী জীবন-সম্পর্কিত প্রবাদের মধ্যে যে কেবল অনৈক্যই দেখা যায়, তাহা নহে—অনেক সময় সুস্পষ্ট বিরোধও দেখা যায়। ইহার কারণ, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফল কোন কোন সময় বিভিন্ন হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। বাংলা প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায়—

কালো গরুর দুধ ভালো।

কিন্তু একটি ইংরেজি প্রবাদে আছে—

A red cow gives good milk

উপরি-উদ্ধৃত একটি বাংলা প্রবাদে আছে যে,—'দুধ দেয় গরুর লাথটিও ভাল'; একটি পাশ্চাত্ত্য প্রবাদে তাহার পরিবর্তে শুনিতে পাওয়া যায়, 'What use is a cow that gives plenty of milk, if she kicks the pail over ?' পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের কোন সমস্যারই যেমন কেহ সমাধান করিতে পারে নাই, প্রবাদের ভিতর দিয়াও তাহার কোন সমাধান পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্য দিয়া বিশিষ্ট এক একটি লোক-সমাজের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু কোনও চরম সত্য প্রকাশ পায় না।

কোন কোন প্রবাদ-রচনার মূলে ব্যক্তিবিশেষের নাম আরোপ করা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে যেমন সোলোমন, সক্রেটিশ, প্লেটো প্রভৃতির নামে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাংলাদেশেও খনা, ডাক ও রাবণের নামে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, ইহারা কেহই এখানে বিশেষ ব্যক্তি নহে, ইহারা নির্বিশেষে চরিত্র মাত্র। লোক-সমাজে ইহাদের প্রত্যেকেরই পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতেই তাহাদের নাম প্রবাদগুলির সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে বাংলা দেশের একটু পার্থক্যও অনুভব করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে যাঁহাদের নাম প্রবাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কিন্তু বাংলা প্রবাদের সঙ্গে যাহাদের নাম সাধারণতঃ যুক্ত হইয়া আছে, তাহারা অনৈতিহাসিক জনশ্রুতিমূলক চরিত্র মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, খনা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, ইহার অর্থ খাঁদা নাক। ডাক ও রাবণ অনৈতিহাসিক চরিত্র। অতএব বাংলা প্রবাদের সঙ্গে ইহাদের নাম যুক্ত হইবার জন্য ইহাদের লোক-সাহিত্যগত মূল্য হ্রাস পাইতে পারে নাই।

তবে এ'কথা সত্য যে, বাংলা সাহিত্যে 'অন্নদা-মঙ্গল' রচয়িতা ভারতচন্দ্রের কতকগুলি পদ প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। যেমন,

১। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায় না সম্ভাষে।

৩। হাবাতে যত্তপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।

৪। বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।

৫। খুঞা তাঁতি হ'য়ে দেহ তসরেতে হাত।

৬। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

৭। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

৮। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।

৯। নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

১০। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ?

১১। গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।

১২। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

১৩। যার কর্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।

১৪। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।

১৫। সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥ ইত্যাদি

অবশ্য এখানে বিচার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্রেরই কতকগুলি পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে, না ভারতচন্দ্রই কতকগুলি লৌকিক প্রবাদ-বাক্যকে নিজে এক একটি সাহিত্যিক রূপ দিয়া তাঁহার কাব্যমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ব্যবহৃত বহু প্রবাদ আধুনিক বাংলায় ইহাদের লৌকিক রূপ রক্ষা করিয়া চলিতে দেখা যায়; অতএব ইহাদিগকে লোক-মুখ হইতেই সংগ্রহ করিয়া কাব্যে স্থান দেওয়া অসম্ভব নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'রোগের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ, এ'সবার শেষ রাখ্‌তে নেই।'—আধুনিক বাংলায় প্রচলিত এই প্রবাদটি মধ্যযুগের কবিগণ এই ভাবে তাঁহাদের কাব্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন—

ব্যাধি-অগ্নি-রিপু-ঋণ একই সমান।—কাশীরাম
রোগ-ঋণ-রিপু না রাখিব অবশেষে।—ঘনরাম
ব্যাধিশেষ শত্রুশেষ রাখা বিধি নয়।—মাণিকরাম

ভারতচন্দ্রও কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ এই ভাবেই তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন কি না, তাহা অনুসন্ধান না করিয়া এই বিষয়ে কিছুই বলিতে পারা যাইবে না। তবে ভারতচন্দ্র যে-সকল প্রবাদ তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের কোনও আধুনিক লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, অতএব ইহারা তাঁহার মৌলিক রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রবাদ মাত্রই সমাজ জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইজন্য সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত বিষয়মূলক প্রবাদও পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু তাহা পরিবর্তিত ও নূতন সমাজের উপযোগী করিয়া কমই লওয়া হয়। হাজার বছরের প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদে এই কয়টি বাংলা প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়াছিল, যথা—

১। আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী। (ভুসুকু)
২। গুরু বোব সে সীসা কাল। (ঐ)
৩। বর সুণ গোহালী কি সো দুঠ্‌ট বলন্দে। (সরহ)
৪। হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ। (ঐ)
৫। দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ। (ঢেণ্ডন)
৬। হাঁড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী। (ঐ)
৭। রাজসাপ দেখি জো চমকাই তং কিং বোড়ো খাই। (ভুসুকু)

ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র নিম্নলিখিত প্রবাদগুলি আধুনিক বাংলায় এই ভাবে রক্ষা পাইয়াছে—

৩। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
৪। হাতে শাঁখা দর্পণে দেখা।
৫। দোয়া দুধ বাঁটে সামায় না।

অন্যগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক হাজার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাই ইহাদের পরিবর্তনের কারণ। এখানে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় আছে এই যে, যে-কয়টি প্রবাদ সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি প্রাচীন প্রবাদেরই আধুনিক বাংলা রূপ মাত্র, ইহাদের মধ্যে চিত্র কিংবা ভাবগত কোন পরিবর্তন হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনের নূতন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোন প্রবাদই সংস্কার লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস পায় না; ইহারা লুপ্ত হইয়া গেলেও পরিবর্তিত হয় না, বরং তাহাদের পরিবর্তে নূতন প্রবাদের উদ্ভব হইতে পারে।

বাংলা ভাষায় এ' পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার প্রবাদ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, এই দশ হাজার প্রবাদই আধুনিক চলতি কিংবা সাধু ভাষায় প্রচলিত আছে। প্রায় দশ হাজার প্রবাদ বাংলা প্রবাদ-

সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইলেও প্রকৃতপক্ষে চলিত কথা কিংবা লিখিত সাহিত্যে বর্তমানে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প এবং আধুনিক নাগরিক জীবন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ও লিখিত বাংলায় ইহাদের প্রবাদ ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে। সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

জীবনের গুরুতর দিকটির প্রতি প্রবাদের সর্বদা লক্ষ্য থাকিলেও, অনেক সময় একটি নিতান্ত লঘু রস-পরিবেশের ভিতর দিয়া ইহার ভাব প্রকাশ করা হয়। তাহা না হইলে প্রবাদ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত না হইয়া সমাজ-বিজ্ঞান বা দর্শনের পর্যায়ে স্থান পাইত। অনেক সময় কোন চিত্র অতিরঞ্জিত করিয়াও রসসৃষ্টি করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উপদেশমূলক বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদের মধ্য দিয়া রসসৃষ্টি করিবার দায়িত্বও সুকৌশলে পালন করা হইয়াছে। বাংলা প্রবাদের ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্ম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

আসল ঘরে মশাল নাই ঢেঁকি শালে চাঁদোয়া ॥
আসুন মশায় বসুন খাটে।
পা ধোও গে গেড়ের ঘাটে, জল খাও গে মাঠে বাটে ॥
আসলেন বাবু বসলেন ঘরে, প্রাণ গেল তোয়াজ করে ॥
আহ্লাদী যায় মরতে, তিন ফুল যায় ধর্‌তে।
ও আহ্লাদী মরিস্‌নি, লোক-হাসানো করিস্‌নি ॥
আহ্লাদী লো ঝি, তোকে ঝোড়া ঢাকা দি'।
তোকে উদ্‌ বেড়ালে খাউ, মোর মনের দুঃখ যাউ ॥
আহ্লাদী লো ঢেপের খই, এত আহ্লাদ পেলি কই ॥
আহ্লাদে আট্‌খানা, লেজামুড়ো দশখানা ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবাদের মধ্য দিয়া সামাজিক আচরণের সুকঠোর সমালোচনা করা হয়। সেই সূত্রে জাতীয় জীবনের ত্রুটিগুলির উপর তীব্র কটাক্ষই ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়, ইহার গুণ সম্পর্কে ইহাদের মধ্যে কোনও উল্লেখ থাকে না। অতএব কেবল মাত্র প্রবাদ-সংগ্রহ হইতে কোন জাতিসম্পর্কে যদি কোন ধারণা করা যায়, তবে ইহার ত্রুটির দিকটাই প্রকাশ পাইবে, ইহার কোন গুণের পরিচয় প্রকাশ পাইবে না। নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদ-

গুলির মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের ত্রুটির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে, কাহারও কোন গুণের কথা প্রকাশ পায় নাই, যেমন—

অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুট্‌তে খরতর ॥
অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু ॥
অকালে বাড়ে সকালে মর্‌তে ॥
অকেজো নাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর ॥
অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড় ॥
অঘটির ঘটি হ'লো, জল খেতে-খেতে প্রাণটা গেল ॥
অজাত পুত্রের নামকরণ ॥
অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হ'লে মনস্তাপ ॥
অতিভক্তি চোরের লক্ষণ ॥
অদন্তের দাঁত হ'ল, কামড় খেতে প্রাণটা গেল ॥

জাতির প্রবাদ-সংগ্রহ দ্বারা আধুনিক সাহিত্য-রসিকের প্রয়োজন অপেক্ষা সমাজতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিদের প্রয়োজন অধিক; ভাষাতত্ত্ববিদেরও ইহাতে প্রয়োজন অল্প নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে যে, আধুনিক সাহিত্য-রসিকেরই ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অল্প। কারণ, ইহার দ্বারা তাহার কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কিংবা প্রাচ্য কোনও সাহিত্যিকই নিজেদের রচনায় প্রবাদ ব্যবহার করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন না। কিন্তু প্রবাদ জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় অতি মূল্যবান্ উপকরণ। প্রবাদের কোন নির্বাচিত সংগ্রহ দ্বারা নৃতত্ত্ববিদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না—নির্বিচার সংগ্রহেই তাঁহার প্রয়োজন। কারণ, সমগ্র ভাবেই সমাজকে তাঁহার জানা আবশ্যক। সাহিত্য-রসিকের নিকট কোন প্রবাদ 'শ্লীল' কিংবা 'অশ্লীল' বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু নৃতত্ত্ববিদের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনায় সমাজের মধ্যে 'শ্লীল' কিংবা অশ্লীল' বলিয়া কিছুই নাই, তাঁহার নিকট সকলেরই মূল্য সমান। এই বিষয়ে একজন খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিৎ উল্লেখ করিয়াছেন,—An anthropologist is a tedious fellow who finds almost as much grist for his mill in bad proverbs as in good ones. It is not for him to extract the gold from the dross, so long as the material is authentic

evidence of how a given people actually speaks, thinks and believes. Nay, what from a civilized point of view seems crude, or even downright stupid, may yet for the folk concerned be the very quintessence of their peculiar wit and wisdom.'

আধুনিক রুচি-সম্পন্ন কোন কোন সমালোচক বাংলার আধুনিকতম বিশিষ্ট কোন প্রবাদ-সংগ্রহের মধ্যে 'অশ্লীল' প্রবাদের স্থান দিবার জন্য নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু যে সকল প্রবাদ লোক-সমাজ নিজেই সৃষ্টি এবং রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের রুচি-সম্পর্কিত বিচার করিবার ভারও লোক-সমাজের নিজেরই উপর, ব্যক্তিবিশেষের উপর নহে। অতএব লোক-সমাজের বহির্ভূত নাগরিক সমাজের রুচি দ্বারা ইহাদের রস-বিচার করা অসঙ্গত। উপরি-উদ্ধৃত পাশ্চাত্ত্য নৃতত্ত্ববিদের উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল আধুনিক রুচিসম্পন্ন সমালোচক ভ্রান্ত। সংগ্রহ যদি প্রামাণিক হয়, তবে নীতি কিংবা রুচির কোনও প্রশ্ন সেখানে আসিতে পারে না—লোক-সমাজের সামগ্রিক পরিচয় লাভ করিবার জন্য ইহাদের নির্বিচার সংগ্রহেরই প্রয়োজন, নির্বাচিত কিংবা আংশিক সংগ্রহ দ্বারা কোনও বিজ্ঞান-সম্মত মীমাংসায় আসিয়া উপনীত হইতে পারা যায় না।

প্রবাদ লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতর বাংলা সাহিত্যে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গিয়াছিল। বাংলার সমাজ-জীবনের মধ্যে তখন পর্যন্ত জাতীয় রসবোধের অভাব কিংবা নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা এমন সুদূরপ্রসারী হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর রস-চৈতন্যে তখনও ইহার স্থান ছিল। কোন বিষয় কিংবা অবস্থা প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী (effective) করিয়া ব্যক্ত করিবার জন্য সেই যুগে শক্তিশালী লেখকগণও প্রবাদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। সেক্সপীয়র যেমন তাঁহার কোন কোন নাটকের নামকরণেও প্রবাদের ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—*All's Well that Ends Well* ইত্যাদি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশেরও কয়েকজন প্রতিভাশালী নাট্যকার, যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র প্রবাদ দ্বারাই তাঁহাদের কয়েকটি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন, যেমন—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'কুড়ে গোরুর ভিন্ন গোঠ' ইত্যাদি। ইহাতে তাঁহাদের রচনার বক্তব্য বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের নিকট অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে বাংলায় প্রবাদের ব্যবহার যে অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্য কেহ কেহ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগত রুচিবোধকে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রবাদ লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতই লোক-সমাজের জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। লোক-সমাজের জীবন হইতেই ইহার উদ্ভব, লোক-সমাজের জীবনেই ইহার বিকাশ ও অবস্থান। লোক-সমাজের দেহ যতদিন অক্ষত থাকে, ততদিন ইহারও বিনাশ নাই। কিন্তু এই লোক-সমাজের জীবনেই যদি ভাঙ্গন দেখা দেয়, তবে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মত ইহাও স্বভাবতঃই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব ইহার মূল অত্যন্ত গভীর। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে নাগরিক জীবনে রুচির পরিবর্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলার পল্লীজীবনের সংহতি যদি বিনষ্ট না হইত, তবে ইহাদেরও প্রচলন কেহই রোধ করিতে পারিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলার পল্লীজীবনের সংহতি অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই জন্য সে যুগের সাহিত্যে প্রবাদের যত প্রচলন ছিল, বিংশ শতাব্দীতেই তাহা তেমন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান বাংলার সমাজ-জীবন যে দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, বাংলায় এ'পর্যন্ত যে-সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা ব্যবহারতঃ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হইয়া যাইবে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার যেমন সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। অতএব ইহা সমগ্রভাবে লোক-সমাজের অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিবর্তনেরই ফল—নাগরিক সমাজের রুচি-পরিবর্তনও ইহা হইতেই আসিয়াছে।

প্রবাদ লোক-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ততম বাহন; বিস্তৃত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় ইহাতে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সংহত হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ততা ও সর্বজনীন মানবিক ভিত্তির জন্যই ইহা যেমন নিজস্ব সমাজের মধ্যে সহজেই ব্যাপক প্রচার লাভ করে, তেমনই দেশান্তরেও ইহা সহজেই বিস্তার লাভ করিতে পারে। ইহাদের সংক্ষিপ্ততার গুণের জন্যই ইহারা নিরক্ষর লোক-সমাজের স্মৃতির উপর কোনও অনাবশ্যক ভার-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদগুলিই ইহার প্রমাণ—

অজগরের দাতা রাম ॥

অতি আশ সর্বনাশ ॥

অতি দর্পে হতা লঙ্কা ॥
অতি মন্থনে বিষ ওঠে ॥
অতি মেঘে অনাবৃষ্টি ॥
অতিলোভে তাঁতি নষ্ট॥
অতি সাধ অতি বিষাদ ॥
অনটনের দুনো ব্যয় ॥
অনাথের দৈব সখা ॥
অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া ॥
যে সয় সে রয় ॥

অতি-সংক্ষিপ্ততার জন্য ইহাদের অর্থবোধ কদাচ লুপ্ত হইতে দেখা যায় না। কারণ, ইহারা নিতান্ত নিরাভরণ বলিয়া ইহাদের অর্থ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

কোন কোন সময় প্রবাদ কোন লৌকিক কাহিনীর কোন সংক্ষিপ্ত অংশও হইতে পারে। কাহিনীর যে অংশটুকুর মধ্যে ইহার ঘটনা কিংবা সংলাপ সকল দিক দিয়া চরমোৎকর্ষ লাভ করে, তাহাই প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়া যায়। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পশ্চিম বঙ্গে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,—'এই রোগেই যে ঘোড়া মরে।' ইহার সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি এই—এক ব্যক্তি তাহার ঘোড়াটি তাহার এক বন্ধুর নিকট রাখিয়া কোথাও বেড়াইতে গিয়াছিল। বন্ধুটি অসাধু প্রকৃতির লোক ছিল। সে ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়া ইহার অর্থ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। বন্ধুটি ফিরিয়া আসিয়া যখন ঘোড়াটি চাহিল, তখন সে বলিল, ঘোড়াটি রোগ হইয়া মরিয়া গিয়াছে, ইহা সে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়াছে। বন্ধুটি বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তখন অপর বন্ধুটি বলিল, 'চল ভাগাড়ে তোমার ঘোড়া তোমাকে দেখাইয়া দিই, তবেই আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হইবে।' বলিয়া বন্ধুকে লইয়া ভাগাড়ের দিকে যাত্রা করিল। ভাগাড়ে গিয়া একটি মৃত গরুর কঙ্কাল দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'এই তোমার ঘোড়ার কঙ্কাল, ইহা চিনিয়া লও।' ঘোড়ার মালিক জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহার শিং হইল কি করিয়া?' তখন অসাধু বন্ধুটি বলিল, 'এই রোগেই যে ঘোড়া মরে।' এই উক্তিটি বাংলা প্রবাদ রূপে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গ হইতেও এই শ্রেণীর একটি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সেখানে একটি প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—'কিবা বিয়ার বিয়া, আবার

চিৎ বাজ্‌না।' ইহার সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি এই—বিবাহোপলক্ষ্যে বাজ্‌না বাজাইবার জন্য এক দল বাদ্যকর নিযুক্ত করা হইল। বিবাহের সময় ঢোল বাজাইতে বাজাইতে ঢুলী হঠাৎ পা পিছ্‌লাইয়া উঠানের মধ্যে পড়িয়া গেল, কিন্তু লোক-লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাটিতে চিৎ হইয়া পড়িয়াই ঢোল বাজাইয়া চলিল। বাদ্যকরের দলের এক ব্যক্তি এই বলিয়া প্রকৃত ব্যাপারটি গোপন করিল, 'কিবা বিয়ার বিয়া, আবার চিৎ বাজ্‌না।' ইহা হইতে সকলে বুঝিল যে, ঢোল বাজাইবার ইহা একটি ব্যয়সাধ্য প্রণালী। অনেক প্রবাদের মধ্যেই বহু বিস্তৃত কাহিনীর এই প্রকার অনেক অংশ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কাহিনীগুলি লোক-সমাজ যতই বিস্মৃত হইতেছে, প্রবাদগুলি ততই অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে।

এই প্রকার ঐতিহাসিক তথ্যের কোনও খণ্ডাংশ কিংবা অতীত সামাজিক জীবনের কোনও অস্পষ্ট চিত্র প্রবাদগুলির মধ্যে ধরা পড়ে; যেমন,

ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত ॥
নবাব সরফরাজ খাঁ ॥
রতন বাবুর নাতি স্বর্গে দেবে বাতি ॥
লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন ॥

কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবাদের সংখ্যা বাংলা ভাষায় খুব অধিক নহে। কারণ, বিশেষ অপেক্ষা নির্বিশেষ বিষয়-বস্তুই প্রবাদের অধিকতর লক্ষ্য।

প্রবাদ যে পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসে এবং সময়োপযোগী করিয়া আধুনিক কালে অল্পই রচিত কিংবা পরিবর্তিত হয়, তাহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ প্রমাণ বাংলার প্রবাদে কড়ার হিসাব ও কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ। বহুকাল হইল, এ'দেশে ইহাদের প্রচলন লুপ্ত হইয়া গিয়া সে'স্থলে পাই কিংবা পয়সার হিসাব প্রবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি বাংলা প্রবাদে কড়ি ও কড়ার যত উল্লেখ পাওয়া যায়, টাকা আনার তাহার একাংশেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিম্নে কড়া সম্পর্কিত কতকগুলি প্রবাদের উল্লেখ করা গেল—

আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল ॥
এক কড়ার মুরোদ নাই, ভাত মারবার গোঁসাই ॥
রাঙা ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়ার মূল ॥
গোবরে ধুতুরা ফুল, হাটে নে গেলে তিন কড়া মূল ॥

ঘরে নেই এক কড়া, তবু নাচে গায়ে-পড়া ॥
ঘরে নেই দু'কড়া, উঠোনময় কুঁকড়া ॥
চাচাই বল কাকাই বল কলাটি পাঁচ কড়া ॥
চার কড়ার চড়ুই চণ্ডীমণ্ডপে বাস ॥
চার কড়ার চেটাই নেই, চণ্ডীমণ্ডপে বসা ॥
চার কড়ার পিঠে খেয়ে বাপ্‌কে বলে শালা ॥
দিতে তিন কড়া নিতে পাঁচ কড়া ॥
নাটানী যায় হাটে।
চার কড়ার শিন্নি কিনে পথে পথে চাটে ॥
ষোল কড়াই কানা ॥
হাতে নেই কড়াবট, প্রাণ করে ছট্‌ফট্‌ ॥

শেষোক্ত প্রবাদটিতে কেবল কড়া-ই নহে, মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত অন্যতম হিসাব বট-এরও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। প্রবাদোক্ত কোন বিষয়ের অপ্রচলনের জন্য যখন ক্রমে সেই প্রবাদ সমাজের মধ্যে দুর্বোধ্য হইয়া উঠে, তখন তাহা ব্যবহারতঃ লুপ্ত হইয়া যায়। অতএব মনে হয়, সর্বশেষ প্রবাদটি সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইলেও, আধুনিক কালে ব্যবহারতঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কড়ার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গেলেও, ইহার অর্থ সমাজের মধ্যে সুস্পষ্টই রহিয়াছে এবং যতদিন ইহার অর্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি না হইবে, ততদিন ইহা প্রচলিত থাকিবে।

প্রবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বক্রোক্তি ও রূপক ইহার প্রধান অবলম্বন। প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজ-জীবনের কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনার পরিবর্তে ইহার মধ্য দিয়া বরং অপ্রত্যক্ষ (indirect) ভাবে তাহা ব্যক্ত হইয়া থাকে, যেমন—

অবাক করলে নাকের নথে।
কাজ কি আমার কানবালাতে ॥

নাকের নথ কিংবা কানবালা এখানে বক্তব্য বিষয় নহে, এই দুইটি বস্তু অবলম্বন করিয়া এখানে যে বিষয়টি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ইহার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ হইয়া আছে। এই উক্তিটির মধ্যে ব্যঙ্গের ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—ইহা শ্লেষাত্মক। ইহাতে বঞ্চিতা নারীর অভিমানের সুরটি ইহার স্বাভাবিক রস

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরম কৌশলে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহার অর্থ সহজ ও সরল ভাষায় এই—তোমার নিকট হইতে কিছুই পাই নাই, আর পাইব বলিয়া আশাও করি না। কিন্তু এখানে না পাওয়ার বেদনা মনের মধ্যে যে জ্বালা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই মুখের ভাষায় সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। যে দিব দিব করিয়া কিছুই কোন দিন দেয় নাই, তাহার নিকট আর কিসের আশা করা যায়? ইহাই এই প্রবাদটির বক্তব্য। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে এখানে যে প্রত্যক্ষ আঘাতটি করা হইল, তাহা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। বক্তব্য বিষয়টি আকর্ষণীয় করিবার জন্য এই প্রকার অপ্রত্যক্ষ ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বাংলা প্রবাদের ইহা একটি সাধারণ বিশেষত্ব।

কিন্তু প্রবাদের ভিতর দিয়া সর্বদাই যে এই প্রকার বক্রোক্তি কি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা নহে—কোন কোন সময় সমাজ-জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজ ও প্রত্যক্ষ ভাবেও ব্যক্ত হয়, যেমন—

অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ, তিনের রেখ না চিন।

স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক যে সকল প্রমাদ প্রচলিত আছে, তাহাদেরও এক একটি প্রত্যক্ষ মূল্য আছে, যেমন,

কানে কচু নাভিতে তেল।
কবিরাজ ফিরিয়া গেল॥

ইহাদের মধ্যে যে বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তাহাদিগকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করা হইলে, এই সকল প্রবাদের বাস্তব মূল্য হ্রাস পায়। সেইজন্য সাধারণতঃ এই শ্রেণীর প্রবাদের অর্থ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে রূপক কিংবা বক্রোক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। আবহাওয়া ও কৃষিকার্য-বিষয়ক প্রবাদগুলি সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য; কারণ, ইহাদেরও একটি বাস্তব মূল্য আছে। অতএব ইহাদের রচনায় প্রত্যক্ষতার গুণ খর্ব হইলে ইহাদের বাস্তব মূল্য হ্রাস পায়। সেইজন্য ইহারাও প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমন—

পূর্ণ আষাঢ় দখিনা বায়, সেই বৎসর বন্যা হয়॥
প্রথম বছরে ঈশানে বায়। হ'বেই বর্ষা কয় খনায়॥
কার্তিকের উনো জলে। দুনো ধান খনা বলে॥
বৈশাখী বোনা আষাঢ়ী রোয়া। জায়গা হয় না ধান থোয়া॥ ইত্যাদি

নিরবয়ব ভাব মাত্রই প্রত্যক্ষ রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা বাংলা প্রবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। যে যাহার কাজ করে—এই ভাবটি বাংলা প্রবাদে এইরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমন—

দা'য় করে দা'র কাজ।
কুড়ুলে করে কুড়ুলের কাজ॥

অনাশ্রিত একটি ভাব এখানে দুইটি প্রত্যক্ষ বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইবার ফলে বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কোনও অস্পষ্ট ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বাংলা প্রবাদের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে বিষয়টির যেমন প্রত্যক্ষতার গুণ প্রকাশ পায়, তেমনই রচনারও একটি রসরূপ দেখা দেয়।

প্রবাদ লোক-সাহিত্য হইলেও ইহাতে রচনার কোনও শৈথিল্য অনুভব করা যায় না, ইহা সংক্ষিপ্ত ও অর্থ-সার মাত্র বলিয়া রচনাগত শৈথিল্য প্রকাশের ইহাতে বিশেষ অবকাশও নাই। ইহার পরিমিত অবয়বের মধ্যেও অনেক সময় পরিণত রচনা-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব ও চিত্রগত বৈপরীত্য নির্দেশ করিয়া এই প্রকার প্রবাদ রচিত হইয়াছে, যেমন—

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হ'লে মনস্তাপ॥
অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে তাই কি ধরে॥
অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়॥
অতি পিরীত যেখানে, অতি-বিচ্ছেদ সেখানে॥
অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়॥
অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর॥
আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত॥
আগে তিতা, পাছে মিঠা॥
আগে দাও কড়ি, পিছে দেব বড়ি॥
আগে দেয় জলের ছিটা, পরে খায় লগির গুঁতা॥
আজ আমীর, কাল ফকির॥
আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল॥
আনাড়ির ঘোড়া লয়ে, বুদ্ধিমানে চড়ে।
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে॥

আপন কর্মে বড় চাড়, পরের কর্মে মন ভার ॥
আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা ॥
এক কিল দিয়ে, শ'কিল খায় ॥
ছুঁচ চুরি কর্‌তে, কুড়ুল হারায় ॥

প্রবাদে অনেক সময় শ্রুতিসুখকর অনুপ্রাশের ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন—

অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু ॥
অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া ॥
অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ॥
অবাক করলি রাধা, অম্বলে দিলি আদা ॥
অবাক করলে নাকের নথে।
কাজ কি আমার কানবালাতে ॥
অবোধের গোবধে আনন্দ ॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর ॥
আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি ॥
আড়াই আঙ্গুল দাঁড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি ॥
আতি চোর পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর ॥
আতে তেতো দাঁতে নুন, পেট ভরে তিন কোণ ॥
আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না, ভাতার চায় ॥
আন কথায় কান ভার, ভেজাল কথায় মন বেজার ॥
আমায় না দিয়ে ননী, কত ধন বাঁধবে ধনী ॥
কড়ি দিয়ে কিন্‌ব দই, গয়লানী মোর কিসের সই ॥
কড়ি দিয়ে চিনি নাড়ী, নারী দিয়ে নর ॥
কথা, কড়া, কারসাজি, তিন ক'তে কবিরাজি ॥
কাকে এ'লে শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে ॥

অনেক সময় মিত্রাক্ষর রচনার মধ্যেও ইহার চমৎকারিত্ব দেখা যায়, যেমন—

অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল ॥
অন্ধের নড়ি, কৃপণের কড়ি ॥
অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি ॥
অম্বল কম্বল ডম্বল, তিন শীতের সম্বল ॥

আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায় ঠন্ ঠন্ ॥

আচার ভ্রষ্ট, সদা কষ্ট ॥

আচারে কড়া, বিচারে এড়া ॥

আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট ॥

আজ মুচি, কাল শুচি ॥

আট নায়ের ঠাট বেশি ॥

আড়ে নেই ফাড়ে আছে ॥

আদা আর কাঁচকলা, পাখী আর সাতনলা ॥

আন্ সতীনে নাড়ে-চাড়ে; বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে ॥

আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো পাত ॥

আম শুন্‌তে জাম শুনেছ, চাঁদ লিখ্‌তে ফাঁদ লিখেছ ॥

আশায় মরে চাষা ॥

আষাঢ় মাস, চাষার আশ ॥

আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে, কুলার বায়ে বালাই ওড়ে ॥

আহ্লাদী যায় মরতে, তিন কুল্ যায় ধরতে।
ও আহ্লাদী মরিস্ নি, লোক হাসানো করিস্ নি ॥

ইষ্ট যেই কিষ্ট সেই, দুয়ে কিছু ভেদ নেই ॥

উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা ॥

উঠ্‌ল বাই ত কটক যাই ॥

উন ভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল ॥

কড়ি পেলে হরি মেলে ॥

কোনও একটি শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা ইহাদের উদ্দিষ্ট অর্থের উপর যেমন জোর দেওয়া হয়, তেমনই তাহাতে শ্রুতিমাধুর্যেরও সৃষ্টি হয়, যেমন—

অন্নচিন্তা চমৎকার, বস্ত্রচিন্তা নৈরাকার।
তার থেকে অধিক চিন্তা, তামাক নাই যার ॥

অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে ॥

অমানুষ মানুষ নিন্দে, বদ্‌না নিন্দে ঝারি।
জোনাকি পোকায় সূর্য নিন্দে, করুয়া নিন্দে কারি ॥

আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ॥
আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেলা।
এক পাগলে রক্ষা নাই, তিন পাগলের মেলা॥
এক ঠগ দুই ঠগ তিন ঠগের মেলা।
ঠগের গুরু যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র তার চেলা॥

অনেক সময় বিশেষ কোনও একটি ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে একাধিক সমধর্মী চিত্রের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে, ইংরেজিতে ইহাকে parallelism বলে; যেমন,

আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ॥
নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র।
তার চেয়ে অধিক তেতো বোন্-সতীনের ঘর॥
মায়ে রাঁধে যেমন তেমন, বোনে রাঁধে পানি।
ওই অভাগী রাঁধে যেন চিনি পরমান্নি॥
মাষ নাশে ঘন চাষে, কুলবধূ নাশে প্রবাসে।
আদর নাশে নিত্য গমনে জো নাশে ঘন পবনে॥
মেয়ে চিনি হাসে, মুক্তা চিনি ভাসে।
হাতী চিনি দাঁতে, মরদ চিনি বাতে॥

প্রবাদ সর্বদাই যে মিত্রাক্ষরযুক্ত কিংবা পদ্যের আকারে রচিত হইবে, তাহা নহে; অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও যে সকল প্রবাদ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের এক বৃহৎ অংশই সাধারণ গদ্যে রচিত। ভাব প্রকাশই ইহার মূল লক্ষ্য, রস-সৃষ্টির দাবি ইহাতে গৌণ। অতএব সহজ গদ্যে রচিত এই সকল বাংলা প্রবাদের এ'দেশে বহুল প্রচলন আছে, যেমন,

অদৃষ্টের কিল পুতেও কিলোয়।
অধিবাসের গুঁতো সামলালে বিয়ে করা ত অল্প কথা।
অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড় করে।
অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।
অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

অপার নদী কোথায় আছে ?
আকাটা নায়ের সাজ বেশি।
আকাঁড়া চালের মাঝের দোকান।
পাটিওয়ালা পাটিতে শোয় না।
রোগ, ঋণ আর শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নেই।

তবে এ'কথা সত্য যে, স্মরণ রাখিবার পক্ষে সহায়ক বলিয়া মিত্রাক্ষরযুক্ত প্রবাদ-রচনারই প্রবণতা সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি মিত্রাক্ষরযুক্ত পদই যে ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক দেশের প্রবাদ-সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য।

সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক কতকগুলি প্রবাদ সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কোনও জটিল রোগ-সম্পর্কিত স্নচিন্তিত পরামর্শ ইহাদের মধ্য দিয়া কোথাও দেওয়া হয় নাই, বরং তাহার পরিবর্তে সাধারণ ভাবে নীরোগ জীবন যাপন করিবার মত সহজ পালনীয় কতকগুলি উপদেশই ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হয়। ইহাদের মধ্য দিয়া লোক-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রকাশ পায়, চিকিৎসা-সম্পর্কিত ব্যক্তিবিশেষের গবেষণার কোনও স্নগভীর ফলাফল ব্যক্ত হয় না—

আঁতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট খালি এক কোণ।
এ বেলা ও বেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥
আলো-হাওয়া বেঁধো না, রোগে-ভোগে সেধো না
যার দাঁত সাফ নয়, তার আঁত সাফ নয়॥
সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুটে॥
বেড়াও যদি ভোরের বেলা, থাক্‌বে না আর রোগের জ্বালা॥
কানে কচু নাভিত তেল, কবিরাজ ফিরিয়া গেল।
মাংসে মাংস বৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল।
দুধে বীর্যবৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল॥
শাক, অম্বল, পান্তা। তিন ওষুধের হন্তা॥

স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবাদের মতই আবহাওয়া বিষয়ক কতকগুলি প্রবাদও সকল দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে যেমন আছে, March comes in like a lion and goes out like a lamb', বাংলাতেও শুনিতে পাওয়া যায়,

মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্বদায় ॥
পূর্ব-আষাঢ় দখিনা বায়ু। সেই বৎসর বন্যা হয় ॥
মাঘে মেঘে একই রীত, যত্র বায় তত্র শীত ॥
বামুন, বাদল, বান। দক্ষিণা পেলেই যান ॥
যদি বর্ষে আঘনে। রাজা যায় মাগনে ॥

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রবাদের মধ্যে কৃষিকার্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ বাংলায় খনার বচন নামে পরিচিত। ইহাদের যে একটি ব্যবহারিক মূল্য আছে, তাহা কৃষিজীবী সমাজের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়; সেইজন্য ইহারা বাংলার জনশ্রুতিতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাদের বিষয় প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কতকগুলি প্রবাদের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে সাবধানতা-সূচক বাণী উচ্চারিত হয়; যেমন,

অতি চালাকের গলায় দড়ি; অতি-বোকার পায়ে বেড়ি ॥
অতি দর্পে হতা লঙ্কা ॥
অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই ॥
অতিপিরীত যেখানে অতিবিচ্ছেদ সেখানে ॥
অতিপিরীত যেখানে কীর্তি ঘটে সেখানে ॥
অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়েতে উড়াবে।
অতি-নিচু হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে ॥
অতি মন্থনে বিষ ওঠে ॥
অতি লোভে তাঁতী নষ্ট ॥
যত হাসি তত কান্না।

বিভিন্ন দেশ হইতে অনুরূপ বহু প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে।

ইংরেজিতে এক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত রচনা আছে, তাহাকে epigram বলে। ইহা যেমন সরল, তেমনই প্রত্যক্ষ। ইহার কোন কোন বিষয়ের সঙ্গে প্রবাদের সামঞ্জস্য থাকিলেও, সমগ্রভাবে বিবেচনা করিতে গেলে, ইহা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর রচনা—ইহা প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহার একটি অংশকে মধ্যযুগের ইংরেজিতে *Priamel* বলিত; ইহাতে কতকগুলি বিপরীতধর্মী বিষয় ও চিত্র

একই বাক্যের ভিতর আনিয়া সুচতুরভাবে বিন্যাস করা হইত। বাংলাতেও অনুরূপ রচনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, যেমন—

বাকি, বাক্য, বাটপাড়ি, এই তিন নিয়ে দোকানদারি।
বামুন, বাকশ, বাঁশ, তিনে বাস্তু নাশ ॥
গুরু, গরু, আগুন, পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ ॥
জন, জামাই, ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা ॥
নারী, কাগজ, না', তিনের বৈরী বা' ॥
আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান, এই তিনে বর্দ্ধমান ॥
মশা, মোল্লা, শাঁখা, এই তিনে ঢাকা ॥
ষাঁড়, রাঁড়, সন্ন্যাসী, এই তিন নিয়ে হল কাশী ॥

প্রবাদের যেমন উপদেশ প্রচারই লক্ষ্য, তাহার পরিবর্তে রস-সৃষ্টিই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ; এই রস-সৃষ্টি করিতে গিয়া ইহাতে যে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহার মূল্য ইহাতে সর্বদা প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী নহে। তবে আংশিক সত্য ইহাদের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য থাকিলেও, বহিরঙ্গ রচনার দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে প্রবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই—সেই জন্য ইহারা বাংলার প্রবাদ-সংগ্রহের মধ্যেই স্থান লাভ করিয়া থাকে।

অনেক সময় এই শ্রেণীর রচনা সূত্রের মত সংক্ষিপ্ত হয় বলিয়া, ইহারা যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহা অতিক্রম করিয়া গেলে ইহাদের অর্থ পরিগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে এই প্রবাদটি প্রচলিত আছে—

সাপ, স্বপন, পোনা।
এই তিন একজনা ॥

ইহার অর্থ এই যে, সাপ, স্বপ্ন এবং পোনা মাছ দেখিয়া যে ব্যক্তি সে কথা গোপন রাখিতে পারে, সে প্রকৃতই মানুষ। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যা জনশ্রুতি হইতে গৃহীত, উদ্ধৃত রচনাটি হইতে স্বাধীনভাবে এই অর্থ অনুমানও করিতে পারা যায় না। অতএব ইহার সম্পর্কিত জনশ্রুতি লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই উক্তিগুলিও দুর্বোধ্য এবং অপ্রচলিত হইয়া যায়।

প্রচলিত উপকথার কোনও নীতি বা উপদেশ সংক্ষিপ্তাকারে প্রবাদরূপে

গৃহীত হইতে পারে। যেমন, 'সসর্পে গৃহে বাস'। সংস্কৃত উপকথার এই উপদেশ বাক্যটি হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে, যথা—

দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তর-দায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

সমগ্র শ্লোকটির যে অংশটি মাত্র সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের ব্যাপকতম অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত, তাহাই এদেশের প্রবাদরূপে প্রচলিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, অন্যান্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার মধ্যস্থতায় যদিও এই নীতিকথা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচার লাভ করিয়াছিল, তথাপি অনুরূপ প্রবাদ আর কোনও অঞ্চল হইতে এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। হিন্দী ভাষায় অনুরূপ অবস্থায় এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন—

আস্তিন কা সাঁপ।

অনেক সময় এই প্রকার সংস্কৃত শ্লোকাংশের অর্থ পরিবর্তিতও হইয়া যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' একটি সুপরিচিত সংস্কৃত উপকথা হইতে গৃহীত শ্লোকের অংশ; ইহার অর্থ অদ্য ধনুর্গুণ ভক্ষ্য, কিন্তু বর্তমানে যে অর্থে ইহা বাংলা প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা এই অর্থে নহে, বরং 'দিন আনি দিন খাই' ইহাই এখন ইহার অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যেমন, আমার অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ অবস্থা। অদ্য এবং ভক্ষ্য এই কথা দুইটির উপর এখানে অনাবশ্যক জোর পড়িয়া যাওয়ার ফলে এই শ্লোকাংশ এখন ইহার মৌলিক অর্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক ভাষায় এমন কতকগুলি বাগ্‌ভঙ্গি আছে, তাহা কতকটা প্রবাদেরই অনুরূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা প্রবাদ নহে। ইংরেজিতে ইহাদিগকে **proverbial phrase** ও বাংলায় প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলা হয়। যেমন, 'তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা', 'কোমর বেঁধে কাজে লাগা' ইত্যাদি। প্রবাদ দ্বারা যেমন একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়, এই প্রকার বাক্যাংশ দ্বারা তেমন কোনও সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না; ইহা বাক্যের ভাব বা অর্থ প্রকাশের সহায়ক মাত্র, কিন্তু কোনও স্বাধীন বাক্য নহে; সেইজন্যই ইহাদিগকে বাক্যাংশ বলা হইয়াছে। প্রবাদের মধ্য দিয়া অর্থ প্রকাশ করিবার যেমন একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, ইহার মধ্যেও বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার সহায়ক তেমনই একটি প্রচলিত ভঙ্গি আছে। সুনির্দিষ্ট একটি ভঙ্গি থাকিবার জন্যই ইহারা প্রবাদ বলিয়া

ভ্রমোৎপাদন করে। সেইজন্য বাংলা প্রবাদের নির্বিচার সংগ্রহে ইহারাও স্থান লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অতি-আধুনিক পাশ্চাত্ত্য প্রবাদ সংগ্রাহকগণ নিজেদের সংগ্রহের মধ্য হইতে ইহাদিগকে সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করিবারই পক্ষপাতী।

এমন কি, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ব্যতীতও কতকগুলি প্রচলিত সাধারণোক্তি (common place remark)ও বহু প্রবাদ-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। ইংরেজি দুইটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ-সংগ্রহে এই উক্তিগুলিও প্রবাদরূপে গৃহীত হইয়াছে[১]—

John Bull.	I told you so.
Hard cheese.	Silly Billy.
Home Rule, Home Rule.	Simple Simon.
Merry England.	Noah's Ark.

এই সম্পর্কে একজন অতি-আধুনিক ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন—

'It must surely be obvious that these are not proverbs at all, but simply trite, commonplace remarks. There are many true and beautiful English proverbs in these volumes, but one is compelled to sift a rubbish heap to find them.'[২] এই উক্তি বহু বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহ সম্পর্কেও আনুপূর্বিক প্রযোজ্য।

প্রায় সকল বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহেই এই শ্রেণীর বহু নিদর্শন স্থান লাভ করিয়াছে, যেমন,

অকাল কুষ্মাণ্ড	অমৃতে অরুচি
অকালের বাদ্‌লা	অরণ্যে রোদন
অগস্ত্য যাত্রা	অৰ্দ্ধ চন্দ্র
অমাবস্যার চাঁদ	আকাশ-কুসুম

কিন্তু ইহাদের কোন কোনটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলিয়া গণ্য করা গেলেও, প্রকৃত প্রবাদ বলিয়া কাহারও দাবি স্বীকার করা যাইতে পারে না। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতই প্রবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা

---

১ Smith, *The Oxford Dictionary of English Proverbs* (Oxford, 1935) ; Apperson, *English Proverbs and Proverbial Phrases* (London, 1929).

২ Champion, *Racial Proverbs* (London, 1938), p. xiv.

আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই ; সেইজন্য প্রবাদ বলিতে জনশ্রুতিমূলক উক্তি (traditional saying) মাত্রই গৃহীত হইয়া থাকে।

কোন কোন প্রবাদ বাহিরের দিক দিয়া সময়োপযোগী করিয়া সামান্য রূপান্তরিত করা হইলেও, ইহাদের মূল উদ্দেশ্য কিংবা বক্তব্য বিষয়ের কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় না। ইউরোপে খ্রীষ্টান্ ধর্মের কেন্দ্ররূপে যখন রোম নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তখন এই প্রবাদটির উদ্ভব হইয়াছিল, যেমন, 'The nearer Rome, the worse Christian' অথবা 'The nearer the Pope, the worse Christian.' খ্রীষ্টান্ জগতে রোমের প্রাধান্য লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদটি বাহিরের দিক দিয়া এই প্রকার সামান্য পরিবর্তিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে, যেমন, 'The nearer the church, the farther from God.' কিন্তু ইহাতে অর্থের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। বাংলাতেও কিছু কিছু প্রবাদ এই প্রকার বাহিরের দিক হইতে সময়োপযোগী সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যতদিন এ'দেশে কড়ির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, ততদিন অর্থ সম্পর্কিত সকল প্রবাদেই কড়ির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত ; কড়ির ব্যবহার অপ্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে কোন কোন সময় কড়ির স্থলে পয়সা কিংবা টাকা শব্দই ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদগুলির কড়ি শব্দের পরিবর্তে বর্তমানে টাকা শব্দই ব্যবহৃত হয়, যেমন,

> কড়ি তোমার, ভোগ আমার।
>
> কড়ি থাক্‌লে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়।
> না থাক্‌লে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও নয়॥
>
> কড়ি থাক্‌লে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত ॥[১]

কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য অর্থের কোন তারতম্য হইতেছে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রবাদের অর্থই লক্ষ্য, রূপ ইহার লক্ষ্য নহে।

মূল অর্থগত উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন না করিয়া বাহিরের দিক হইতে কোন কোন প্রবাদ সামান্য পরিবর্তিত হইতে পারে—এই পরিবর্তন শব্দগত মাত্র, অর্থগত নহে। শব্দগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কোন প্রবাদ যদি

১ সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ (১৩৫৯) পৃঃ ১৯৯, ৩৮৭ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

লোক-সমাজের মধ্যে প্রচলিত থাকে, তবে তাহাও প্রামাণিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে—ইহার মৌলিক রূপটির সন্ধান করিয়া প্রচলিত রূপগুলি প্রবাদ-সংগ্রহ হইতে প্রত্যাহার করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ, 'অঘটির ঘটি হ'লো, জল খেতে-খেতে প্রাণটা গেল'—এই প্রবাদটির যে আর একটি রূপ, যথা, 'আদেখ্‌লের ঘটি হ'লো, জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল' সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উভয়ই প্রামাণিক। একটিকে মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া আর একটি এখানে পরিত্যাগ করা যায় না। কারণ, এই উভয় পাঠই সমাজের প্রচলন হইতেই গৃহীত হইয়াছে এবং লোকমুখে ইহার বহিরঙ্গগত যে সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে, তাহারও একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। মূল্যের দিক দিয়াও উভয়ই সমান; কারণ, ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও রস-বিচারের উপর কোন প্রবাদের মূল্য নির্ভর করে না, সমাজই ইহার যথার্থ মূল্য-নির্ধারক; অতএব সমাজ যাহার প্রচলন রক্ষা করিয়াছে, তাহার মূল্য তাহাকে সমাজই দিয়াছে, এই বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষের বিচারের কোনও মূল্য নাই। এই সকল প্রবাদ কখনও কখনও একই প্রবাদের বিভিন্ন পাঠান্তরও যেমন হইতে পারে তেমনই স্বাধীনভাবে উদ্ভূত স্বতন্ত্র প্রবাদও হইতে পারে। যেমন, 'নাচ্‌তে না জানলে উঠানের দোষ', ও 'নাচ্‌তে না জানলে উঠান বাঁকা' এই দুইটি প্রবাদ একটি আর একটির পাঠান্তর বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু 'পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি' এবং 'পোড়া মন পাসরে মরি, পরের থালার ভাত আপন থালায় ভরি' এই দুইটি প্রবাদ পরস্পর স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত বলিয়াও মনে হইতে পারে। কারণ, অনুরূপ সামাজিক পরিবেশে এবং অভিন্ন অভিজ্ঞতায় অনুরূপ প্রবাদের উদ্ভব হওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নাই।

সমাজ-জীবনের অপ্রচলিত কোনও প্রথা অবলম্বন করিয়া রচিত কোনও প্রবাদ লোক-শ্রুতিতে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন হয় বলিয়া, ইহাদের প্রচলন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। একটি ইংরেজি প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায়, 'Good wine needs no bush.' ইহার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন প্রথার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাচীনকালে ইংলণ্ডে প্রত্যেক মদের দোকানের সম্মুখে একটি ওক্ বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা ঝুলাইয়া রাখিবার রীতি প্রচলিত ছিল; এই শাখা দেখিয়াই জনসাধারণ বুঝিতে পারিত যে, ইহা মদের দোকান। বর্তমানে এই

রীতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ইংরেজি প্রবাদের মধ্যে ইহার এই উল্লেখটি রহিয়া গিয়াছে। বাংলাতেও এই প্রকার কয়েকটি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। সতীদাহ প্রথা অবলম্বন করিয়া রচিত এই দুইটি প্রবাদ বাংলার প্রবাদ-সংগ্রহে ধৃত হইয়াছে—

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে॥
কার আগুনে কেবা মরে আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী, বল্‌ছে—দে উলু॥

প্রথম প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়াছে, 'সহমরণোদ্যতা সতীর একটি আমের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপনের প্রথা হইতে।' দ্বিতীয়টির উদ্ভব হইয়াছে, 'ভুল করিয়া কোন কলু বউকে অন্যের চিতায় দাহ করিবার উপলক্ষ্যে।'[১]

প্রবাদ সাধারণতঃ নারীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নারীই প্রধানতঃ ইহার রচয়িত্রী। ইহার মধ্য দিয়া নারীর নিজস্ব মুখভঙ্গীটির পর্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রবাদ নারীচরিত্রের অত্যন্ত নির্মম সমালোচক; কারণ, নারীর মত নারীচরিত্রের এমন তীক্ষ্ণ সমালোচক পুরুষও নহে। নারীচরিত্রের গুণ অপেক্ষা ত্রুটিই প্রবাদের আলোচ্য। বধূ-সম্পর্কিত কতকগুলি প্রবাদ এখানে উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে,

আদুরে বউ নেংটা হ'য়ে নাচে॥
একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনি॥
কলির বউ ঘর ভাঙানি॥
কাজ নেই বউয়ে কাজ করে।
নিকামা বউ কি কাম করে॥
কোন্ কালে বউ রূপসী॥
জাড়কালে বউয়ের জার কাঁটা, গরম কালে ঘামাচি॥
ক্ষুদ গলে না বউয়ের ডরে, বেবাক ক্ষুদই উথলে পড়ে॥
ঝারি চোখ, উনান ঘর, বাঁদী চোর, বউ মুখর॥

১ সুশীলকুমার দে, ঐ, পৃঃ ৮৬

ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে ॥

দাদা ক'রেছে পেয়াদাগিরি, সেই দেমাকে বউ গ্যাদারি ॥

দিন গেল হেসে খেলে, রাত হলে বউ কাপাস ডলে ॥

ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সোজা।
কলিতে বউ রোজা ॥

পিটে পিটে করেন বউ।
এক পিটে তিন বউ, আর ত খেতে নারেন বউ ॥

বউ উঠ্‌তে ঠাঁই পায় না, উঠান-জোড়া দাসী ॥

বউ গিন্নী হ'লে তার বড় ফরফরানি।
মেঘভাঙা রোদ্দুর হ'লে বড় চড়চড়ানি ॥

বউটি ভাল বটে, টোক্‌না খেয়ে বাট্‌না বাটে ॥

বউ নয় ত হীরে।
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি, আজ দিয়েছে ছিঁড়ে ॥

বউ না বোবা, বউ না বাবা ॥

বউ নারে বউ না, গরল ডাকিনী।
দিন হ'ল মানুষের ছা, রাত হ'লে বাঘিনী ॥

বউ বড় রাজী, তার আবার ঠাকুরঝি ॥

বউ বিয়ল বেটা, গাই বিয়ল নই।
প্রাণ ধ'রে এ'কথা কি কারেও বলি সই ॥

বউ ভাঙ্গলে সরা গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙ্গলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা ॥

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিক কেঁকায় যেমন ॥

বউয়ের পাঙ্গা ভারি পা গোদা, বউকে কিছু বলো না, দাদা ॥

বউয়ের রাগ বেরালের উপর, বেড়ালের রাগ বেড়ার উপর ॥

বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে ব'সে কর কি।
মেজ বউ মেজের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আঁটি।
সেজ বউ সেঁজুনী, সব কাজেতে এগুনী।
ন' বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা।

নতুন বউ নথনী, শেওড়া গাছে পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্‌ঠাকুরপোর গোঁফে ঘসি ॥
শুনে গেলাম বউ দেখ্‌তে, বউ চায় আমায় ধরে খেতে ॥

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মানব-চরিত্রের ত্রুটিগুলির সমালোচনা প্রবাদের যেমন লক্ষ্য, ইহার গুণাবলীর উপলব্ধি তেমন লক্ষ্য নহে। সেই সূত্রেই বধূচরিত্রের ত্রুটিগুলিই এখানে নির্মম ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছে। উদ্ধৃত প্রবাদ-গুলির মধ্যে বধূচরিত্রের যে সকল বিভিন্ন দিকের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই পুরুষের লক্ষ্যগোচর হইতে পারে না। একদিন যে স্বয়ং বধূরূপে নিজের শাশুড়ীর নিকট হইতে সহানুভূতিহীন আচরণ লাভ করিয়াছিল, সেই আজ শাশুড়ীরূপে তাহার নিজের পুত্রবধূর উপর অনুরূপ আচরণ করিতেছে। উদ্ধৃত প্রবাদগুলি এই প্রকার পরিণত-বয়স্কা নারীর জীবনাভিজ্ঞতার পরিচায়ক—ইহাদের মধ্য দিয়া প্রৌঢ়া নারীর অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণা বিচিত্র রসরূপ লাভ করিয়াছে; পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই। তবে নারীর অনুকরণে পুরুষ তাহার নিজস্ব বহির্মুখী জীবনের কোন কোন অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রবাদের ভিতর দিয়া যে ব্যক্ত করে নাই, তাহা নহে। তবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই মনে হয়।

যে সকল বিষয় বাংলা প্রবাদের উপজীব্য রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলা প্রবাদকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যেমন—প্রকৃতি, নারী ও চারিত্র-নীতি। যদিও নারী-সম্পর্কিত প্রবাদগুলি নারীচরিত্রের কতকগুলি বিভিন্ন দিকই প্রকাশ করিয়াছে, তথাপি উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা একদেশদর্শী অর্থাৎ নারীর দৃষ্টিতে নারীচরিত্রই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও নারীর একটি পরিচয় আছে, তাহা পুরুষের দৃষ্টিতে নারী—তাহার কোনও পরিচয় বাংলা প্রবাদগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। এমন কি, নারীর দৃষ্টিতে পুরুষের পরিচয়ও যে ইহাদের মধ্য দিয়া খুব স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নহে। নারী যেমন প্রবাদের রচয়িত্রী, নারীই ইহার প্রধান উপজীব্য; বাংলা প্রবাদের জগতে নারীকে অতিক্রম করিয়া নারী অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেইজন্য বলিতেছিলাম, প্রবাদ নারীচরিত্রের একদেশদর্শী মাত্র, বাঙ্গালী নারীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইহাদের মধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে না। চারিত্রনীতি

বলিয়া বাংলা প্রবাদের যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাতে ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের সম্পর্ক নানা দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রবাদের এই বিভাগেই পরিণত সমাজ-মনের বহু পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার ফল ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা আনুপূর্বিক নারীর রচনা নহে, এই অংশে পুরুষের পরিণত বুদ্ধি ও বিভিন্নমুখী জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ ডাকের বচন বলিয়া পরিচিত প্রবাদগুলি ইহারই অন্তর্ভুক্ত। খনার বচন, স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবাদ প্রভৃতি প্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করা যায়। যদিও জনশ্রুতি অনুসারে খনা নারী, তথাপি খনার বচন বলিয়া পরিচিত প্রবাদগুলি কৃষিকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত পুরুষেরই রচনা হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাতৃতান্ত্রিক কৃষিজীবি সমাজে প্রত্যক্ষ কৃষিকার্যে নারী পুরুষ অপেক্ষা কম দক্ষ নহে—অতএব খনার বচনগুলির উদ্ভবের মূলে মাতৃতান্ত্রিক কৃষিজীবী সমাজের মৌলিক প্রেরণার অস্তিত্ব থাকিতে পারে ; সেই সূত্রেই খনার বচনগুলিও মূলতঃ নারীর রচনা হওয়া সম্ভব।

প্রকৃতি, নারী ও চারিত্র-নীতি বিষয়ক প্রবাদগুলি এখানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না—কারণ, বাংলা প্রবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা করিলাম. তাহা হতেই ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট অনুভূত হইতে পারিবে। তবে ইহাদের সম্পর্কে এখানে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিতে পারা যায়।

প্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্যে প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপের কোনও রস-পরিচয় পাওয়া যায় না বরং তাহার পরিবর্তে প্রকৃতির যে একটি ব্যবহারিক (practical) দিক আছে, তাহারই পরিচয় প্রকাশ পায়। ধাঁধার প্রকৃতির সঙ্গে প্রবাদের প্রকৃতির এখানেই পার্থক্য। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ধাঁধা কবিতা, প্রবাদ দর্শন।

জ্যৈষ্ঠে শুখা আষাঢ়ে ধারা,
শস্যের ভার সয় না ধরা।
জ্যৈষ্ঠে খরে আষাঢ়ে ঝরে।
কেটে মেড়ে গোলা ভরে॥

এই প্রবাদ দুইটির মধ্যে জ্যৈষ্ঠের রুদ্র এবং আষাঢ়ের সজল প্রকৃতি-রূপের

কোন সরস পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, ধরিত্রীর তপস্যা ও ধারাস্নানের সঙ্গে এখানে কোনও সম্পর্ক নাই। এখানে গ্রীষ্ম এবং বর্ষার ব্যবহারিক তাৎপর্যের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহা কৃষকের দৃষ্টি—কবির দৃষ্টি নহে। ঋতু-পরিবর্তনের যে একটা ব্যবহারিক দিক আছে, তাহা সরল কৃষকের মুখে সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতিবোধই সর্বত্র প্রবাদগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ছড়া ও ধাঁধার প্রকৃতি ইহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে।

নারী-বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্যে জননীর স্থান সর্বোচ্চে—

চিঁড়ে বল মুড়ি বল ভাতের বাড়া নাই।
পিসি বল মাসি বল মায়ের বাড়া নাই॥

কিন্তু অকৃতজ্ঞ সন্তানের হাতে পড়িলে এই মায়েরও লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। বিশেষতঃ বিবাহ করিয়া বধূ গৃহে আনিলে স্বভাবতঃই সন্তানের মাতৃভক্তি পত্নী-প্রেমে রূপান্তর লাভ করে—এই লইয়া বধূর প্রতি জননীর বিদ্বেষবোধ জাগিয়া উঠে। পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ীর এই বিদ্বেষবোধ অসংখ্য প্রবাদের জনক। এই বিদ্বেষের অগ্নিতে ননদেরা ইন্ধন যোগায়, কিন্তু ননদ ত আর বেশি দিন ননদ থাকে না—অল্পদিনের মধ্যে নিজেও বধূ হইয়া নিজের শাশুড়ীর বিদ্বেষ-দৃষ্টির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সুকঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সেইজন্য ননদের স্থান প্রবাদে সুস্পষ্ট হইলেও সুবিস্তৃত নহে। বরং ননদের পরিবর্তে জা'র সঙ্গেই বধূকে বাস করিতে হয়, সেইজন্য প্রবাদে জা'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রবাদগুলির রচয়িত্রী প্রধানতঃ প্রৌঢ়বুদ্ধি শাশুড়ী স্বয়ং; সেইজন্য তাহার নিন্দা ইহাদের মধ্যে সামান্য স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র; কিন্তু স্থান সামান্য হইলেও বিদ্বেষের তীব্রতার দিক দিয়া ইহা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বহুবিবাহপ্রথা-পীড়িত এই সমাজে যে একদিন সতীনের জ্বালা কতদূর তীব্র ছিল, তাহাও কোনও কোনও প্রবাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়বুদ্ধিহীন ও অপদার্থ স্বামী লইয়া বাংলার নারীগণ যে দুঃসহ জীবন যাপন করিয়া থাকে, তাহার বেদনাও বাংলার প্রবাদের ভিতর দিয়া রূপ পাইয়াছে। পূর্বেও বলিয়াছি, নারীর দৃষ্টিতে নারীর জীবন যতখানি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, বাংলা প্রবাদগুলির ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

চারিত্রনীতি বিষয়ক প্রবাদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের ক্রটির দিকটাই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহার যে একটি

মহত্তর দিক আছে, তাহা অনুভূত হয় নাই। অতএব মানবিক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইহাদের মধ্যে নাই। তবে ত্রুটিগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মানুষকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই ইহাদের লক্ষ্য—কেবল মাত্র মানব-চরিত্রের নিন্দাই ইহাদের লক্ষ্য নহে; ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষাত্মক মনোভাব ইহাদের মধ্যে থাকিলেও এই শুভবুদ্ধিটুকুর জন্য ইহারা সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, মানব-জীবনের বহু রহস্যই যেমন অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে, প্রবাদোক্ত চারিত্রনীতি প্রচার দ্বারাও তাহাদের কোন কিছুর সম্পর্কেই চূড়ান্ত মীমাংসার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অতএব এই নীতিবোধ আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল।

কিছুকাল যাবৎ বিশেষতঃ কলিকাতা সহর প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহারই মধ্যস্থতায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলা দেশের যে যোগাযোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে অন্যান্য প্রদেশের কিছু কিছু প্রবাদ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইতেছে, যেমন,

মরদ কা বাত, হাথী কা দাঁত॥

মার ত হাথিয়ার লুঠত ভাণ্ডার॥

যে ভাষা বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্বোধ্য নহে, সেই ভাষা হইতেই ইহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাদের লৌকিক রূপ যে সর্বদাই রক্ষা পায়, তাহা নহে—বরং ইহারা ক্রমে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া স্বাঙ্গীকৃত হইতে থাকে। যে সকল প্রবাদ বাঙ্গালী জীবনের অনুকূল নহে, তাহারা কদাচ ইহাদের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না।

ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই কিছু কিছু ইংরেজি প্রবাদ বাংলায় অনূদিত হইয়াও ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ যইয়াছে, এ'কথা সত্য; কিন্তু তথাপি এ'কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে প্রবাদ যাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের এক প্রধান অংশই ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সেইজন্য যে পরিমাণ ইংরেজি প্রবাদ বাংলায় অনূদিত হইয়া ব্যবহৃত হইবার কথা, প্রকৃত পক্ষে তাহার কিছুই হয় না। কোন কোন প্রবাদ আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ইংরেজির অনুবাদ; যেমন 'অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী' ইহা 'Little learning is a dangerous thing' এই ইংরেজি প্রবাদটির বাংলা অনুবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'

এই বাংলা প্রবাদটি কবে কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে অনুসন্ধান না করিয়া এই বিষয়ে কিছুই বলিতে পারা যাইবে না—ইহাও বাংলা মৌলিক প্রবাদ হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

ধাঁধাকে যেমন আমরা লৌকিক ধাঁধা এবং সাহিত্যিক ধাঁধা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি, প্রবাদ সম্পর্কেও এই নীতি গ্রহণ করা যায়; কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, বিশেষতঃ ক্বচিৎ দুই এক ক্ষেত্রে যে ইহাদের ব্যবহার দেখিতেও পাওয়া যায়, তাহাতেও দেখা যায় যে, তাহা নূতন করিয়া আর সাহিত্য রূপ দেওয়া হয় না, কারণ, তাহা প্রধানতঃ গদ্যের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা কাব্য বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যে যে প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে পদ্যের মধ্যে স্থান দিবার প্রয়োজনীয়তায় এক একটি নূতন সাহিত্যরূপে দেওয়া হইত। সেইজন্য সাহিত্যিক প্রবাদ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু ব্যবহৃত হইলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহার ব্যবহার প্রচলিত নাই।*

* এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত প্রায় সকল বাংলা প্রবাদের জন্য সুশীলকুমার দে সম্পাদিত বাংলা প্রবাদ (১৩৫৯) এবং ইংরেজি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত অন্যান্য প্রবাদের জন্য S. G. Champion *Racial Proverbs* (London, 1988) H. Davidoff, *A World Treasury of Proverbs from Twenty Four Languages* (New York, 1946), দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

পুরাকাহিনী

সৃষ্টির দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবার কৌতুহল লইয়া অপরিণত-বুদ্ধি মানব একদিন যে সকল অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়াছিল, ইংরেজিতে তাহাদিগকে myth বলে—বাংলায় তাহা লৌকিক পুরাণ অথবা পুরাকাহিনী বলিয়া অনুবাদ করা যায়। কিন্তু লৌকিক পুরাণের পুরাণ কথাটি কাহারও মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে; কারণ, পুরাণ শব্দ দ্বারা অনুরূপ সংস্কৃত রচনা বুঝায়; অতএব এই শ্রেণীর বাংলা রচনা পুরাণ সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত না করিয়া একটি স্বতন্ত্র শব্দ দ্বারা অভিহিত করাই সঙ্গত—এই সম্পর্কে পুরাকাহিনী শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। পুরাকাহিনী শব্দটির আর একটু সুবিধা আছে; ইংরেজি myth-এর সঙ্গে legend কথাটি প্রায়ই যুক্ত হইয়া থাকে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে অর্থের খুব বেশি পার্থক্য নাই—সামান্য পার্থক্য আছে মাত্র। পুরাকাহিনী শব্দটি দ্বারা ইংরেজি myth এবং ইতিকথা শব্দটির দ্বারা ইংরেজী legend শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে; কারণ, myth শব্দের পুরাণত্ব যেমন পুরা কথাটির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইবে, তেমনই legend কথাটিরও অর্থ কথা শব্দটির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবে।

পুরাকাহিনী যতই প্রাচীন এবং অবিশ্বাস্য হউক না কেন, ইহার ঘটনারাশি পুরাকালে প্রকৃতই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আদিম ও লোক-সমাজ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে সৃষ্টির কি ভাবে উদ্ভব হইল, কি ভাবে জীবের জন্ম হইল, দেবদেবীগণই বা কি ভাবে উদ্ভূত হইলেন, ধর্মবিশ্বাসেরই বা কি ভাবে ? হইল, তাহাই কাহিনীর আকারে বর্ণনা করা হয়। অলৌকিক চরিত্রই এই সকল কাহিনীর নায়ক নায়িকা, অলৌকিক আচরণ তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ; স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, পাতাল ইহার ঘটনা-স্থান। ইহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ইহারা 'the science of a pre-scientific age' অর্থাৎ ইহা প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান। ইহার অর্থ এই যে, মানুষের

বিচার-বুদ্ধি যখন পর্যন্ত পরিণতি কিংবা পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে নাই, তখন সে যে ভাবে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহারই পরিচয় কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। যে প্রেরণা আধুনিক বৈজ্ঞানিককে বিশ্বসৃষ্টির বিবিধ রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সেই প্রেরণা আদিম মানবের মধ্যেও যে বর্তমান ছিল, পুরাকাহিনী তাহারই প্রমাণ। অলৌকিকতায় ও ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে বিশ্বাসী আদিম সমাজের সঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিবাদী সমাজের বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে; সেইজন্য একদিন যে সকল কাহিনী আদিম ও লোক-সমাজের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হইত, আজ তাহাই নিতান্ত উদ্ভট বলিয়া বিবেচিত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যেমন মানুষের শরীর গঠন বিশ্লেষণ করিয়া তাহার জন্ম-রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে, আদিম সমাজ কেবল মাত্র নিজস্ব অপরিণত কল্পনা-শক্তির সহায়তায় মানবের এই জন্মরহস্যেরই উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণা এক—কেবল মাত্র শক্তির তারতম্যের জন্য ইহার ফল বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন কাহিনী মাত্রই যে পুরাকাহিনী (myth) বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তাহা নহে—অলৌকিক দেবদেবীই পুরাকাহিনীর নায়ক-নায়িকা হইতে পারেন, অন্য কোন চরিত্র ইহার নায়ক-নায়িকার স্থান অধিকার করিতে পারে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে পুরাকাহিনী মাত্রেরই ধর্মবোধের উপর ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে; ইহাদের আবেদন মূলতঃ ধর্মীয়। যখন দেবদেবীর পরিবর্তে মানব-মানবী নায়ক-নায়িকার স্থান গ্রহণ করে, তখনই পুরাকাহিনী লোক-কথার স্তরে নামিয়া আসে। সে কথা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে যে, যদি পুরা-কাহিনীর সঙ্গে অলৌকিক দেবদেবীরই সম্পর্ক থাকে এবং একমাত্র ধর্মবোধই ইহার ভিত্তি হয়, তবে ইহা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া ধর্মীয় (sectarian) সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত কি না! সংস্কৃত পুরাণের যেমন উচ্চতর কিংবা লোক-সাহিত্যগত কোনও দাবি নাই, তেমনই পুরাকাহিনী যদি তাহারই অনুরূপ রচনা হয়, তবে ইহার লোক-সাহিত্যের মধ্যে আলোচনার সার্থকতা কি? বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনা-যোগ্য, তবে এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে ইহার বিচার করা যাইবে।

এ'কথা সত্য যে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া আদিম সমাজে সাহিত্য, ধর্ম ও আচারে (ritual)-র মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তাহাতে কোন কোন বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করিবার সময়ই পুরাকাহিনী সমূহ আবৃত্তি ও সঙ্গীত গীত হয়। লোক-কাহিনীর মধ্যেও পুরাকাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে, অর্থাৎ লোক-সমাজেও যখন কোনও ধর্মীয় আচার পালন করা হয়, তখনই পুরাকাহিনী আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। বাংলা দেশেও যে সকল পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশই ধর্মীয় আচার পালন করিবার সময়ই আবৃত্তি কিংবা গীত হইয়া থাকে। তবে ধর্মাচার-নিরপেক্ষ স্বাধীন পুরাকাহিনী যে এ'দেশে নাই, তাহা নহে—সে'কথা পরে দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করিব। কিন্তু ধর্মাচার অবলম্বন করিয়া পুরাকাহিনীর বিকাশ হইলেও ইহার একটি বহিরঙ্গগত পরিচয় আছে, তাহার মধ্য দিয়া লোক-সাহিত্যের আবেদন যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। অর্থাৎ পুরাকাহিনী সাপের কিংবা অন্য কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের মত নহে—যেহেতু ইহা কাহিনী, অতএব ইহাতে একটি কাহিনীগত ঔৎসুক্যও আছে। অতএব ইহার বহিরঙ্গগত সাহিত্যরূপ ও কাহিনীগত আবেদন ইহার সাহিত্যিক দাবি যে কতকটা সার্থক করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, আধুনিক নাগরিক রুচি-সম্পন্ন সাহিত্যবোধের কথা এখানে আমি বলিতেছি না, যে সমাজে পুরাকাহিনীগুলি সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সমাজের কথাই আমি এখানে বলিতেছি। কাব্যের মধ্যে কল্পনার যে স্থান আছে, লোক-কাহিনীর মধ্যে কল্পনা তদধিক স্থান অধিকার করে সত্য, কিন্তু তথাপি যে যুগের সমাজ কল্পনার দিক দিয়া কোনও শাসন স্বীকার করিত না, পুরা-কাহিনীর পরিকল্পনায় তাহার কল্পনাবোধ কদাচ পীড়িত হইত না; অতএব তাহার নিকট ইহার রসাবেদন ব্যর্থ হইবার কোনও কারণ ছিল না। বিশ্বসৃষ্টির উদ্ভবের রহস্য ভেদ করিতে গিয়া প্রাচীন বাংলার লোক-সমাজ একদিন অনুভব করিয়াছিল—

নহি রেখ নহি রূপ নহি ছিল বন্নচিন্।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতিদিন॥
নহি ছিল জলস্থল নহি ছিল আকাশ।
মেরুমন্দার নহি ছিল ন ছিল কৈলাস॥

নহি ছিল সৃষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাহক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥
ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক ব্রাহ্মণ।
পাহাড় পর্বত নহি নহিক স্থাবর-জঙ্গম॥
পুণ্যস্থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর-সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি সৃষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
ব্রহ্মাবিষ্ণু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥[১]

ইহার যেমন বহিরঙ্গগত একটি রস-পরিচয় আছে, তেমনই কল্পনারও একটি সার্থক আবেদন আছে। এই গুণেই ইহা লোক-সাহিত্যগত দাবী পূর্ণ করিতে সক্ষম। পুরাণের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, পুরাণ অপ্রচলিত ভাষায় রচিত, সেইজন্য লোক-সাহিত্যের দিক হইতে তাহার ভাষাগত আবেদন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্য নিজস্ব ভাষায় রচিত হয়; অতএব পুরাণের মধ্যে কোন কোন স্থলে সাহিত্যিক আবেদন সার্থক হইলেও, পুরাকাহিনীর সাহিত্যিক আবেদন ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষ। তারপর কাহিনী মাত্রেরই একটি লৌকিক আবেদন আছে; এই আবেদন রসেরই আবেদন। পূর্বেই বলিয়াছি, যে সমাজ কল্পনার কোন শাসন স্বীকার করিত না, কোন অলৌকিক ঘটনাই সেই সমাজের রসবোধ পীড়িত করিতে পারিত না। অতএব এইসকল কাহিনীর মধ্যে যতই অসম্ভব উপাদান থাকুক, ইহা উদ্দিষ্ট সমাজের কৌতুক চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছে। রূপকথার অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে কল্পিত মানব-মানবীর চরিত্র যে অবাস্তব আচরণ করিয়া থাকে, পুরাকাহিনীর দেবচরিত্রের আচরণ তদপেক্ষা অধিক অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না; সেইজন্য রূপকথা পুরাকাহিনীর ক্রমপরিণতির ফল বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। অতএব রূপকথার মধ্য হইতে একদিন সমাজ যে রসাস্বাদন করিয়াছে, পুরাকাহিনীর মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে তাহা যে

১ শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩৬), পৃঃ ১-৩

আস্বাদন করিতে পারিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি এ'কথা সত্য যে, পুরাকাহিনীই লোক-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প লৌকিক উপাদানে গঠিত। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণও সমগ্র লোক-সাহিত্যের মধ্যে ইহাকেই 'least popular' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্গণ কিছুকাল যাবৎ যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পুরাকাহিনীর আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ফলে ইহার ভিতর হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে কেহ কেহ মনে করিতেন, পুরাকাহিনীর মধ্যে কোন কোন বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, কেহ বা ইহার মধ্য হইতে রূপকের অনুসন্ধান করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলর প্রমুখ পণ্ডিতগণ এক কালে মনে করিতেন, পুরাকাহিনীর মধ্য দিয়া রূপকের আকারে আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আবার কেহ মনে করিতেন, পুরাকাহিনী অবসর-বিনোদনের সহায় মাত্র—ইহার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। আধুনিক অনুসন্ধানকারিগণ এই সকল মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া নূতন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করিয়াছেন যে, পুরাকাহিনীর সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক ছিল, বর্তমান কোন কোন আদিম কিংবা লোক-সমাজ হইতে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াসমূহ লুপ্ত হইয়া গেলেও পুরাকাহিনীসমূহ তাহাতে প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে। 'Ceremonies often die out while myths survive, and thus we are left to infer the dead ceremony from the living myth'[১] বাংলা দেশে যে সকল পুরাকাহিনী এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ভাবে আর কোনও সম্পর্ক নাই, তথাপি কোন কোন পুরাকাহিনীর সঙ্গে মূলতঃ যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। সৃষ্টি-পত্তনের যে কাহিনী পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজানুষ্ঠান বা বারমতি উপলক্ষ্যে আবৃত্তি করা হইত, বাংলা দেশের অধিকাংশ মেয়েলী

১ J. G. Frazer *The Golden Bough* (London, 1911-15) ix p. 374.

ব্রতের মত ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজানুষ্ঠানের সঙ্গেও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক রহিয়াছে। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক্। সূর্য হইতে সৃষ্টির উদ্ভব; সেইজন্য সূর্যের বিষুব রেখায় আগমন হইলে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা তাহার গতিপথে নূতন শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক আচার পালন করা হয়—সেই উপলক্ষেই সৃষ্টিপত্তনের কাহিনী আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিপত্তনের এই কাহিনীর সঙ্গে যথার্থই মূলতঃ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার যোগ ছিল বলিয়া অনুভব করা যায়। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াসমূহ এখন ধর্মীয় আচার (ritual)-এর রূপ ধারণ করিয়া কোন রূপে সমাজে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে, ইহাদের মৌলিক তাৎপর্য সমাজ বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

বাংলা দেশে অধিকাংশ পুরাকাহিনীই এখন পর্যন্তও কোন না কোন আচার, বিশেষতঃ ব্রতাচারের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত,—পূর্বে যে সৃষ্টিপত্তনের কাহিনী উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যেমন ধর্মঠাকুর বা লৌকিক সূর্যদেবতার বিশেষ পূজানুষ্ঠানের আচারভুক্ত, তেমনই পশুপক্ষীর জন্মবৃত্তান্ত-মূলক সাধারণ লৌকিক কাহিনীগুলি পর্যন্ত এমন কোন না কোন মেয়েলী ব্রতাচারের সঙ্গে জড়িত। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে কাউয়া (কাক) পীরের ব্রত নামক এক মেয়েলী ব্রত আছে। রবি ও বৃহস্পতিবারে আতপ চাউলের ভাত রাঁধিয়া শাক ও অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া একটি আওটু পাতে তাহা কাউয়া পীরকে নিবেদন করিতে হয়। দুই চোখে যত পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন কাক, কোকিল, ঘুঘু, পায়রা, শালিখ প্রভৃতিকে এই ব্রতের প্রসাদ খাইতে দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি পাখীরই জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাক ও বাদুড়ের জন্ম কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে,—এক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির লোক, কিন্তু ব্রাহ্মণী অত্যন্ত নীচাশয়া। একদিন তাঁহাদের গৃহে এক অতিথির আগমন হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে পঞ্চব্যঞ্জন রান্না করিয়া পরিতোষ সহকারে অতিথিকে ভোজন করাইবার জন্য বলিল। দুইজন ভোজনে উপবেশন করিল, ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণী উত্তম দ্রব্যসমূহ নিজের স্বামীকে এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ অতিথিকে পরিবেশন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কিছুই না বলিয়া আহার করিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু অতিথি এই আচরণে বিরক্ত হইয়া আহার অসমাপ্ত রাখিয়াই

আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল, মুখে কাহাকেও কিছু বলিল না। যাইবার সময় এই বলিয়া অভিশাপ দিয়া গেল যে, নীচ সংসর্গে বাস করিবার জন্য ব্রাহ্মণ নীচ-প্রাণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে; ব্রাহ্মণীকেও এই বলিয়া অভিশাপ দিল যে, সেও তেমনই নীচাসক্ত জীব হইয়া জন্ম লাভ করিবে। বলিবা মাত্র ব্রাহ্মণ কাক ও ব্রাহ্মণী বাদুড় হইয়া উড়িয়া গেল। এইভাবে কাক ও বাদুড়ের জন্ম হইল।

এই প্রকার অনেক পুরাকাহিনী বর্তমানে ব্রতাচারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া স্বাধীন কাহিনী রূপেও প্রচার লাভ করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইষ্টিকুটুম, বউ কথা কও, চোখ গেল প্রভৃতি পাখীর জন্মকাহিনীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের জন্ম সম্পর্কে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাহিনী এখন অধিকাংশই কোন ব্রতাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে। তবে পূর্ব মৈমনসিংহের কাউয়া পীরের ব্রতকথায় ইহাদের জন্মকাহিনী এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেই মনে হয়, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সকল পাখী সম্পর্কেও যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা সকলই একদিন কোনও ব্রতানুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই উদ্ভুত হইয়াছিল। ব্রতের সম্পর্ক এখন ঘুচিয়া গিয়া কাহিনীগুলিই মাত্র জনশ্রুতির পথ বাহিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। অধিকাংশ ব্রতানুষ্ঠানই ঐন্দ্রজালিক (magical) ক্রিয়ার প্রভাব-জাত। অতএব উক্ত পুরাকাহিনী কিংবা ব্রত-কথাগুলির সঙ্গেও যে গৌণত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কেবল মাত্র বাংলা দেশেই নহে, বাংলার বাহিরে উপজাতীয় অঞ্চলেও পুরাকাহিনী প্রধানতঃ ধর্মীয় আচারের সঙ্গেই সম্পৃক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের করমোৎসব উপলক্ষ্যে করম রাজার কাহিনী আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, বৈগাজাতির 'লারুকাজ' অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সৃষ্টিপত্তনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়; এমন কি, তাড়ী সংগ্রহ করিবার পূর্বে মারিয়া জাতি তাল বা চাউগাছের নীচে যে পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাতে তাল বা চাউগাছের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকের মূলেই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রেরণা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, পুরাকাহিনীর সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং আদিম সমাজ

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার কালে যে সকল অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিত, তাহারই সূত্র ধরিয়া লোক-কাহিনীসমূহ বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। অতএব পুরাকাহিনী আদিম কিংবা লোক-সমাজের যে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিত, বর্তমান নাগরিক কিংবা শিথিল-বদ্ধ পল্লীসমাজে সে উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না।

পুরাকাহিনীর উদ্ভবের মূলে পারিপার্শ্বিক ও বাহ্যিক কারণের পরিবর্তে অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক কারণের উপরও কেহ কেহ অত্যন্ত জোর দিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই অভিমত যে, আদিম সমাজভুক্ত মানবের অন্তর্নিহিত কতকগুলি স্বাভাবিক ধর্ম হইতেই পুরাকাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ যতদিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মের কোনও সন্ধান লাভ করিতে পারে নাই, ততদিন যে ভাবে সে এই প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় পুরাকাহিনীর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মানব-মন তাহার নিতান্ত আদিম, 'অসভ্য' ও 'বর্বর' অবস্থায়ও যে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিত না, পুরাকাহিনীগুলি তাহারই প্রমাণ। যখন কোন বিষয় সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞানই ছিল না, তখনও সে সৃষ্টি ও জীবনের জটিলতম রহস্য উদ্ভেদ করিতে চাহিত। এই বৃত্তি যদি মানুষের মধ্যে না থাকিত, তবে মানুষে ও পশুতে কোনও পার্থক্য থাকিত না। অতএব মানবিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে পুরাকাহিনীর যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সেইজন্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা তাঁহাদের আলোচনার একটি অপরিহার্য বিষয় বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন।

অজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের স্বাভাবিক একটি অভিমান-বোধ অর্থাৎ নিজের অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার না করিবার প্রবৃত্তিও পুরাকাহিনীর উদ্ভবের অন্যতম কারণ। একজন ইংরেজ লোকশ্রুতিবিৎ লিখিয়াছেন—'I should imagine that the fathers of 30,000 B. C, were just as anxious to maintain the fiction of their omniscience as the parents and schoolmasters of to-day.'[১] পুত্রের নিকট পিতা সর্বদাই নিজের অজ্ঞতা গোপন করিয়া পিতৃত্বের অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পান। সেইজন্য

১ E. E. Kellet, *The Story of Myths* (London, 1927) p. 25.

শিশুপুত্র যখন তাহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবিধ প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে পিতাকে প্রশ্ন করিত, তখন অজ্ঞ পিতা নিজের পুত্রের নিকট নিজের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যে-সকল অসম্ভব কাহিনী বর্ণনা করিতেন, তাহাও ক্রমে পুরাকাহিনীর মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। আধুনিক পরিবারের মধ্যে পিতা কিংবা মাতার যে স্থান, আদিম কিংবা লোক-সমাজের মধ্যে ওঝা বা পুরোহিতেরও সেই স্থান ছিল। অজ্ঞ পিতা যে-ভাবে পুরাকাহিনী রচনা করিয়াছে, অজ্ঞ ওঝা বা পুরোহিত সেই ভাবেই অসংখ্য পুরাকাহিনী রচনা করিয়াছে। পুরোহিতের পদ-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান হইতে যেমন ইহাদের প্রেরণা আসিয়াছে, পুরোহিতের মুখ হইতে উচ্চারিত বলিয়াই আদিম ও লোক-সমাজে তাহা ব্যাপক প্রচারেরও তেমনই সহায়ক হইয়াছে। সেইজন্য পুরাকাহিনী এখনও ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অজ্ঞতার মত অজ্ঞতাকে গোপন করিবার প্রবৃত্তিও পুরাকাহিনীর উৎপত্তির অন্যতম কারণ।

অজ্ঞতা-প্রসূত ভয়ও পুরাকাহিনী রচনার অন্যতম মৌলিক কারণ। দুর্যোগের রাত্রে অরণ্য কিংবা পর্বত-শিখরে যখন বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ করিত, তখন গুহাবাসী মানুষ আতঙ্কে শিহরিয়া ভাবিত, কোনও অনিষ্টকারী শক্তি কল্পিত দৈত্যদানবের রূপ ধরিয়া প্রকৃতির ধ্বংসের আয়োজন করিতেছে। পরদিন দুর্যোগ যখন কাটিয়া যাইত, তখন তাহারা গিয়া দেখিত, পর্বতগাত্র ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, বিরাট মহীরুহ মূলোৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া আছে—তাহা হইতেই তাহারা দৈত্যদানবের কল্পিত শক্তি-সম্পর্কে নানা কাহিনী রচনা করিত। এই সকল কাহিনী সম্পর্কে কাহারও কোনও তর্ক তুলিবার সামর্থ্য ছিল না বলিয়াই তাহা অবাধে সমাজে প্রচার লাভ করিত। পরে বিশেষ কোনও কাহিনী বংশ-পরম্পরায় পুরোহিত কিংবা ওঝার স্মৃতিপথ বাহিয়া সমাজে বিস্তার লাভ করিত। অতএব অজ্ঞতা-প্রসূত ভয় পুরাকাহিনী রচনার অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

ভয়ের সঙ্গে আদিম জাতির শিশুসুলভ বিস্ময়বোধও পুরাকাহিনী রচনার কারণ। এই বিস্ময়বোধকে 'the first element in the acquisition of all knowledge' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কৌতূহল মানব-মনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত-বুদ্ধি মানবের মনে ক্রমে ক্রমে

এই কৌতূহলবোধ দূর হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানহীন শিশুর মনে যেমন অনন্ত কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই জ্ঞানলেশহীন আদিম সমাজের মধ্যেও ইহার ব্যাপক পরিচয় লাভ করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি-সম্পর্কে আদিম সমাজের এই বিস্ময় ও কৌতূহলবোধ হইতেও পুরাকাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। বিস্ময় ও কৌতূহলবোধ হইতেই জ্ঞানলাভের সূত্রপাত হইয়াছে, এই সূত্রে পুরাকাহিনী মানব-জ্ঞানের প্রথম সোপান। আকাশের দিকে চাহিয়া মানুষ দেখিয়াছে, কতকগুলি নক্ষত্র যদি কল্পনার সূত্র দ্বারা সংলগ্ন করা যায়, তবে ইহারা এক একটি পশুর রূপ লাভ করে ; তাহা হইতেই মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশির পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে ; তারপর মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি কেন যে মর্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া আকাশে আরোহণ করিয়াছে, সেই সম্পর্কেও কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। এই ভাবে গ্রহনক্ষত্র-সম্পর্কিত পুরাকাহিনী সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রের যেমন সীমা নাই, এই সম্পর্কিত পুরাকাহিনীরও তেমনই সংখ্যা নাই।

উপরোক্ত কারণ সমূহের সঙ্গে আরও কয়েকটি মনস্তত্ত্বমূলক কারণ পুরা-কাহিনীর উদ্ভবের মূল বলিয়া অনুমান করা হয় ; যেমন, একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর সামঞ্জস্য কল্পনা। মানুষ জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়—ইহা হইতেই আদিম সমাজ মনে করিত, বিশ্বপ্রকৃতিও একদিন এমনই ভাবে জন্মলাভ করিয়াছে। পক্ষী ডিম্ব প্রসব করে, ডিম্ব হইতেই ইহার শাবক জন্মগ্রহণ করে ; অতএব কোনও জাতির পুরাকাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়, ডিম্ব হইতে বিশ্বসৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং একটি বস্তু কিংবা অবস্থার সঙ্গে আর একটি বস্তু কিংবা অবস্থার তুলনা করিবার প্রবৃত্তি হইতেও পুরাকাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

মানব-মনের স্বাভাবিক ভয় হইতে যেমন কোন কোন পুরাকাহিনী মূলতঃ রচিত হইয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয়, তেমনই মানব-মনের মধ্যে স্বাভাবিক সাহসিকতারও যে একটি স্থান আছে, তাহা হইতেও কোন কোন পুরাকাহিনী উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত ভয়ও যদি মানুষকে জয় করিতে পারিত, তাহা হইলে মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্তু ভয়ের পার্শ্বেই তাহার সাহসিকতার একটি বৃত্তিও প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। সুযোগ পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশ করে ;

তাহার ফলেই মানুষ দেশ হইতে দেশান্তর, দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরের পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতে পারিয়াছে। সেইজন্য পৃথিবীর সর্বত্র আজ মানব-বসতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। মানব-মনের এই স্বাভাবিক সাহসিকতার বৃত্তি হইতে সকল দেশেই বহু পুরাকাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাকাহিনীর একটি বিশিষ্ট কাহিনী-গুণ আছে। তাহা পরিণত-মনের রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম না হইলেও, যে-যুগের সমাজে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, সে-যুগের সমাজের কাহিনী শুনিবার পিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইত। গল্প শুনিবার প্রবৃত্তি যেমন মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক, গল্প উদ্ভাবন করিবার প্রবৃত্তিও মানুষের তেমনই একটি স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র। অতএব এই বৃত্তি যতই অপরিপুষ্ট হউক, ইহা সর্বদাই নূতন নূতন কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং গল্প শুনিবার স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে মানব-সমাজ চিরদিনই সেই কাহিনী গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। এইভাবে পুরা-কাহিনীর ধারা সমাজের মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইংরেজিতে myth-এর সঙ্গে legend কথাটি প্রায় সর্বদাই যুক্ত হইয়া থাকে। Myth শব্দটিকে বাংলায় যদি পুরাকাহিনী বলিয়া অনুবাদ করা যায়, তবে legend কথাটিকে ইতিকথা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। Myth-এর সঙ্গে legend-এর পার্থক্য সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ লোক-কথার সঙ্গে পুরাকাহিনীর সম্পর্ক আছে বলিয়া বিবেচনা করেন। একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পুরাকাহিনী, কাহিনী ও কথা (folk tale)র মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ইহাদের চরিত্রগুলির গুণগত পার্থক্য মাত্র। পুরাকাহিনীর চরিত্র দেবতা, কাহিনীর চরিত্র অতি-মানব এবং কথার চরিত্র মানব—এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোনও পার্থক্য নাই। সেইজন্য লোক-কথাকে কেহ কেহ 'broken down myths' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে পুরাকাহিনী লৌকিক প্রয়োজনীয়তায় দৈব সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া মানবিক সম্পর্ক লইয়া পুনর্গঠিত হইতে পারে—পুরাকাহিনীর ভিত্তির উপর লোক-কথা রচিত হয়।

এ'কথা সত্য যে, লোক-কথায় বিশেষতঃ রূপকথা ও ব্রতকথায় পুরাকাহিনীর বহু উপাদান আছে। কাক ও বাদুড়ের জন্ম-সম্পর্কিত যে পুরাকাহিনী পূর্বে

উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কাউয়া (কাক) পীরের ব্রতকথা। পূর্বে ব্রতকথা সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, বহু ব্রতকথা রূপকথায় এবং রূপকথা ব্রতকথায় পরিণত হইয়াছে। অতএব পুরাকাহিনী ব্রতকথা ও রূপকথা প্রত্যেকেরই গল্প বলাই যখন লক্ষ্য; তখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে—তবে তাহা সত্বেও ইহাদের নিজেদের পরস্পর মৌলিক বৈশিষ্ট্যও রক্ষা পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলায় দেবমাহাত্ম্যসূচক যত আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই সূচনায় সৃষ্টির উদ্ভব-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং এই পুরা-কাহিনীর সূত্র ধরিয়াই অলৌকিক ও মানবচরিত্র সমূহের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব ইহাদের মধ্য দিয়া যে একটি পরস্পর যোগসূত্র আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করিয়াছেন,—Stories are found telling of journeys to the spirit land, of talking animals, of men metamorphosed into animals and trees, and these are all animistic or originate in animistic belief. Modern folk-tales containing such stories possess a very great antiquity, or are merely very old myths partly obscured by a veneer of modernity.[১] বাংলার অধিকাংশ রূপকথাই এই প্রকার পুরাকাহিনীর ভিত্তির উপর রচিত।

কি কারণে পুরাকাহিনী লোক-কথায় রূপান্তরিত হয়, এখন তাহাই আলোচনা করিতে হইবে। মানবের চিন্তাধারা যতই ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহা যুগোচিত পরিবর্তিত হয়। যে সমাজ প্রকৃতির নিকট হইতে সর্বদা নির্মম আচরণ লাভ করিয়াছে, সেই সমাজ যখন প্রাকৃতিক নিয়ম-সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়া সেই প্রকৃতিকেই নিজের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে, তখন প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যে তাহার ক্রমপরিবর্তিত হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই ক্রমপরিবর্তন অনুযায়ী তাহার পুরাকাহিনীও স্বভাবতই পরিবর্তিত হইবে। যে সকল উপকরণের নূতন পরিবেশের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়া পরিবর্তন করা সম্ভব, তাহারা সেই অনুযায়ী নূতন রূপ

১ L. Spence, *An Introduction to Mythology* (London, 1931), p. 28.

লাভ করিবে ; যাহা পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নহে, তাহা ক্রমবিকাশের ধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রাণহীন জড় পদার্থের মত এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিয়া কালক্রমে লোপ পাইবে। পুরাকাহিনীর এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াই লোক-কথার উদ্ভব হইয়াছে। পুরাকাহিনীর যে সকল উপকরণ এই ধারার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, তাহা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া কিংবা সামাজিক আচারের (ritual) রূপ লাভ করিয়া নির্জীব জড় পদার্থের মত ক্রমে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রের বাহিরে চলিয়া যায়। বাহিরের দিক হইতে কোনও ধর্ম যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন ইহার সম্পর্কিত পুরাকাহিনী ও আচারসমূহ সমাজের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে, ইহার এই প্রচ্ছন্ন উপকরণগুলি তখন ক্রমে ধর্মের সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ও লোক-কথার মধ্য দিয়া নূতন পরিচয় লাভ করে মাত্র।

একজন ইংরেজ লোকশ্রুতিবিৎ এই কথাটি সম্প্রতি সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন,—'on the official demise of a religion it may continue to be celebrated secretly, and this secret celebration may degenerate into magic and its myths change into folk-tale.'[১] অতএব কত বিস্মৃত জাতির বিলুপ্ত পুরাকাহিনীর বিচিত্র ভিত্তির উপর যে বাংলার লোক-কথাসমূহ রচিত হইয়াছে, তাহা আজ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, পুরাকাহিনী মাত্রই অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ইহারা রূপান্তরিত হইতেছে। লোক-সাহিত্যের স্বাভাবিক ধর্মের মতই ইহাও রূপান্তরিত হইতে গিয়া কখনও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় অবনমিত এবং কখনও লোক-কথায় উন্নীত হইতেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত পুরাকাহিনীতে বিস্ময়কর ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি যে সকল অঞ্চলে সমুদ্র কিংবা বৃহৎ জলাশয় সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেই সকল অঞ্চলেও অনন্ত জলরাশি হইতেই যে সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, এমন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ সম্পর্কে দুইটি মতই প্রচলিত আছে—প্রথমতঃ সাধারণ মানবিক চিত্ত-বৃত্তি

১ ibid. p. 88.

হইতেই এই পরিকল্পনার পরস্পর স্বাধীন উদ্ভব ; দ্বিতীয়তঃ এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ইহার বিস্তার। তবে যাঁহারা শেষোক্ত মতাবলম্বী, তাঁহারা একথা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে ইহা এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে ; বরং তাঁহারা মনে করেন, 'all cases should be examined on their individual merits.' এই সম্পর্কে যে কোনও সাধারণ নিয়ম মানিয়া লইতে পারা যায় না, তাহা সত্য।

পুরাকাহিনীকে বিষয়ানুসারে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে প্রথমেই সৃষ্টির কাহিনী উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতি এবং প্রধান দেবদেবীগণ কি ভাবে সৃষ্ট হইল, তাহাদের কথাই মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই পৃথিবীতে কি ভাবে বসতি স্থাপিত হইল, তাহাও উল্লেখিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে কি অবস্থা ছিল, কি অবস্থায় কি রূপের ভিতর হইতে প্রথম সৃষ্টির উন্মেষ হইল—আদিম সমাজের প্রাকৃতিক জ্ঞানের এই সকল বিচিত্র পরিচয় ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্ব-সৃষ্টির পরই জীবজন্মের বৃত্তান্ত পুরাকাহিনীতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মানুষ, পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীবের উৎপত্তির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাকাহিনীতে সৃষ্টিতত্ত্বের মত ব্যাপক বর্ণনা আর কোন বিষয়ের নাই। বিভিন্ন প্রকৃতির পুরাকাহিনীর নিম্নে কিছু পরিচয় দেওয়া যাইবে।

বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সন্ধান করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, আজ পর্যন্তও তাহার সেই অনুসন্ধানের বিরাম নাই। তবে আদিম সমাজ যে উপায় অবলম্বন করিয়া এই অনুসন্ধানের কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল, আধুনিক সমাজ তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহাদের উভয়ের মৌলিক প্রেরণার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ঋগ্বেদের প্রাচীন ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কূহ কস্য শর্মন্
নভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিংচ নাস ॥ ২ ॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে
হপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ পিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্ মহিনা জায়তৈকন্ ॥ ৩ ॥—১০, ১২৯

'তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল? ১।

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না, কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ২।

সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলমগ্ন ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। ৩।'—রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ।

বাংলা দেশের লৌকিক পুরাকাহিনীতেও প্রায় অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়—

নহি রেথ নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবিশশী নহি ছিল নহি রাতিদিন।
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥
ন ছিল সৃষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল ॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥
ঋষি যে তপসী নহিক নহিক ব্রাহ্মণ।
পাহাড় পর্বত নহি নহিক স্থাবর জঙ্গম ॥

পুণ্যস্থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল।
নহি সৃষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
ব্রহ্মাবিষ্ণু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥
বার বরত নহি ছিল ঋষি যে তপসী।
তীর্থস্থল নহি ছিল গঙ্গা-বারাণসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার॥
দশ দিকপাল নহি মেঘ-তারাগণ।
আয়ু-মৃত্যু নহি ছিল যমের তাড়ন॥
চারিবেদ নহি ছিল শাস্ত্রর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার॥
জীবজন্তু নহি ছিল ন ছিল বিম্বুপাত।
দেব-থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ।[১]

এক অখণ্ড মহাশূন্যতার মধ্যে শূন্যে ভর করিয়া সৃষ্টিকর্তা তখন নিঃসঙ্গ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তারপর ক্রমে এই ভাবে সৃষ্টির উদ্ভব হইল—

শূন্যত ভরমন পরভুর শূন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মায়াধর॥
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন॥
অনিল হইতে পরভুর হয়ে গেল দয়া।
ঠাকুরের পরিষদ হইল কত মায়া॥
আসন ছাড়িয়া পরভু বৈসেন চুমুক[২] উপরে।
পরভুর আসন বিম্বু সহিতে না পারে॥
ভাঙ্গিল জলের বিম্বু হইল ভাগ ভাগ।
শূন্যেত বেড়াওন পরভু কাউর নহি পান লাগ॥

---

১ শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩৬), পৃঃ ১-৪, সহজ অর্থোপলব্ধির জন্য বানান যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

২ জলবিম্ব

স্থখেতে বেড়াওন পরভু লাগাল না পাইয়া।
তথা হইতে রহিলেন্ত আসন করিয়া॥
বিশার[১] উপরে পরভুর উপজিল দয়া।
আপনি সিরজিল পরভু আপনার কায়া॥
দয়ার সাগর পরভু হ'য়ে গেল থিত।
দেহ হইতে পুনর্জন্ম জন্মে আচম্বিত॥
জনমিল পুরুষ তার নহি হাতা পাও।
রজোবীজে জনম তার নাহিক বাপ মাও॥
জনমিল পুরুষ তার নহিক ছুটি আঁখি।
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি॥
দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।
পরভু সঙ্গতি কেহ নহ একজন॥[২]

সৃষ্টিকর্তা নিরঞ্জন (সূর্য) অবশেষে নিজের আসনে উপবেশন করিলেন, চৌদ্দ যুগ একাসনে বসিয়া তপস্যায় কাটিয়া গেল; যখন তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হইল, তখন তিনি তাঁহার দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এক হাই তুলিলেন, তাঁহার সেই হাই হইতে উল্লূকের জন্ম হইল। জন্মলাভ করিয়া উল্লূক পক্ষী উড়িয়া যাইতে লাগিল, ধর্ম তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি উল্লূক, উল্লূক বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার ডাকে উল্লূক আর চলিতে পারিল না, উড়িয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল। উল্লূক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কি আদেশ জানিতে চাহিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন. 'তুমি কোথা হইতে আসিলে?' উল্লূক বলিল. 'এই মাত্র তোমার হাই হইতে আমার জন্ম হইল।' শুনিয়া নিরঞ্জন ধর্ম তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—

'আইস, আইস, ওরে বাছা উল্লূক, থাক মোর দৃষ্টে।
তিলেক বিরাম আহ্মি করি তব পৃষ্ঠে॥"
ধেয়ানেত শুনিল পক্ষে (পক্ষী) পরভুর বচন।
পিঠা পেতে দিল পক্ষ করিতে আসন॥

১ বিশ্বের; শূন্যপুরাণ, ঐ, পৃঃ ৪-৭

উল্লূকের পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিয়া নিরঞ্জন ধর্ম যোগসাধনা করিতে লাগিলেন। চৌদ্দ যুগ এই ভাবে কাটিয়া গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় উল্লূক কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে বলিল, 'আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, ক্ষুধায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।' ধ্যানস্থ থাকিয়াই ধর্ম উল্লূকের মনের কথা জানিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, 'কোথাও কিছু নাই, তোমাকে কি খাইতে দিব ?' উল্লূক বলিল, 'তোমার মুখের অমৃত দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন তোমাকেই পৃষ্ঠে বহন করিব।'

ধেয়ানেতে শুনিলেন্ত পরভু দিলেন্ত ততখন।
মুখের অমৃত পরভু দিলেন্ত ততখন॥
মুখ পাতি উল্লূক আহার খায় সুখে।
বদনের লাল দিল উল্লূকের মুখে॥

প্রভুর মুখামৃত উল্লূক কিছু আহার করিল, কিছু শূন্যে পড়িয়া গেল; যে অংশ শূন্যে পড়িল, তাহা হইতে জলের সৃষ্টি হইল। উল্লূকের উপর আসন করিয়া নিরঞ্জন ধর্ম সেই নির্মল জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন। উল্লূক তাঁহার ভার সহিতে পারিল না—রসাতলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, জলের আঘাতে তাহার বীর পক্ষ খসিয়া পড়িল, তাহাতে হংসের জন্ম হইল। হংস কিছুক্ষণ শূন্যে ভ্রমণ করিয়া ধর্মের আহ্বানে তাঁহার নিকট আসিল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কি অভিপ্রায় জানিতে চাহিল। ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি করিয়া জন্ম হইল বল।' হংস বলিল, 'উল্লূকের বীরপক্ষ হইতে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিলাম—তুমিই আমার মাতাপিতা, তুমিই আমার প্রভু।'

এত শুনি নিরঞ্জন আনন্দিত মন।
হংসেরে চাহিয়া কিছু বলন্তি তখন॥
'জীঅ জীঅ হংস বাছা হও রে চিরাই।
জলের হিল্লোলে আমি বহু কিলেশ পাই॥
আইস বাছা পরমহংস থাক মোর দিঠে।
তিলেক বিরাম আন্ধি করি তব পিঠে॥
ধেয়ানেতে জানিল হংস পরভুর বচন।
পিঠ পেতে দিলা হংস করিবা আসন॥

হংসের পিঠেত পরভু জলেত বসিল !
ধেয়ানেতে বসি পরভুর কত যুগ গেল ॥

হংসের ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল, ধর্মঠাকুরের ভার আর সহ্য করিতে পারিল না—তাঁহাকে ফেলিয়া শূন্যে পলাইয়া গেল। প্রভু জলের উপর আপনি ভাসিতে লাগিলেন, জলে প্রলয়ের উচ্ছ্বাস দেখা দিল। তিনি জলের উপর তাঁহার পদ্মহস্ত স্থাপন করিলেন, তাহাতে কূর্মের জন্ম হইল। জন্মমাত্র কূর্ম পলাইয়া যাইতে লাগিল, ধর্ম তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। কূর্ম আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথা হইতে আসিলে খুলিয়া বল।' কূর্ম বলিল, তোমার পদ্মহস্তের স্পর্শে আমি এই মাত্র জন্মলাভ করিলাম।' শুনিয়া নিরঞ্জন ধর্ম তাহাকে বলিলেন,

জীও জীও কূর্ম বাছা হওরে চিরাই।
জলের হিল্লোলে আহ্মি বড় দুঃখ পাই ॥
আইস বাছা কূর্মরাজ থাক আমার দিঠে।
তিলেক বিশ্রাম আহ্মি করি তুহ্মার পিঠে ॥'

শুনিয়া কূর্মরাজ পিঠ পাতিয়া দিল, ধর্ম নিরঞ্জন জলের উপর কূর্মপৃষ্ঠে আসন করিয়া বসিলেন। তিনি পুনরায় ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে কূর্ম ভারে কাতর হইয়া পড়িল, অবশেষে তাঁহাকে পৃষ্ঠ হইতে নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া গেল, তিনি পুনরায় জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন। তখন উল্লূক পরামর্শ দিল, 'দেবতা হইয়া জলের উপর আর কত ভাসিয়া বেড়াইবে? বরং জলের উপর সৃষ্টি পত্তন কর।' ধর্ম বলিলেন, 'কোথাও স্থল নাই, কি ভাবে সৃষ্টির পত্তন হইবে?' উল্লূক বলিল, 'তোমার কনক পৈতা ছিঁড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও, তাহাতেই সৃষ্টির উপায় হইবে।'

উল্লূকের বাক্য শুনি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা খুলিয়া লইল ততখন ॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা।
জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা ॥

জন্ম মাত্র বাসুকি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িল, ধর্মঠাকুর ও উল্লূককেই খাইয়া ফেলিতে চাহিল। দুইজনে পলাইয়া বাঁচিলেন। ঠাকুর ভাবিলেন, 'নাগের

আহার কোথা হইতে যোগাইব ?' তখন উল্লূক বলিল, 'তোমার কানের কুণ্ডলটি জলে ফেলিয়া দাও।' ঠাকুর তাহাই করিলেন, তাহা হইতে ভেকের জন্ম হইল, বাসুকি আহার করিয়া শান্ত হইল, তারপর ঠাকুরের মাথার উপর ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর নিজের গলায় পদ্মহস্ত স্থাপন করিলেন, সেখান হইতে তিলেক পরিমাণ ময়লা লইয়া বাসুকির মাথায় রাখিলেন, তাহা হইতে বসুমতীর সৃষ্টি হইল।[১] ক্রমে বাসুকির মাথায় বসুমতী বাড়িয়া চলিতে লাগিল; দেখিয়া ধর্মঠাকুর ও উল্লূকের মনে আনন্দ আর ধরে না। ঠাকুর তখন বসুমতীকে বলিলেন, 'আমি যাহার জন্ম দিব, তাহাকে তুমি তোমার মধ্যে স্থান দিও।' শুনিয়া বসুমতী আনন্দের সঙ্গে তাহা স্বীকার করিলেন। জল ছাড়িয়া ঠাকুর উল্লূককে লইয়া তীরে উঠিলেন, তারপর 'উল্লূক আসন কৈলেন প্রভু নারায়ণ।' ত্রিকোণ পৃথিবীর জন্ম হইল। পৃথিবী ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, ঠাকুর ও উল্লূক তখন পৃথিবীর সীমা নিরূপণ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন।—

ভরমিতে ভরমিতে দুহে চলে ঠাঞি ঠাঞি।
বেগেতে বাঢ়িয়া চলে দেবী বসুমাই॥
পৃথিবী ভরমিয়া দুহে পরিসরম হইঞা।
অর্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিঞা॥
তাহে আদ্যাশক্তির জন্ম হইল আচম্বিত।
ঘামেতে জনমিল শক্তি চলিল তুরিত॥

উল্লূক ধর্ম ঠাকুরকে বলিল, 'আমরা কেন ঘুরিয়া মরিতেছি? এইবার পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি কর। জগৎস্রষ্টা বলিয়া তোমার নাম প্রচার লাভ করুক।' এদিকে আদ্যাশক্তি জন্মলাভ করিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই—কেবল ধর্ম ও উল্লূক সম্মুখের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। আদ্যাশক্তি তাহাদের পিছু ছুটিলেন। অবশেষে তিনি উভয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? তোমার কি ভাবে জন্ম হইয়াছে, বল।' আদ্যাশক্তি বলিলেন,

১ স্রষ্টার গায়ের ময়লা (dirt) হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবার কথা উড়িষ্যার আদিবাসী অঞ্চলেও শুনিতে পাওয়া যায়; দ্রষ্টব্য Verrier Elwin, *Tribal Myths of Orissa* (*Bombay, 1954*), pp. 3, 4,482. ভারতীয় অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলেও ইহার অনুরূপ পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে।

'তোমার অর্ধাঙ্গের ঘাম হইতে এইমাত্র আমার জন্ম হইল, আমার আর কোন মাতাপিতা নাই।'

এতবাক্য শুনি তথা হাসিল নিরঞ্জন।
ঝিয়ারি বলিয়া তাক করিল সম্ভাষণ ॥
দুইজনা যুক্তি করি বোলে দুইজন।
আদ্যাশক্তি বোলে নাম রাখিল তখন ॥
ঠাকুর উল্লূক দোহে বাজিল যে কথা।
'উল্লূক তোহ্মার খুড়া, আহ্মি তোমার পিতা ॥'

উল্লূক ঠাকুরকে বলিল, 'এখন আদ্যাশক্তিকে একাকী রাখিয়া কোথায় যাইবে?' তিনি বলিলেন, 'আদ্যাকে ঘরে রাখিয়া তপস্যা করিতে যাইব।' শুনিয়া আদ্যাশক্তি বলিলেন, 'তপস্যায় গিয়া আমাকে ভুলিয়া থাকিও না!' ঠাকুর বলিলেন, 'তোমাকে ছাড়া এক তিল আমি কোথাও থাকিব না।' তখন আদ্যাকে গৃহে রাখিয়া ধর্মঠাকুর ও উল্লূক উভয়েই বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিবার জন্য গেলেন। বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিয়া ঠাকুর তাহার তীরে তপস্যা করিতে বসিলেন। চৌদ্দ যুগ তপস্যায় কাটিয়া গেল। এদিকে আদ্যাশক্তি যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসঙ্গ জীবন তাঁহার ক্রমে দুঃসহ হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের কামনা হইতে কামদেবের জন্ম হইল। কামদেব জন্মমাত্র জোড়হাত করিয়া বলিলেন, 'কি করিতে হইবে, আদেশ কর।' তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'সত্বর বল্লুকায় গিয়া আমার পিতাকে আমার সংবাদ দাও।' কামদেব বল্লুকাতীর গেল; তপস্যায় মগ্ন ধর্মঠাকুরের তপোভঙ্গ করিল। ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'কে আমার তপস্যা ভঙ্গ করিল?' উল্লূক তখন সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। ঠাকুর কামদেবকে একটি মৃৎপাত্রে বন্দী করিয়া রাখিয়া গৃহে চলিলেন। সেই মৃৎপাত্র মধ্যে কালকূট বিষের জন্ম হইল। গৃহে আসিয়া ধর্মঠাকুর আদ্যার যৌবন দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তারপর তাহাকে বলিলেন, 'তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি বল্লুকায় তোমার পাত্রের সন্ধান করিতে যাইতেছি।' আদ্যা বলিলেন, 'আমার জন্য কি রাখিয়া যাইতেছ?' ঠাকুর বলিলেন, 'এক পাত্রে বিষ ও আর এক পাত্রে মধু রাখিয়া যাইতেছি—ইহা লইয়া যাহা ইচ্ছা করিও।' বলিয়া উল্লূককে সঙ্গে করিয়া পুনরায় বল্লুকা তীরে আসিলেন। কিন্তু আদ্যার বর কোথায় পাইবেন? এমনই দিন যাইতে

লাগিল। এ'দিকে আদ্যা যৌবনভার সহিতে পারিতেছেন না; মনে করিলেন, বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ভাবিয়া পাত্র হইতে বিষ লইয়া পান করিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইল না, বরং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি গর্ভবতী হইলেন। ধর্ম বল্লুকা নদীর তীরে তপস্যায় মগ্ন—তিনি এই বিষয় কিছুই জানেন না। আদ্যার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হইল। তাঁহারা সকলেই জন্মান্ধ হইলেন এবং জন্ম মাত্র তিনজনই তপস্যা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। নিরঞ্জন ধর্ম তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য দুর্গন্ধ শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের সম্মুখে চলিলেন। প্রথমতঃ তিনি ব্রহ্মার সম্মুখে গেলেন; দুর্গন্ধ পাইয়া ব্রহ্মা তিন অঞ্জলি জল দিয়া মড়া ভাসাইয়া দিলেন। তারপর তিনি বিষ্ণুর সম্মুখে গেলেন; দুর্গন্ধ পাইয়া বিষ্ণুও তিন অঞ্জলি জল দিয়া তাহা ভাসাইয়া দিলেন।

ভাসিয়া ভাসিয়া পরভু করিল গমন।
শিবের নিকট গিয়া ভাসে নারায়ণ ॥
দুর্গন্ধ পাইয়া শিব ভাবে মনে মন।
কোথা কারো জন্ম নাহি মরিল কোনজন ॥
ধেয়ানেত জানিল এহি পরভু নারায়ণ।
বুঝিতে তিন জনার মন আসিল সনাতন ॥
দু'হাতে ধরিয়া মড়া তুলিয়া লইল।
দুর্গন্ধিত শব ল'য়ে শিব নাচিতে লাগিল ॥
'পচাগন্ধ মড়া হয়ে আইলা নারায়ণ।
চিনিতে নারিল আন্ধার ভাই দুইজন ॥'

ধর্মঠাকুর বলিলেন, 'তুমিই কেবল আমাকে চিনিলে, অতএব তোমার দুই চক্ষু অন্ধ ছিল, আমি তোমার দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন তিন চক্ষু দান করিলাম।' চক্ষুদান পাইয়া শিব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তারপর বলিলেন, 'আমার দুই ভাই অন্ধ, তাহাদিগকেও তোমার চক্ষুদান দিতে হইবে।'

এত শুনি পরাৎপর বোলে ত্রিলোচনে।
'তব মুখামৃতে চক্ষু পাইব দুহিজনে ॥'
মুখর অমৃত দিয়া দুহার চক্ষু দিল।
অমৃত পাইয়া দুহার দিব্যচক্ষু হইল ॥

এইবার তিন ভাই আদ্যাশক্তির কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্মঠাকুর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি উৎপাদন করিবার জন্য বলিলেন, বিষ্ণুকে সৃষ্টি পালন করিবার আদেশ দিলেন এবং ত্রিলোচনের উপর সৃষ্টি সংহারের ভার অর্পণ করিলেন ; তারপর আদ্যাশক্তিকে বলিলেন,

'নরলোকের জনম হেতু তুহ্মি দেহ মন।
তুহ্মা হইতে হয় যেন সৃষ্টির পত্তন।'
আদ্যাশক্তি বোলে, 'পরভু শুন মায়াধর।
কেমনে করিব সৃষ্টি সংসার ভিতর॥
অযোনিসম্ভবা ভোগ নাহিক আহ্মার।
কেমন উপায় করি কহ করতার॥'
মহাপরভু বলে, 'শুন, আহ্মার বচন।
যে রূপে করিব তুহ্মি সৃষ্টির সৃজন॥
যোনিরূপা হএ তুহ্মি সর্বজীবে রবে।
মানুষ আদি জীবজন্তু গর্ভেত জনমিবে॥
এহিরূপে কর সৃষ্টি কহি যে তোমারে।
মহেশ করিবে বিভা জন্ম-জন্মান্তরে॥'

নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের উপদেশ মত আদ্যাশক্তি বারবার জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অবশেষে শিবকে বিবাহ করিলেন—তাঁহাদের মিলনের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীতে নরনারী জন্মগ্রহণ করিল।

সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনী উপরে আলোচনা করা গেল, তাহা পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের লোক-সাহিত্যে প্রায় অভিন্ন, তবে উত্তর বঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা উপরি-উদ্ধৃত পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ়ের কাহিনী হইতে অনেক সংক্ষিপ্ত। পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃত কাহিনী অপেক্ষা যে কেবল সংক্ষিপ্তই তাহা নহে, তাহার মধ্যে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। নানা কারণে তাহা আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিবার যোগ্য ; ইহার সহিত উপরি-উদ্ধৃত কাহিনীর তুলনা করা যাইতে পারে—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
যাহার লীলায় হৈল এ তিন ভুবন॥

না ছিল স্বর্গ মর্ত্য না ছিল পাতাল।
জল মধ্যে ভাসে প্রভু সেই দীনদয়াল॥
নাহি ছিল হুতাশন আছিল ত পানী।
নাহি ছিল গুরুশিষ্য ভাটি আর উজানী॥
নাহি ছিল চন্দ্রসূর্য না আছিল শিষ।
সর্পের মুখে না আছিল কালকূট বিষ॥
হুঙ্কারে না হইল সব স্থান নৈরাকার।
না আছিল জল স্থল ঘোর অন্ধকার॥
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদি হইল মন।
শক্তি বিনে কিরূপেতে করিবে স্বজন॥
নিদ্রা ভাঙ্গি মহাপ্রভু হইল চেতন।
চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ॥
'কোথা হৈতে আইলা তুমি কি নাম তোমার।'
এই বলিয়া ধরিবারে মনে কৈলা সার॥
লড়ালড়ি করি প্রভু যায় ধরিবারে।
চতুর্দিকে যায় প্রভু নারে ধরিবারে॥
তুরমান গিয়া প্রভু তাহাকে ধরিল।
অতিক্রোধে তার পরে চাপিয়া বসিল॥
জানুপদ দিয়া প্রভু করিল আসন।
নখে বিদারিতে প্রভু ভাবিলেক মন॥
শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক ঝারা।
শূন্য মধ্যে জন্মিলেক লক্ষ লক্ষ তারা॥
উদরে না বহে বীর্য মুখেতে আসিল।
সেই বীর্যে সূর্যদেব তখনে হইল॥
সেই বীর্যে চন্দ্র জন্ম হৈল তখন।
জন্মিয়া যে চন্দ্রদেব উঠিল গগন॥
আদ্য কথা কহি আমি শুন হে বিচার।
বৈকার স্থাপনা এই শুন কহি সার॥

চৈতন্য পাইয়া পুনি করে নিরক্ষণ।
সহিতে না পারি বেগ হৈলা অচেতন॥
বৈকার স্থাপনা এই ক্ষিতি অবতার।
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু মনে কৈল সার॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি কহিতে লাগিল।
আপনার দেখা পুনি আপনে পাইল॥
ভাবুক ভাবিনী যদি ভাবতে দেখিল।
ভাবিতে ভাবিতে প্রভু বিমর্ষি পাইল॥
হুঙ্কারে জন্মিল ধর্ম বিষ্ণু হইল মুখে।
আপনে আপনে কায়া রাখিল সম্মুখে॥
আদি অনাদি দুই করি নিরীক্ষণ।
ভাবের আনলে ঘর্ম হইল তখন॥
সেই ঘর্মে পরমাত্মা হইলেক যেই।
সেই ঘর্মে জর্মিলেক আপ্তমা সেই॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ঘর্মেতে জর্মিল।
এই সকল একে ·একে আপনে জর্মিল॥
জলস্থল ভরি আছে এ তিন ভুবন।
সেই ঘর্মে জর্মিলেক যথ জীবগণ॥
যোগ পরিচয় হেতু করিল কারণ।
আদি অনাদি সৃষ্টি করিল তখন॥
আকাশ পাতাল মর্ত্য সৃজন করিয়া।
আদ্যাদেবী আছিলেক অনাদির ক্রিয়া॥
অনাদিয়ে বলে, 'আদি, তোমারে বুঝাই।
উৎপত্তি প্রলয় সমর্পিলুম তোমার ঠাঁই॥'
আদি বোলে, 'তোমা সঁপি আমি আছি ভিন
তোমার আমার জান এক অংশ চিন॥'
আদি বলে, 'কহি দেও সয়ালের স্থিতি।
কেমন সংযোগে হইল কাহার উৎপত্তি॥

কোথা হৈতে আইলে সেই কোথা চলি যায়।
সেই সব বিবরণ কহিতে জুয়ায়॥'
আদ্য অনাদ্যরূপে করে নিরক্ষণ।
ভাবেকে আপনা ঘর্ম জর্মিল তখন॥
সেই ঘর্মে জন্ম হৈলা আদ্য সর্বজন্তু।
আনল বরুণ ভাবি স্থির কৈলা তনু॥
একে একে সর্বজন সৃজন করিলা।
সেই ঘর্মে মহামুনি সকল জর্মিলা॥
সেই ঘর্মে মহামুনি হইলেন স্থাপন।
সেই ঘর্মে হইলেন পৃথিবী উৎপন॥
আকাশ-পাতাল-মর্ত্য সৃজন করিলা।
সংসারের যথ কিছু সকল সৃজিলা॥[১]

উপরি-উদ্ধৃত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে ঘটনার পারম্পর্য ও তাহার সুস্পষ্ট বিন্যাস নাই। এই বিষয়ে কতকগুলি অপরিস্ফুট কল্পনা সমাজ-মনে উদিত হইয়া এই রচনাগুলির মধ্য দিয়া তাহাদের অস্পষ্ট ছায়া বিস্তার করিয়াছে মাত্র—কোন সুপরিণত ভাব ও রস-পরিকল্পনা ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। পৃথিবীর সকল দেশের পুরাকাহিনীতেই সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—ইহাদের ভাব ও চিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য বড় দেখা যায় না। পৃথিবীর সকল দেশের পুরাকাহিনীতেই অনন্ত জলরাশি সৃষ্টির প্রথম উদ্ভব-স্থল বলিয়া গণ্য হইয়াছে; এই পুরাকাহিনীর পথেই বৈজ্ঞানিক সত্যেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, যদিও সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা সংস্কৃত পুরাণ মাত্রেরই অন্যতম প্রধান লক্ষণ, তথাপি বাংলা লোক-সাহিত্য হইতে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা উপরে উদ্ধৃত করা গেল, তাহার সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী অপেক্ষা বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের অধিবাসী

১ গোরক্ষ-বিজয়, মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৪) পরিশিষ্ট (ক) পৃঃ ৩—৯

উপজাতীয় লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীর অধিকতর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে মধ্যভারতের গঁড়জাতির মধ্যে যে সৃষ্টি-তত্ত্বের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি—

'......in the beginning all was water, and Bhagavan (the Eternal) sat on a lotus leaf in the midst of the ocean. His priest Sahadev Pandit, sat by his side, in his hand a holy book large as a mountain. Bhagavan cleaned his body of the dirt that was on it and out of that dirt he made a crow and bade it go in search for the earth. The crow set out and for six months it searched, but found no place to rest nor anything to eat or drink, for all was ocean. But there was a huge tortoise, Chakramal Chatri was its name—on the bottom of the sea was its foot ; its head reached to the sky. The crow settled on its head, and Chakramal Chatri asked, 'Who are you ? For twelve years I have been hungry. I will make a meal of you.' The crow answered, 'Bhagavan has sent me forth to find the earth but six months have passed and I have not found it, and I too am hungry.' Chakramal Chatri answered, 'You rest here for a time, and I will look for the earth instead.' So saying, he sank into the depth of the ocean, and there he discovered that the earth had been swallowed by Nal Raja and Nal Rani who were living in hell....[১]

উড়িষ্যার পার্বত্য ভূইঞা জাতির মধ্যেও এইরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়—

"In the beginning there existed only God or Dharma whose visible representation was the Sun with the moon. Then there

১ Hivale and Elwin, *Songs of the Forest*, op. cit. pp. 18 ff

appeared an ocean of water of the depth of seven times the height of a man with upraised hands.'[১]

পঞ্চভূতময় বিশ্বসৃষ্টির পরই দেবদেবীর জন্মকাহিনীর কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহাও পুরাকাহিনীর একটি বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। উপরে বিশ্বসৃষ্টির যে কাহিনী উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বিশ্বপ্রকৃতির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান কয়েকজন দেবতা, যেমন সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির পালক ও ইহার সংহার-কর্তার আবির্ভাব হইয়াছে এবং বিশ্বজননী বা আদ্যাশক্তিরও জন্ম হইয়াছে। অতএব এখানে দেবদেবীর জন্মকাহিনী বলিতে অপ্রধান দেবদেবীর কথাই বলা হইতেছে। সংস্কৃত পুরাণে 'তেত্রিশ কোটি' হিন্দু দেবদেবীর বিচিত্র জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের নিজস্ব প্রকৃতি হইতে যে সকল দেবদেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের জন্মবিবরণ সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে নাই, বাংলার লোক-সাহিত্যেই আছে। তাঁহাদের মধ্যে মনসা, নেতা, শীতলা, এই তিন জনের জন্মকাহিনী এখানে উল্লেখ করিতে পারি—বাংলার লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে ইহাদের সকলেরই বিশেষ স্থান আছে। মনসার জন্ম-সম্পর্কে প্রায় সকল মনসা-মঙ্গলকাব্যেই শুনিতে পাওয়া যায়, শিব-বীর্য পদ্মের মৃণাল বাহিয়া পাতালে নাগলোকে চলিয়া গেল, তাহা হইতে সেখানেই মনসার জন্ম হইল। অলৌকিক দেবতার জন্ম সর্বদাই অলৌকিকতা দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক দেবদেবীর জন্মকাহিনী এমনই অলৌকিক। মনসার সহচরী নেতার জন্ম-সম্পর্কেও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চণ্ডীর বাক্যে শিব মনসাকে বনবাস দিয়া আসিতে গেলেন। বনবাসে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি স্বগৃহে ফিরিলেন, তখন—

ভাবিতে ভাবিতে শিবের ঘর্ম যে হইল।
অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ঘর্মেতে জর্মিল॥

১ S. C. Roy, *The Hill Bhuiyas* (Ranchi. 1928), p. 262. বাংলার পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া গুজরাটের ভীলজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত আদিবাসীর লোক-সাহিত্যে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীর জন্য Verrier Elwin, *Myths of Middle India* (Bombay, 1948), pp. 8-26 এবং *Tribal Myths of Orissa* (Bombay, 1954), pp, 8-28 দ্রষ্টব্য।

কন্যা দেখি শিব বলে, 'কোথা তব ধাম।
সত্য করি বল মোরে কিবা তব নাম ॥'
শিববাক্য শুনি কন্যা কহিতে লাগিল।
'তব ঘর্মে পিতা মম জনম হইল ॥
নেতা দিয়া ঘর্ম তুমি মুছিয়া ফেলিলা।
নেতের ঘর্মেতে পিতা মোর জন্ম দিলা ॥'
নিজ কন্যা বলি শিব যখন জানিল।
নেতের ঘর্মে জন্ম বলি নেতা নাম দিল ॥
বস্ত্র মধ্যে জন্ম বলি বস্ত্রকার্য দিল।
শিব-বাক্যে নেতা স্বর্গ-রজকিনী হইল ॥[১]

বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার জন্ম-সম্পর্কেও বাংলাদেশে অনুরূপ অলৌকিক একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই অবলম্বন করিয়া 'শীতলা-মঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হইয়া থাকে,

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন্।
কত মুনিঋষি আইল কে করে গণন ॥
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শান্তমতি ॥
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল ॥
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে সুধাইলা ॥
'কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী ॥'
দেবী কন, 'অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল ॥'
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।
'যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম ॥

১ মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত, প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৩৭) পৃঃ ৫৪

সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল'॥[১]

বাংলা দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রদেশ পর্যন্ত উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র শীতলার পূজা প্রচলিত আছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

লৌকিক দেবদেবীর উৎপত্তি-সম্পর্কিত কাহিনীগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে দেবদেবীগণ যে নামে পরিচিত, সেই নামের একটি ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস দেখা যায়। ব্যাখ্যাগুলি যে অত্যন্ত কষ্টকল্পিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার অর্থ এই—যে-ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া লৌকিক দেবদেবীর নামগুলি মূলতঃ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তারপর ইহাদের সম্বন্ধে একটি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে।

কেবল মাত্র দেবদেবীই নহে, কোন কোন লৌকিক ধর্মাচারে বিভিন্ন জীবসৃষ্টি ও দেবদেবীর পূজার উপকরণ সমূহের উৎপত্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, মালদহের শিবের গাজন বা আদ্যের গম্ভীরায় পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জন্মকথার পর জীব, কপিলা ধেনু, পূজার ঘট-ধুব্‌চি, ঢাক, ঢাকের কাঠি ইত্যাদির সৃষ্টিকাহিনী পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।[২] তাহাতে মৃত্তিকা ও জীবসৃষ্টির কাহিনী এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়—

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে মাটি সৃজন করিল যে॥
সে কাল কামার ব্যাটা গড়িয়া দিল দা।
আগা পাছা বুঝে তার মাছে দিল ছ্যা॥
আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু তার মাঝে বসে শিব।
যেখানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেখানে বসুক জীব॥

তারপর পূজার ঘট ও ধুব্‌চির জন্মকথা এই—

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনে মাটি সৃজন করিল যে॥

১ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (কলিকাতা ১৯৫০) পৃঃ ৬৫৮
২ হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা (মালদহ, ১৩১৯), পৃঃ ১৮-৩০

সে কালকুমার বলে গোঁসাই মনে পড়িল।
কালকুমার ব্যাটা ছিল দু'তিন ভাই।
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাঁই ঠাঁই॥
মাটি কাটিয়ে তারা চড়িয়ে দিল চাকে।
ঘট ধুব্‌চির ডঙ্কের পাতিল গড়াল আড়াই পাকে॥
রবি শুকাইয়া দিল ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল
ত্রিশ কোটি দেবতা দিল বর।
ঘট ধুব্‌চির জন্মকথা বলিলাম সভার ভিতর॥

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঘট ধুব্‌চির জন্মকথার মধ্যে কোন অলৌকিকতা নাই। রবি অর্থাৎ সূর্য শুকাইয়া দিল এবং ব্রহ্মা অর্থাৎ অগ্নি পোড়াইয়া দিল বলিয়া যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা মৃৎপাত্র তৈরী করিবার কোনও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু এই প্রকার জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনার দৃষ্টান্ত দেবতা কিংবা দেবপূজা-সম্পর্কিত পুরাকাহিনীতে নাই বলিলেই চলে। ধর্ম ঠাকুরের পূজায় যে ছাগ বলি হয়, তাহারও এক অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া 'শূন্যপুরাণে' একটি কাহিনী রচিত হইয়াছে।[১] পুরাকাহিনী কেবল মাত্র যে পূজাচার (ritual) পালন সম্পর্কেই বর্ণিত হয়, তাহা নহে—লৌকিক আচার পালনের মধ্যেও অনেক সময় পুরাকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের মেয়েলী বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যে বিবাহের স্ত্রীআচার-ভুক্ত কোন কোন উপকরণের এই প্রকার জন্মকাহিনী বর্ণিত হইয়া থাকে—

রজনী প্রভাত কালে মহারাজা হুকুম করে
হলুদ আন্‌তে হ'বে,
হলুদ রে, তোর জনম কোন্ খানে ?
আমার জনম জান্‌তে পার বাণিয়ার দোকানে॥
সিন্দুর রে, তোর জনম কোন্ খানে ?
আমার জনম জান্‌তে পার গেরস্তের পালানে॥

এইভাবে বরণ কুলা, বেশর, মুকুট, মেহ্‌দী প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত এই গানটিতে আলোচিত হইয়াছে। দেবতা-সম্পর্কিত জন্মবৃত্তান্ত হইলে তাহা যেমন

১ শূন্যপুরাণ, পৃঃ ২২৯-৩৬

অলৌকিক ঘটনা দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, প্রত্যক্ষ ভাবে দেবতা-সম্পর্কিত কাহিনী না হইলে তাহা অলৌকিকতা দ্বারা তেমন ভারাক্রান্ত হয় না। পৃথিবীর জন্ম কেহ কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নাই, অতএব কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের সম্পর্কিত কাহিনী রচিত হয়; কিন্তু মাটির ঘট কিংবা ধুব্‌চিটি কি ভাবে গড়া হয়, অথবা হলুদ কি ভাবে উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায়; অতএব ইহাদের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে কাহারও অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতাটিই তাহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয় মাত্র। তবে এ'কথা সত্য, এই শ্রেণীর পুরাকাহিনী সংখ্যার দিক দিয়া যেমন নগণ্য, রচনার দিক দিয়াও তেমনই বৈচিত্র্যহীন।

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াও লোক-সমাজে স্বাধীন পুরাকাহিনী রচিত হইয়া থাকে; এই সকল কাহিনী ধর্ম ও লোকাচার-মুক্ত হয়, ইহারা লোক-কথার স্বধর্মী। তবে ইহাদের মধ্যে দেবচরিত্রের উল্লেখ থাকে বলিয়া স্বভাবতঃই অলৌকিক বৃত্তান্তও আসিয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। জনক রাজাকে শিব একটি ধনুক দিয়াছিলেন; জনক রাজা তাহা তাঁহার পূজার ঘরে রাখিয়া দিলেন। পূজার ঘর যাহারা প্রত্যহ মার্জনা করিত, তাহারা কেহই ধনুকটি তুলিয়া ইহার নীচ ভাগ মার্জনা করিতে পারিত না—ইহার চারিদিক ঘিরিয়া মার্জনা করিয়া রাখিত মাত্র। একদিন রাজা জনক কন্যা সীতাকে ঘরটি মার্জনা করিবার আদেশ দিলেন। সীতা ধনুকটি বাম হাতে তুলিয়া ধরিয়া ডান হাত দিয়া ইহার নীচ ভাগ মার্জনা করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। তারপর জনক রাজা পূজা করিবার সময় যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, ধনুকের নীচ ভাগটিও সে'দিন মার্জনা করা হইয়াছে। জনক রাজা বিস্মিত হইয়া সীতাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলেন, তিনিই ধনুকটি বাম হাতে তুলিয়া ইহার নীচ ভাগ মার্জনা করিয়াছেন। শুনিয়া জনক রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে এই ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে পারিবে, তাহার নিকটই তাঁহার কন্যা সীতার বিবাহ দিবেন।

লবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশের কি করিয়া জন্ম হইল, এই বিষয়েও পূর্ব মৈমনসিংহের মেয়েলী কথায় এই বৃত্তান্তটি শুনিতে পাওয়া যায়। সীতা

তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র লবকে লইয়া বাল্মীকির আশ্রমে বাস করিতে-ছিলেন ; একদিন তিনি নদীতে জল আনিতে যাইবার কালে লবকে বাল্মীকির নিকট রাখিয়া বলিলেন, 'আমি নদী হইতে জল আনিতে যাইতেছি, লবকে আপনি একটু দেখিবেন—সে যেন একাকী আমার পিছন পিছন চলিয়া না আসে।' বাল্মীকি বলিলেন, 'তুমি যাও, আমি লবকে দেখিব।' বলিয়া লবকে কাছে বসাইলেন। তিনি তখন রামায়ণ-রচনায় মগ্ন ছিলেন ; মুহূর্তের মধ্যে লবের কথা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় রামায়ণ-রচনায় মনোযোগী হইলেন। এ'দিকে লব বৃদ্ধ কবির নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া যে পথে জননী নদীর দিকে গিয়াছেন, একাকী সেই পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একেবারে ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। সীতা সকল ব্যাপার বুঝিতে পরিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া কুটিরের পথে রওয়ানা হইলেন। এ'দিকে লব নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবা মাত্র বৃদ্ধ কবির চৈতন্যোদয় হইল। তিনি লবকে দেখিতে না পাইয়া আশঙ্কা করিলেন, সে নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে। সীতাকে এখন কি বলিয়া প্রবোধ দেওয়া যায় ? তিনি যে লবের সকল দায়িত্ব নিজের উপর লইয়াই তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ঘাটে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন ! এখনই ত সীতা ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'বাবা, লব কোথায় ?' তিনি তখন কি উপায় করিবেন ? বৃদ্ধ বাল্মীকি আর কালবিলম্ব না করিয়া যজ্ঞকুশ দ্বারা লবের অনুরূপ একটি শিশুর পুত্তলিকা নির্মাণ করিলেন এবং তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিলেন। তারপর শিশুটিকে লইয়া সীতার ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লব সীতার সঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন। এখন তিনি এই নবজাত শিশুটিকে লইয়াই বা কি করিবেন ? সীতা নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ছেলেটি কোথায় পাইলেন, বাবা ?' বাল্মীকি সকল কথা খুলিয়া বলিলেন ; তারপর সীতাকে বলিলেন, 'ইহাকে তোমার দ্বিতীয় পুত্ররূপে পালন কর। কুশ দ্বারা ইহাকে নির্মাণ করিয়াছি, অতএব ইহার নাম রাখিলাম কুশ।' সীতা সাগ্রহে শিশুটিকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে লাগিলেন। এইভাবে কুশের জন্ম হইল।

দেব সেনাপতি কার্তিক (কার্তিকেয়) কেন চিরকুমার এই বিষয়েও একটি পুরাকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। উষার সঙ্গে কার্তিকের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। বর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনি বরযাত্রী সহ বিবাহের

উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, কিছুদূর আসিয়া মনে হইল, তাঁহার হাতের দর্পণটি তিনি বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। দর্পণটি লইবার জন্য কার্তিক বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন ; অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পার্বতী কুলো আড়াল দিয়া চারিটি মহিষের পোড়া মাংস সহ বায়ান্ন আড়া চাউলের ভাত খাইতেছেন। কার্তিক দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়া জননীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্বতী বলিলেন, 'আজ বাদে কাল ঘরে বউ আসিবে, তখন পাঁচখানি জিনিস রাখিয়া একখানি জিনিস খাইতে দিবে, কোনদিন তাহাও হয়ত দিবে না। সেইজন্য আজ জন্মের সাধ খাইয়া লইতেছি। শুনিয়া কার্তিক বলিলেন, 'মা, আমি বিবাহ করিব না।' এই বলিয়া তিনি চিরকুমার রহিয়া গেলেন।

এই প্রকার আরও বহু পুরাকাহিনী বাংলার স্ত্রীসমাজের সর্বত্র প্রচলিত আছে ; ইহাদের মধ্যে লোক-কথার উপকরণ থাকিলেও ইহারা পূর্ণাঙ্গ লোক-কথা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহারা পুরাকাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, দেবতা কিংবা পৌরাণিক চরিত্র ইহাদের অবলম্বন। তথাপি পৌরাণিক দেবচরিত্রকে এখানে নিতান্ত বাস্তব গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয় বলিয়া ইহাদের সাহিত্যরস অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করা যায়।

পশুপক্ষীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অনেক সময় পুরা-কাহিনী রচিত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনীর সঙ্গে ধর্মাচারের কোনও সম্পর্ক নাই। যেমন, সাপের জিহ্বাগ্র দ্বিখণ্ডিত কেন, এই বিষয়ে একটি কাহিনী বাংলার প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করিতে পারি। সমুদ্র-মন্থনের পর দেবতাগণ কুশাসনে বসিয়া অমৃত পান করিলেন ; তারপর অসুরদিগকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহারা যখন অমৃতভাণ্ড লইয়া সে স্থান হইতে পালাইয়া গেলেন, তখন নাগগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দেখিল, অমৃত পান করিবার আর কোনও আশা নাই ; তাহারা নিরুপায় হইয়া দেবতাগণ যে সকল কুশাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাই জিহ্বাগ্র দ্বারা লেহন করিতে লাগিল। কুশের তীক্ষ্ণ ধারে তাহাদের জিহ্বাগ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সেই হইতেই সর্পজাতি দ্বিজিহ্ব। এই প্রকার আরও বহু কাহিনী, যেমন ঢোঁড়াসাপের বিষ নাই কেন,

কুসুম পক্ষী হলুদবর্ণ কেন, টিক্‌টিকির লেজ খসিয়া পড়ে কেন, অশ্বত্থ গাছের ফল এত ছোট কেন, ফল্গুনদীর বক্ষ বালিতে আচ্ছন্ন কেন ইত্যাদি বাংলার সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাহিনীর মধ্য দিয়া অপরিণত-বুদ্ধি মানবের শিশুসুলভ অনুসন্ধিৎসারই পরিচয় পাওয়া যায়। লোক-সাহিত্য রূপে ইহাদের যে মূল্যই থাকুক না কেন, মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহাদের স্থান আছে। সেইজন্যই পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতেই এই শ্রেণীর কাহিনী সংগ্রহ করিতে অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া থাকেন।

একটি কাহিনীর মধ্যেই ঢোঁড়া সাপ কেন নির্বিষ হইল এবং ভীমরুল, বোল্‌তা, কাঁকড়া-বিছা, বিষপিঁপড়া ইত্যাদি কোথা হইতে বিষ পাইল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীটি মালদহ জিলা হইতে সংগৃহীত; ইহা উত্তর বিহারেও শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, সর্পদেবী মনসা ঢোঁড়া সাপকেই সর্পাপেক্ষা বিষাক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেইজন্য লৌহবাসরে লখীন্দরকে যখন দংশন করাইবার প্রয়োজন হইল, তখন তিনি ইহাকেই এই কার্যে নিয়োজিত করিলেন। ঢোঁড়া সাপ দেবীর আদেশ পালন করিবার সকল দায়িত্ব লইয়া লৌহবাসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে যখন সে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হয়, তখন গঙ্গাদেবী লখীন্দরকে রক্ষা করিবার জন্য ঢোঁড়ার সম্মুখে এক কৌশল স্থাপন করিলেন। গঙ্গাদেবী জানিতেন, ঢোঁড়া পরম বিষাক্ত হইলেও ইহার এক বিষয়ে একটি অত্যন্ত দুর্বলতা আছে—সে আহার্য সম্মুখে পাইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। তাহাই মনে করিয়া গঙ্গাদেবী ঢোঁড়ার সম্মুখে এক ঝাঁক মায়া-মৎস্য সৃষ্টি করিলেন। ঢোঁড়া তাহার দায়িত্বের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া গেল। সে তাহার দাঁতের বিষ একটি কচুপাতায় রাখিয়া মায়া-মৎস্যের পিছনে ছুটিতে লাগিল। বহু দূর গিয়া মায়া-মৎস্য অদৃশ্য হইয়া গেল; তারপর যখন সে কচুবন হইতে তাহার বিষ ফিরিয়া লইতে গেল, তখন দেখিতে পাইল, তাহা ভীমরুল, বোল্‌তা, কাঁকড়া-বিছা ও বিষপিঁপড়ায় লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। ঢোঁড়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দেবীর নিকট ফিরিয়া গেল। সকল কথা শুনিয়া দেবী তাহাকে অভিশাপ দিলেন, 'সর্প হইয়াও তুমি নির্বিষ হইবে—যে মানুষ তোমাকে দেখিলে একদিন প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইত, সে তোমাকে পায়ে মাড়াইবে।' ঢোঁড়া দেবীর পা ধরিয়া

কাঁদিতে লাগিল ; বলিল, 'এই অপমান আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব ?' অবশেষে দেবীর কিঞ্চিৎ দয়া হইল ; তিনি বলিলেন, 'কেবল মাত্র শনি ও মঙ্গলবারে তোমার বিষ কার্যকরী হইবে, অন্য দিন কার্যকরী হইবে না।' সাধারণের বিশ্বাস একমাত্র শনি কিংবা মঙ্গলবারে যদি ঢোঁড়া কাহাকেও দংশন করে, তবে তাহার প্রাণ রক্ষা পায় না—অন্য কোন দিন তাহার দংশনে কোনও অনিষ্ট হয় না।

ইষ্টিকুটুম পাখীর কি ভাবে জন্ম হইল, কেন ইহা হলুদ বর্ণ হইল এবং ইহা 'ইষ্টিকুটুম, ইষ্টিকুটুম' বলিয়া সর্বদা কেন ডাকে, এ'সম্পর্কে পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে এই কাহিনীটি শুনিতে পাওয়া যায়—এক গৃহস্থের বাড়ীতে কুটুম্ব আসিয়াছিল। শাশুড়ী বধূকে ভাল করিয়া রান্না করিতে বলিল। কিন্তু বধূর রান্নায় তেমন দক্ষতা ছিল না ; সে ব্যঞ্জনে বেশি পরিমাণ হলুদ দিয়া ফেলিল, কিছুতেই হলুদের রং আর ফিরাইতে পারিল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সেই ব্যঞ্জন শুদ্ধ হাঁড়িটি নিজের মাথায় ভাঙ্গিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সে সর্বাঙ্গ হলুদবর্ণরঞ্জিত এক পাখীর রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া গেল। হাঁড়ির তলায় যে কালি ছিল, তাহা তাহার মাথায় লাগিয়াছিল বলিয়া তাহার মাথাটি কালো রং ধারণ করিল। কুটুম্বের জন্যই তাহার পাখী রূপে জন্মিতে হইল বলিয়া কুটুম্বের কথা সে আর ভুলিতে পারিল না, সেইজন্য কেবলই 'ইষ্টিকুটুম, ইষ্টিকুটুম' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। আজ পর্যন্ত তাহার সে ডাকের বিরাম নাই। এই পাখীর স্বরে 'গৃহস্থের খোকা হোক' এই কথাগুলিও শুনিতে পাওয়া যায়। ইষ্টিকুটুম পাখীটি 'বেনে বউ' নামেও পরিচিত।

টিকটিকির কি করিয়া জন্ম হইল, এই বিষয়েও একটি সুন্দর কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—একদিন বিক্রমাদিত্য আকাশে কত নক্ষত্র আছে তাহা বরাহকে গণনা করিয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। বরাহ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, কারণ, আকাশের নক্ষত্র গণনা করিবার বিদ্যা তাঁহার আয়ত্ত ছিল না, তথাপি রাজার নিকট একথা প্রকাশ না করিয়া বিষণ্ণচিত্তে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া পুত্রবধূ খনা শ্বশুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় খনারও অধিকার নিতান্ত অল্প ছিল না। অগত্যা তিনি পুত্র বধূর নিকট নিজের বিষাদের কারণ বর্ণনা করিলেন। খনা বলিলেন, 'আপনি এ জন্য ভাবিবেন না, আমি আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া দিব।' রাজার

নিকট নিজের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বরাহ খনার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। খনা আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া দিলেন, রাজার নিকট বরাহের মর্যাদা রক্ষা পাইল। কিন্তু বরাহ পুত্রবধূর জ্ঞান দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, অচিরেই তাঁহার খ্যাতি তাঁহার পুত্রবধূ গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কারণ; রাজা বিক্রমাদিত্যের কিছুই অগোচর থাকিবে না। এই ভাবিয়া তিনি একদিন পুত্রবধূ খনার জিহ্বাটি কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন, খনার সেই কর্তিত জিহ্বাটিই টিকটিকি হইল।

আরও বিশেষ একটি পাখীর কি করিয়া জন্ম হইল? সেই বিষয়েও এই কাহিনী শুনা যায়। পূর্বে ইচ্ছা করিলে একজন আর একজনের চক্ষু দুইটি ধার লইতে পারিত। এক ব্যক্তির এক বন্ধু ছিল, সে অন্ধ; এই জন্য সে শ্বশুর বাড়ী যাইতে পারে না। একদিন অন্ধ ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে বলিল, 'আমাকে তোমার চক্ষু দুইটি ধার দাও, শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিব। বন্ধুপ্রীতি বশতঃ সে নিজের চক্ষু দুইটি তাহাকে দিল, কিন্তু সে আর তাহা ফিরাইয়া দিল না। সেই ব্যক্তি পরে পাখী হইয়া কেবলই বিলাপ করিতে লাগিল; কখনও তাহার কণ্ঠে শোনা যায়, 'বন্ধু, নিলে চক্ষু দিলে না।'

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উপাসিত লৌকিক দেবতা সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়; কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

বর্ধমান জিলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী বরাকর নামক স্থানের নিকটে কল্যাণেশ্বরী নামে এক দেবী আছেন। তাঁহার কোনও প্রতিমা নাই, বস্ত্রাচ্ছাদিত একখণ্ড প্রস্তরে তাঁহার পূজা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, দেবী বিমুখী হইয়াছেন, তাহার কারণ সম্পর্কে এই কাহিনীটি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রত্যহ অন্ততঃ একটি পশু বলি দিয়া কল্যাণেশ্বরীর পূজা করিতে হইত। একদিন বলির জন্য কোনও পশু কেহ লইয়া আসিল না। বিনা পশুবলিতেই সেদিন পুরোহিত পূজা নির্বাহ করিল—দেবীর রক্তপিপাসা সে দিন মিটিল না। দেবীর পুরোহিত সপরিবারে মন্দিরের প্রাঙ্গণেই বাস করিতেন, তাহার আট বৎসর বয়স্কা একটি সুস্থ সবল কন্যা ছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে যখন মন্দিরের ভিতর আর কেহই ছিল না, তখন কন্যাটি নিয়মিত প্রসাদ খাইবার জন্য মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার নধর কান্তি দেহটি দেখিয়া দেবীর ক্ষুধা বাড়িয়া গেল—

কিছুতেই লোভ দমন করিতে না পারিয়া তাহাকে গিলিয়া ফেলিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইতে চলিল, কন্যাটির কোনও সন্ধান না পাইয়া পুরোহিত মন্দিরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তাহার কন্যার শাড়ীর অগ্রভাগটি দেবী-প্রতিমার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। পুরোহিতের কিছুই আর বুঝিতে বাকী রহিল না। দেবী লজ্জায় তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইলেন, তদবধি সেই ভাবেই আছেন।

মানভূম জিলার পুঞ্চা থানার অধীন পাকৃবিড়ড়ার নামে এক গ্রাম আছে। তাহাতে একটি পরিত্যক্ত জৈন মন্দিরে অন্ততঃ আট ফুট উচ্চ একটি মহাবীরের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসী ইহার নাম দিয়াছে কালভৈরব। তিনি ক্ষেত্ররক্ষক। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অলস প্রকৃতির দেবতা। তাঁহাকে পূজা দিলে তাহা তিনি গ্রহণ করিবার পরিবর্তে অন্য দেবতারা লুটিয়া খায়। বৃষ্টির সময় তাহার পায়ে কাদার দাগ দেখা যায়, তিনি কৃষকের ধানক্ষেত পাহারা দিয়া রাত্রিযোগে নগ্নপদে ঘুরিয়া বেড়ান। সেইজন্য দিনের বেলায় তাঁহার পায় কাদার দাগ লাগিয়া থাকে। মৌকুড়া গ্রামে যে ধর্মের গাজন হয়, তাহা তিনি স্বগ্রাম হইতেই মাথা উঁচু করিয়া দেখিয়া থাকেন, কষ্ট করিয়া সেই গ্রাম পর্যন্ত হাঁটিয়া যান না।

উপরে যে সকল কাহিনীর উল্লেখ করা গেল, তাহা ব্যতীতও চন্দ্রসূর্য-তারকা, জাতীয় বীরচরিত্র, সামাজিক প্রথার উদ্ভব, পরলোক, আত্মা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়াও পুরাকাহিনী রচিত হইয়া থাকে। কোন কোন বস্তু ও বিষয়-সম্পর্কে যে বাধানিষেধ (taboo) মানিয়া চলা হয়, তাহার উৎপত্তি সম্পর্কেও পুরাকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন, বিশেষ কোন কোন মাছ বা মাংস কোন কোন জাতির লোকের পক্ষে কেন যে অভক্ষ্য, তাহা বর্ণনা করিয়া বহু পুরাকাহিনী রচিত হইয়াছে। ইহারা বাংলার লৌকিক পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায়। তবে এই সকল কাহিনীর সাহিত্যিক দাবী নিতান্ত গৌণ।

বাংলার আধুনিক বহু ব্রতকথা পুরাকাহিনীরই অন্তর্গত। কারণ, ইহাদের অধিকাংশেরই মধ্যে কোন্ দেবতার কি ভাবে জন্ম হইল, কোন্ দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবার ফলে কাহার পশুপক্ষী, বৃক্ষ বা প্রস্তররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইল, এই সকল কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ব্রতকথা মাত্রই ব্রত উপলক্ষ্যে

আনুষ্ঠানিক ভাবে আবৃত্তি করা হয়; প্রত্যেক শ্রোতা এবং শ্রোত্রী হাতে একটি করিয়া ফুল লইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাহিনী শুনিয়া যায়। আংশিক কোন কাহিনী শুনিয়া পূজাস্থান কেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশে এখন পর্যন্ত যে সকল পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার এক প্রধান অংশ ধর্মাচারেরই (ritual) অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। উপজাতীয় অঞ্চলের লোক-কাহিনীর সঙ্গে ইহার ধর্মাচারের এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব নাই। বাংলা দেশেও সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে এমন ছিল না, ধর্মাচারের ক্ষেত্র ব্যতীতও একদিন এ'দেশের সমাজ পুরাকাহিনীর মধ্য দিয়া সাহিত্য রস সন্ধান করিতে পারিত।

এখন বাংলা পুরাকাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণের কি পার্থক্য এ'বিষয়ের আলোচনা করিয়াই এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, বাংলা পুরাকাহিনী প্রচলিত ভাষায় রচিত এবং সংস্কৃত পুরাণ অপ্রচলিত ভাষায় রচিত; অতএব সংস্কৃত পুরাণের লোক-সাহিত্যগত দাবি কিছু মাত্র নাই। এতদ্ব্যতীতও ইহাদের মধ্যে আরও যে সকল পার্থক্য আছে, তাহা এখানে নির্দেশ করিব।

সংস্কৃত পুরাণের কাহিনী দৈব ও অলৌকিক বৃত্তান্ত দ্বারা যতখানি ভারাক্রান্ত, বাংলা পুরাকাহিনী ইহাদের দ্বারা তত ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইবে না। ইহার কারণ, পুরাণ প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিবেশ যতদূর উপেক্ষা করিয়াছে, পুরাকাহিনী তাহা ততদূর উপেক্ষা করিতে পারে নাই। পুরাকাহিনীর অন্তর্গত একমাত্র সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ বাদ দিলে, ইহার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাস্তব ও গার্হস্থ্য পরিবেশের সুকোমল স্পর্শ সর্বদাই অনুভব করা যায়। কুশের জন্ম সম্পর্কে যে বাংলা পুরাকাহিনীটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে সামান্য একটু অলৌকিকতা থাকিলেও ইহার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব গার্হস্থ্য পরিবেশটি ইহার অলৌকিকতার ভাবটি আচ্ছন্ন করিয়া দিতে যে সক্ষম হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। ইহার মধ্যে শিশু-সন্তানের প্রতি জননীর সতর্কতা, বৃদ্ধ অভিভাবকের কর্তব্যবোধ, শিশুর চঞ্চলতা—মানব-চরিত্রের এই সকল বাস্তব দিকই এমন মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে যে, ইহার মধ্যে কুশ দ্বারা মানব-শিশু নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিবার অলৌকিক বৃত্তান্তটি নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। ইষ্টিকুটুম বা কুসুম পক্ষীর জন্মবৃত্তান্ত

এবং কার্তিকের চিরকৌমার্য সম্পর্কেও এই কথাই বলিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যেও শাশুড়ী-বধূর চিরন্তন মানবিক সম্পর্কের পরিচয় এত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার দ্বারা কাহিনীর অলৌকিক অংশটুকু নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণের মধ্যে বাস্তব মানবিক সম্পর্কের কোনও সহজ পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় না; প্রত্যক্ষ সমাজের পটভূমিকায় ইহারা রচিত নহে। পুরাকাহিনীতে যেমন লৌকিক চরিত্রেরও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি ইহার দেবদেবী কিংবা রামায়ণ-মহাভারতোক্ত চরিত্রও যেমন প্রধানতঃ লৌকিক আচরণই করিয়া থাকে, সংস্কৃত পুরাণে তেমন নহে। সংস্কৃত পুরাণে কোনও লৌকিক চরিত্র নাই, দুই একটির উল্লেখ থাকিলেও ইহাদিগকে পুরাকাহিনীর চরিত্রের মত কদাচ লৌকিক আচরণ করিতে দেখা যায় না; এই সকল কারণে পুরাকাহিনী ও পুরাণের পার্থক্য সর্বদাই সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়; এই পার্থক্যের জন্যই পুরাকাহিনী লোক-সাহিত্য, পুরাণ ধর্মীয় রচনা মাত্র।

যে সকল ধর্মাচার অবলম্বন করিয়া বাংলায় এখনও পুরাকাহিনী সমূহ আত্মরক্ষা করিয়া আছে, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পুরাকাহিনীর শেষ নিদর্শন সমূহও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—এই বিলুপ্তির সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

ইতিকথা

পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ myth বা পুরাকাহিনী হইতে legend কথাটিকে সর্বদাই স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করেন। তাঁহাদের প্রদত্ত myth বা পুরাকাহিনীর সংজ্ঞা লইয়া পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এইবার legend কথাটির সংজ্ঞা ও প্রতিশব্দ লইয়া আলোচনা করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ legend কথাটির এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া থাকেন,—Originally something to be read at religious service or at meals, usually a saint's or martyr's life.' অতএব দেখা যাইতেছে, legend সাধারণতঃ জাতির কোনও বীর কিংবা সাধক চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত ইতিবৃত্ত। ইহাকে লৌকিক ইতিবৃত্ত বা সংক্ষেপে ইতিকথা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। পুরাকাহিনী কিংবা myth-এর সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, দেব-দেবী ও অন্যান্য অলৌকিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া পুরাকাহিনী রচিত হয়, কিন্তু লৌকিক কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া legend বা ইতিকথা রচিত হয়। অতীত সমাজ-জীবনের অন্তর্ভুক্ত কোনও বীর কিংবা সাধকের চরিত্র অবলম্বন করিয়া মুখে মুখে ইহা রচিত হয়, মুখে মুখেই কীর্তিত হয়, তারপর যতদিন পর্যন্ত সমাজ তাহাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া চলে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের সম্পর্কিত কাহিনীগুলিও স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করে। কালক্রমে সমাজ তাহাদের জীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে, সমাজের স্মৃতি হইতে ইহারা লুপ্ত হইয়া যায়। ইতিকথাই কোন কোন সময় জাতির উচ্চতর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'এপিক' সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে।

পুরাকাহিনী (myth)-র সঙ্গে ইতিকথা (legend)-র অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, পুরাকাহিনীর চরিত্রগুলি নির্বিশেষ, কিন্তু ইতিকথার চরিত্রগুলি এক একটি বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়া থাকে। ইতিকথার চরিত্রগুলি একদিন যে এই সমাজেরই মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সমাজের দশজন লোকের মতই

আচরণ করিতে গিয়া অসাধারণত্ব দেখাইয়া গিয়াছে, সমাজ-মন তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তাহাদের চরিত্রের মধ্য দিয়া যে অতি-মানবত্বের (super-man) ভাবই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা যে একদিন সমাজের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছিল, তাহা ইতিকথার মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। পুরাকাহিনী ও ইতিকথার মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য এই যে, পুরাকাহিনীর মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যাখ্যা (misinterpretation)-ই শুনিতে পাওয়া যায়, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের বিশ্লেষণই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ইতিকথার উদ্দেশ্য তাহা নহে—ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক চরিত্র-মহিমা কিংবা জাতির কোনও বীরত্বমূলক কাহিনী বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পুরাকাহিনী ও ইতিকথার এই যে পার্থক্যের কথা বলিলাম, তাহা যে সর্বদাই খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, তাহা নহে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ এ'কথা উপলব্ধি করিয়াছেন যে,—The line between myth and legend is often vague.' কিন্তু বাহির হইতে ইহা যতই অস্পষ্ট হউক, ইহাদের উভয়ের আভ্যন্তরীণ মৌলিক পার্থক্যের বিষয় কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বাংলার গোপীচাঁদ-ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র ও গোরক্ষনাথ-মীননাথের বৃত্তান্তকে গীতিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে যে ইতিকথা বা legend-এর উপকরণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তথাপি এ'কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের মধ্যে গীতিকার উপাদানেরও অভাব নাই। ব্যক্তিবিশেষের কর্ম ও সাধনা ইতিকথার উপজীব্য হইয়া থাকে বলিয়া ইতিকথা সাধারণতঃ এক-চরিত্র-প্রধান রচনা হইয়া থাকে—ইহার একটি মাত্র চরিত্রের পার্শ্বে অন্যান্য চরিত্রগুলি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত গোপীচাঁদ-ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র কিংবা গোরক্ষনাথ-মীননাথের বৃত্তান্তকে এক-চরিত্র-প্রধান রচনা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না। বিভিন্ন চরিত্রের মিলিত আচরণের ভিতর দিয়া তাহাদের মধ্যে কাহিনী-রস-নিবিড়তা লাভ করিয়াছে, এই দিক দিয়া ইহারা ইতিবৃত্তের উপকরণ দ্বারা রচিত হইয়াও গীতিকারই লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। ইতিকথা অপেক্ষা গীতিকার কাহিনীগুণ অধিক। গীতিকার কাহিনী অধিকতর মানবিকগুণ-সমৃদ্ধ। সমাজ কর্তৃক ইতিকথার নায়ক-চরিত্র অতি-মানব (super-man) কিংবা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া কল্পিত হয়, সুতরাং অতি

সহজেই তাহার মধ্যে পুরাকাহিনী-সুলভ অলৌকিকতা প্রশ্রয় লাভ করে; গীতিকার কাহিনীর মধ্যে এই ত্রুটি প্রকাশ পাইবার কোনও সুযোগ থাকে না। গোপীচন্দ্র-মাণিকচন্দ্র-ময়নামতী কিংবা গোরক্ষনাথ-মীননাথ কাহিনীর মধ্যে মানবিকতা-বোধ অলৌকিকতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এই গুণে ইহারা ইতিকথার বিষয় হইয়াও সার্থক গীতিকার পরিচয় লাভ করিয়াছে। এইভাবে অনেক সময় ইতিকথার বিষয় গীতিকার অঙ্গীভূত হইতে পারে। উক্ত কাহিনী দুইটি সম্পর্কে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু তথাপি কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, গোপীচাঁদকে যদি সমাজের বীর (hero) চরিত্র কিংবা গোরক্ষনাথকে যদি সাধক (saint) চরিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে যে কাহিনী তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা কেন ইতিকথার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যাইবে না? পূর্বেই বলিয়াছি, ইতিকথা হইতে গীতিকার কাহিনীগুণ অথবা সাহিত্যগুণ অধিক। সাহিত্যগুণের দিক দিয়া যে সকল ইতিকথা যথার্থ রাসোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগকে ইতিকথা বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহাদের যথার্থ মর্যাদা প্রকাশ পায় না। তাহাদের মধ্য হইতে যথার্থ গীতিকার গুণ বিকাশ লাভ করিলে তাহাদিগকে গীতিকা বলিয়াই উল্লেখ করা সঙ্গত। এখানে আরও কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞায় যাহাকে 'বীর' কিংবা hero বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়, গোপীচন্দ্র সেই শ্রেণীর চরিত্র নহে। তাঁহার জীবনে রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস-জীবনের দুঃখ বরণ করিবার যে কথা আছে, তাহার প্রেরণা তাহার নিজস্ব অন্তর হইতে আসে নাই—জননীর কঠিন আদেশরূপেই আসিয়াছে এবং সেই আদেশ অমান্য করিবার সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে। সুতরাং তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণে national hero বা জাতির কোনও সুমহান্ চরিত্রের আত্মোৎসর্গের কোনও পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই। অতএব তাহার চরিত্রের মধ্যে যে ঐতিহাসিক উপাদানই থাকুক না কেন, কেবল মাত্র তাহাই তাহাকে জাতির বীর কিংবা ত্যাগীর মর্যাদা দিতে পারে না। গোরক্ষনাথের কাহিনী সম্পর্কেও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, তাঁহার ঐতিহাসিক পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্ট, তাহা একান্ত অলৌকিকতা লক্ষাণাক্রান্ত। কিন্তু ইতিকথার ঐতিহাসিক পরিচয় এত অস্পষ্ট হইবার উপায় নাই। সেইজন্যই নাথ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও কাহিনীই

ইতিকথার পর্যায়ে স্থান পাইতে পারে না। তাহা হইলে বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত এমন কি বিষয়ে আছে যে, তাহা ইংরেজি legend-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ইতিকথা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যাইতে পারে?

ব্যক্তি-বিশেষের বিশিষ্ট জীবন-সাধনার প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাবোধ যতদিন বর্তমান থাকে, ততদিন পর্যন্তই তাঁহার সম্পর্কিত বিবরণ সমূহ সমাজে প্রচলিত থাকে। কিন্তু সমাজ-জীবন চিরপরিবর্তনশীল। ইহা কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এই পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের সম্মুখে কোনও দিনই বিশেষ কালাশ্রিত বিশেষ একজন ব্যক্তির জীবন-সাধনা ধ্রুব নক্ষত্রের মত চিরদিনই স্থির আদর্শ রূপে গণ্য হইতে পারে না। আদিম সমাজ-জীবন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে (communally) উদ্‌যাপিত হইত, তখন গোষ্ঠী-সংগ্রামের (community warfare) মধ্যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যাহারা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করিত, তাহাদের জীবন সমাজের আদর্শ ছিল—তাহারাই গোষ্ঠীর 'বীর' নামে পরিচিত হইত, তাহাদের অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী লইয়া তখন সমাজের ইতিকথা রচিত এবং কীর্তিত হইল। কিন্তু বর্তমান সমাজ-জীবনের সম্মুখে এই বীরত্বের আদর্শ অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন গোষ্ঠী-সংগ্রাম সমাজ-জীবনের নিয়মিত আচার-আচরণের আর অন্তর্ভুক্ত নহে; এমন কি, সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত (racial) কলহও অসামাজিক আচরণ বলিয়া ইহাদের মধ্য দিয়াও যে সকল তথাকথিত 'বীরত্বে'র পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহাকেও সমাজ কোনও দিক দিয়াই অভিনন্দন জানায় না। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের আমলে সামন্তরাজদিগের সীমান্ত রক্ষা কিংবা প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ সম্পর্কিত যে সকল বীরত্ব প্রকাশ পাইত, তাহাদের সঙ্গেও এ'দেশের সাধারণ সমাজের যোগ যে খুব নিবিড় ছিল, তাহা মনে হইতে পারে না। সেইজন্য সে যুগের বাঙ্গালীর বীরত্বের কোনও কাহিনী ব্যাপকভাবে ইতিকথার উপজীব্য হইতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্য ভাগবতে' উল্লেখ করিয়াছেন,

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে বৌদ্ধ পালরাজদিগের রাজত্ব বাংলা

দেশে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই অবসান হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কিত কাহিনী তখনও সমাজের মধ্যে ব্যাপক লোকপ্রিয়তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। ইহাদের কোনও পরিচয় পাওয়া না গেলেও বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারাই বাংলার প্রাচীনতম ইতিকথা। পালরাজগণ কেবল মাত্র শৌর্য বীর্যেই সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই—তাঁহাদের এই সকল গুণের সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালীর পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহা মনে হয় না—বরং তাঁহারা তাঁহাদের বৌদ্ধধর্ম-সুলভ দানশীলতার জন্য সাধারণ সমাজের নিকট স্থায়ী শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তুর্কী আক্রমণের পর নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সম্মুখীন বাংলার সমাজের মধ্য হইতে পালরাজদিগের শৌর্যবীর্য ও দানশীলতার আদর্শ ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতে আসিতে স্বাভাবিক নিয়মেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত পাল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা মহীপাল সম্পর্কিত গীতি-কাহিনী সমাজের মধ্যে দীর্ঘতম কাল স্থায়ী ছিল। 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত' এই বাংলা প্রবচনটি হইতে এই গীতি-কাহিনীর ব্যাপকতার কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। রংপুরের বিশাল মহীপালের দীঘি এখনও তাঁহার বদান্যতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন রূপে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু মহীপালের গীতের কি বিষয়-বস্তু ছিল, তাহা জানিবার এখন আর কোনও উপায় নাই। সমাজের উপর পালরাজদিগের প্রভাব লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্কিত ইতিকথাগুলিও ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে রাজা মহীপাল সম্পর্কিত জনশ্রুতি যে কোন কারণেই হউক, সমাজের মধ্যে সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে বহুকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘতমকাল ব্যাপিয়া ইহা সমাজে প্রচলিত থাকিবার ফলে রাজা মহীপালের মৌলিক ঐতিহাসিক আচরণের মধ্যে ইহাতে বিবিধ অনৈতিহাসিক উপাদান প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাহার ফলে তাঁহার সম্পর্কিত কাহিনী অধিকাংশই ইতিকথার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গিয়া অনৈতিহাসিক জনশ্রুতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে।

মহীপাল সম্পর্কিত একটি জনশ্রুতিমূলক কাহিনী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'মহীপালের গান' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] বলাই বাহুল্য যে, ইহা বৃন্দাবন দাস কর্তৃক

---

১ কলিকাতা, ১৯৩২, পৃঃ ৩১৯-১৫ ?

উল্লেখিত পূর্বোদ্ধৃত 'মহীপালের গীত' নহে। ইহা মাত্র ২৬টি পদে সম্পূর্ণ—ইহার কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পাল সম্রাট্ মহীপালের শৌর্যবীর্য কিংবা দানশীলতার কোনও পরিচয়ের পরিবর্তে তাঁহা কর্তৃক নারীহরণের এক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিতে গিয়া স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'মহীপাল নামে পালবংশে আরও একজন রাজা ১০৭০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তিনি দ্বিতীয় মহীপাল। তাঁহার অত্যাচার-অনাচারেই পাল বংশের পতন হয় এবং ভীম নামে একজন কৈবর্ত কিছুদিনের জন্য পালরাজাদের সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাংলার সর্বেসর্বা হন। পালরাজাদেরই কয়েকটি তাম্রশাসনে এই দ্বিতীয় মহীপালের উৎপীড়ন কাহিনী ক্ষোদিত আছে। আমাদের ছোট পালাটির নায়ক কি এই দ্বিতীয় মহীপাল ?'[১] কিন্তু এই বিষয়ে প্রকৃত কথা এই যে, উচ্চ চারিত্রগুণই সমাজকে ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে ইতিকথা রচনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে—কোনও অত্যাচারীর প্রাণহীন অত্যাচারের বৃত্তান্ত সমাজকে মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে প্রেরণা দিতে পারে না। অবশ্য এই অত্যাচারের প্রণালীর মধ্যে যদি যথার্থ বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার স্পর্শ থাকে, তবে আর একদিক দিয়া তাহা সমাজের হৃদয় অধিকার করিতে পারে। এইজন্য দুঃসাহসিক ডাকাতি এমন কি উপস্থিত বুদ্ধিভিত্তিক চোরের কাহিনীও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু নারীহরণের মধ্যে অপহরণকারীর যে চারিত্রিক নীচতার পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা কোনদিনই জাতীয় ঐতিহ্যমূলক সাহিত্যের ভিত্তি হইতে পারে না; কারণ, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইতিকথা (legend) 'এপিকে'র ভিত্তি। সুতরাং মৌখিক সাহিত্যের যে পরিচয়ের মধ্যে 'এপিকে'র বীজ নিহিত থাকে, তাহা সর্বদাই উচ্চ আদর্শমূলক হইতে বাধ্য। অতএব একদিক দিয়া যে কাহিনীর মধ্যে নারীহরণের মত একটি অসামাজিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যেমন ইতিকথার বিষয় নয়, তেমনই অন্যদিক দিয়া যে চরিত্র জাতির প্রথম ইতিকথা রচনার প্রেরণা দিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গেও তাহা সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে না। তবে এই মহীপালের গানটি দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয়—তাহা

১ ঐ, পৃঃ ৬৩

এই যে, পাল সম্রাট্ মহীপাল সম্পর্কিত ইতিকথা এ'দেশের সমাজে দীর্ঘতম কাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহার ফলে কালক্রমে তাঁহার সম্পর্কিত অনৈতিহাসিক জনশ্রুতি সমাজে বিপুল সংখ্যায় প্রচার লাভ করিয়াছিল। তারপর কালক্রমে সমাজ যখন নৈতিক অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়া আসিয়াছিল, স্বাধীন পাল সম্রাট্দিগের উচ্চ চারিত্র আদর্শ যখন ইহার সম্মুখ হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল—সমাজে যখন কেবল মাত্র চার অক্ষর যুক্ত মহীপালের নামটি ব্যতীত তাঁহার চারিত্র মহিমার আর কোনও স্মৃতিই অবশিষ্ট ছিল না, তখন এদেশের সমাজ কেবল মাত্র তাঁহার নামটি অবলম্বন করিয়াই এই কাহিনীটির ভিতর দিয়া নিজস্ব সমসাময়িক অধঃপতিত মনোভাবেরই পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। যে সমাজের মধ্য হইতে ইতিকথার বিষয়গুলি জন্মলাভ করে, সেই সমাজ-ব্যবস্থা ও তাহার ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হইয়া গেলে, তাহার নিকট সেই ইতিকথাগুলিরও আর কোনও মূল্য থাকে না—তখন সমাজের নূতন আদর্শ অনুযায়ী সমাজে নূতন ইতিকথার জন্ম হয়। অনেক সময় ইহাদের মধ্যে প্রাচীন সংস্কার কিছু কিছু থাকিয়া যায়, সেই সূত্রেই একটি ঘৃণিত নারীহরণের বৃত্তান্তের মধ্যে বৌদ্ধ পাল সম্রাট্ মহীপালের নামটি আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নে কাহিনীটি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করা গেল—

চুয়া চুন্নে বাঁট্যারে লীলা বাসর কোটারা ভরে।
আমলা মতি বাঁট্যারে লীলা আবের কোটেরা ভরে ॥
'তোলা পানিতে নায়ারে বাপজান মাথা হয়েছে আটা।
মহীপাল রাজা কেটেছে দীঘি আমি সেই দীঘিতে যাব ॥'
'কলঙ্কিনী লীলারে তুমি যেয়োনা দীঘির ঘাটে।
কলঙ্কিনী লীলারে তুমি যেয়োনা দীঘির ঘাটে ॥'
বাপেরো মানা না শুনে লীলা চল্লো দীঘির ঘাটে।
মায়েরো মানা না শুনে লীলা চল্লো দীঘির ঘাটে ॥
আগে পাছে দাসী বান্দী মধ্যে চললো লীলা।
আগে পাছে গোলাম নফর মধ্যে চললো লীলা ॥
হাঁটু পানিতে নাম্যারে লীলা হাঁটু মঞ্জন করে।
মাজা পানিতে নাম্যারে লীলা গাও মঞ্জন করে ॥

বুক পানিতে নাম্যারে লীলা বুক মঞ্জন করে।
খবুর‍্যার আগে খবর গেল মহীপাল রাজার কাছে ॥
'যে লীলার জন্যে রে মহীপাল তুমি ছয়মাস ভাঙ্গাছ নীয়ার।
যে লীলার জন্যে রে মহীপাল তুমি ছয়মাস ভাঙ্গাছো রোদ।
লীলার মাথার কেশরে মহীপাল দীঘির পানি ছাপিয়ে পড়েছে ॥
কেশে বাজ্যা উঠ্‌ছেরে মহীপাল কত রুই কাতলা।
যে লীলার জন্যে রে মহীপাল ভাঙ্গ্যাছিল নীয়ার ॥
সেই লীলা আইছেরে মহীপাল তোমার সরোবরে।
এক দীঘির ঘাটেরে মহীপাল সাঁতরে বাসরে ফেরে।'
বারে বারে ঘুর‍্যারে মহীপাল রাজায় চুল ধরিয়া রাখিল ॥
'কে ধরিল কে ধরিল আমার চুলের দুখে মল্যাম।
বাপের মানা না শুন্যা আমি দীঘির ঘাটে মল্যাম ॥
কলঙ্কিনী লীলা গো আমি কলঙ্কিনী হলাম।
মায়ের মানা না শুন্যা আমার সকল সম্মান গেল ॥'

কাহিনীটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'প্রথম ছত্রের "বাসর" কথাটি এবং পিতামাতার আদেশের বিরুদ্ধে নায়িকার স্বেচ্ছাতারিতার বিবরণ হইতে বোঝা যায়, রাজার ফাঁদে ইচ্ছা করিয়া ধরা পড়িবার গোপন-বাসনা নায়িকার মনে মনে ছিল। দূতের কথা হইতেও রাজা যে এই মেয়েটির জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। রাজা ও লীলার নামে গোড়া হইতে একটা অপবাদ ছিল; ইহাও লীলার মাতাপিতার বার বার দীঘিতে যাইতে নিষেধ করা হইতে বোঝা যায়। এই অবস্থায় যে পাখী নিজে হইতে ফাঁদে ধরা পড়িতে উৎসুক, তাহাকে বন্দী করায় রাজার বোধ হয়, বিশেষ কোন দোষ স্বীকার করা যায় না।' এই ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, অতএব এই কাহিনীটির মধ্যে একটুকু গীতিকার ধর্ম আছে, কিন্তু ইতিকথার ধর্ম নাই; কারণ, ঐতিহাসিক চরিত্রের ইতিহাসোল্লেখিত আচরণকে ভিত্তি করিয়াই ইতিকথা রচিত হয়, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কোনও নামের যথেচ্ছ ও লৌকিক আচরণের উপর ভিত্তি করিয়া ইতিকথা রচিত হয় না। রাজার নামটি মাত্র এখানে ঐতিহাসিক হইলেও তাঁহার আচরণটি এখানে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

পূর্বোল্লেখিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)য় সঙ্কলিত 'রাজা রঘুর পালা'টি আদর্শ ইতিকথার লক্ষণাক্রান্ত—ইহা গীতিকা বা ballad-এর লক্ষণাক্রান্ত নহে। রাজা রঘু ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মৈমনসিংহ জিলার উত্তর সীমায় অবস্থিত সুসঙ্গ অঞ্চলের স্বাধীন রাজা ছিলেন। পূর্ব মৈমনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর অধিবাসী বাংলার বার ভূইঞার অন্যতম ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলীর সঙ্গে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহু বিবরণ এখন পর্যন্তও ঐ অঞ্চলের লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক রাত্রির মধ্যে রাজা রঘুর গারো প্রজাগণ ধনাই নদী হইতে জঙ্গলবাড়ী পর্যন্ত তিন ক্রোশ দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়া ঈশা খাঁ কর্তৃক বন্দী রাজা রঘুকে সেই পথে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই ঐতিহাসিক বিবরণ এই পালাটির ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাজা রঘুর নামে সেই খালটি এখনও 'রঘুখালি' নামে পরিচিত। অতএব কাহিনীটির ঐতিহাসিক পরিচয় এখনও সমাজে অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই—ইহার মধ্যে বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা ও আত্মত্যাগের কথা আছে। সুতরাং ইতিকথার প্রায় প্রত্যেকটি উপকরণ দ্বারা রচনাটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে—

সুসঙ্গ রাজের মহিষী কমলার মৃত্যুর পর রাজা পত্নীশোকে উন্মাদের মত হইয়া গেলেন—রাজকার্যে আর কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারেন না।

সোনার অঙ্গ পুইড়া যেমুন রে—
আরে রাজার অঙ্গ ছালি অইছে।
রাণীর লাগিয়া রাজার রে
আরে রাজার আধা হাল অইছে॥

রাজার নিজের জন্য যত না হউক; শিশু রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—

দুধের বাচ্চা থইয়া গেছে গো রাণী
কি দ্যা পালি তারে।

রাজাকে নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে দেখিয়া একদিন রাণী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আশ্বাস দিলেন যে তিনিও পুত্রের মায়া কাটাইয়া যাইতে পারিতেছেন না; সুতরাং তিনি স্থির করিয়াছেন, অদৃশ্য থাকিয়াই তিনি তাহার প্রতি

লক্ষ্য রাখিবেন। তাহার লালন পালন বিষয়ে তিনি নিজেই দায়িত্ব লইবেন—তবে একটি নির্জ্জন কুটীরে শিশু রাজপুত্রকে আনিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে, তিনি সেখানে আসিয়া তাহাকে অন্যের অলক্ষিতে স্তন্য দান করিয়া যাইবেন। রাজা সেই ব্যবস্থাই করিলেন—

ঘর না বান্ধিয়া দিলরে
আরে ঘর সায়ারের কিনারে।
তার মধ্যে ছাওয়াল পুতেররে
আরে ভালা বিছানা যে করে॥
নিশি রাইতের মাধ্যে সগলরে
আরে ভালা নিভুতি হইলে।
কমলা সায়র তনে রে
আরে রাণী আইয়ে ঘরের মাধ্যে।
ঘরের মাধ্যে আইয়া রাণী রে
আরে রাণী দুগ্ধ দেয় কুমার রে॥

এইভাবে দিন যাইতে থাকে। অদৃশ্য জননীর স্তন্যপুষ্ট হইয়া রাজপুত্র দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে থাকে। কিন্তু রাজা নিজের কৌতূহল আর কিছুতেই দমন করিয়া রাখিতে পারেন না। তিনি মনে করিলেন, একদিন নিশীথ রাত্রে যখন রাণী কমলা সায়র হইতে উঠিয়া আসিয়া রাজপুত্রকে স্তন্যদান করিতে থাকিবেন, তখন তিনি গোপনে সেই গৃহমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

সারা নিশি পোষাইবাম রে
আরে ভালা রাণীর লাগিয়া।
দেখবাম কেমনে রাণী আইয়ারে
আরে ভালা যায় দুগ্ধ দিয়া॥

কমলা সায়রের তীরে এক নিভৃত স্থানে রাজা রাণীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, কমলা সায়রের জল যেন চন্দ্রালোকে জ্বলিয়া উঠিল—মথিত সমুদ্র-বক্ষ হইতে যেমন লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনই কমলারাণী কমলা সায়রের জলরাশি হইতে উত্থিত হইয়া ধীর পাদক্ষেপে রাজপুত্রের গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 'অমৃত' পান করাইয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন

রাজা তাহার আঁচলটি ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাহা কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না—রাণী কমলা সায়রের জলে মিশিয়া গেলেন, আর কোনও দিন উঠিয়া আসিলেন না—নিদারুণ মর্মাহত হইয়া রাজা অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করিলেন।

ঈশা খাঁ মস্নদ আলি সুসঙ্গ রাজের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কি ভাবে কখন তিনি সুসঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিতে পারেন, কেবল সেই সুযোগেরই সন্ধান করিতেছিলেন। সুসঙ্গরাজের মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইয়া তিনি সসৈন্যে আসিয়া সুসঙ্গের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাহা অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র রঘুনাথের বয়স মাত্র তখন পাঁচ বৎসর। তিন মাস রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখিয়া অবশেষে ঈশা খাঁ রাজপ্রাসাদ অধিকার করিলেন। শিশু রাজপুত্র রঘুনাথকে বন্দী করিয়া লইয়া তিনি নিজের রাজধানী জঙ্গলবাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারোগণ সুসঙ্গ রাজের প্রজা ছিল। তাহারা এই সংবাদ শুনিয়া দলে দলে রাজধানীতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের রাজাকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। তারপর অগণিত গারো নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দশ দিক উচ্চকিত করিয়া জঙ্গলবাড়ীর পথে যাত্রা করিল। ঈশা খাঁর রাজধানী জঙ্গলবাড়ী সহর ঘিরিয়া গভীর পরিখা কাটা ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রে গারো সৈন্যদল সেই পরিখার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া নগর আক্রমণ করা সহজ সাধ্য ছিল না, কি ভাবে কার্য সিদ্ধি হইতে পারে, সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহাদের বৃদ্ধ সর্দার বলিল,

তিন কোশ দূরাত আছে ধনাইয়ের ঢালা।
গাঙ্গিনা আর তার মধ্যে কাট্যা আন নালা॥

তিন ক্রোশ দূরে যে নদী আছে, তাহা হইতে খাল কাটিয়া এই পরিখার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে পারিলে সেখান হইতে সৈন্যবাহী নৌকা লইয়া জঙ্গলবাড়ী সহর আক্রমণ করা যাইতে পারে। 'বাইশ কাহন' গারো তৎক্ষণাৎ খাল কাটিয়া পথ করিয়া ফেলিল—তারপর নৌকা লইয়া জঙ্গলবাড়ী সহরে উপস্থিত হইল। সুসঙ্গের রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, এই আনন্দে ঈশা খাঁ নগরে বিজয়োৎসব পালন করিতেছিলেন। গারোরা গিয়া

রাজার কারাগারে প্রবেশ করিল; দেখিল, তাহাদের রাজাকে সেখানে 'পাষাণ'-চাপা' দিয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা বন্দী রাজার পাষাণ মোচন করিয়া দিল, তারপর তাহাকে লইয়া কারাগৃহের বাহিরে চলিয়া আসিল। ঈশা খাঁর নিজের ভাওয়াইল্যা বা পান্‌সি নৌকা ঘাটেই বাঁধা ছিল—গারোরা তাহাদের রাজাকে তাহাতেই তুলিয়া লইল। তারপর

ভাওয়াল্যায় উঠিয়া তবে দাঁড়ে মাইল টান।
শূন্যে উড়া করে যেমুন পবন সমান॥
তিন দিনের পথ যায় পরেকেতে বাইয়া।
ঈশা খাঁ লাগাল পায় আর কেমুন করিয়া॥

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এক রাত্রির মধ্যে গারোরা যে খালটি কাটিয়া রাজা রঘুকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও তাহারই নামে 'রঘুখালি' নামে পরিচিত।

এই বৃত্তান্তটির মধ্যে ইতিহাস ও কথা বা কাহিনী এক সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, অতএব ইহা একটি সার্থক ইতিকথা (legend)। পূর্বেই বলিয়াছি, জাতির কোনও বীর কিংবা সাধক চরিত্র অবলম্বন করিয়াই ইতিকথা রচিত হইয়া থাকে। উপরে যে কয়টি ইতিকথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদের প্রত্যেকটিই বীরচরিত্র-মূলক। নিম্নে আর একটি ইতিকথা উল্লেখ করিতেছি, তাহা কোনও জাতীয় বীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত নাই, ইহাতে যে চরিত্রটির একটি অপূর্ব আত্মত্যাগের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কোনও বিশিষ্ট অভিজাত পরিচয় নাই, সে সাধারণ নমঃশূদ্র জাতির সন্তান, তবে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিল বলিয়া সমাজ বিশ্বাস করিত, এই দিক দিয়া সাধারণ সমাজের বিচারে তাহাকে সাধকও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে যে স্তরের লোকই হউক, সমাজের কল্যাণের জন্য সে যে ভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়াই তাহার চরিত্রের লোকোত্তর মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে—এই সুমহান্ আত্মোৎসর্গের জন্য উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞানহীন সাধারণ সমাজের নিকট আজও তাহার স্মৃতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাঁহার সম্পর্কিত কাহিনীটি এই—

নমঃশূদ্র সন্তান জৈত্যা একজন হিরালি[1] অর্থাৎ সে মন্ত্র দ্বারা মেঘের

১ পূর্বে হিরালির উল্লেখ করা হইয়াছে।

গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়া কৃষকগণ বিশ্বাস করে। ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা শিলাবৃষ্টি নিরোধ করিয়া কৃষকের পাকা বোরো ধান ধ্বংস হইতে রক্ষা করা তাহার প্রধান কাজ। এই কার্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা আছে বলিয়া সকলে মনে করিয়া থাকে। সে'বার বৈশাখ মাসের বার তারিখ সন্ধ্যার পূর্বে আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ দেখা দিল—কৃষকের পাকা বোরো ধান তখনও কাটিয়া ঘরে তোলা হয় নাই। আকাশের দিকে তাকাইয়া কৃষকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল; কারণ, মেঘের রঙ্ দেখিলেই তাহারা বুঝিতে পারে, কোন্ মেঘে কেবল ধারা বর্ষণ হইবে, আর কোন্ মেঘে শিলা বর্ষণ হইবে। সেদিন আকাশে মেঘের রঙ দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, তাহাতে মুষল-ধারায় শিলাবৃষ্টি হইবে, তাহার ফলে এক মুষ্টি ধানও ক্ষেতে অবশিষ্ট থাকিবে না।

বারই বৈশাখের বেলা হৈল তিন প্রহর।
সাজিল বিষম দেওয়া মাথার উপর ॥
হাইরা কোনায় গুড়্ গুড়্ ডাকে মাড়ি মির্তিকা লড়ে।
আস্মান হইয়াছে কালা হিল নাকি পড়ে ॥
গুড়্ গুড়্ গুড়্ হিলের গৈড় পশুপক্ষী কান্দে।
আন্ধার হৈল দেশ কেউর না পরাণ বান্ধে ॥
হাওরে চাহিয়া দেখ্যা মাথাত দিয়া হাত।
সক্কলের এক চিন্তা কি করে বরাত ॥

সকলে বুঝিতে পারিল, জৈত্যা হিরালি ব্যতীত এই বিপদ হইতে আর কেহ তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না, তখন সকলে গিয়া তাহার দ্বারস্থ হইল। এই বিপদ হইতে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য তাহার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইল—

জৈত্যার দুয়ারে আইজ জাইতের ভেদ নাই।
তুমি যদি ধান বাঁচাও আমরা বাচ্যা যাই ॥
তুমি জৈত্যা মন্ত্র জান জান হিলের চাইল।
গুরুর সাধন ভজন জান শিল তুফানের ভাইল ॥
আইজের হিলে বন্ধ যদি যায়।
চাইর দিকে জুড়িয়া লাগবো হায় রে হায় হায় ॥

জব্বর হিরালি তুমি বয়স সত্তুর আশী।
আইজ বন্ধ রাইখ্যা তুমি দেখাও সাবাসী॥
লক্ষ মানুষের পরাণ বাঁচাও মুখের ভাত দিয়া।
দেখাও হিরালির গুণ হিল খেদাইয়া॥

জৈত্যা বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছিল, বয়স সত্তর আশী—তথাপি শত শত গ্রামবাসীর প্রার্থনা সে অপূর্ণ রাখিবে কেমন করিয়া? সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আকাশের দিকে চাহিল—

বাইরে খাড়া হৈয়া জৈত্যা আস্‌মানেতে চায়।
আইজের হিলে বন্ধ রাখন হৈব জবর দায়॥
রাঁড়ীর পুৎ ভুত্‌রা[1] আইজ নিজ মূর্তি লইয়া।
জালিয়ার হাওরে আইল যমদূত হৈয়া॥

কিন্তু বৃদ্ধ জৈত্যা ইহাতে পশ্চাৎপদ হইল না—প্রয়োজন হইলে সে তাহার নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া গ্রামবাসীকে অনাহার হইতে বাঁচাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল—

পূজার ঘরে গিয়া জৈত্যা উভা বান্ধে চুল।
কপালে সিন্দূর দিয়া হাতে লৈল ত্রিশূল॥
রুদ্রাক্ষের গুরুদত্ত মালা গলায় লৈয়া।
রক্ত বস্ত্র পিন্ধ্যা জৈত্যা খাড়াইল আসিয়া॥
স্ত্রীপুত্র আইয়া তারে পরণাম করিল।
ছোট্ট ছাওয়াল রামচন্দ্রেরে একবার চুমা দিল॥
আসমান চাহিয়া কৈল জয় গুরুর জয়।
এই হিল খেদাইয়া কর জালিয়া[2] নির্ভয়॥
শিঙ্গা লইল কান্ধে তুইল্যা জোড় হাত করি।
উস্তাদেরে প্রণাম জানাইয়া চল্‌ল তড়াতড়ি॥
লম্বা লম্বা পায় হাঁটে বাতাস যেমন যায়।
ছয় হাত লম্বা যোয়ান খাজুর গাছের প্রায়॥

১ রাঁড়ীর পুৎ ভুৎরা—ভুৎরা নামক মেঘ, সে বিধবার সন্তান এই অর্থ।
২ হাওরের নাম, হাওরেই গ্রীষ্মকালে বোরো ধান জন্মায়।

এ'দিকে আকাশে দুর্যোগ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মেঘের উপর মেঘ সঞ্চার করিয়া কালবৈশাখী তাণ্ডব নৃত্যের আয়োজন করিতেছে—পশুপক্ষী আর্তনাদ করিয়া যে যাহার আশ্রয়স্থানের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, গৃহের মধ্যে থাকিয়া মানুষ বার বার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে ক্ষেতের আল ধরিয়া অবিচলিত পদক্ষেপে বৃদ্ধ হিরালি বোরো ধান ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোথাও একটি মাত্র যদি বজ্রপাত হয়, তাহা হইলে জৈত্যার দীর্ঘ দেহ তাহা আকর্ষণ করিয়া লইবে এবং মুহূর্তের মধ্যেই সেই বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু তথাপি নির্ভীক বৃদ্ধ হিরালি পরম আত্মবিশ্বাসে তাহার কর্তব্য পালন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিল।

দশ দিকে আন্ধাইর কৈরা দৈত্যি যেমন আইসে।
পূর্ণিমার চান্দে যেমন রাহুরে গরাসে॥
দেওয়ার ডাক গুর্ গুর্ গুর্—জৈত্যা ডাকে আয়।
জালিয়ার হাওরের দিকে ডাক শোনা যায়॥
গর্জ্জিয়া উঠি দেওয়া জিল্‌কি ঠাডা পড়ে।
জৈত্যার শিঙ্গাটি বাজে জাল্যার হাওরে॥
ঘন ঘন জিল্‌কি দেয় বিষম ঠাডা পড়ে।
ঘরে রৈয়া গিরস্থেরা শিব শিব করে॥
আয় আয় ডাকে জৈত্যা তন্ত্র মন্ত্র কয়।
ঘরে থাক্যা লোকে ভাবে কি হয় কি হয়॥

নির্ভীক জৈত্যা উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া তাহার শিঙ্গায় ফুঁ দিতে লাগিল। মেঘ গর্জ্জনের মধ্যে তাহার শিঙ্গার ধ্বনি মিশিয়া গেল, নিজের কানেই নিজের শব্দ সে শুনিতে পাইল না। এমন সময় সহসা—

আশমানের যত হিল (শিল) একত্র হইয়া।
জৈত্যার উপর পড়ে আশমান ভাঙ্গিয়া॥

সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝিতে পারি, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য বজ্রপাতের ফলে জৈত্যার মৃত্যু হইল। কৃষক সমাজ বিশ্বাস করিল, আকাশের সমস্ত শিলা সে মন্ত্রদ্বারা নিজের দেহের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইল, তাহাতে তাহার দেহের প্রতিটি অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, এই ভাবেই

সে নিজে মৃত্যু বরণ করিয়া গ্রামবাসীকে অনাহার হইতে রক্ষা করিল, কারণ দেখিতে পাওয়া গেল, ক্ষেতের একটি ধানও সে'দিন নষ্ট হয় নাই।

এক ছড়া ধান নষ্ট নাই রইল সকল ধান।
জৈত্যা বাঁচাইল দেশ দিয়া নিজের পরাণ॥
ধন্য হইল বঙ্গদেশের নমঃশূদ্র জাতি।
ধন্য হইল জাল্যার পাড়ের মানুষ যত ইতি॥
আসমান হৈলরে সাফ সুরুজ দেখা যায়।
হাজার মানুষ ভাঙ্গ্যা পড়ে জৈত্যার জায়গায়॥

কিন্তু সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, কেবল বৃদ্ধের চূর্ণীকৃত অস্থিগুলি ভস্মরাশির মত স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পরম শ্রদ্ধাভরে কৃষকগণ সেই অস্থিচূর্ণগুলি সংগ্রহ করিল, নিজেদের বোরো ক্ষেতে তাহা পুতিয়া রাখিল, মনে করিল, ইহার ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারাই তাহাদের বোরো ক্ষেত শিলাবৃষ্টি হইতে চিরদিন রক্ষা পাইবে। এই অস্থিচূর্ণ এখনও এই সমাজে 'জৈত্যার হাড়' নামে পরিচিত। জৈত্যা হিরালির এই অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিকথার আকারে পূর্ব মৈমনসিংহের কৃষক সমাজে ব্যাপক প্রচার লাভ করিল।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা আনুপূর্বিক ইতিহাস তাহা ইতিহাসই, ইতিকথা বা legend নহে—যাহা ইতিহাস এবং কল্পনা উভয়েরই মিশ্র উপাদানে রচিত তাহাই ইতিকথা বা legend. আনুপূর্বিক ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বন করিয়া রচিত বৃত্তান্ত বাংলার মৌখিক সাহিত্যে খুব বেশী নাই, কারণ, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসবোধ এ জাতির কোন কালেই ছিল না—সেইজন্য এ'দেশে মধ্য যুগে ইতিহাসের নামেও ইতিকথাই রচিত হইয়াছে। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' সংগ্রহে আরও কয়েকটি এমনই ইতিকথার সন্ধান পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য বর্তমানে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার কোন কোন বিষয়ের আদি রূপ ইতিকথামূলক ছিল—ইহাদের মধ্যে ধর্মমঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর ধর্মমঙ্গল বৃত্তান্তের মৌখিক পরিচয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ইতিকথার এখন আর বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—(ক)

বাংলা লোক-গীতির সুর-বিচার

(১)

কোন গানেরই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাহিত্যিক বিচার-বিশ্লেষণের সংগে যুক্ত হয়, তার সাঙ্গীতিক গঠন-বৈশিষ্ট্যেরও আলোচনা।

কথা ও সুর

কেন না গানের কথায় কাব্যের প্রকাশ যতটুকুই থাকুক না কেন, সুরসংযোগেই তাহার শিল্প সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই কথা জানতেন ব'লে কোন আধুনিক সমালোচক 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনা থেকে বিরত হয়েছিলেন।

কথা ও সুরের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কেবল সত্যিকারের গানেই সম্ভব, তবে অনেক সময় কোন কোন গানকে যেমন আমরা কবিতার মত আবৃত্তি ক'রে থাকি, তেমনি অনেক কবিতাকেও গানের সুরে গাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এমন অবস্থায় গানের সুর একটা প্রথা বা 'ফর্ম' মাত্র; যেমন, এক সময় প্রথা ছিল, যে-কোন বিষয়কে কাব্যের আকারে বলা।

পল্লীগীতির আলোচনায় আমরা এই দু'টো ব্যাপারই দেখতে পাব; অর্থাৎ সত্যিকারের লিরিক-ধর্মী গান, সুর ছাড়া শুধু কথায় যার গতি পংগু, যেমন ভাটিয়ালী, বাউল ইত্যাদি; এবং এমন সব গান, যাকে কেবল গান নয়, কবিতা বলতেও অনেকের বাঁধবে, যথা—ভাটের গান। এই শেষোক্ত প্রকারের গানে সুরের প্রয়োগ যে কেবল অপপ্রয়োগ, এমন কথা বললে বেশি বলা হবে; কেন না, এই ধরনের ঐতিহাসিক বা অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সুরের মধ্য দিয়ে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে, নীরস তথ্যবহুল কথা তা' না হ'লে শ্রোতার বিরক্তির কারণ হ'তে পারত। প্রসংগত ব'লে রাখা চলে যে, এই সব গানে সুর যেমন সরল, সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট ছকে ফেলা, তেমনি নেই এর সুরের মধ্যে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত বলিষ্ঠতা। এই সব প্রায় আবৃত্তিমূলক এবং অনেকটা নকল সুরের সাঙ্গীতিক মূল্য যাই হোক, এই ধরনের ছোটখাট সুরের বাঁধা ধরা নক্সা বা প্যাটার্ণের মধ্যে আমরা বৃহত্তর ও প্রধান প্রধান পল্লীগীতিগুলির ছায়া ও প্রভাব লক্ষ্য করতে পারব।

(২)

খাঁটি শিল্পসৃষ্টির পেছনে রয়েছে ভাবাবেগের অকৃত্রিমতা, গভীর আত্ম-প্রত্যয়েই যার উদ্ভব। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেদের মনের গঠন সরলই হোক, আর জটিলই হোক, হোক না তাদের জ্ঞানের পরিধি সীমায়িত, এমন কি ত্রুটিপূর্ণ, শিক্ষিত সহুরে ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম-বিচারকুশল জ্ঞানাভিমানী মার্জিত বুদ্ধিকে হয়ত তারা ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের চোখেই দেখে থাকে; তবুও এ'টুকু বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যায় যে, সামান্য ও সংকীর্ণ জ্ঞানকে বিচারবিহীন সরল বিশ্বাসে আত্মসাৎ করা তাদের পক্ষে যত সহজ, শিক্ষিত লোকের পক্ষে তত নয়; বহুমত-কণ্টকিত ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান-অরণ্যে দিশাহারা হ'য়ে শিক্ষিতদের মধ্যে তাই কেউ হ'য়ে পড়েন সন্দেহবাদী, কেউ বা একরোখা কোন মতবাদের পেছনে বিকারগ্রস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করেন। ফলে স্বদেশ ও স্বজাতির যে বিশিষ্ট ভাবধারা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট চিন্তা ও ধারণা রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত রয়েছে, তাকে স্বীকার ক'রে, ভালবেসে ও বিশ্বাস ক'রে দেশকালের সীমার মধ্যেই যে প্রবল আত্মশক্তির স্ফুরণ ঘটে, বাক্যে কর্মে ব্যবহারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে যার সুনির্দিষ্ট পরিচয় গাঁথা হয়ে থাকে, শিক্ষিতের ভাগ্যে সেই শক্তিলাভ অনেক সময়েই ঘ'টে উঠে না। যাঁরা সাহিত্য আলোচনা করেন, গত শতকের সাহিত্যিক ধুরন্ধরদের জীবনে ও তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে তাঁরা এই শক্তির অমোঘ রূপ দেখে চমৎকৃত হয়েছেন, আবার আধুনিক যুগের আত্মভ্রষ্ট স্বজাতিচ্যুত দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীর দুর্বল অনির্দিষ্ট মনের ক্ষ্যাপামির পরিচয়ও আজ চারদিকেই দেখা যাচ্ছে। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অশিক্ষিত লোকেরা নিজেদের সরল বিশ্বাস ও বুদ্ধিতে বিশিষ্ট সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও সংস্কারকে অস্থিমজ্জায় গ্রহণ করেছে ব'লে শিক্ষিতের বিচারে ত্রুটিযুক্ত হ'য়েও এক অতি বিশিষ্ট মানস-চেতনার অধিকারী হয়েছে—এই চেতনার মধ্যেই জাতির একটি অতি নিশ্চিত পরিচয় বিশ্বাসের একনিষ্ঠতায় সুদৃঢ় ও শক্তিমান্ হ'য়ে তাদের সকল প্রকার চিন্তায় ও কর্মে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই অশিক্ষিত জন-সাধারণের রচিত শিল্পে ও সংগীতে এমন একটি জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে, যা' মহৎ না হ'লেও খাঁটি।

পল্লীবাসীর শিল্প-মানস

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের এই অকৃত্রিম পরিচয়কে বুঝবার জন্যে এই গ্রাম্য শিল্পি-

রচিত সংগীত-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রয়োজন। সাহিত্যের দিক দিয়ে এই বিচার আজ পর্যন্ত মন্দ হয় নি, সংগ্রহও অনেক হয়েছে, তবে সংগীতের দিক দিয়ে এর বিচার বা সংগ্রহ কোনটাই আশানুরূপ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর রচিত গানেও এই বাংলাদেশী লোক-সঙ্গীতের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু এই সব গানের মধ্যে সুর-রচনার কৌশল বা নিয়ম-নীতির কোন পরিচয় আছে কি না, এ সম্বন্ধে শিক্ষিত মহলে প্রায় কোন আলোচনাই হয় নি, গানের কথা-অংশটুকু সংগ্রহ ও বিচার ক'রেই তাঁরা সাহিত্যিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। অথচ সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁরাই হয়ত লক্ষ্য করেছেন, বাংলার পল্লীগীতির মধ্যে কেমন ক'রে যেন মিশে আছে বাংলার আকাশ বাতাস নদী বনপ্রান্তরের সৌন্দর্য, বাঙ্গালীর মনের মর্মকথা। কবি, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমালোচকগণ এই বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনোভাবের পরিচয় নানাভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন; কেবল সঙ্গীতের মধ্য দিয়েও তা' যে কেমন স্পষ্ট ও নিশ্চিত, সেইদিকেই দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন নি। শুধু নিরাকার তত্ত্ববিলাস নয়, রসোজ্জ্বল রূপ ছাড়া বাঙ্গালীর মন যে তৃপ্ত হয় না, এর পরিচয় নানাভাবেই অনেকে দেখিয়েছেন। শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের বিচারেও এর অনেক প্রমাণ মিলবে। কিন্তু একথা আমরা এখনও ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখিনি, কি ভাবে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্প কীর্তনের মধ্যে কথা, সুর ও তালের এক অপরূপ মিশ্রণ ঘটেছে, যেখানে প্রত্যেকের মধ্যে বিস্তারের অপূর্ব সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সকলে একসঙ্গে চলাটা কত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কেমন ক'রে একদিন বাইরে থেকে আসা রাগসঙ্গীত আপন মাহাত্ম্য বিস্মৃত হয়ে কীর্তনের রসে এমন বেমালুম হারিয়ে গেছে যে, আজ আর তাকে খুঁজে বের করা মুস্কিল। কঠিন রাগসঙ্গীতকে হজম ক'রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে রাখাতে বাঙ্গালীর শিল্পিমনের এই সবল পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে, এবং যখন দেখি কীর্তনের পেছনেই শক্তিরূপে রয়েছে লোক-সঙ্গীতের ধারা, তখন সাধারণ শিক্ষিত লোক হিসেবে এর বিচার না ক'রে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলাবস্তু হিসেবে একে অবহেলার চোখে দেখে আমরা জাতিগত অপরাধ করেছি।

পল্লীসংগীতের সাহিত্যিক পরিচয়ের তুলনায় সাংগীতিক পরিচয়

বাঙ্গালীর শিল্পিমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

সেই অপরাধ-ক্ষালণের কিছুটা চেষ্টা মাত্র এখানে করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ কাজ একদিনের নয় বা একজনেরও নয়, জনসাধারণের উপেক্ষা ও শৈথিল্যে ও তদুপরি রাজনৈতিক নানা ঘটনা ও সমস্যায় কর্তব্য সম্পাদন ক্রমশঃই দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। তবে আমাদের ভরসা এই যে, এখনও পল্লী-সঙ্গীতের অপমৃত্যু ঘটেনি। পাশ্চাত্ত্য দেশে লোক-সঙ্গীতের রূপ খুঁজতে গেলে নাকি আজকাল সহরে আসতে হয়। আমাদের তেমন অবস্থা নয়; কেবল ভাগ্যদোষে যা' আমাদের বহু প্রাচীন বঙ্গ, মুসলমান আমলের 'বঙ্গালহ্' ও আধুনিক পূর্ব-পাকিস্তান, সেইখানেই মেঘনার বুকে ও সুর্মা উপত্যকায় লোক-সঙ্গীতের একটি অতি বিশিষ্ট রূপ ভাটিয়ালীর জন্মভূমি হওয়ায় সন্ধানী পাঠকের আগ্রহে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়বার কারণ উপস্থিত হয়েছে।

৩

ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৯০ জন গ্রামে থাকেন ব'লে দেশের একটা বৃহৎ শক্তি সেখানেই সংহত হ'য়ে আছে; সেই শক্তি একদিকে সমাজ ও অন্য দিকে জনসাধারণের মনোভূমি আশ্রয় ক'রে নানা ভাবে বিকশিত হচ্ছে। এর মূল রয়েছে বহুদিনাগত ধর্ম-সংস্কার, রীতিনীতি ও নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে। এইজন্যেই বিনা চেষ্টাতেই ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় তার ধ্যান-ধারণার চিন্তা ভাবনার মূল সূত্রগুলি অতি সহজেই সাধারণ লোকের মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আর তাই অন্যদিকে না হ'লেও এই জাতির ভাব-জগতের মধ্যে একটি সম্পূর্ণতার আভাস রয়েছে। এর সাক্ষাৎ ফল হোলো জীবনের সর্বদিকে সৃষ্টিমূলক প্রয়াস—সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অন্যান্য শিল্পকলায়, জন্মমৃত্যু-বিবাহ, ইহকাল ও পরকালের সর্ববিধ চিন্তায়।

ভারতের বিশেষত বাংলার জনসাধারণের জীবনকথায় পল্লী-সংগীত

পল্লীগীতিকে আশ্রয় ক'রে এক বাংলা দেশেই যে বিচিত্র সঙ্গীত ও বিচিত্রতর প্রকার ভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে এই ধরনের সবল সক্রিয় সমাজ ও জনমন। তাই বাংলার লোক-সঙ্গীত কেবল চাষীর গান নয়, এই গান সমগ্র জনসাধারণের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে, তার উৎসবে ব্যসনে অন্নচিন্তায় ও ধর্মচিন্তায়, সুখে দুঃখের নানা অভিব্যক্তিতে রচিত হয়েছে এই গান। এই বিভিন্ন দিকের সম্মিলিত সমগ্র রূপেই পল্লীজীবনের

যথার্থ পরিচয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই পরম ঐক্যের সন্ধান পেয়ে একদা একজন বিদেশী সঙ্গীতানুরাগী বিস্মিত হয়েছিলেন। বাংলা দেশের কোন এক গ্রামে নৌকা বেঁধে রেভারেণ্ড পপ্‌লী সাহেব চারদিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত শুনতে পেলেন—'There was nothing discordant and it all blended together into a pleasing harmony.' বহুকাল ধ'রে একসঙ্গে বাস ক'রে এসেছে বাংলার ধনিদরিদ্র, চাষী ও জমিদার, হিন্দু-মুসলমান। বাইরের বিভেদ যে অন্তরের ঐক্যানুভূতির অন্তরায় হয়নি, তার প্রমাণ এই বিভিন্নমুখী পল্লীগীতির ভিতরকার ঐক্যসূত্রটি। আজও বাইরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে নানা বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, এই সূত্রটি ছিন্ন হয়নি ব'লেই মনে হচ্ছে।

আরও একটু কথা আছে। বাংলা দেশে আধুনিক-পূর্ব যুগ পর্যন্ত সহরে ও গ্রামে তফাৎটা তত স্পষ্ট ছিল না ; যতটা ছিল ও এখনও আছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে। দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌর মত বড় বড় সহর এক কোলকাতা ছাড়া বাংলা দেশে ছিল না, আর কোলকাতাও তো সেদিনের বৃটিশ আমলের কিছু আগে থেকে সহর হ'বার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। হয়ত অনেকটা এই কারণেই বাংলা দেশে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ও বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গোড়া থেকেই অব্যাহত ছিল। তাই চাষীদের গান কেবল চাষীদের শোনবার জন্যে নয়, আর শিক্ষিতদের সঙ্গীত কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা উৎসবে পূজাপার্বণে বাংলার সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণই একযোগে আনন্দ উপভোগ ক'রে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকারের গীতকে সকলেই সমভাবে তাদের অন্তরের সামগ্রী ক'রে তুলেছে।

বাংলায় নাগরিক জীবন ও পল্লীজীবনে প্রভেদ

এর ফলে শিল্পসঙ্গীতের (art music) একটি ধারা যা সমগ্র ভারতীয় বিশিষ্ট সংগীত-চিন্তার সংগে যুক্ত, তা' অতি সহজেই বাংলার সবখানেই সঞ্চারিত হ'য়ে পড়েছে। বাংলা দেশের প্রাণকেন্দ্রে তার আপন পরিচয় যদি যথেষ্ট গভীর না হোতো, সমগ্র জাতি যদি তার নিজস্ব সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত না থাকতো, তবে এর মধ্যে দিয়েই তার সর্বনাশ ঘটতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। তাই শুদ্ধাচারী প্রবলপরাক্রান্ত রাগসংগীত বাংলার জনসাধারণের সংগে মিশ্‌তে গিয়ে নিজের রাজকীয়

বহিরাগত সঙ্গীতের উপাদান ও বাংলার পল্লীগীতি

পোষাকটি ছেড়ে এসেছেন ; বাংলাদেশও তাঁর চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে যা'তে স্পষ্টই বুঝা যায়, এঁকে আর বাংলাদেশের বাইরে দেখতে পাওয়া যাবে না। এমনি ক'রে বাইরের সংস্কৃতিকে আত্মশক্তির মধ্যে শুষে নিয়ে ব্যাংলার শিল্প সমৃদ্ধতর হয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আত্মীকরণের ব্যাপার সকলের জানা আছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার যে ব্যতিক্রম হয় নি, সেইটাই কেবল আমাদের বলবার কথা।

এই সংযোগের ফলে বাংলার লোক-গীতির মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যানুগত হ'য়েও সুরে ও ছন্দের যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তার সামান্য একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। পৃথিবীর যাবতীয় পল্লী-গীতিতে সাধারণতঃ পাঁচ স্বরের খেলাই দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞদের এই মত। এই pentatonic scale বা পঞ্চস্বারিক গ্রামের পরিচয় যে বাংলার পল্লী-সঙ্গীতে নেই, তা' নয় ; তবে সেগুলো সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়, বাংলার সীমান্ত প্রদেশে, যথা, সাঁওতালদের গানে,—যাদের সঙ্গে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক যোগ তত স্পষ্ট নয়, অথবা যারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সযত্নে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা ক'রেছে। এ ছাড়া খাস বাংলার মধ্যেও যেখানে এই পাঁচস্বারিক গ্রামের চিহ্ন আছে, বুঝতে হ'বে সেগুলো গান নামে চ'লে গেলেও আসলে আবৃত্তি-ধর্মী, আর সেইজন্যই সুরকে সেখানে নিতান্তই সরল ও সংক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রবেশ করতে হ'য়েছে ; যথা, ভাটের গান। এই ধরনের কয়েকটি উদাহরণ বাদ দিলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের সাধারণ সঙ্গীতের মধ্যে পাঁচ স্বর নয়, সাতস্বরেরই প্রয়োগ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে শিল্পসঙ্গীতসুলভ জটিলতা না থাকলেও, পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যে যতটুকু অলংকার তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আঘাত না ক'রেও টিকে থাকতে পারে, তাও রয়েছে। কোনও যুগে এই পল্লী-সঙ্গীতও পাঁচস্বরমূলকই ছিল কি না, তা' আজ আর বলবার উপায় নেই ; আজ কেবল এই কথাই বলব, বাংলার লোক-গীতি অন্যান্য যাবতীয় লোক-সঙ্গীত থেকে আলাদা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপভঙ্গীতে নয়, সাত স্বরের বিশেষ ঐশ্বর্য নিয়েও। আর কেবল সুরের দিক দিয়েই নয়, ছন্দের দিক দিয়েও এর মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব হ'য়েছে। এর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে রাগসঙ্গীত বা শিল্পসঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুটা চেতনা জাগ্রত রয়েছে ব'লেই সুরে ও

পল্লীগীতিতে প্রযোজ্য স্বরের সংখ্যা

সুর ও ছন্দে বৈচিত্র্য

তালে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত ব্যাপারটিই পল্লী-সঙ্গীতের আপন সত্তার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, গান শুনতে শুনতে সহসা এ সব কথা কারও মনে হবে না, যদি না সে আগে থেকে তার বিশ্লেষণী বুদ্ধিটি শানিয়ে নিয়ে তৈরী হ'য়ে থাকে।

সকল দেশের পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যেই কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ রয়েছে, দেশকাল-অনুগত বিশেষ ভঙ্গিমাটি ছাড়াও। ভাষার মত সঙ্গীতও একটা বিশেষ ভাব-কল্পনাকেই প্রকাশ করে, উপযুক্ত পদবিন্যাসেই (musical phrases) তার সম্পূর্ণতা। এই কথার ব্যাখ্যা ক'রে টার্ণার সাহেব বলেছেন—'একটা কথা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে চাই যে, সঙ্গীতের মধ্যে ভাষা নয়, সাঙ্গীতিক ভাবকল্পনা বা তার অঙ্গগত পদের সম্পূর্ণতাই প্রয়োজন।' তিনি হয়ত এখানে এই কথাই বলতে চেয়েছেন, পল্লীসঙ্গীতের মধ্যে ভাষার সম্পূর্ণতা নয়, সুরের নক্সাগত সম্পূর্ণতারই প্রয়োজন বেশী; কেন না, এই বিশেষ নক্সাগুলো বা পদগুলো (musical phrases) সমগ্র গানের মধ্যে বারবার আবৃত্ত হ'তে দেখা যায়। এই দিক দিয়ে অর্থাৎ সুরের দিক দিয়ে পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যে একটি অত্যন্ত সরল বাঁধুনী র'য়েছে, অল্প কয়েকটি পদমিশ্রণে তার সুসম্পূর্ণ রূপটি ফুটে উঠে। এই পদান্তর্গত স্বরগুলি সরলভাবে কিংবা জটিলভাবে সজ্জিত থাকতে পারে, যেমন বাংলাদেশের অনেক লোকগীতিতেই তা' দেখিতে পাওয়া যাবে, ছন্দ ও সুর উভয় দিক দিয়েই; কিন্তু সবগুলো পদ নিয়ে যে সমগ্র গঠনভঙ্গীটি তৈরী হোলো, তা' সরস ও সংক্ষিপ্ত। শিল্পসঙ্গীতের মধ্যে যে ব্যাপ্তি ও জটিলতা সুর ও তালকে আশ্রয় ক'রে আছে, এখানে তার অভাব।

পল্লীগীতির সাধারণ লক্ষণ

পল্লী-সঙ্গীতের আর একটি লক্ষণ হোলো, সে স্বয়ংসম্পূর্ণ,—যে পরিবেশে যেমন ভাবে এই গান গীত হ'য়ে থাকে, সেখানেই তার পূর্ণ রূপটি পুরোপুরি প্রকাশিত হয়,—সেই বিশেষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, নিজেদের হাতে তৈরী একতারা দোতারা জাতীয় দু' একটি যন্ত্র, এমন কি গায়কদের বাগ্‌ভঙ্গীর সেই অসাধু উচ্চারণ—এ সব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে এ'লে পল্লী-সঙ্গীতের অঙ্গহানি হ'তে বাধ্য; এমন কি, সভ্য জগতের বিচিত্র মধুরধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্র-সংযোগে গীত হ'লেও তার এই অভাবপূরণ আর কিছুতেই হয় না। এই ধরনের একটি ব্যাপারকেই লক্ষ্য ক'রে বোধ হয় পূর্বোক্ত টার্ণার সাহেব লিখেছেন—'এই

অজ্ঞাত গ্রাম্য রচয়িতাদের রচনা মূলতঃ 'মেলডি' জাতীয় (melody) হ'লেও এদের মধ্যে স্বর-সঙ্গতির (harmony) জৌলুস আনতে গিয়ে পরবর্তী সঙ্গীতজ্ঞগণ বারবার ব্যর্থ হ'য়ে কেবল এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, তাদের নিজেদের সাঙ্গীতিক জ্ঞান এই অজ্ঞাত শিল্পীদের কাছে নিতান্তই হীন।' মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা হ'লেও বাংলার লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এর কিছুটা সমর্থন পাওয়া যাবে। নানা প্রতিষ্ঠানের তাগাদায় আজকাল ওস্তাদি বা আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বাংলার কোনও কোনও পল্লী-গীতির সংস্কার বা উন্নতি-বিধানের যে হাস্যকর চেষ্টা করছেন, তার মাধ্যমেই এর প্রমাণ মিলতে পারে।

লোক-সঙ্গীতের আলোচনায় যতই অগ্রসর হব, ততই দেখতে পাব যে, এর সৃষ্টি অশিক্ষিত মস্তিষ্কের খামখেয়ালীতে নয়, এর মধ্যেও রয়েছে সমস্ত সার্থক শিল্পসম্মত নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলা, যুক্তি দিয়ে যার বিচার চলে; গ্রাম্য গায়ক জেনে হোক, না জেনে হোক, অত্যন্ত কঠোর ভাবেই তা' পালন ক'রে থাকে। এমনি কি, রাগসঙ্গীতের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকার যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করেছেন এবং আধুনিক রাগসঙ্গীত চর্চায় যা' প্রায়ই উপেক্ষিত হয়, তারই দু'একটাকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে এই লোক-সঙ্গীতে অনুসৃত হ'তে দেখে এই কথাই মনে হয়, রাগ-সঙ্গীতের জন্ম-ইতিহাসের পেছনে আছে যে এই লোক-সঙ্গীতই, তা' বোধ হয় মিথ্যা নয়। তাই লোক-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত লক্ষণগুলো অন্ততঃ রাগ-সঙ্গীতের প্রথমাবস্থায় বর্তমান ছিল, ধ'রে নিতে পারি। পরে অবশ্য ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে সে পুরাণো নিয়মকে বর্জন ক'রে নূতন নিয়ম গ'ড়ে তুলেছে। তবু রাগ-সঙ্গীতের সেই প্রাচীন পদ্ধতিগুলো এখনও কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। আমরা 'গ্রহ অংশ ন্যাস' নামে শাস্ত্রীয় সূত্রানুযায়ী কোন রাগের যে বিশেষ স্বরে আরম্ভ, বিশেষ স্বরসন্দর্ভে স্থিতি, এমনি আর এক বিশেষ স্বরে বিরতির নির্দেশ পাই, তারই কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে। এখানে কেবল এইটুকু বলতে চাই যে, সঙ্গীতের বৈয়াকরণেরা বোধ হয় লোক-সঙ্গীতের কোন নিয়ম-নিষ্ঠা থাকতে পারে, এ'কথা বিশ্বাস করেন না; তা না হ'লে, সব সময় কানের কাছে শুনতে পেয়েও কি ক'রে তাঁরা এ সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার আছেন?

লোক-সঙ্গীতের সুনির্দিষ্ট প্রণালী

(৪)

বাঙ্গালী জীবনের নানাদিকের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে, বাংলার লোক-সঙ্গীত। দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি থেকে উচ্চ আধ্যাত্মিক কল্পনা পর্যন্ত সর্বত্র সুর জুগিয়েছে এই লোক-গীতি।

নদীমাতৃক বাংলা দেশ। জলের সংগে তার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে যেমন সে অন্ন যোগায়, অন্যদিকে বন্যায় তার অন্ন ঘুচিয়েও দিয়ে যায়।

ভাটিয়ালীর প্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব

এই নদীর ধারে ও বুকের উপর বাস ক'রে যে সমস্ত ও মাঝি, নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এর সংগে তাদের প্রাণের যোগ স্থাপন ক'রেছে, ভাটিয়ালী তাদেরই আনন্দ-বেদনায় নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। ভাটিয়ালী এই আনন্দ-বেদনারই রসরূপ; এর মধ্যে দিয়েই নিরক্ষর চাষী ও মাঝির সুখদুঃখের প্রেমভক্তি-ভালবাসার নানা কথা সরল সৌন্দর্যে ফুটে উঠে। এইসব গানের মধ্যে সাধারণ মানুষের মনের কথাই ব্যক্ত। হ'তে পারে বাউলের তত্ত্বগভীর বাক্যের কাব্যসৌন্দর্য এখানে নেই, তবুও একথা সহজেই বলা চলে যে, তত্ত্বকথার চেয়ে মানুষের সুখদুঃখটা প্রাচীনতর। তত্ত্বকথা বলতে গেলে মনের প্রবীণতার প্রয়োজন হয়; এই কথা মনে রেখে এবং বাংলা দেশের এই বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা ক'রে আমরা বলতে পারি, ভাটিয়ালীর সৃষ্টি বাউলের অনেক আগেই হ'য়েছে। তাই এখান থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক্।

আমরা পল্লী-সঙ্গীতকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—এক, যে সমস্ত গান ঘরের মধ্যে বা প্রাঙ্গণে অনেকের সংগে একযোগে গাওয়া হয়; আর এক

"বাইরের" গান ও "ঘরের" গান

প্রকারের গান, যা' গাওয়া হয় ঘরের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বা শূন্য নদীর বুকে। ভাটিয়ালী এই শেষোক্ত শ্রেণীর গান এবং বোধ হয় সকল প্রকার বাংলা লোকগীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেবল তাই নয়, এর অসামান্য প্রভাব নানা গীতের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করছে, বাউলও বাদ যায় না। এইদিক থেকে ভাটিয়ালীকে বাংলা পল্লীগীতির ভিত্তি-স্বরূপই বলা চলে। আমরা অবশ্য ভাটিয়ালীর সুরের দিক দিয়েই এই কথা বলছি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মারফৎ যে ভাটিয়ালীর সংগে আমাদের পরিচয়, আসল ভাটিয়ালীর চেহারা সে'রকম নয়। বিভিন্ন যন্ত্র ও

তাল সহযোগে জাঁকজমকের সঙ্গে গীত ভাটিয়ালী শুনেই আমরা অভ্যস্ত ; কিন্তু মেঘনার বুকে বা সুর্মা নদীর উপত্যকা ও তৎসংলগ্ন হাওর অঞ্চল যেখানে এই সঙ্গীতের খাস জন্মস্থান, সেখানে এই ভাটিয়ালী শুনতে পাওয়া যাবে না। কারণ, আসল ভাটিয়ালীর সঙ্গে কোন যন্ত্রই বাজে না, তার গতিও স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ তাল বা ছন্দোহীন। অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু এতে অবাক্ হ'বারও কিছু নেই।

ভাটিয়ালী গায় একজনে, শোনেও বোধ হয় একজনেই। হাতে কোন কাজ নেই, পাল তু'লে দিয়ে হাল ধ'রেছে নৌকার মাঝি, এই অবসরটুকু ভ'রে তুলবার জন্যে সে গান ধরেচে—'আমি স্বপ্নে দেখি··· ············" ; নদীর জলের সঙ্গে, উন্মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে এ'র সুর বাঁধা। উপরে অনন্ত নীলাকাশ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে নীচে তার বহুদিনের চেনাশোনা নদী নিতান্তই জানা সুরে একটানা গান গেয়ে চলেছে, চারদিকে দৃষ্টি কোথাও বাধা মানে না,—এই দিগন্ত প্রসারিত শূন্যতার মাঝখানে একলা মাঝি। সে জানে এই প্রশান্ত গম্ভীর বিস্তৃতিকে কোন সুরের মন্ত্রে ভ'রে দেওয়া যায়, কর্মহীন অবসরে নদীর সঙ্গে মুখোমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা তার মনে প'ড়ে যায়। এই নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে মনের দুয়ার আপনিই খুলে যায়। কিন্তু পরকে শোনাবার তাগিদ নেই, তাড়াহুড়ো করবার কোনও প্রয়োজন নেই—তাই তার কণ্ঠ থেকে যে গান বেরোয়, সে গান ছন্দের বন্ধনে সুরকে চঞ্চল ক'রে তুলে না, সুর তার স্বচ্ছন্দগতিতে মাঝির মনের কথার দু'একটিকে মাত্র একেক বারে সঙ্গে নিয়ে লম্বা একটানা পথে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তে পাড়ি জমায়। এমন পরিবেশে সাধারণ শিক্ষিত লোক হয়ত দার্শনিক হ'য়ে পড়বেন, কিন্তু আমাদের মাঝির চোখ বুজে দর্শন-চিন্তা করার সময় নেই, কোনও একটা পদাংশের মাঝখানে সুরকে ছাড়ান দিয়ে সে হয়ত বড় জোর হুঁকোয় দুটো টান লাগিয়ে নিচ্ছে এবং তারপরে বাকী পদটুকু পূরণ ক'রে দেওয়ায় মাঝখানের এই বিবৃতিতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ছে না। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ভাটিয়ালীর এই নিবিড় অন্তরঙ্গতা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রকৃতির ঠিক মাঝখানে থেকে তার মর্মবাণীর সন্ধান যেন এরা পেয়েছে, তাই এদের কণ্ঠের সুরের আকৃতিকে আকাশ নদী বন ও প্রান্তর যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে ধরে। তার নিরাভরণ

ভাটিয়ালীর খাঁটিরূপ

ছন্দোবন্ধনহীন কণ্ঠস্বর প্রকৃতি নিজের হাতে পূর্ণ ক'রে তোলে। শুদ্ধমাত্র কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে যে এই অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাকে সুন্দরতর করবার ক্ষমতা কোন যন্ত্রের নেই।

পূর্বোক্ত অঞ্চলে অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা হয়তো এমনি কোন এক মাঝির গান শুনতে পাবেন, নয়তো দেখবেন গরু-মোষগুলোকে চরাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে গাছতলায় শু'য়ে আছে কোন রাখাল, তারও চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ,—সবুজের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আকাশ মাটির শেষ সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ শুনবেন, সেই পূর্বশ্রুত ভাটিয়ালী সুরে আর কোন নতুন গানের কলি। এই রাখাল কোন ছন্দোবদ্ধ কাজে ব্যস্ত নয়, সেই মাঝিও ছিল না; এদের চারদিকে প্রকৃতির মধ্যেও কোনও চঞ্চল ছন্দস্পন্দন অনুভূত হচ্ছে না—তাই ব'লেই যে ভাটিয়ালী ছন্দোহীন, এমন মনে হ'তে পারে। আরও মনে হয়, এই প্রকৃতির দুলালেরা যে মুহূর্তে কাজকর্মের ফাঁকে একটু হাঁফ ছেড়ে প্রকৃতি মায়ের কাছটিতে এসে বসে, সেই মুহূর্তেই সে তাদের অন্তরের মধ্যিখানে প্রবেশ ক'রে তাদের কণ্ঠস্বরের বাঁশীটিকে বাজিয়ে তোলে। এই অপরূপ একাকীত্ব, বাইরের প্রকৃতির এই বিশাল বন্ধনহীন বিস্তার, এই মধুর কর্মহীনতা—এই সবই যেন একযোগে এই পরমাশ্চর্য গীতধারাকে সৃজন ক'রেছে।

সুদূর পল্লীঅঞ্চলের ভাটিয়ালীকে তার বিশিষ্ট পরিবেশ থেকে সহরে টেনে এনে সর্বসাধারণের গোচর ক'রে একদিকে যেমন ভাল কাজই করা হচ্ছে, তেমনি একে সহুরে রুচির উপযোগী ক'রে তুল্‌তে গিয়ে এর আসল রূপটিই ঢেকে ফেলা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে এখনও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কেন না, এমনি ক'রেই অনুরূপ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে ইউরোপের অধিকাংশ ভাল লোক-সঙ্গীত বর্তমানে এমন ভদ্র অর্থাৎ বিকৃত রূপ নিয়েছে যে, তাদের আসল রূপ গবেষণার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'হারমোনাই-জেশন' বা স্বর-সঙ্গতির যৌথ কারবারের চাপে প'ড়ে ইউরোপীয় লোক-সংগীতের চেহারা এমন ভাবে পাল্টে গেছে যে, তাকে চেনা তো দুষ্করই, পল্লীঅঞ্চলে আর তাকে খুঁজেও পাওয়া যায় না, বরং পাওয়া যায় কোন সহরবাসীর সংগৃহীত কৌতূহলোদ্দীপক দুর্লভ সামগ্রী রূপে।

সহুরে ভাটিয়ালী

ভাটিয়ালীর এই স্বভাব সম্পূর্ণতা, যন্ত্র ও ছন্দের সাহায্য ব্যতিরেকেই তার রূপের যে এই পূর্ণ প্রকাশ, সে সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনামত কারণ নির্দেশ

ক'রে এইবার ভাটিয়ালীর অন্যান্য দু'একটি লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা যাক্। ভাটিয়ালীর গঠনভঙ্গীর মধ্যে আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এতে দু'তিনটি শব্দ নিয়ে এক একটি শব্দগুচ্ছ এক একবারে উচ্চারিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ থাকে এই উচ্চারণের পরেই লম্বা একটানা বা আন্দোলনযুক্ত একটি স্বরের কাজ। সাধারণতঃ, দেখা যাবে, শব্দগুচ্ছের শেষ বর্ণটি যে স্বরে গিয়ে দাঁড়ায়, সেই স্বরটিই দীর্ঘ হ'য়ে উঠে। এই স্বরের দৈর্ঘ্য কতটুকু হ'বে তার কোন বাঁধাধরা মাপকাঠি নেই, তা' সম্পূর্ণ নির্ভর করে গায়কের নিজস্ব মেজাজ ও রুচিবোধের উপর। স্বরপ্রয়োগের দিক দিয়ে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়—আরম্ভেই ভাটিয়ালী সাধারণতঃ চড়ার সুরের দিকে চলে যায় এবং তারপরেই ধীরে ধীরে কখনও বা দ্রুতবেগে নেমে আসে খাদের দিকে, সেইখানে ক্রমেই গান যেন বিশ্রাম লাভ করে। এ যেন প্রাণের কোন গভীর কথাকে দিগ্‌দিগন্তে শুনিয়ে দিয়ে আবার নিজের প্রাণের গভীর খাদেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এ ছাড়া ভাটিয়ালীতে সাতস্বরের প্রয়োগ তো হয়ই, অনেক সময় এর গানের গতি দুই সপ্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। এই ব্যাপারে রাগ-সঙ্গীতের কোন প্রচ্ছন্ন হাত আছে কি না, কিংবা রাগ-সঙ্গীতের কোন গীতরীতির সঙ্গে এর কোথাও সাদৃশ্য আছে কি না, সে সব বিচার একটু পরে করা হবে। 'বাইরের' গান হিসাবে ভাটিয়ালীর এই বর্ণনার পরেই মনে হবে, আর একটি পল্লীগীতির কথা, 'বাইরের' গান হয়েও যা' ভাটিয়ালীর স্বভাবের একান্তই বিপরীত।

ভাটিয়ালীর গীতরীতি

আমরা সারি গানের কথা বলছি। ভাটিয়ালী ছন্দোহীন মন্থরগতি, সারি গান ঠাসবুনো ছন্দে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। দুই প্রকার গানই সেই মাঝিরাই গেয়ে থাকে, কিন্তু তবু দুইয়ে কী ক'রে এই পার্থক্য সম্ভবপর হোলো, তার বিচার করতে গেলে দেখতে পাব যে, এমন ব্যাপার ঘটেছে পরিবেশের তফাতের জন্যেই। ভাটিয়ালী একজনের গান ব'লেই এবং পরিবেশের এই নির্জন উদার বিস্তৃতির জন্যেই সুরের মধ্যে এই নির্লিপ্ত ধ্যান-গভীরতা রয়েছে, ছন্দের ঠোকাঠুকিতে যাকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলা হয় না। আর সারিগান বহু জনের সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীত বলেই এবং বিশেষ ছন্দোবদ্ধ কাজের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই এর মধ্যে তাল কেবল অপরিহার্যই নয়, বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ। ভাটিয়ালীকে যদি রাগ-সঙ্গীতে ধীর-গম্ভীর

সারি বনাম ভাটিয়ালী

আলাপের চালের সঙ্গে তুলনা করি, তবে সারিগানে রয়েছে যেন দ্রুতগতি গতের চাল।

সারিগানের সময় ও উপলক্ষ্য হচ্ছে বৈঠার সাহায্যে নৌকা চালানো—ছোট পাঁচসাত হাত লম্বা নৌকা থেকে আরম্ভ ক'রে ষাটজনের উপযোগী ছিপের নৌকা একযোগে তালে তালে যখন দ্রুতগতিতে চালানো হয়, তখনকার গান এই সারিগান, এই action-এর মধ্যে সে গেয়—বিশেষ একই প্রকার কাজের একঘেয়েমিকে দূর ক'রে তাকে সুন্দর গতি দেবার জন্যে, ছন্দ তাই আপনিই এসে পড়ে। ভাটিয়ালীতে এই action-এর ও উদ্দেশ্যের একান্ত অভাব ব'লেই তার মধ্যে শিল্পগত সৌন্দর্য আরও গভীরতর হ'য়ে উঠেছে। সকলের সংগে মিলে গায়ের জোরে তালে তালে বৈঠা চালানোতে শরীর ও মনে যে ছন্দস্ফূর্তি জাগে, দাঁড় ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকায় ঠিক তার উল্টো ব্যাপার ঘ'টে থাকে। এ ছাড়া সারি কথাটা যদি শ্রেণী অর্থে ধরা যায়, তা' হ'লেও একটা অর্থবোধ হ'তে পারে, কেন না; শ্রেণী থাকলেই শৃঙ্খলা থাকবে, তা নইলে তার গতির মধ্যে সৌন্দর্য জাগে না, আর ছন্দ তো শৃঙ্খলিত তালমাত্রাই।

সারিগানের প্রয়োগ ক্ষেত্র

একসংগে কাজ করার মধ্যে এই ছন্দের আবির্ভাব আমরা নানাভাবেই দেখে থাকি। কোনও একটা ভারী জিনিষ তোলবার বা ঠেলবার সময়, ছাদ পেটাবার সময় এবং এমনি দৈনন্দিন নানা ব্যাপারে সকলেই হয়ত দেখেছেন যে, একটা ছন্দে কাজ হচ্ছে এবং সেই ছন্দকে রক্ষা করিবার জন্যে একটা ছড়ার মতন কি যেন আবৃত্তি করা হচ্ছে। ঐই ছড়াই বোধ হয় সারি বা তার অনুরূপ গানের প্রাথমিক ভিত্তি। ক্রমোন্নতি হ'তে হ'তে একদিন হয়ত এতে সুর যোজনা করা হয়েছে এবং অর্থহীন ছড়াগুলিও ধীরে ধীরে লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে বিশিষ্ট ছন্দের আমদানি ক'রে তাকে সুন্দর তালে পরিণত করা হয়েছে।

সারি পর্যায়ের অন্যান্য গান

শুধু নৌকা চালানোর ব্যাপারেই সারিগান সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই বহুলোক একসঙ্গে একই ধরনের কাজে নিযুক্ত, সেখানেই আমরা এই ধরনের গান শুনতে পাই। ছাদ পেটার গান, ধান কাটার গান ইত্যাদি, নানা নাম থাকলেও, আসলে এ'গুলো সারিজাতীয় গানই। কাজের পার্থক্য অনুসারে কথার বিভিন্নতা

থাকলেও, সুরের রচনা-কৌশল প্রায় সর্বত্রই এক। সুরের দিক দিয়ে এই সমস্ত গান ভাটিয়ালীর কাছে ঋণী। এমন কি, কথার দিক দিয়েও সারিগান অনেকটা ভাটিয়ালীর মতই। কাজেই তফাৎটা বেশির ভাগ নির্ভর করছে গাইবার ভংগীর মধ্যে, ছন্দ থাকায় ও না থাকায়।

বাংলার পল্লী-সংগীতে ভাটিয়ালীর প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর, তার সুরের নক্সাটাকে একটু হেরফের ক'রে যে কত ভাবে বিভিন্ন লোক-গীতিতে যোগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আগে আমাদের একটি ফেলে আসা আলোচনা আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক্। ভাটিয়ালীর সুরের এই নক্সাটির আরও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং তার সংগে রাগ-সংগীতের কোন যোগাযোগ রয়েছে কি না, তাও দেখাবার চেষ্টা করা দরকার।

রাগসংগীতের সঙ্গে সম্পর্ক

পল্লী-সঙ্গীতে যে নিয়মতন্ত্রের অভাব নেই এবং রাগসঙ্গীতের সঙ্গে তার কিছুটা সম্পর্ক থাকা যে একেবারে বিচিত্র নয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। ঝিঁঝিঁট বাংলা দেশে এত জনপ্রিয় রাগ কেন, এমন কি অনেকের কাছে স্বর্গীয় আখ্যা পেয়ে এসেছে কেন, এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, প্রায় সমস্ত পল্লী-সঙ্গীত ও এমন কি কীর্তনের মধ্যেও এই রাগেরই স্বরগ্রাম বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই রাগ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। আমরা দেখব, এমন অনেক গান আছে, যা'তে মূলতঃ ভীমপলাসী রাগ বা কাফী ঠাটের স্বর লাগলেও কোথাও কোথাও এই খাম্বাজ ঠাটের স্বরও যুক্ত হয়েছে। এইখানে ব'লে রাখা ভাল যে, পূর্বভারতীয় সঙ্গীতে ঝিঁঝিঁটের দুই রূপ স্বীকৃত,—এক, যা খাদের পঞ্চম পর্যন্ত নেমে আসে, এবং অন্যটি যা খাদের ধৈবত পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়। রাগসঙ্গীতে এই শেষোক্ত প্রকার ঝিঁঝিঁটের নাম কঁসৌলী ঝিঁঝিঁট। এই নামটি আমাদের জেনে রাখা দরকার—অধিকাংশ পল্লী-সঙ্গীতের পেছনে রয়েছে এই কঁসৌলী ঝিঁঝিঁট। সাধারণ ঝিঁঝিঁটের বা তথাকথিত পাহাড়ী ঝিঁঝিঁটের স্বররূপ হচ্ছে:—স র ম I প ম গ ব স ণ্ ধ্ প্ I প্ ধ্ স র গ ম গ, ধ স I আর পল্লীগীতির ঝিঁঝিঁট বা এই কঁসৌলী ঝিঁঝিঁটের স্বররূপ এই রকম:—স র ম I প ম গ র স ণ ধ্ I ধ্ স স র গ, র গ স I এখানে একথা বললে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—আমাদের মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রকার ঝিঁঝিঁটের

মূল রয়েছে এই পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যেই। উল্লিখিত স্বরব্রূপের মধ্যে কেবল ভাটিয়ালী নয়, অন্যান্য লোকগীতিরও সাধারণ রূপ প্রত্যক্ষ করছি ব'লেই এই সিদ্ধান্ত করার যৌক্তিকতা অনুভব করছি। অনেক রাগের মূল যে এই পল্লীর সুরের মধ্যেই, সেই কথার প্রমাণও যেন এই প্রসঙ্গে কিছুটা পাচ্ছি।

এদিকে গানের মধ্যে কথার পরিবেশনের নিয়ম আলোচনা করলে দেখা যাবে, শিল্প-সঙ্গীতের টপ্‌পা নামক গীতরীতির সঙ্গে এ বিষয়ে ভাটিয়ালীর বেশ মিল রয়েছে। এখানে হিন্দুস্থানী টপ্‌পা নয়, বাংলা টপ্‌পার কথাই বলা হচ্ছে। টপ্‌পা গোড়ায় হিন্দুস্থানী রীতিতে গীত হ'লেও বাংলা দেশে এসে সে নবরূপ ধারণ করেছে, তার মধ্যে বাংলার নিজস্ব রুচিও মেজাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দুস্থানী টপ্‌পায় অত্যন্ত দ্রুত তালের যে তাড়া আছে, বাংলা টপ্‌পায় তা' নেই—এখানে তালগুলির গতি মন্থর। কেবল তাই নয়, এই সব তালে মোটামুটি ভাবে তালের হিসেব থাকলেও মাত্রা গুণ্‌তির হিসেব নেই, অর্থাৎ সুর মাত্রার সঙ্গে লাফালাফি ক'রে অগ্রসর হয় না—ছন্দ এখানে গা ঢাকা দিয়ে পিছনে স'রে আছে। ভাটিয়ালীর মত এর কথাগুলোও এক এক গোছা ক'রে গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আর তার পরেই কথার হাল থেকে ছাড়ান পেয়ে সুর 'জমজমা' নামক তালের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে। তফাৎ দাঁড়াল এই, ভাটিয়ালীতে একটানা সুরের যা কাজ, টপ্‌পার বেলায় 'জমজমা' তালের কাজও তাই। যদি বলা যায়, বাংলা টপ্‌পায় ভাটিয়ালীর প্রভাব আছে, তা' হ'লে বোধ হয় খুব মিথ্যা কথা বলা হবে না। বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত-চেতনা সর্বত্র সঞ্চারিত হ'য়ে রয়েছে ব'লেই টপ্‌পার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে ব'লে মনে করতে পারি। এই টপ্‌পা বাংলার কেবল পল্লী-সঙ্গীত নয়, গত শতকের নানা প্রকারের গীত থেকে আরম্ভ ক'রে এ' যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীত পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলা টপ্‌পা বনাম ভাটিয়ালী

রাগসঙ্গীত-সুলভ নিয়মতান্ত্রিক আলোচনায় আমরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হচ্ছি। রামায়ণ গান বা পুরাণ গান ইত্যাদি প্রায় আবৃত্তিমূলক গানের কথা বাদ দিলে বাউল, ভাটিয়ালী, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় লোক-সঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের আস্থায়ী ও অন্তরার মত দুটি ভাগ পাই, অবশ্য ধ্রুপদে বা আধুনিক বাংলা গানে যে বাকী দুটো

গানের কলি বা 'তুক'

তুক্ সঞ্চারী ও আভোগের পরিচয়ও পাই, পল্লীগীতিতে প্রায় কোথাও তা' নেই। এই শেষ তুক্ দুইটির প্রয়োগে শিল্পসঙ্গীত জটিলতর ও সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠেছে। কবিগানে জুড়িরা যে অত্যন্ত চড়াস্বরে গান ধ'রে থাকে, তার মধ্যে আস্থায়ী অন্তরা ভাগ থাকার কথা নয়, তবে 'কবি'র নিজের গানের সঙ্গে তুলনায় এই চড়া স্বরের কাজে সমস্ত গানটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা রয়েছে মনে করতে পারি। পুরাণ গান ইত্যাদিতে পাঠক সাধারণতঃ চার লাইন এক সঙ্গে উচ্চারণ করেন এবং তাদের মধ্যে স্বরের তফাৎ বড় একটা থাকে না; কোথাও কোথাও এই চার পংক্তিতে চার রকম স্বরই ব্যবহৃত হয়। তাকে আস্থায়ী অন্তরার ভাগে ভাগ করা যায় না, যদিও এই ভাগ চারটির কথা একেবারে উপেক্ষাও করতে পারি না। অন্ততঃ একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্যেও এই স্বরের তফাৎ দরকার। এই চার পংক্তি গাইবার পরেই সম্মিলিত কণ্ঠে একটু উঁচু স্বরে গাওয়া হয় দিশা বা ঘোষা। প্রসংগতঃ বলা চলে, বইয়ের মূল গানের স্বরকে এইখানে উন্নততর করার চেষ্টা রয়েছে, পল্লীর গায়কেরা এতে পাল্লা দিয়ে নূতন ও সুন্দর স্বর যোজনা করে। এমনি ভাটের গান বা কবিতাতে প্রথম দুই পংক্তির স্বরই সর্বত্র গাওয়া হয় ব'লে আস্থায়ী অন্তরার প্রশ্ন উঠে না, আগেই বলা হয়েছে।

দিশা বা ঘোষা

আমরা এতক্ষণ বাউল সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বাউলের স্বরে ও কথার গভীর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনায় যে কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর সংগৃহীত লোক-সঙ্গীতে, তাঁর রচিত গানে। বাউল, দেহতত্ত্ব, মারফতি, শরিয়তি, হকিয়তি, মাইঝ-ভাণ্ডারি ইত্যাদি সবগুলিই প্রায় সমগোত্রীয় ব'লেই শুধু একটিরই আলোচনা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থানীতে 'বাউরা' মানে পাগল। বাউল মানেও পাগল হওয়া বিচিত্র নয়। গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, এই সব তত্ত্বের কথা কাব্যের রূপকে বাউলের মধ্যে পাই। বাউল সংসার বিরাগী যোগী, তার চিন্তাধারা কর্মধারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে খাপছাড়া অস্বাভাবিক—তাই সে পাগল বৈকি। আর বাউলের কোন সম্প্রদায় নেই, 'বাউল সম্প্রদায়' কথাটা বোধ হয় শব্দের অপপ্রয়োগ। তাই দেখি আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্বের আলোচনায় সাম্প্রদায়িকতা নেই—এখানে সুফী ফকিরের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে, জাতিভেদের কথাও সুতরাং এখানে উঠে না।

বাউল

এই সেদিন 'খ্যাপা' নাম দিয়ে যে বাউল গান রচনা ক'রে গেলেন, সেগুলো গাওয়া হয় সাধারণতঃ ফিকিরচাঁদ ফকিরের রচিত সুরে। শ্যামা-সঙ্গীতে 'রামপ্রসাদী' যেমন বিশেষ এক ধরনের সুর, বাউলের বেলায় 'ফিকিরচাঁদি'ও সেই রকম এক বিশিষ্ট সুর। পল্লীগীতিতে শিল্পসঙ্গীতের মতন ধ্রুপদ খেয়াল জাতীয় গীত-রীতির নাম নেই, কিন্তু গীত-রীতি আছে; 'ফিকিরচাঁদি' এই রকম এক গীতরীতি।

এই 'ফিকিরচাঁদি'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা চলে। আমরা পূর্বে পল্লী-সঙ্গীতে এক ধরনের ঝিঁঝিঁট রাগ ও খাম্বাজ ঠাটের উল্লেখ করেছি।

খাম্বাজ ও বিলাবল ঠাটের প্রাধান্য

'ফিকিরচাঁদি'র রূপটি একটু আলাদা। কঁসৌলি ঝিঁঝিঁট যা' ভাটিয়ালীতে খুব বেশী প্রচলিত তার রূপটি হচ্ছে,—স র ম, প ম গ ধ স ণ় ধ়, ধ স - স র গ, র গ স I এর সঙ্গে 'ফিকিরচাঁদি'র তুলনা করা যাক্ :—II স I স র I গ প - I ধ ন - I ধ স স I ন ধ প I প ম গ I - গ র I র গ ম I গ র স I - - II খুব সূক্ষ্মবিচার না ক'রেও বলা চলে, এতে বিলাবল পর্যায়ের রাগের প্রভাবই বেশি। এই প্রসঙ্গে একথা ব'লে রাখছি যে, বিলাবল আমাদের যাবতীয় দেবস্তুতি ও তত্ত্বমূলক সঙ্গীতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সুর। অধিকাংশ সংস্কৃত স্তোত্র বিলাবলের শুদ্ধ স্বর সাহায্যে গাইলে ভাল শোনায়—গাম্ভীর্য রক্ষার পক্ষে এই ধরনের সুরই ভাল—এটা অনেকেই স্বীকার করবেন। তবে এক কারণে বৈঠকী সঙ্গীত হিসেবে এই গাম্ভীর্য বাউলে রক্ষিত হয়নি—সেটি হচ্ছে বাউলের ছন্দোবাহুল্য, তারও কারণ, বাউল গান গাইবার সময় নাচে। বলা বাহুল্য, এ পাগলের নাচ নয়। সাধারণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করলেও বাউলের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে—এ নৃত্য তাই বেপরোয়া মাতামাতি নয়, তাই বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তালেও বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাল ফের্‌তা আছে। এক হিসেবে বাউল গান শুধু কানে শোনবার নয়, চোখে দেখবারও বস্তু। বাউলের একতারা, নৃত্যের ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই সামনে থেকে দেখে শু'নে তবে বুঝতে হয়; এ সম্পর্কে নন্দলালের আঁকা বাউলের চিত্রটি মনে করা যেতে পারে। এখানে শ্রাব্যের সঙ্গে দৃশ্যসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ সমন্বয় ঘটেছে।

এই বাউল গানে একটু আগেই দেখতে পেয়েছি যে, বিলাবল অঙ্গীয় রাগের

প্রভাব রয়েছে। তা ছাড়া একথা বলাও হয়েছে যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতে ঝিঁঝিঁটের প্রভাবটাই সবচেয়ে ব্যাপক। বাংলা দেশে বিভাসের এক বিশেষ রূপ চলতি আছে—এটিও বিলাবল অঙ্গের এবং এই সুরেও অনেক পল্লীসঙ্গীত আছে, তবে এই সব পল্লীসঙ্গীতে মাঝে মাঝে একটু কোমল নিখাদ ব্যবহার করার দিকে ঝোঁক রয়েছে, আর তা' করলেই কিছুটা ঝিঁঝিঁটের সঙ্গে সম্পর্ক জন্মে যেতে পারে।

বাংলা লোক-সঙ্গীতের আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইখানে আলোচনা করা যাক্। কবিজাতীয় গান ছাড়া অধিকাংশ পল্লীগীতির গঠনরীতির মূল ভঙ্গিমাটুকু থাকে পূর্বাঙ্গে, অতএব বিভিন্ন সুরের মধ্যে পার্থক্যের পরিচয় সেখানেই বিশেষভাবে রয়েছে। এদিক দিয়ে এই সঙ্গীতকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি :—(১) যে সব সুর 'স র ম প' এমনি ক'রে আরোহণ করে, (২) যেগুলো 'স গ ম প' ক'রে (৩) যেগুলো 'স র গ প' ক'রে ও (৪) যে সব সুর 'স র গ ম প' এমনি ক'রে পঞ্চম পর্যন্ত সোজাসুজি সরলভাবে আরোহণ ক'রে যায়। এই চারটি প্রকারের প্রথমটি দেখা যাচ্ছে 'গ' বাদ, দ্বিতীয়টিতে 'র' বাদ, তৃতীয়ে 'ম' বাদ ও শেষটিতে পূর্বাঙ্গের কোন স্বরই আরোহণে বাদ যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটি বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করতে বলছি এই জন্যে যে, লোকসঙ্গীতে উপরি-উক্ত নিয়মগুলো এমন কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হ'য়ে থাকে, যা' কেবল রাগ-সঙ্গীতেই দেখা যায়। এই ব্যাপারটির মধ্যে আরও একটু গুরুত্ব রয়েছে এইজন্য যে, রাগ-সঙ্গীতের প্রায় সমস্ত রাগই এই পদ্ধতিতে ভাগ ক'রে দেওয়া যায়। রাগ-সঙ্গীতে যে নিয়মনিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি, তার মূল যে কোন্খানে এই সম্বন্ধে একটা সন্দেহ মনে জাগা স্বাভাবিক।

স্বর-প্রয়োগগত বিশ্লেষণ

আমরা ইতিপূর্বে 'গ্রহ অংশ ন্যাস' ব'লে রাগ-সঙ্গীতের একটা অতি প্রাচীন সূত্রের উল্লেখ করেছিলাম। এই সূত্র অনুসারে কোন রাগের প্রথম সূচনা কোনও একটি বিশেষ স্বরে এবং কতকগুলো বিশেষ স্বরসন্দর্ভে তার রূপ প্রকাশিত হ'তে হ'তে একটি নির্দিষ্ট স্বরে এসে দাঁড়ালে তার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয়। আজকাল রাগবিচারে প্রায় কেউই এই নিয়মটির কথা ভাবেন না; কিন্তু ভাবলে মাঝে মাঝে যে সুফল পাওয়া যায়, সে কথা নিশ্চিত। আমার মনে হচ্ছে, এই সূত্রটি

গ্রহ অংশ ও ন্যাস

পল্লী-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অতি সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। এবং তাই ব'লেই আমাদের আগেকার সন্দেহটা কেবলই দৃঢ়ীকৃত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্ :—স র ম, প ম গ র স ণ ধ; ধ স, স র গ, র গ স, পল্লী-সঙ্গীতের এই সুরটিতে ষড়জ থেকে গান আরম্ভ না করলেই শিল্পের দিক দিয়ে বিকৃতি ঘটবে। রাগ-সঙ্গীতের শিল্পমুগ্ধ ভক্ত ও বৈয়াকরণেরা এর থেকে এইটুকু শিক্ষা লাভ করতে পারেন যে, তাঁদের নিজেদেরই রাগ সম্বন্ধীয় নিয়মকানুনগুলি কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য সঙ্গীত-রচয়িতারা অনুসরণ ক'রে আসছে, অথচ তাঁরা নিজেরা এ বিষয়ে কতটা পরিমাণে উদাসীন হ'য়ে পড়েছেন!

মালদহ অঞ্চলের গম্ভীরা মূলতঃ শিবকেই উপলক্ষ্য ক'রে গীত হ'লেও এই নামটিকে আশ্রয় ক'রে নানা বিষয়ের গানই গাওয়া হ'য়ে থাকে। শিবও সব সময় তাঁ'র দেবত্বের মহিমা নিয়ে দূরে থাকতে পারেন না, ভক্তেরা তাঁকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের গণ্ডীর মধ্যে; দেশের আর্থিক, সামাজিক দুর্গতির জন্যে তাঁকে দায়ী করে। কথার দিক থেকে গম্ভীরা অনেক বেশী পরিমাণে জীবন্ত। অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের মত গম্ভীরার স্বররূপ অত সরল নয়, এর কারণ বোধ হয় শিল্প-সঙ্গীতের প্রভাব। নিত্য নতুন ঘটনা বা অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে প্রতি বছরই বহু গম্ভীরা গান রচিত হচ্ছে; নতুন গান রচনার সময়ে স্বভাবতঃই গীত-রচয়িতা বা সুর-রচয়িতারা সমসাময়িক সঙ্গীতের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হ'তে পারছেন না। ফলে এর সুরের কাঠামোর পেছনে পাচ্ছি একদিকে শিল্পসঙ্গীত বা অন্যান্য এমন সঙ্গীত যা লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না এবং অন্য-দিকে লোকসঙ্গীত—এই উভয়ের একটা যোগসূত্র গম্ভীরায় রয়েছে। এই দিক দিয়ে পল্লীর প্রতিভা আরও অগ্রসর হ'লে ভবিষ্যতে আমরা এক অভিনব সঙ্গীতের রূপ পেতে পারি। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এ কাজ সম্ভবপর হ'তে পারে একমাত্র প্রতিভাবান্ লোক-সঙ্গীত রচয়িতাদের দ্বারাই, শিল্প-সঙ্গীত-স্রষ্টাদের দ্বারা নয়।

গম্ভীরায় সমসাময়িক সঙ্গীতের প্রভাব

এইমাত্র দেখা গেল, গম্ভীরা মূলতঃ শিব-বিষয়ক হ'লেও অন্যান্য নানা বিষয়ও এতে গাওয়া হয়, হাসির গানও বাদ পড়ে না। কি বিষয়-বস্তুতে, কি সুরে পল্লী-সঙ্গীতে বিভিন্ন প্রকারের গানের মধ্যে নানা মিশ্রণ চ'লে এসেছে। কোন একটা গীতরীতি জনপ্রিয় হ'য়ে গেলে অনেক স্থলে ক্ষেত্র ও বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তার প্রয়োগ করা হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুরের বিনিময়

তাই বিভিন্ন প্রকার গানে অনেক সময় আমরা একই রকমের সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করতে পারব। রূপকথার মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময় ছোট ছোট গান থাকে, তাদের সুর পুরোপুরি ভাটিয়ালীর সুর। 'বাইরের' গান হ'য়েও ভাটিয়ালী 'ঘরের গানে' ও তার প্রভাব বিস্তার করেছে। গদ্যে রচিত ছোট ছেলেদের উপযোগী ক'রে টেনে টেনে বলা এই রূপকথায় ছন্দোহীন এই ভাটিয়ালী সুরের প্রয়োগ একদিকে খুবই মানানসই হয়েছে বলতে হবে। 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন'—বাউলের একটি বিখ্যাত গান; এই গানের সুর হয়ত শোনা যাবে মৈমনসিংহের ব্রহ্মপুত্রে ঘটিত কোন এক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত গীতে—

'বাড়ী তার চন্নপাড়ার চরে।
গোপী শীলের গণা গোষ্ঠী
ব্রহ্মপুত্রে ডুইবে মরে।'

লোক-সঙ্গীত কি সুরের দিক দিয়ে, কি তালের দিক দিয়ে সাধারণতঃ সরলই হ'য়ে থাকে। কতকগুলো বিশেষ ধরনের লোক-সঙ্গীতে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোনও কোনও গীত-রচয়িতার হয়তো একটু জটিল তাল ব্যবহারের দিকে ঝোঁকই থাকে, কীর্তন গায়কদের প্রভাবেও এমন ব্যাপার সম্ভব হ'তে পারে। ফলে দাদরা, কাশ্মীরী, খেম্‌টা, খয়রা ইত্যাদি সোজা তালের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই শোনা যায় লোফা, রূপক বা তেওট ইত্যাদি কঠিন তালের গান।

জটিল তাল

বাংলার পল্লী-সঙ্গীতে স্বরপ্রয়োগে একটা জিনিষের অভাব হয়ত অত্যন্ত স্পষ্ট। তার স্বর-রচনায় কমনীয় সৌন্দর্যের অভাব নেই, সুরের ও তালের নানা কারিগরিরও অভাব নেই, কিন্তু নেই কেবল পৌরুষের পরিচয়। এই দিক দিয়ে ঝুমুর জাতীয় সংগীতের রূপ অন্য রকম—সুরের বৈচিত্র্য না থাকলেও এসব গানের গীত-ভংগিমায় বলিষ্ঠতা রয়েছে। এর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলা লোক-সঙ্গীতের এই অভাব কোন দিন দূর হ'তেও পারে। বাংলার পল্লীগীতিতে সুরের নানা কৌশল থাকলেও, কোনও আয়াসসাধ্য অলঙ্কার বা স্বরভঙ্গি নেই, এটিও লক্ষ্য করবার মত। এই শেষোক্ত লক্ষণটি বাংলা দেশের প্রায় সব রকম আধুনিক ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দেখতে পাওয়া যায়। জলবায়ুর জন্যেই হোক, আর বাঙ্গালীর মানসিক

পরুষ ভাবের অভাব

গঠনভঙ্গীর জন্যেই হোক, এখানকার গানে মাধুর্য ও প্রসাদগুণ একটু বেশি পরিমাণেই পাওয়া যায়। ঝুমুরের সুরের নক্সায় বহু দূরস্থিত দুটি স্বরের মধ্যে মীড়ের সাহায্যে যোগস্থাপনের চেষ্টার বদলে যে হঠাৎ লম্ফ প্রদানের ভাব দেখা যায়, সেটা সাঁওতালি গানেরই যে নকল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার একান্ত নিজস্ব পল্লীগীতির মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের জারীগান ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি গীতরীতিতে আমরা সুরের খানিকটা উদ্দামগতি লক্ষ্য করি। এর কারণ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান করবেন।

আধুনিক যুগে বাংলা পল্লীসংগীতে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, এখানে তাদের কতকগুলি উল্লেখ করছি—

(১) তারের যন্ত্র—একতারা, দোতারা, সংগ্রহ, গোপীযন্ত্র, সারিন্দা।

(২) শুষির যন্ত্র—মুরলী, আড়-বাঁশী, টিপ্‌রা বাঁশী, শিঙা।

(৩) আনদ্ধ যন্ত্র—ঢাক, ঢোল, কাড়া, ঢোলক, খোল, মাদল, খঞ্জনী বা খুঞ্জুরী, আনন্দলহরী বা খমক।

(৪) ঘন যন্ত্র—বহু প্রকারের করতাল, খটতাল, মন্দিরা, কাঁসি, কাঁসর, ঘণ্টা।

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী*

* এই গ্রন্থের জন্ত বিশেষ ভাবে লিখিত।

পরিশিষ্ট—(খ)

বধূর বিদায়-সঙ্গীত

৩১৬ পৃষ্ঠায় 'বধূর বিদায় সঙ্গীত' (bridal farewell song) প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গিয়া অনুমান করা হইয়াছিল যে, বাংলাদেশেও উড়িষ্যার অনুরূপ এই বিষয়ক লোক-সঙ্গীত প্রচলিত থাকিতে পারে, তবে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অতঃপর অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মৈমনসিংহ জিলার মুসলমান সমাজে অনুরূপ সঙ্গীত আজিও প্রচলিত আছে। নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি তাহার প্রমাণ।

'গ্রাম্য বালিকার প্রথম স্বামী-ঘরে যাবার দিনের বিদায় পর্ব কত করুণ! বাপ-মাকে, ভাই-বোনকে ছেড়ে এক অজানা দূরের গাঁয়ে—এক অজানা সংসারে যেতে তার মন চায় না কিছুতেই। তবু যেতেই হয়; তাই সে কেঁদে কেঁদে বিদায় নেয় একে একে সকলের নিকট থেকে। প্রথম সে যায় তার সাত ভাইয়ের কাছে:

দেখ গো দয়ার সাত ভাই তুই নয়ন মেলিয়া,
কালি যে আছিলাম গো সাত ভাই
তোম্‌রার উর ভরা,
আজু উতি যে যাইবাম গো সাত ভাই
তোম্‌রার উর খালি ॥
দেখ গো দয়ার মাওজান তুই নয়ন মেলিয়া,
কালি যে আছিলাম গো মাওজান
তোম্‌রার উর ভরা,
আজু উতি যে যাইবাম গো মাওজান
তোম্‌রার উর খালি।

এমনি ক'রে বালিকা মা-বাপ-ভাই-বোন, চাচা-চাচি সকলের নিকট থেকে কেঁদে কেটে বিদায় নেয়—গীতও ক্রমে দীর্ঘতর হয়।' (রওশন ইজদানী, 'মোমেনসাহীর লোক-সাহিত্য', ঢাকা, ১৩৬৪, পৃঃ ৭১-৭২)।

পূর্ব বাংলার কুমারী মেয়েদিগের মাঘমণ্ডল ব্রতে যে এক শ্রেণীর লোক-

সঙ্গীত আজিও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বর্তমানে ব্রতাচারের (ritual) অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্বে যে বিবাহ-বিষয়ক লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় ; মনে হয়, তাহার এই অংশ পূর্বে বধূর বিদায়-সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন—

এখন কেন কান্দ, বাপধন, মুখে গামছা দিয়া,
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।
এখন কেন কান্দ, মাগো, শানে পাছাড় খাইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥
এখন কেন কান্দ, ভাই গো, খেলার সজ্জা, লইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥

তারপর,

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি॥
নাইয়ারে দিয়াম তাড় বালা মাঝিরে দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভায়ের কান্দন শুনি॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে উঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি বাপের কান্দন শুনি॥

কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত উপরি উদ্ধৃত বিদায়-সঙ্গীতগুলির তুলনায় উড়িষ্যায় প্রচলিত অনুরূপ সঙ্গীতগুলির কাব্যগুণ অনেক বেশি। নিম্নে আরও কয়েকটি ওড়িয়া বধূর বিদায়-সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল।

গানগুলি উড়িষ্যার কটক জিলা হইতে সংগৃহীত—ইহারা সুগভীর সামাজিক তাৎপর্যমূলক। এই প্রকার সঙ্গীত পশ্চিম বাংলার কোন অঞ্চলে এখন প্রচলিত আছে কি না, কিংবা কোনও কালে প্রচলিত ছিল কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। পূর্ববঙ্গে যে এখনও আছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১)

বোউ, হলিলা পানিরে গোড় দিআই দউনখিলু
লো বউ।
এবে কোউপরি দরিআ মঝিরে প্রখর স্রোতরে
ভঙ্গা তরণীরে নাবিক কলুলো বোউ।

মুঁ সতে দরিআ মঝিরে প্রখর স্রোতরে
ভঙ্গা তরণীরে নাবিক হোই নাব বাহিবি কি।
তমে মানে মোর ভল শুনিব লো বোউ ॥

পিণ্ডা দাঢ়ে বাট চালি আসএ নাহিঁ লো বোউ।
কোউ পরি খণ্ডা দাঢ়ে বাট চলিবি মুঁহিঁ লো বোউ ॥
যেত বেলে মতে জনম দেলুলো বোউ।
ছাতিরে গোড় বেকরে খুর দেই
মারি থাআন্তু লো—
সেত বেলে দোষ লাগি ন আন্তা লো।
এতে বেলে বড় দোষ লাগিব লো
সেত বেলে দোষ লাগিথিলে ব্রাহ্মণকু
তিল স্বর্ণ দান করিথিলে পাপরু
মুক্তি লভি আআন্তু লো বোউ।
এ দোষরু মুক্তি লভিবা নাহি লো বোউ ॥

মা, আমাকে স্রোতের জলে পা দিতে দাও নাই। এখন কেমন করিয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রখর স্রোতে ভাঙ্গা নৌকার নাবিক করিয়া ভাসাইয়া দিলে? আমি কি সত্যই সমুদ্রের মধ্যে প্রখর স্রোতে ভাঙ্গা তরণীর নাবিক হইয়া নৌকা বাহিতে পারিব? আমার ভাল দেখা ত তোমার উচিত।

ওগো মা, বারান্দার ধার দিয়া আমি হাঁটিতে জানি না। আমি কি করিয়া খাঁড়ার ধারের (edge) উপর দিয়া পথ চলিব? যখন আমাকে জন্ম দিয়াছিলে তখন আমার বুকে পা এবং গলায় ক্ষুর দিয়া মারিয়া ফেলা উচিত ছিল, তাহা হইলে তখন তোমাকে কেহ দোষ দিত না। ওগো মা, এখন বড় দোষ লাগিবে। তখন দোষ লাগিলে ব্রাহ্মণকে তিল-স্বর্ণ দান করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতে—এখনকার দোষ হইতে আর মুক্তি পাইবে না।

(২)

কেতকী বাস কি গেণ্ডু[১] পুষ্পরে।
ঝিঅ স্নেহ কাহিঁ ঝিআরি ঠারে[২] ॥

---

১ গেঁদা, ২ ভাইঝিতে।

মায়ামৃগ[১] দেখি রাম ভুলিলে।
গোলাপ ফুলরে তুমে ভুলিল ॥
শুআস্ক[২] তুণ্ডরে[৩] শ্রীকৃষ্ণপদ।
সারি কহে সিনা রাধা গোবিন্দ ॥
কাউ[৪] সে কথাকু কাহুঁ[৫] পাইব।
কাআ কাআ হোই রাজ্য বুলিব[৬] ॥
হল লঙ্গলরে যাহার মন।
সে কাহুঁ জানিব মর্যাদা মান ॥
অপার সিনা লক্ষে টঙ্কা জঞ্জাল।
ফুল পাখুড়ারে[৭] মোর জঞ্জাল ॥
সামুকার জন্ম পানিরে লীন।
মোর জন্ম খন্দাশালরে[৮] লীন ॥
পিঠি কি জানিব পেটর কথা।
পর কি জানিব মো মন কথা ॥
পিণ্ডা[৯] দাঢ়ে[১০] বাট চালি ন থিলি।
খণ্ডা[১১] দাঢ়ে বাট কি প্রকারে চালিবি ॥

কেতকী পুষ্পের যে সুগন্ধ, তাহা কি গেঁদা ফুলে পাওয়া যাইবে? মেয়ের প্রতি যে স্নেহ, তাহা কি ভাইঝির প্রতি স্নেহের সমান হইতে পারে? রামচন্দ্র মায়ামৃগ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, তুমি গোলাপ ফুল (জামাইকে) দেখিয়া ভুলিয়া গেলে। টিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে, ময়না রাধাগোবিন্দ নাম বলিতে পারে—কাক সে কথা কোথায় পাইবে? কা কা করিয়া রাজ্যময় ঘুরিয়া বেড়াইবে। হাল-লাঙ্গলে যাহার মন পড়িয়া আছে, মান মর্যাদা সে কি করিয়া জানিবে? দিদির জন্য লক্ষ টাকার চিন্তা, আমার জন্য ফুল পাঁপড়ির চিন্তা। (এখানে মনে হইতেছে, পিতা অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার যোগ্যতর স্থলে বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু কনিষ্ঠার বিবাহ-কালে সেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন নাই, ফলে যোগ্য বরও পান নাই। সেইজন্য কন্যাটি মাতাপিতার উপর অভিমান বশতঃ এ'কথা বলিতেছে।)

---

১ ঋ-কারের উচ্চারণ 'রু', ২ টিয়াপাখীর, ৩ মুখে, ৪ কাক, ৫ কোথা হইতে, ৬ ঘুরিবে, ৭ পাঁপড়িতে, ৮ রান্নাঘরে, ৯ বারান্দা, ১০ ধারে, ১১ খাঁড়া।

শামুকের জন্ম জলের জন্য, আমার জন্ম রান্নাঘরের জন্য। পিঠ পেটের কথা কি করিয়া জানিবে? পর আমার মনের কথা কি জানিবে? বারান্দার ধার দিয়া কখনও পথ চলি নাই—খাঁড়ার ধারের উপর দিয়া এখন কি করিয়া পথ চলিব?

(৩)

চরণ পদ্মতলু[১] দয়া সাগর।
সতে এ দুখিনীকি[২] কল[৩] অন্তর॥
বড় কঠিন তুম্ভ স্নেহ ছাড়িবা।
তীক্ষ্ণ অসিধারে পথ চালিবা॥
লঙ্কা অসুরঙ্ক সঙ্গে বিবাহ দেই।
এবে ত রহিব অচিন্তা[৪] হোই॥
শিবঙ্কু আশ্রা[৫] করি বৃষ যেসন[৬]।
ঘাস গ্রাসরে তার বিতে জীবন॥
সেহি পরায়[৭] দশা হোলা মোহর।
বৃথা সেবিবা সিনা তব পয়র[৮]॥

হে দয়ার সাগর, তোমার চরণ-পদ্মতল হইতে এই দুঃখিনীকে সত্যই দূর করিলে? তোমার স্নেহ ছাড়িয়া যাওয়া তীক্ষ্ণ অসিধারের উপর দিয়া পথ চলার মত কঠিন। লঙ্কার অসুরের সঙ্গে (আমার) বিবাহ দিয়া এখন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে। শিবের মত দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বৃষের যেমন ঘাস খাইয়া জীবন কাটিয়া যায়, আমার সেই প্রকার দশা হইল। তোমার চরণ সেবা আমার বৃথা হইল। (ইহা গৃহদেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। মাতাপিতা এবং গৃহদেবতা ইঁহারা যেন প্রত্যেকেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র; সরলা বালিকা গৃহ-দেবতাকেও এখানে মানুষের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া দেখিতেছে—এই সর্বত্র সমদর্শিতার মধ্যে একটি উচাঙ্গের সাহিত্যিক আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে।)

১ তলা হইতে, ২ দুখিনীকে, ৩ করিলে, ৪ নিশ্চিন্ত, ৫ আশ্রয়, ৬ যেমন, ৭ প্রায়, রকম, ৮ চরণ।

পরিশিষ্ট—(গ)

শব্দসূচী

অ

আ

ব

সমাপ্ত

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি. এইচ. ডি প্রণীত

বাংলার লোক-সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া

ভূমিকা

বাংলার ছড়ার বিভিন্ন বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

ছেলেভুলানো

দোলনা, ঘুম আয়রে, ঘুম যারে, ঘুম যায়, বর্গী এল দেশে, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, নিদ্রালি মা, খোকার খাওয়া, কান্না, নৃত্য, অভিযান, বিয়ে, খোকা ও চাঁদ, খোকা ধন, শিশু ও মা, শিশু ও কৃষ্ণ, মামাবাড়ী, পশুপক্ষী, বিবিধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছেলেখেলা

আগডুম-বাগডুম, আইকম-বাইকম, শিবঠাকুরের বিয়ে, প্রশ্নোত্তরের খেলা, মাছ ধরনে যাব, ঐন্দ্রজালিক, হাডুডু, বিবিধ খেলার ছড়া।

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক জীবন

বৌ, বুড়া বড়, জামাই, ভাসুর, ননদ, কন্যা, পতিগৃহে যাত্রা, প্রেম, সাত ভাইয়ের বোন, ঘর কন্না, ইত্যাদি।

উৎসব

গাজন, দোলপূজা, মাগন, পীর ও গাজী, পোষেড়া, নীল।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রত

যমপুকুর, পুণ্যি পুকুর, দশপুত্তল, সেঁজুতি, হরিচরণ, অশ্বত্থনারায়ণ, হ্যাঁচড়া, গজুই, ভাদুলি, ভাইফোঁটা, ইতুপূজা, থোয়াব্রত, তোষলা, তারা, মাঘমণ্ডল, ইত্যাদি

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছড়া ও আধুনিক বাংলা কবিতা

সপ্তম অধ্যায়

ছড়ার ছন্দ

'এতদিন পর্যন্ত আমরা তাঁকে পণ্ডিত গবেষক বলেই জানতাম, কিন্তু তাঁর ভেতরে যে একটি সৌন্দর্যভুক্ মনের অস্তিত্ব বর্তমান, তার সন্ধান মিলবে এখানে।' ...লেখকের শক্তি এবং জীবনবোধ এখানে যথার্থ অর্থেই স্পর্শগ্রাহী।'—**যুগান্তর**, ১৭।১২।৬১

'গল্প বলার একটি সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি শুরুতেই পাঠক মন আকৃষ্ট করে। ...নানা ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও মানুষের মন যে আসলে স্নেহমমতা ভালবাসার মধ্যে আশ্রয় খোঁজে 'বনতুলসী'র কয়েকটি গল্পেই এই সহজ সত্যটি উদ্‌ঘাটিত।'—**আনন্দবাজার পত্রিকা**, ২৮।১।৬২

'প্রতিটি গল্পের মধ্যে এক আশ্চর্য চমক আছে। লিপি-চাতুর্যে এবং কল্পনার বলিষ্ঠতায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট সংযোজন এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

—**অমৃত** ১৫।১২।৬১

'লেখকের হৃদ্য আন্তরিকতার স্পর্শে গল্পগুলি মধুর ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। প্রায় সব গল্পগুলিরই পাত্র-পাত্রী অতি সাধারণ মানুষ, তথাকথিত বিদগ্ধতার কোন খোলসই নেই তাদের অঙ্গে, কোনরূপ 'ইজমে'ও ভারাক্রান্ত নয় তাদের জগৎ, তবু শুধু মাত্র সহজ সাধারণ মানুষের একান্ত ঘরোয়া হাসি-কান্নার পরিচয়েই আখ্যানগুলি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, পড়ে বেশ একটা আরাম পাওয়া যায়।' —**মাসিক বসুমতী** কার্তিক, ১৩৬৮ সাল।

'Asutosh Bhattacharyya is well-known in academic circles... His contribution to creative literature is all the more welcome, for it shows the man in the scholar...The stories are set against widely separated backgrounds and the plots are very often able to capture the mood of the locale...And one feels rather relieved that there is no psychological 'mish-mash or scholary trick in the stories.' —**Hindusthan Standard, 1.4.62.**

ক্যালকাটা বুক হাউস : ১।১ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২